বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-১৭
শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী,২০১৭

বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-১৭
শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী,২০১৭

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের গবেষক মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান কর্তৃক এম ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **"বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমরা প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এ গবেষণা কর্মটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণার ফল।

৩. এটি গবেষকের একক কর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়।

৪. এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমাদের জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষনা কর্ম সম্পাদিত হয়নি।

এ অভিসন্দর্ভটির চুড়ান্ত পান্ডুলিপিটি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়জী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **“বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)”** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার একক ও নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমি যতদুর জানি এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

জানুয়ারী, ২০১৭।

মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান

এম ফিল গবেষক

রেজি নং- ১৭

শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে। যার অশেষ কৃপায় আমার পক্ষে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একান্ত অনুপ্রেরণা ও স্নেহ মিশ্রিত তাগিদেই আজকের এ গবেষণাকর্ম। যার দেশে-বিদেশে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণার সময় প্রদানে তিনি ছিলেন হৃষ্টচিত্ত, একনিষ্ঠ। গবেষণাকর্মের নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে তিনি যেভাবে বারংবার তাগিদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং সাহস যুগিয়েছেন তা বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অবাধ প্রবেশাধিকার আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সহজতর করেছে। তাঁর ঋণ অশোধ্য। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক স্যারের সহধর্মীনী জনাবা আরিফা রহমান এর প্রতি। গবেষণার কাজে স্যারের বাসায় সময়ে অসময়ে যাতায়াতের ফলে যিনি আমাকে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গন্য করেছেন। তাঁর অবিরত সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষকই অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেইন ভূইয়া, অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. এ.কে.এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, সহযোগী অধ্যাপক মিসেস নুসরাত ফাতেমা, সহযোগী অধ্যাপক জনাব এস.এম মফিজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ সাইফুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ জাকারিয়া, সহকারী অধ্যাপক জনাব এ.টি.এম সামছুজ্জোহা, সহকারী অধ্যাপক জনাব মাহমুদুর রহমান এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। যিনি বগুড়া সংক্রান্ত নানা তথ্য-উপাত্ত, বই পুস্তক, দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তিনি শুধু নানা তথ্য দিয়েই সহযোগিতা করেননি, আমার গবেষণা কর্মের নিয়মিত খোজ-খবর নিয়ে গবেষনা কর্মটি সম্পাদনে তরান্বিত করেছেন।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমি বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন, বগুড়া সরকারী শাহ্সুলতান কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সাহিদুর রহমান, সরকারী আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোস্তফা আহাদ তালুকদার, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মীর তাইফ মামুন এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যারা প্রত্যেকেই বগুড়া সংক্রান্ত নানা তথ্য দিয়ে এবং গবেষণা কর্মের খোজ-খবর নিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই নিমাইদিমী আদর্শ কলেজের নন্দীগ্রাম বগুড়া এর প্রভাষক ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান এর নিকট।

অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি (শাহবাগ, ঢাকা), এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আরকাইভস, বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর গ্রন্থাগার (রাজশাহী), উর্ডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী (বগুড়া) জেলা পরিষদ গ্রন্থাগার (বগুড়া), গন উন্নয়ন গ্রন্থাগার (ঢাকা ও বগুড়া) সরকারী গনগ্রন্থাগার(বগুড়া), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের (ঢাবি) সেমিনার লাইব্রেরি, বগুড়া জেলা পরিষদ রেকর্ড রুম ও লাইব্রেরি, বগুড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ লাইব্রেরি, বগুড়া UPPS(NGO) লাইব্রেরী, বগুড়া নট্রামস লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বগুড়ার “মল্লিকা” পত্রিকা সম্পাদক জনাব আজিজার রহমান তাজ, বগুড়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আব্দুর রহিম বগ্রা ও অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ঢাকাস্থ বৃহত্তম বগুড়া সমিতির সভাপতি জনাব এডভোকেট মোঃ মাসুদুর রহমান (রন্টু) ও সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. কে. এম. কামরুল ইসলাম সহ বগুড়া শহরের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবেসক, সাংবাদিক, উকিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

ব্যক্তিবর্গ আমাকে গবেষণার বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বন্ধুমহলকে, তাদের মধ্যে বন্ধুবর জনাব মোহম্মদ ইসমাইলের নামে সর্বাগ্রে স্বরণ করছি। যার আর্থিক সহযোগিতায় আমি এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হয়েছি। তার কাছে আমি চির ঋণী। এছাড়া বন্ধু বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ ইয়াছিন, মাসুম বিল্লাহ, মোস্তফা হোসেইন শাহীন (মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে অবস্থানরত) ইমাম মোকারম হোসাইন (লন্ডন প্রবাসী) জাকির হোসেন খান পিটার (চায়না প্রবাসী)। বিভাগের সহপাঠী জনাব মহিউদ্দিন ওমর, আমিনুল ইসলাম (শিমু), মোঃ আনিছুর রহমান, আবু সালেহ সেকেন্দার, সাহাবুদ্দিন মিন্টু, মোজাম্মেল, ফিরোজ, আরাফাত, ফরিদ, লিটু, রনি, রাখি, পান্না, দিপু, দিপা, তানিন, সিফাত, নাজমুল, কিবরিয়া, তানজীদ, বাপ্পী, আশিক, ইমরান, অপি, সোহেল প্রমুখের কাছে ঋনী। তাছাড়া গবেষণা কর্মে বগুড়ার যে বন্ধুরা আমাকে অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে মনির, নুরুল হক, সবুজ, ফয়সাল, ইয়াকুব, জোবায়ের, মামুন এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর বগুড়ার ছোট ভাই সুজন, বান্না, নাজিব, এরশাদ, রাজু, মঞ্জু, হামিদ, আজাদ, জনি, তানিম, সাদ্দাম, কাজল, রাকিব, রতন, সবুর, সবুজ, দিনার ও ইলিয়াস এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মোঃ আফছার আলী সরকার, স্নেহময়ী মাতা জনাবা মোছা মালেকা বেগম ওরফে মাসুমা এর প্রতি। যাদের অকুণ্ঠ সমর্থন, ভালবাসা আর প্রতিনিয়ত গবেষণা কর্মের খোজ খবর নিয়ে আমার এ গবেষণা কর্মটি তরান্বিত করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তিন ভাই জনাব আব্দুল মান্নান সরকার, আব্দুল হান্নান সরকার, আব্দুল খালেক সরকার এবং তাঁদের সহধর্মীনিরা সুইটি, মুনজিলা, সালমাদের প্রতি। আমার শ্বশুর বাংলাদেশ ব্যাংকের জয়েন ডাইরেক্টর জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, শ্বাশুড়ী জানাবা মোছা রশিদা বেগম আমাকে গবেষনা কর্ম সম্পাদনে তাগিদ, উৎসাহ ও সহযোগীতা দান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। আমি তাদের কাজে চির ঋণী। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মরহুম চাচা মোঃ আজিজার রহমান সরকার কবিরাজ এবং চাচী আমেনা, চাচা আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ সরকার ও চাচী রশিদা, চাচাতো ভাই মানিক ও রাসেল, ভাতিজা মারুফ, সিনদিদ, হামীম, মুন্তাফী ভাতিজি তাবাসসুম,

মাইশার প্রতি। আমার শ্যালক তানভীর মাহতাব ও রাশেদ শাহরিয়ার গবেষণা কর্মের উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাদের অবদান কে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি। পরিবারের আর সবার সহযোগিতাও আমি স্বরণ করছি। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী মোছা সালসাবিল মাসুদ (মনি) গবেষণার ব্যাপক উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি তার সাফল্যময় জীবন কামনা করছি।

জানুয়ারী, ২০১৭।

মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান

এম ফিল গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

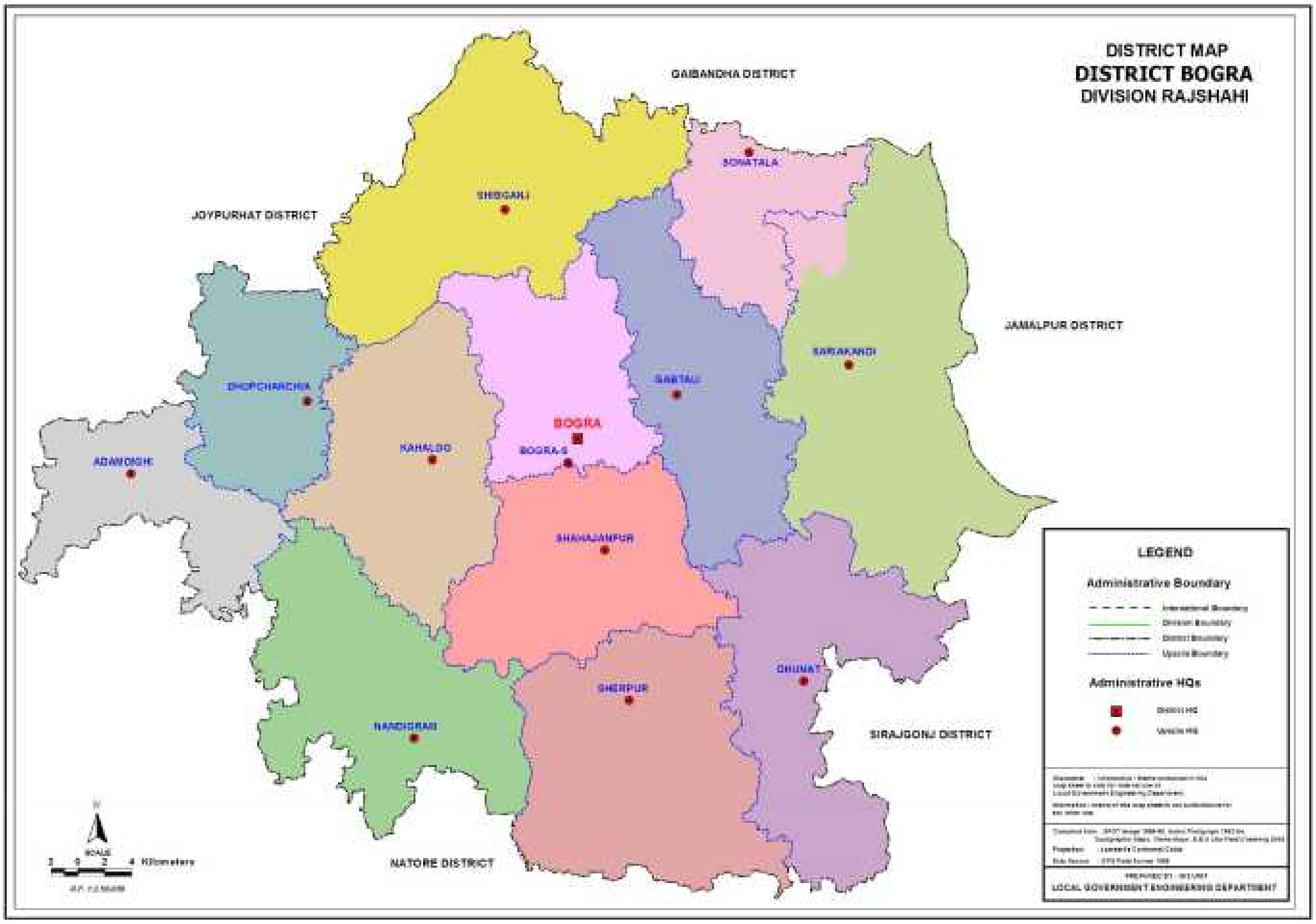

বগুড়া জেলার মানচিত্র-১*

*www.google.com/ Engineering Dept./Bogra

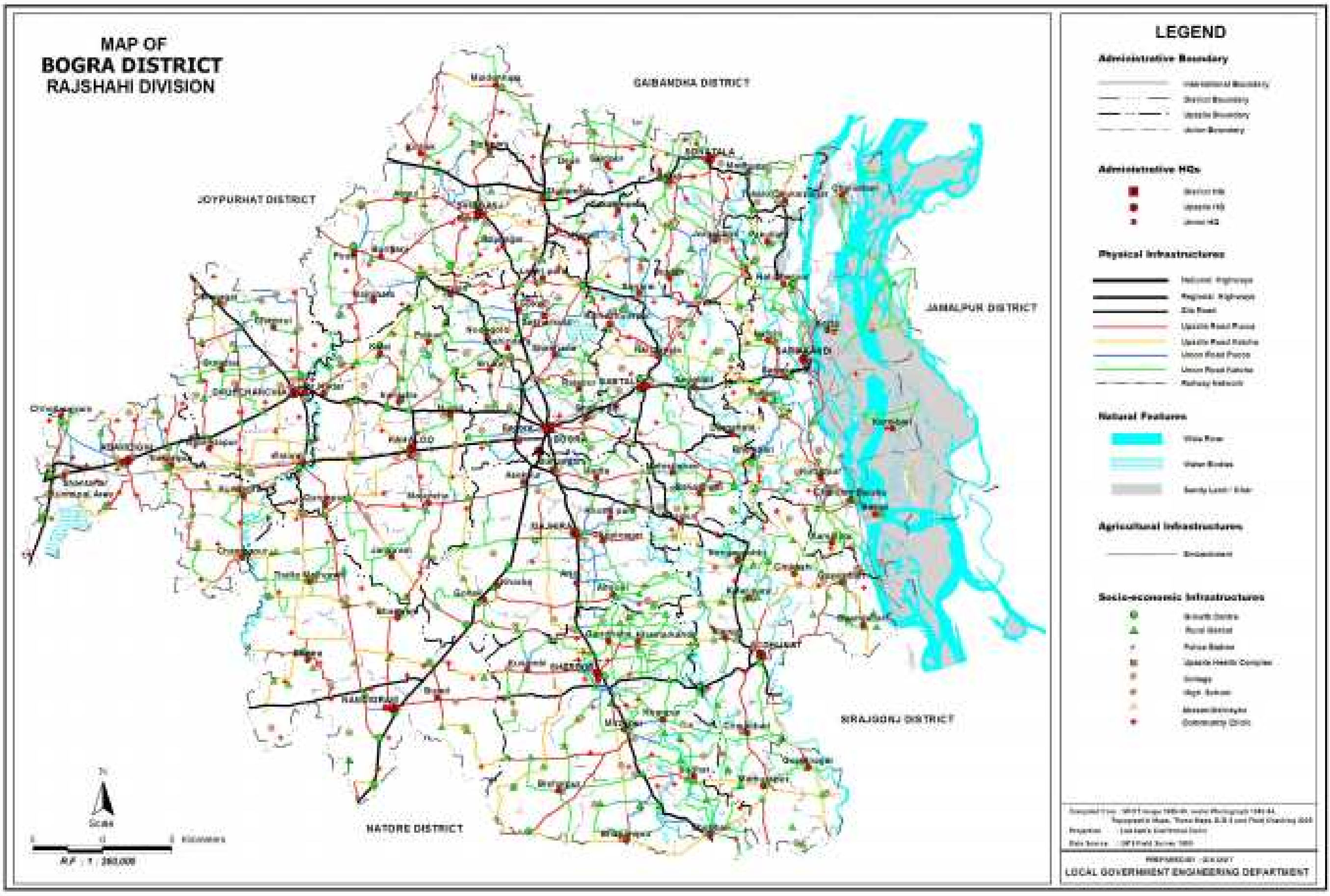

বগুড়া জেলার মানচিত্র-২*

---

*www.google.com/ Engineering Dept./Bogra

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র..	i
ঘোষণাপত্র..	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার..	iii-vi
মানচিত্র..	vii-viii
সূচীপত্র..	ix-x
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা..	**১-১৫**
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বগুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতি ও ইতিহাস	**১৬-২৯**
২.১ জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ..	১৬-২৩
২.২ জেলার গঠন প্রণালী..	২৪-২৬
২.৩ জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..	২৬-২৯
তৃতীয় অধ্যায় ঃ সমাজ	**৩০-৭১**
৩.১ অধিবাসীদের পরিচয়..	৩০-৩৬
৩.২ বাসগৃহ..	৩৭-৪০
৩.৩ খাদ্যাভ্যাস..	৪১-৫১
৩.৪ পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার..	৫১-৫৫
৩.৫ সামাজিক উৎসব..	৫৫-৭১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ সংস্কৃতি	**৭২-১৭১**
৪.১ ভাষা ও সাহিত্য..	৭২-১০৬
৪.২ মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্প..	১০৭-১২৯
৪.৩ লোকসংগীত ও যাত্রা..	১২৯-১৪১
৪.৪ সংবাদপত্র..	১৪২-১৭১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বগুড়া জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা **১৭২-২১৭**

৫.১ বগুড়া জেলায় শিক্ষার প্রেক্ষাপট.. ১৭২-১৭৩

৫.২ বগুড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তার.. ১৭৩-১৭৩

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষা.. ১৭৪-১৭৫

৫.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা... ১৭৬-১৮৮

৫.৫ উচ্চতর শিক্ষা... ১৮৮-২০২

৫.৬ নারী শিক্ষা... ২০২-২০৬

৫.৭ বিশেষ শিক্ষা.. ২০৭-২১৪

৫.৮ মাদ্রাসা শিক্ষা... ২১৪-২১৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্টজনদের অবদান........... **২১৮-৩০১**

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার... **৩০২-৩০৭**

গ্রন্থপঞ্জি.. ৩০৮-৩২৮

পরিশিষ্ট (ক) ৩২৯-৩৭১

পরিশিষ্ট (খ) ৩৭২-৩৯৩

পরিশিষ্ট (গ) ৩৯৪-৪০০

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ একটি জাতির আত্মপরিচয়কে জানতে হলে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানকে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না । কেননা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই মানুষের সার্বিক ধীকল্প, চিন্তা-চেতনা ও কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ ও রূপায়ণ ঘটে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক ইতিহাস যতটা গুরুত্ব পেয়েছে জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা ততটাই অবহেলিত হয়ে আছে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার ইতিহাস; সরকার উত্থান-পতনের ইতিহাস। এতে সাধারণ মানুষের ইতিহাস প্রায়ই অনুপস্থিত। অথচ রাষ্ট্রের ভাঙাগড়া মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে; পরিবর্তন আনে জনপদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হলে এখানকার সমাজ জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের ফলে বাঙালির জীবনে ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। একইভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবেও এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে লক্ষনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় আমরা এসব পরিবর্তনের চিত্র খুঁজে পাই না। এ জন্যই প্রয়োজন মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তনের সূত্রগুলো অনুসন্ধান করা ।

মানুষের জীবনাচরণের সার্বিক কর্মকান্ডই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে কেবল শিল্প, সাহিত্য, নাচ-গানই বুঝায় না। মানুষের আহার-বিহার, চালচলন, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, চাষাবাদ, শিক্ষাব্যবস্থা সকল কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতি নদ-নদী জলবায়ু মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ রূপ দান করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং জাতির আত্মপরিচয়কে জানতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়েও গবেষণা করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণার দিকে ইতিহাসবিদগনের দৃষ্টি পড়েছে। এক্ষেত্রে ষাটের দশকে প্রকাশিত ড. এম.এ. রহিমের ‘ Social and Cultural History of Bengal(Karachi: Pakistan Publishing House, Vol.I, 1963; Vol.II, 1967) গ্রন্থটি প্রথম প্রয়াস এবং নির্দিষ্টভাবে ‘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস’ শিরোনামে এ গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রয়াসও বটে[১]। এ গ্রন্থটি প্রসঙ্গে ড. রহিম প্রথম খন্ডের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন:[২]

“ মুসলিম আমলের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য আমি দুখন্ডে একখানা গ্রন্থ প্রনয়নের পরিকল্পনা গ্রহন করি। প্রথম খন্ড শুরু হয়েছে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এবং শেষ হয়েছে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খন্ড ১৫৭৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। বর্তমান গ্রন্থ, প্রথম খন্ডে বাংলাদেশে মুসলমান জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়, যেমন তাদের উৎপত্তি ও অগ্রগতির পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে তাদের সামাজিক জীবন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পারস্পরিক দ্বন্ধ সংঘাতের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেয়া হয়। যদিও এই গ্রন্থ প্রধানত মুসলমানদের উপর লিখিত, তথাপি হিন্দুদের উন্নতি ও তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং মতবাদ সমূহেরও যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. ডক্টর এম.এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬), ১ম খন্ড মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনু.) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২); বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭) ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (অনু.) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)।

২. ডক্টর. এম.এ. রহিম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. মুখবন্ধ (ছয়)।

এছাড়াও ড. আব্দুল করিম[৩], ড. আজিজুর রহমান মল্লিক[৪], ড. সালাহউদ্দিন আহমদ[৫], ড,. সুফিয়া আহমদ[৬], ড. ওয়াকিল আহমদ[৭], ড. মুনতাসীর মামুন[৮], ড. ইমরান হোসেন[৯], ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া[১০], কামরুদ্দীন আহম্দ[১১] প্রমুখ গবেষকগন বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। তবে অধিকাংশ গবেষকই তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্বাচিত করেছেন। ফলে এই গবেষণাগুলো থেকে বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পূর্নাঙ্গ চিত্রটি পাওয়া যায় না। এছাড়া ড. আব্দুল করিম, ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, ড. সুফিয়া আহমদ অভিন্ন বাংলার পটভূমিকায় কাজ করেছেন কিন্তু তাঁদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এগুলো থেকে বাংলাদেশের পূর্ণাংঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সিলেট-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা উত্তর বাংলার মানুষের নিকট দুর্বোধ্য। অনুরূপভাবে উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলার জীবনরীতিতে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের জীবন পদ্ধতি থেকে পল্লি অঞ্চলের মানুষের জীবন পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য। তেমনি চর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনধারাও সমতল ভূমির মানুষের জীবনধারা থেকে আলাদা। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া বাঞ্চনীয়[১২]। এক্ষেত্রে বৃহত্তর জেলাসমূহ গবেষণার ইউনিট হতে পারে। এই দৃষ্টিকোন থেকেই বাংলাদেশের একটি জেলা বগুড়া জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে আমার এই গবেষণা।

---

৩. A. Karim, *Social History of the Muslims of Bengal (Down to A. D., 1538) (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1959).*

৪. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims of Bengal (1757-1856) (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961).*

৫. Salahuddin Ahmed, *Social ideas and Social Change in Bengal (1818-1835) (Leiden : E.J. Brill, 1965).*

৬. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1884-1912) (Dacca : Oxford University press, 1974).*

৭. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)।

৮. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫) (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩)।

৯. ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)।

১০. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।

১১. কামরুদ্দীন আহ্মদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকা : জহীরুদ্দীন মাহমুদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৩, বঙ্গাব্দ।

১২. বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস চর্চা বিষয়ে দ্রষ্টব্য : মোঃ মাহবুবর রহমান, "বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাস সাধনার ধারা এবং আবদুল হক চৌধুরী", মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া ও তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), আবদুল হক চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১১৫-১৩৬; ড.কে.এম. করিম, "আর্কিভিষ্টের দৃষ্টিতে স্থানীয় ইতিহাস চর্চা", ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, Vol. 9, 1980, পৃ. ২৬-৩২; মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা", বাংলা একাডেমী পত্রিকা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৫), পৃ. ১১৮-১২৬; রতন লাল চক্রবর্তী, "বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা : একটি নিরীক্ষা", ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা (১৫শ-২০শ বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩), পৃ. ৪১-৫৮; মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "বাংলাদেশের স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় মুসলমানদের অবদান : ১৭৯৯-১৯৮৩", আই.বি.এস. জার্নাল (১৪০০ :১), পৃ. ১৩৫-১৪৫

১.২ বগুড়া জেলা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট:

বঙ্গদেশের পৌরাণিক ও প্রাচীন ইতিহাসে বগুড়া একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। অতি প্রাচীনকালে এ ভূ-খন্ড পৌন্ড্রবর্ধনের অংশ ছিল। পৌন্ড্রবর্ধন পূর্ব-ভারতের অন্যতম রাজ্য যা আরো পূর্ববর্তী রাজ্য কামরূপ থেকে করতোয়া নদী দ্বারা বিভক্ত ছিল। এ পৌন্ড্রবর্ধনের কথা মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণগ্রন্থে উল্লেখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ১২৮০ সালে পৌন্ড্র পরিবারের সন্তান বাসুদেব পৌন্ড্রবর্ধনের শাসনকর্তা ছিলেন। মহাস্থানগড়ের কয়েক মাইল উত্তরের 'মহাস্থানই ছিল পৌন্ড্রবর্ধনের রাজধানী পেন্ড্র নগর। মহাস্থানগড়ের শিলালিপি ও বিভিন্ন অশোক-স্তম্ভ থেকে জানা যায় এ জেলা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যদের শাসনাধীনে ছিল[১৩]। পরে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সপ্তম শতকে এ জেলা শশাঙ্কের এবং পরে হর্ষবর্ধনের অধীনে ছিল বলে জানা যায়। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউ-এন-শাং এ সময় পৌন্ড্রবর্ধন সফর করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিরুকী' তে পৌন্ড্র নগর বা মহাস্থানগড়ের অনেক বিবরন পাওয়া যায়। অষ্টম শতকে বগুড়া যশোবর্ধনের শাসনাধীনে আসে। ললিতাদিত্য প্রমুখের পর অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পালদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ পাল রাজা মদন পালকে পরাজিত করে বিজয় সেন এ অঞ্চল অধিকার করে সেন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেন বংশ ১১৫০ থেকে ১২০৪ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য চালায়। সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১২০৬ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত ১৭জন মুসলিম শাসক এ অঞ্চল শাসন করেন। সর্বশেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন ওরফে 'বোগরা' খান বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কথিত আছে তারই নামানুসারেই এ অঞ্চলের নাম বগুড়া হয়। ১২৮২ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত শাহী বংশের সুলতানগন এ অঞ্চল শাসন করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মোঘলদের শাসনাধীনে চলে যায় এবং প্রায় দুই শত বৎসর মোঘলদের শাসনাধীনে থাকে। অত:পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশ ইংরেজ শাসনাধীনে চলে যায়। ইংরেজদের আমলেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আধুনিক বগুড়া জেলার পতন ঘটে।

অতীতের বগুড়া ঐতিহ্যময়। তার প্রবহমান সভ্যতার বেগবান ও খরধার। সেকালের খরস্রোতা করতোয়ার প্লাবন পীড়িতা বগুড়া খিয়ার ও পলিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়। অতীতের ভীমের জাঙ্গাল, রানী ভবানী ও রানী সত্যবতীর জাঙ্গাল, মহাস্থানের গড়, পুষ্পগড়, কর্নগড়, হস্তিগড়, দুর্গাহাটার গড়, ফতেপুর গড়, বানগড়, বিহার ও গোকুলের বৌদ্ধ মেড় বা মান মন্দির, গোবিন্দ ভিটার কৃষ্ণবিষ্ণুর গোরুঢ় লীলামন্দির, গুপ্ত বারানসী, জীয়ত কুন্ড, গরুর স্তম্ভ প্রভৃতি সহ স্মারক হয়ে আছে। পাল সেন ও গুপ্ত রাজাদের আনন্দসাগর, জয় সাগর, বল্লাল দীঘি, নান্দিয়াল দীঘি, শশাঙ্ক দীঘি, হারুজ্জ বা কুজাল দীঘি, বাবা আদমের দীঘি, বেল আমলার দ্বাদশ শিবমন্দির, শেরপুর মুর্চা, কেল্লা-কুসী,মোগল পাঠানটুলী, তুর্কান শাহের শির মোকাম, ধর মোকাম, সুলতানী ধাপ, যোগীর ভবন, জৈন গোসাই পিঠ তথা সিদ্ধ তীর্থ মঠ, চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা লক্ষিন্দরের কীর্তিবহুল উজ্জয়িনী বা উজানী নগর প্রভৃতি স্থানগুলি বৈদিক, পুরাণিক ও আধুনিক পর্যায়ে চার হাজার বছরের মহাকীর্তির স্মারক হিসাবে বগুড়ার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

---

১৩. অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, ঢাকা বিজনেস পোস্ট পাবলিকেশন-১৯৯০, পৃ-৯

ক্ষত্রিয় নিধনকারী বিশ্বত্রাস পরশুরামের রাজত্ব এ বগুড়ায়। শাহ সুলতান বলখীর মহান কীর্তিও এখানে। হিন্দু মতে সতীকুল শিরোমণি বেহুলা লক্ষিন্দরের দেবগ্রাম বা দেবরাশন বগুড়ায়। পৌরাণিক পরশুরাম, বলরাম, শ্রীরাম, শ্রীগোপালের লীলাক্ষেত্র এ বগুড়া। আবার বখতিয়ার খিলজী, শাহ সুলতান বলখী, বাবা আদম, তুর্কান শাহর অমর কীর্তিও এ বগুড়ায়। গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবন পাড়া, গোবর্দ্ধনপুর, রামেশ্বরপুর, রামশহর পৌরাণিক অনিরুদ্ধ উষাহরণক্ষেত্র। উষার পিতা বান রাজার বানগড় বগুড়ায়। পৌরাণিক মহাদানবীর বলি রাজা দানবরাজা এখানকার ময়দান হাটা ও বলীপুরে রাজত্ব করতেন। বলীরাজ তনয় পুন্ডরীকাক্ষ পৌন্ড্র এ স্থানের নামকরণ করেন পৌন্ড্রবর্দ্ধন নগরী। পরে উহাই পাভুয়া নামে খ্যাত হয়। পুরাতন ভারতের নৃপতি প্রভাকর বর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন, মহারাজা বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি শাসকবর্গ বহুকাল এখানে আসীন ছিলেন। প্রবাদ কাহিনী মতে বিক্রমাদিত্য পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম সভাপন্ডিত বরাহ মিহিরের বিদুষিণী পত্নী খনাবতী এই বগুড়ারই আকাশতারা গ্রাম থেকে আকাশের তারকা গণনা করে ধন্যা হয়েছেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী, রামপালের সভাকবি সন্ধাকর নন্দী, বেহুলার ভাষানের কবি জীবন মৈত্র, শ্রীচৈতন্য চরিতের কবি কর্ণপুর বগুড়ার বিশেষ গর্বের। মহাব্যোধী গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘদিন বগুড়ার বিহার বা ভাসুবিহার সমাহিত ছিলেন। মহারাজ অশোক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জ্জুন এখানে সমাহিত রয়েছেন। জৈন্য গুরু মহাবীর পার্শ্বনাথ বগুড়ার যোগীর ভবনে সমাহিত থেকে অত্রাঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচার করেন। চালুঞ্চার একাদশ শিবলিঙ্গ বা শিববিহার চৈত্য শৈব সাক্তের বিরাট তীর্থ। মহাস্থান বীরবালা পরশুরাম সহোদরা শিলাদেবীর আত্মবিসর্জন স্থান। আর এ শিলাদেবীর ঘাট ও শেলবর্ষ পরগণা বগুড়ার পূর্ণতীর্থ। পৌরাণিক বরুন রাজার কন্যা বারুনীর আত্মবিসর্জন স্থানে এষনও বারুনীর মেলা বসে। বগুড়া শিল্পে, সম্পদে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও শস্যে এককালে মায়াফান্দ বা মায়াজাল নামে আখ্যায়িত ছিল। যার জন্য সুদূরের কাশ্মীর রাজ ছদ্মবেশে মহাস্থান রাজকন্যার পানিগ্রহন মানসে এখানে এসে মায়া ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। মহাভারতীর পঞ্চপান্ডব এখানে দীর্ঘদিন অজ্ঞাত করেছেন। দানবীর কর্ণ সুবর্ণ গ্রাম বা কর্ণপুরে গুপ্ত নিবাসপুরী নির্মাণ করে এ অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করেন। মহাবীর ভীম ও কর্ণ এখানে ভীমগড় বা কর্ণগড় স্থাপন করেছিলেন।[১৪] কাজেই বগুড়াবাসীর গর্বের বিষয়-অতীতের মহাসম্পদ, শিক্ষা ও সভ্যতার ধারক ও বাহক এ বগুড়া। ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির এই সমৃদ্ধির কারণে বগুড়া জেলা স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে আমার জানামতে এ যাবত কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ কারণে বর্তমান গবেষণাকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.১ গবেষণার সময়কালের(১৯৪৭-২০০০) যৌক্তিকতাঃ

গবেষণার সুবিধার্থে আমার গবেষণার সময়কালকে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছি। বিশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ সারা বাংলা জুড়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, ১৯২৩ সালেল বেঙ্গল প্যাক্ট, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান ভাগ বাঙালী জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৫২ সালের বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা,

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ-৯

১৯৬৯ সালের সংগ্রামী মানুষের গনঅভূত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পথচলা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ। এরপর শুরু হয় সামরিক শাসন। ক্ষমতায় আসে জেনারেল শাসকরা দেশ চালায় সামরিক ফরমানে। ১৯৮১ সালে এক ব্যর্থ সামরিক ক্যুতে শাহাদাত বরণ করেন তৎকালীন সেনা শাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এর কিছুকাল পরে আরেক সামরিক ক্যু তে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন সেনাপ্রধান হুসাইন মোঃ এরশাদ। হোঁচট খায় গণতান্ত্রিক পথযাত্রা। সামরিক শাসন উৎখাতের জন্য শুরু স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী সম্মিলিত বিরোধী দলের গণআন্দোলন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালের ৬ ই ডিসেম্বর পদত্যাগে বাধ্য হন সামরিক শাসক হুসাইন মোঃ এরশাদ। ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক বি.এন.পি সরকার। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনার নেতৃতাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার। ১৯৪৭ সালের পর থেকে রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনে গোটা বাঙালী জাতীয় জীবনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোন শতাব্দীর শুরু এবং শেষটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যে কারনে বিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষ ২০০০ সালকে গবেষণার শেষ সীমা রেখা নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৪ অধ্যায় বিশ্লেষণ:-

গবেষণার বিষয়টি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। এর প্রথম অধ্যায়ে আমরা গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যখ্যা করেছি এবং দ্বিতীয় বগুড়া জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ জেলার গঠন প্রণালী ও জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে জেলার অধিবাসীদের পরিচয় তাদের বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং জেলার নানা ধরনের উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে সামাজিক চেতনা ভিত্তিক। চতুর্থ অধ্যায়ে জেলার সংস্কৃতিক ভাবনায় ভাষা ও সাহিত্য পরিচিতি, মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্প, লোক সংগীত সংবাদপত্র বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্ট জনদের অবদান বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায় উপসংহার যাতে নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি শেষ করার পূর্বে গবেষণার মূল শিরোনামের দুটি প্রধান প্রত্যয় সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১.৫ সমাজ

একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বসবাস করে তখন সেটাকে আমরা বলি সমাজ। গিডিংস্ (Giddings) ‘সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতকগুলো স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি সমষ্টি’কে সমাজ বলেছেন।[১৫] সুতরাং ‘কোন জনসমষ্টির সঙ্ঘবদ্ধতা’ ও ‘নির্দিষ্ট কোন একটি উদ্দেশ্য’কে সমাজ গঠনের অন্যতম নিয়ামক বলা যেতে পারে।

---

১৫. ‘Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends’.
উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), সমাজ দর্শন, (কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, একাদশ পুনর্মুদ্রণ ১৯৮০), পৃ. ৪৮ (১ নং পদটীকা)

শুধুমাত্র সমাজবদ্ধ জীব হিসেবেই মানুষ একত্রে বসবাস করে না। পারস্পরিকভাবে তাদের মধ্যে চলতে থাকে অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমাজতত্ত্ববিদগণের অনেকেই পারস্পরিক এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। ম্যাকাইভার (Maciver) সমাজকে 'Web of social relationsships' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং অন্যান্য আচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Page) বলেন:[১৭]

সমাজ হল আচার এবং কার্য-প্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানা রকম সমবায় এবং বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা - এ সকল কিছুর দ্বারা গঠিত প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমরা সমাজ বলি। এ হল সামাজিক সম্পর্কের জাল।

আর সমাজের এই পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বা আচার ব্যবস্থাগুলো এমন সুগভীর সম্বন্ধযুক্ত যে, এখানে এককভাবে কোন ব্যক্তির যথেচ্ছ আচরণের কোন অবকাশ নেই।[১৮] অতএব সমাজের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্নটিও গুরুত্ববহ। টমাস এ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas) সমাজকে 'প্রজ্ঞাশীল জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] সুতরাং একটি সুসংবদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:[২০]

ক. পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি

খ. যারা এই সম্বন্ধের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিতৃপ্ত এবং

গ. এই পারস্পরিক সম্বন্ধ অবশ্যই জীবনধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এভাবে সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সর্বজনসম্মত গ্রহণযোগ্য একটা সংজ্ঞায় তাঁরা এখনও উপনীত হতে পারেননি। সেকারণেই সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে তাঁরা এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনায় উৎসাহী হয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজকে একটা প্রত্যয় হিসেবে বোঝা সহজ।[২১] তথাপি পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে সমাজ সম্পর্কে যে কথাটি বলা যায় সেটি হলো:[২২]

কোন একটি সাধারণ ভূখন্ডে বসবাসরত, নিজেদের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য সমষ্টিগতভাবে সহযোগিতারত, একই সাধারণ সংস্কৃতির ধারক এবং স্বতন্ত্র সামাজিক ইউনিট হিসেবে কার্যরত একটি সংগঠিত যৌথবদ্ধ জনসংখ্যাকে সমাজ বলে।

---

১৬. পরিমল ভূষণ কর, সমাজতত্ত্ব (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯০) পৃ. ১১৯

১৭. শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ (পদটীকা)

১৮. পরিমল ভূষণ কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৯. "Society is a stable moral union of national beings co-operating to a common end"; শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯ (পাদটীকা)

২০. মোঃ মাহবুব আলম বেগ, "বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে নিম্নবিত্ত সমাজ", অপ্রকাশিত পিএইচ-ডি. থিসিস, বাংলা বিভাগ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৮

২১. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, সমাজ বিজ্ঞান প্রত্যয় ও পদ্ধতি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১) পৃ. ১৬

২২. মো: মাহবুব আলম বেগ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯

১.৬ সামাজিক স্তরবিন্যাস

'No society is classless.' একটি সমাজের সকল অধিবাসী কোনক্রমেই একই শ্রেণীভুক্ত নয় - অর্থাৎ একই স্তরের নয়; কতকগুলো সর্বজনগ্রাহ্য মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরে বিভক্ত। বস্তুত সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর এই বিভক্তিকেই সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে অভিহিত করেছেন।[২৩] 'সরোকিন' জোর দিয়েই বলেছেন:[২৪]

সদস্যদের প্রকৃত সমতা সম্পন্ন স্তরবিন্যাস বিহীন সমাজ একটি অতিকথন মাত্র, যা মানব জাতির ইতিহাসে কখনোই বাস্তবায়িত হবে না।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন

ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় মানুষের সমাজজীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস শুরু হয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই স্তরবিন্যাসের প্রাকৃতিকগত পরিবর্তনও হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয়নি। সমাজবিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি প্রধান ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো দাসপ্রথা, এস্টেট, জাতিবর্ণ, সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা।[২৫]

দাসপ্রথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অন্যতম ধরন হিসেবে দাসপ্রথা প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতায় বিকাশ লাভ করে এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তা দেখা যায়। এই ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজে যে দুই স্তরে উঁচুনিচু বিভক্তি লক্ষ করা যায় তাহলো দাস ও দাসমালিক। তারাই দাস যাদের কোন অধিকার নেই, তারা অন্যের সম্পত্তি।[২৬] এল. টি. হবহাউজ এর ভাষায়:[২৭]

দাস এমন একটি মানুষ যাকে আইন ও প্রথা অন্যের সম্পত্তিরূপে গণ্য করে। চরম ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণভাবে অধিকারহীন একটি প্রাণী মাত্র। সে তার মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি। তাকে কেনাবেচা যায়।

দাস প্রথার উৎপত্তি ঘটেছে একাধিকভাবে। প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিত ও বন্দি সৈন্যদের মেরে না ফেলে দাস বানানো হতো। প্রয়োজনের অতিরিক্তদের বাজারে বিক্রি করতো। এছাড়াও অপরাধী ও ঋণগ্রস্তদের দাস বানানো হতো।[২৮] দাস শ্রমের ব্যবহারের ক্ষেত্র হচ্ছে গৃহ, কুটির শিল্প, শিল্প ও কৃষি। তবে তুলনামূলকভাবে প্রাচীন গ্রিসে দাস শ্রমের ব্যবহার গৃহের বাইরে অন্য তিনটি ক্ষেত্রেই ছিল বেশি।[২৯]

কৃষি শ্রমে নিয়োজিত ভূমিদাস ও অন্যান্য দাসদের মধ্যে পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। যেখানে ভূমিদাসের কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত অধিকার রয়েছে সেখানে দাসের কোনই অধিকার নেই। এমনকি দাসমালিক ইচ্ছা করলেও তাকে কোন অধিকার দিতে পারতো না। কেননা তা ছিল আইন বিরুদ্ধ। ভূমিদাস নিয়োজিত থাকতো নির্দিষ্ট ভূমির সঙ্গে এবং সেই ভূমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটলে তারাও নতুন মালিকের অধীনস্থ হতো। একজন দাসকে যে কোন কাজে লাগানো হতো অন্য দিকে ভূমিদাসরা কেবলমাত্র কৃষি কাজেই নিয়োজিত থাকতো। দাসরা যুদ্ধবন্দি হয়ে অথবা বাজারে বিক্রিত হয়ে বাইরে থেকে আসতো, অন্যদিকে ভূমিদাসরা ছিল ভূমির সঙ্গে যুক্ত স্বদেশী মানুষ।[৩০]

হবহাউজ-এর মতে:[৩১]

---

২৩. রঙ্গলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১-৯; ডক্টর রঙ্গলাল সেন, সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০), পৃ. ১২-২৮; মোকাররম হোসেন, সমাজ ও সমাজতত্ত্ব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৩৪-৪৪; নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৪৫; মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪৬

২৪. বঙ্গলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, পৃ. ২

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩ ; নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৬. পূর্বোক্ত

২৭. পূর্বোক্ত

২৮. পূর্বোক্ত

২৯. রঙ্গনাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, পৃ. ৪

৩০. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০

৩১. পূর্বোক্ত

ভূমি দাস সেই, যে মালিকের নিকট শ্রম প্রদানে বাধ্য থেকেও কতক অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

এস্টেট

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপীয় সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন ছিল এস্টেট ভিত্তিক। এবং সমাজের প্রত্যেক এস্টেটের কতকগুলো আইনসম্মত নির্দিষ্ট পদমর্যাদা অধিকার ও কর্তব্য ছিল। ব্যাপক শ্রম বিভাজন ভিত্তিক এই এস্টেট ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যস্ত সমাজের লোকেরা মূলত তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। যেমন, অভিজাত এস্টেটের সভ্যগণের দায়িত্ব ছিল সকলকে রক্ষা করা, যাজক এস্টেটের সভ্যগণের কর্তব্য ছিল সকলের জন্য প্রার্থনা করা এবং সর্বসাধারণ এস্টেটের সভ্যদের কাজ ছিল সকলের খাদ্যের ব্যবস্থা করা। সামন্ততন্ত্রের সূচনাপর্বে সমাজে শুধুমাত্র অভিজাত ও যাজন এই দুই এস্টেটের অস্তিত্ব থাকলেও দ্বাদশ শতকের পর সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হলে শহরবাসী নাগরিকদের নিয়ে তৃতীয় এস্টেট গড়ে উঠে। উল্লেখ্য প্রতিটি এস্টেটের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল এবং দাসদের সে অধিকার না থাকায় তাদের এস্টেট হিসেবে বলা যেত না।[৩২]

ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ইউরোপীয় ধরনের এস্টেট এমনকি সামন্ততন্ত্র ছিল না। কে. এস. শেলভানকার ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে 'সামরিক ও রাজস্ব সম্পর্কীয়' বলে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অবশ্য অন্যান্য পন্ডিতগণের মতো পাশ্চাত্য ও ভারতের রাজকীয় ক্ষমতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্যের কারণে এখানে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। রাজা যেহেতু ভূমির সর্বময় মালিক ছিলেন না সে কারণে তিনি ভূমির অধস্তন মালিকও তৈরি করতে পারেননি। তিনি নির্দিষ্ট ভূমির বা অঞ্চলের শুধু মাত্র রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও বলা যায় ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা ও অন্যান্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক এস্টেট ভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় না। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বর্ণের সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ত সমাজের যোদ্ধা ও অভিজাত, যাজক, ব্যবসায়ী, ভূমিদাস প্রভৃতি এস্টেটের তুলনাও কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী করে থাকেন।[৩৩]

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক অদ্বিতীয় ধরন হিসেবে ভারতে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলিম ও পার্শ্ববর্তী সমাজেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৩৪] জাতিবর্ণ ব্যবস্থা স্পষ্টতই অর্থনৈতিক পার্থক্যের সাথে সম্পর্কিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চারটি সনাতন বর্ণের দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতিবর্ণগুলো মূলত এক একটি পেশাগত গোষ্ঠী। কোসাম্বীর ভাষায় 'জাতিবর্ণ হচ্ছে নিম্নমানের উৎপাদন ব্যবস্থার অনুসঙ্গী একটি শ্রেণী'। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ এক একটি শ্রেণী। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ এক একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছে।[৩৫]

সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা

বর্তমান কালে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মূলত অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগকে বুঝায় এবং এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের উচ্চ শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথমটি সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যাপক অংশের মালিক, দ্বিতীয়টি মূলত শিল্পের মজুরি

---

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১; রঙ্গনাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, পৃ. ৫-৬

৩৩. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩৪. পূর্বোক্ত. পৃ. ৪২

৩৫. রঙ্গনাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, পৃ. ৬-৭

অর্জনকারী, আর তৃতীয়টি অবয়বহীন অবশিষ্ট দল যাদের ভিতর রয়েছে ক্রেতাদুরস্থ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রমিক ও উদারনৈতিক পেশাজীবী। কোন কোন শিল্প সমাজে কৃষকদের চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৩৬]

পাশ্চাত্য দেশগুলোর সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মূলত মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগকে বুঝায় এবং এই শ্রেণী নির্ধারণের সময় বৃত্তি প্রাধান্য পায় না। মর্যাদা বহুল লক্ষণগুলোর মধ্যে জীবনযাপনের রীতি বিশেষভাবে বিবেচ্য। জীবনযাপন রীতি মূলত পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[৩৭]

অর্থনৈতিক ও মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক অপরদিকে মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক। তবে জাতিভেদ প্রথায় জাতি পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ থাকায় সামাজিক মর্যাদায় যে ছোট সে ছোটই থেকে যায় এবং যে বড় সে বড়ই থেকে যায়। প্রসঙ্গতই আসে বৃত্তির কথা। সমাজে কতকগুলো বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করা হয়। যেমন- তাঁতি, কলু, জেলে, মুচি, মেহতর, ব্যাধ ইত্যাদি। এঁরা সমাজে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলেই পরিগণিত। অপরপক্ষে যজন, যাজন, শিক্ষকতা; এঁরা সমাজে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলে বিবেচিত হন।[৩৮]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সামাজিক স্তরবিন্যাস বহুমাত্রিক। সাম্প্রতিককালে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাত্রা হিসেবে ক্ষমতা, পেশাগত মর্যাদা, আয় অথবা সম্পদ, শিক্ষা ও জ্ঞান, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানমূলক পবিত্রতা, পরিবার ও জাতিগোষ্ঠীর পদমর্যাদা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক মর্যাদাকে মূল্য দেওয়ার ব্যাপারে মোটামুটি একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতা, পেশাগত মর্যাদা, আয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত মাত্রাগুলো কতক পরিমাণে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। যেমন, ক্ষমতা অথবা আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করে পেশাগত মর্যাদাকে কিছু মূল্য দেওয়া যায়। অপরপক্ষে, নিম্ন পেশাগত মর্যাদা সত্ত্বেও ক্ষমতা অথবা আয়ের মাধ্যমেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তর ছাড়া কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনা আপনি প্রকাশ পায় না। তেমনি কোনো পেশাগত মর্যাদা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে, যদি তার নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা না থাকে। তবে নীতিগতভাবে স্তরবিন্যাসের প্রত্যেকটির মাত্রাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদিও একটি মাত্রা অন্যটির চেয়ে অধিকতর মূল্যবান মনে হতে পারে। কিন্তু ঐ অধিকতর গুরুত্বের কথাটি কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রের প্রেক্ষিতেই উপলব্ধি করতে হবে।[৩৯]

১.৭ সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন পদ্ধতি (Way of life)। মানুষের জীবন পদ্ধতি। সংস্কৃতি কথাটা বলতে গেলেই তাই জীবনের কথা, জীবনাচরণের কথা চলে আসে।

জীবনের মধ্যেই সংস্কৃতির বিকাশ। তবে এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম হলে চলে না। তাকে হতে হয় সজীব, সবাক ও সক্ষম। তাই প্রথমেই একটা কথা আমরা বলতে পারি যে, প্রাণহীন জড় প্রকৃতির কোন সংস্কৃতি নেই। আবার প্রাণী জগতের কোন কোন শ্রেণীর জীবন স্পন্দন, কণ্ঠধ্বনি, বাসস্থান এমনকি সমাজ বা দলবদ্ধতা থাকলেও এদের কোন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।[৪০] তাই স্বাভাবিকভাবেই 'সংস্কৃতি' কথাটার সংগে জীবনের একটা যোগসূত্র থাকলেও, সংস্কৃতির বিকাশ প্রকৃতিজগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ঘটেনি একমাত্র মানব জীবনাচরণের মধ্যেই এর ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি এবং বিকাশ।

---

৩৬. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩৭. মো: মাহবুব আলম বেগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২
৩৯. রঙ্গনাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, পৃ. ১৩-১৪
৪০. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ২

মানুষের এমন এমন কতকগুলো জ্ঞান রয়েছে যা অন্য প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। যে সময় থেকে মানব জাতির প্রথম বিকাশের সূত্রপাত, সংস্কৃতি সে সময় থেকেই মানব সমাজ ও মানবেতর প্রাণী সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি করে চলছে। মূলত মানুষের সংগে অন্য প্রাণীর তফাতটা শুধু এই সংস্কৃতির জোড়েই।[৪১]

ইংরেজী Culture শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Cultura থেকে এসেছে। Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২০-এর দশকে সংস্কৃতি কথাটি Culture অর্থে বাংলা ভাষায় চালু করেন। যদিও ইতোপূর্বে Culture অর্থে কিছু কালের জন্য 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়েছিল তথাপি বাংলা ভাষায় 'কৃষ্টি' স্থায়ী হতে পারেনি, স্থায়ী হয়েছে সংস্কৃতি এবং সেটি রবীন্দ্রনাথেরই প্রচেষ্টায়।[৪২]

সংস্কৃতি অর্থ কি? সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ- সংস্কার, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা- বুদ্ধি; রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি।[৪৩] Culture বা সংস্কৃতি শব্দটি মূল অর্থ যদিও কর্ষণ, তবু এ কর্ষণ যে উৎকর্ষ-প্রবণ, তাতে সন্দেহ নেই। মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষজাত সৃষ্টিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি- একথা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতীয় জীবনেও সত্য। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস বিচার করলে এ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।[৪৪]

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য-গীত-বাদ্য, চিত্রকর্ম, মূর্তি, স্থাপত্য ভাস্কর্য বুঝে থাকি। এগুলো সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। মানস ফসল; তবে সংস্কৃতির সবটা নয়।[৪৫]

সংস্কৃতির গোড়ার কথা হলো সৃষ্টি; নব প্রকাশ, নব প্রয়াস। এ প্রয়াসের মূল লক্ষ্য প্রকৃতির সংগে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রগামী করা, শক্তিশালী করে তোলা। সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (Sciences), সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ (arts)[৪৬]

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা বেঁচে থাকা। মানুষ চায় বাঁচার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট থেকে আদায় করে নিতে। এরই নাম জীবিকা প্রচেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তা সহজসাধ্য করা। এই জীবিকা প্রয়াস প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। সংস্কৃতির মূল কথা তাই জীবিকা প্রয়াস, শ্রমশক্তি। বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির স্বরাজ-সাধনা।[৪৭] জীবিকা সম্পৃক্ত এই জীবনাচরণ তথা ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের সার্বক্ষণিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[৪৮]

সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের বহুভঙ্গিম রূপ। সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।[৪৯] সূক্ষ্ম, পরিশ্রুত ও সুন্দর শোভন অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[৫০]

---

৪১. রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১৫

৪২. নীহাররঞ্জন রায়, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯), পৃ. ১-৮

৪৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম.এ. (সংকলিত), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১), পৃ. ৮০০

৪৪. অধ্যাপক মায়হারুল ইসলাম, "পূর্ব পাকিস্তানের সাংকৃতিক পটভূমিকা", মাসিক মোহাম্মদী (২৯শ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৬৪-আশ্বিন ১৩৬৫), পৃ. ৮৭০

৪৫. আনিসুজ্জামান, "আমাদের সংস্কৃতি", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৭৩

৪৬. গোপাল হালদার, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃ. ১০

৪৭. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃ. ৩১

৪৮. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ২৩

৪৯. সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে সুধী মোতাহের হোসেন চৌধুরী এক সময় এ মূল্যবান কথাটি বলেন। আহমদ রফিক, বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৮৮

৫০. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ২৩

সংস্কৃতি কথাটি এত ব্যাপক যে, একে এক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা বা এক কথায় ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। কোন একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ঐ জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে সাধারণত অভিহিত হয়ে থাকে।[৫১]

যা জীবন তাই সংস্কৃতি। মানুষ যে জীবনযাপন করে অর্থাৎ জীবনযাপন করার জন্য এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা সৃষ্টি করে সবই তার সংস্কৃতি। মানুষের কর্মময় জীবনই সংস্কৃতি। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে তাই তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আর কোন একটি দেশের বা গোষ্ঠীর লোকের যাই সংস্কার তাই সে দেশের সংস্কৃতি। মোটকথা দেশের অধিকাংশ লোক সাধারণভাবে যে অভ্যাস চর্চা করে; স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা অনুশীলন করে সেটাই সে দেশের সংস্কৃতির অংশ।[৫২]

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটা গোটা জাতির সামগ্রিক জীবন চর্চার আদর্শ (Mode of living)। এই আদর্শের ভিতর যেমন শিল্প চিন্তার স্থান আছে। যেমন আছে বিদ্যাশিক্ষার একটি সুনিরূপিত স্থান, তেমনি আছে আচার-আচরণের শুচিতা, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সাহানুভূতি, মৈত্রী প্রকৃতি স্বধর্মের পোষকতা। অর্থাৎ মানুষের মানসিক জীবন এবং কর্মময় জীবন, ব্যক্তি জীবন এবং সামাজিক জীবন-এই দ্বিবিধ জীবনের যোগফল নিয়েই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল বিচিত্র সদ্গুনের একটি অখন্ড যৌগিক রূপ, তাকে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ নির্যাসও বলতে পারি।[৫৩] কোন একটি সমাজের ধর্ম, ভাষা, জীবনযাপন প্রণালী, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, উপাসনা পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুকুমার শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বোপরি সার্বিক মূল্যবোধই হলো সংস্কৃতি।

সহজ ভাষায় এক কথায় বলা সম্ভব যে, কোন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি-গ্রাহ্য আচরিত জীবনধারণ পদ্ধতি ও অদৃশ্য মনোজগৎ সমন্বিত করলে যা হয় তা-ই তার সংস্কৃতি। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Ronald Fletcher সংস্কৃতি ব্যবচ্ছেদে যে কাঠামোটিকে খুঁজে পান তা হলো:[৫৪]

The ‘Social heritage’ of a community: the total body of material artifacts (tools, weapons, houses: Places of work, worship, government, recreation, works of art etc.), of collective mental and spiritual ‘artifacts’ (systems of symbols, ideas, beliefs, aesthetic, perceptions, values, etc.) and of distinctive forms of behaviour (institutions, groupings, rituals, modes of organization, etc.) created by a people (sometimes deliberately, sometimes through unforeseen interconnections and consequences) in their ongoing activities within their particular life-conditions, and (though undergoing kinds and degrees of change) transmitted from generation to generation.

অর্থাৎ ইহজাগতিক যাবতীয় কর্মকান্ড, মানসিক ও আধ্যত্মিক যাবতীয় চৈতন্য ও কর্মপ্রবর্তনা এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিশেষ বিশেষ আচরণভঙ্গি মিলেমিশে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।[৫৫]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ভিন্ন পন্ডিত মহল ও অন্যান্য চিন্তাবিদগণের সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও কিছু সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা যায়:[৫৬]

---

৫১. নীলিমা ইব্রাহিম, সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ৩

৫২. মনসুর মুসা (সম্পা) বাংলাদেশ (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪), পৃ. ২২৫-২৩৩

৫৩. নারায়ণ চৌধুরী, বাংলার সংস্কৃতি (কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, বঙ্গাব্দ ১৩৬৩), পৃ. ৩

৫৪. হায়াৎ মামুদ, সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গান্তর (ঢাকা : চেতনা, ১৯৮৮), পৃ. ৫৫

৫৫. পূর্বোক্ত

৫৬. বুলবন ওসমান, সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ১৩

রাশিয়ান চিন্তাবিদ ট. ভি. ডি, রবার্টির মতে, সংস্কৃতি হলো অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমষ্টি। গ্রাহাম ওয়ালেসের মতে সংস্কৃতি হলো, 'চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও বস্তুর সমষ্টি, এক কথায় সামাজিক ঐতিহ্য। বি. মালিনওস্কির মতে সংস্কৃতি হলো, মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির সমষ্টি। সামনারের মতে, লোকজীবনধারা, শুভ-অশুভ বোধ ও প্রতিষ্ঠাসমূহের সমষ্টি হলো সংস্কৃতি। স্যার ই. বি. টাইলরের মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস এবং অন্যান্য সব সম্ভাবনা যা মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে আহরণ করে তা-ই সংস্কৃতি।

টাইলরের সংজ্ঞা অবশ্য পরবর্তী অনেক চিন্তাবিদকে প্রভাবিত করে এবং তাঁর সংজ্ঞার শেষাংশ অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে শেখার ব্যাপারকেই সংস্কৃতির মূল হিসেবে মনে করেছেন। সে অনুসারে সংস্কৃতিকে এক কথায় বলা যায়, 'আহরিত আচরণ'।[৫৭]

সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি সহজ উপায় হলো, সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা। যেমন, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত-নৃত্য, সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয়-রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি।[৫৮] সংস্কৃতিকে সহজভাবে বোঝার জন্য বস্তুগত যা কিছু ব্যবহার ও তৈরি করে তা-ই বস্তুগত সংস্কৃতি।[৫৯] কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে এ জন্য তার সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিষ্টাচার পর্যন্ত সবকিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সেই দেশ এবং জাতির অন্তর্গত মানুষদের জীবনযাপন এবং জীবন-উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত।[৬০]

জীবন চেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এ জন্যে ধর্মীয় বিধি নিষেধ, নৈতিকবোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈল্পিক মান, রাজনীতির প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি সংস্কৃতি।[৬১] তাই কোন ব্যক্তির সংস্কৃতি কি, একথা বোঝার জন্য প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা, রুচি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া।[৬২]

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার এবং প্রাকৃতিক রহস্যভেদের পর্যায় অনুযায়ী মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, রুচি এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মে যে পরিবর্তন ব্যক্তমনের অলক্ষ্যে ক্রমে ক্রমে ঘটে থাকে অর্থাৎ সমাজদেহে যে রূপান্তর ঘটে তাই সংস্কৃতি। দেশ ও জাতি ভেদে যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেটা প্রথমত অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতা এবং দ্বিতীয়ত ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থার-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য।[৬৩]

তাই বর্তমান আলোচনায় প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বিচিত্র উপকরণের সন্নিবেশনে গঠিত হয় মানুষের সংস্কৃতি। আর এ সকল উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

ক. বিশেষ জনপদের ভূগোল-প্রকৃতি, খ. সেই বিশেষ জনগোষ্ঠির উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদনের বন্টন-ব্যবস্থা এবং গ. তার মানস ভাবনা-বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মচেতনা। এই সকল উপকরণের অবদানেই ত' গড়ে ওঠে মানুষের জীবন। অতএব সব মিলিয়েই তার সংস্কৃতি।[৬৪]

অবহমান কাল ধরে প্রবহমান এ সংস্কৃতি ধারার নিয়ামক তথা বহুভঙ্গিম রূপটিকে আর একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ড. আহমদ শরীফের ভাষায় বলা যায়:[৬৫]

---

৫৭. পূর্বোক্ত,

৫৮. বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪), পৃ. ২৭-২৮

৫৯. মুহম্মদ মিজান উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৬০. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৬১. আহমদ শরীফ, স্বদেশ অন্বেষা (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, বঙ্গাব্দ, ১৩৭৭), পৃ. ১

৬২. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৬৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৯), পৃ. ১০৬

৬৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৬৫. আহমদ শরীফ, স্বদেশ অন্বেষা, পৃ. ৩

ধর্মমতের অভিন্নতা দেশকালনিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতি থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমা নির্ভর হত, তাহলে ভৌগোলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাঙাগড়ার সংগে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এত দিনে সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত।

অতএব দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই একেকভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ামকও নয়। সব কিছুর দানে প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনও অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশকালের উপযোগী হয়েছে।

সংস্কৃতি নিয়ে এরূপ সাধারণ ও সংজ্ঞায়িত আলোচনা থেকে একথা আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি একান্তভাবেই জীবন নির্ভর এবং সে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রগতি ও পূর্ণতা। আর মানব সভ্যতার প্রাথমিক কাল হতেই এই প্রগতি ও পূর্ণতার মূলে রয়েছে যে প্রচেষ্টা সেটি হলো:

১. প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজে আয়ত্তে এনে বেঁচে থাকবার উপাত্তগুলোকে সহজলভ্য করা; প্রয়োজনীয় জিনিসকে সহজে লাভ করা;
২. কেন বাঁচব, কিভাবে বাঁচব, ভালভাবে বাঁচা বলতে কি বোঝায় তার উত্তর অনুসন্ধান করা এবং জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য কতকগুলো রীতিনীতি গড়ে তোলা;
৩. যাপিত জীবনের একঘেয়ামি মোচন করা; অবকাশ মূহূর্তকে অনান্দময় করে তোলা ও প্রাত্যহিক জীবনে সৌন্দর্য আরোপ।[৬৬]

মনুষ্যত্বের পরিচয় সৌন্দর্য চেতনায় ও সৌন্দর্য পিপাসায়। সংস্কৃতিরও অন্য নাম সৌন্দর্য চেতনা ও সৌন্দর্য অন্বেষা। মানুষের স্থুল প্রয়োজন সহজেই মেটে কিন্তু সৌন্দর্য পিপাসা অসীম। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সমাজে-ধর্মে-রাষ্ট্রে মানুষের এ বিচিত্র বিকাশের মূলে রয়েছে এই সৌন্দর্য বৃদ্ধি। এ পিপাসাই মানুষকে এগিয়ে নেয় নব নব বিকাশের পথে। পুরাতনে অস্বস্তি ও অবজ্ঞা না জাগলে নতুনের আকাঙ্খা ও প্রয়াস জাগে না। মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই পিপাসা, অন্বেষা ও প্রয়াসেরই ফল।

মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনশীল ও গতিশীল। এ জন্য সংস্কৃতি কখনো পুরোনো হতে পারে না। অনুকারক-অনুসারকের গতানুগতিক ধারার সংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতি নয় আচার। কারণ স্থিতিশীল সংস্কৃতি প্রাণের প্রেরণাহীন ও তাৎপর্য বর্জিত আচারে বা সংস্কারে অবসিত হয়। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষ সৃজনশীল নয়, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি নেই। তারা গ্রহনশীল হয়েই হয় সংস্কৃতিবান। তাছাড়া কোনো দেশ বা জাতে মানুষের ব্যবহারিক ও মানস জীবনের সব চাহিদা মেটাতে পারে, সকল প্রকার অভাব ঘুচাতে সমর্থ তেমন প্রতিভাবান বা ততগুলো প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয় না, অন্তত আজো হয়নি। কাজেই সৃজনশীলতার সাথে গ্রহণশীলতাও থাকা চাই, নইলে সংস্কৃতি চালু রাখা যায় না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মস্থকরণই হচ্ছে সাধ্য। যারা সৃজনে সমর্থ নয়, অথচ গ্রহণ বিমুখ-তাদের মন-মনন ও সমাজ স্থানু।[৬৭]

---

৬৬. এবনে গোলাম সামাদ, নৃতত্ব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ১৩২

৬৭. আহমদ শরীফ, বিচিত্র চিন্তা (ঢাকা : চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৫), পৃ. ২৬৬-২৭০

এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের দেশের উপজাতিদের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি। উপজাতির সংস্কৃতি পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী। বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন উপজাতিরা তাদের স্বীয়ধর্ম, আচার, বিশ্বাস এবং জীবনরীতিতে শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান। তারা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে আদিম জীবনসাধনায় রত, পশ্চাৎপদ আদিবাসীরা অনুগত অনুকারী হিসেবে পূর্ব পুরুষের অবদানকে শ্রদ্ধার সংগে বহন করে চলছে। গ্রহণ-বর্জনের রীতি না থাকায় উপজাতির সংস্কৃতির কোন অভিনব বিকাশ ঘটছে না। ফলে আদিবাসী উপজাতিরা যেখান থেকে জীবন শুরু করেছিল প্রায় সেখানেই থেমে আছে। কিন্তু আবার এই উপজাতিদের মধ্য থেকেই চাকমা ও মণিপুরীরা মেলামেশা ও শিক্ষাদীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমশ সভ্য হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ লোকসমাজে মিশে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সাঁওতাল, গারো, হাজং প্রভৃতি উপজাতীয় লোকেরা এখনো পূর্বপুরুষের আদিম সংস্কৃতিই লালন করে চলছে।[৬৮]

সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে ড. নীলিমা ইব্রাহিমও গ্রহণ-বর্জনের এই মৌলিক তাৎপর্যের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করছেন:[৬৯]

‘দেব-নেব রক্ষা করবো’ এটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবান কথা। সংস্কৃতি গতিশীল। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। যারা এটাকে বুঝতে না পেরে পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থাকে তারা শুধু ফসিলকে নিয়ে থাকে, জীবনকে নয়। অবশ্য তাই বলে সংস্কৃতির ভিত্তিকে অস্বীকার করলে চলবে না। নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে সংস্কৃতির বিন্যাস সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলাদেশের জনগণ হিসেবে আমরা দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সুদূর অতীতকাল থেকে পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপাদানসমূহ গ্রহণ করছি এবং তা এখন আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশ পৃথিবীর কয়েক জাতি শাসন করেছে। সে কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতির উপাদান আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে যেমন রয়েছে, তেমন দু’শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরও বহু উপাদান আমরা গ্রহণ করেছি।[৭০] আমাদের ধর্ম এসেছে-উত্তর ভারত ও আরব থেকে, ভাষাটাও উত্তর ভারতের। প্রশাসনিক ঐতিহ্যও উত্তর ভারত, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপ থেকে পাওয়া। আজকের ব্যবহারিক জীবনের সব উপকরণ এবং মানব জীবনের সব প্রেরণা আসছে ইউরোপ থেকেই।[৭১]

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞগণ সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের মৌলতত্ত্ব হিসেবে-বিবর্তনবাদ, চক্রবাদ, দ্বন্দ্ববাদ, কর্মবাদ, স্বয়ংক্রিয়বাদ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো সমাজের সংস্কৃতির পুরো চিত্র নির্ভর করে মূলত...

১. উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির উপর
২. ভৌগোলিক অবস্থানের উপর
৩. সামাজিক দল সমূহ (যেমন, ভাষাভিত্তিক, বর্ণগত, ধর্মগত ইত্যাদি)[৭২]

তবে সংস্কৃতির পরিবর্তনের যত নিয়ামকের কথাই বলি না কেন নিজেকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরতে না পারলে; নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বজনীন করতে না পারলে; গ্রহণ-বর্জনের মানুষিকতা গড়ে না তুললে; সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। তা সেটি ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রেই হোক আর সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেই হোক।

---

৬৮. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
৬৯. মনসুর মুসা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪
৭০. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৭১. আহমদ শরীফ, বিচিত্র চিন্তা, পৃ. ২৭০
৭২. বুলবন ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

'যুক্ত করহে সবার সঙ্গে' মুক্ত করহে বন্ধ' কবিগুরুর এই উক্তির মধ্যেই সংস্কৃতি তথা সংস্কৃতি পরিবর্তনের মূলমন্ত্র নিহীত।

সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা Herskovits-এর সঙ্গে একমত হয়ে সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি:[৭৩]

১. সংস্কৃতি শিখতে হয়;
২. মানুষের জৈবিক, পরিবেশগত, মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপাদান হতে সংস্কৃতি গৃহীত;
৩. সংস্কৃতি হচ্ছে কাঠামো ভিত্তিক;
৪. সংস্কৃতি তার বিভিন্নমুখী অংশ অনুযায়ী বিভাজনযোগ্য;
৫. সংস্কৃতি পরিবর্তনযোগ্য;
৬. সংস্কৃতি নিয়মানুবর্তী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একে বিশ্লেষণ করা যায়;
৭. সংস্কৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ। এর দ্বারা ব্যক্তি নিজের সামগ্রিক অবস্থা পুনর্বিন্যাস করে সৃষ্টিশীল প্রকাশভঙ্গি অর্জন করে;
৮. সংস্কৃতি গতিশীল ও সর্বত্র বিরাজমান।

৭৩. মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পা.), রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৯১), পৃ. ১৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়
বগুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতি ও ইতিহাস

২.১ জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

বগুড়া বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা।[১] ভৌগলিক দিক থেকে জেলাটি ২৪.৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৫.১০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯.৪০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।[২]

সীমানা

বগুড়া জেলার উত্তরে জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলা, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ ও নাটোর জেলা, পূর্বে যমুনা নদী ও জামালপুর জেলা এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলা অবস্থিত।[৩]

আয়তন

জেলার মোট আয়তন ২৯১৯.৯ বর্গকিলোমিটার।[৪]

ভূ-প্রকৃতি

বগুড়া জেলার অধিকাংশ ভূমি সমতল ও পলিমাটিতে গঠিত।[৫] জেলায় অসংখ্য দীঘি, ছোট-বড় খাল-বিল, নদ-নদী ও জলাশয়ে পূর্ণ। বগুড়া জেলার ভূ-ভাগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫খ-, পৃ. ২৬৫; কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ.৯৩

২. www.bogra.gov.bd

৩. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengol, Vol. VIIII (Delhi: D.K Publishing House, 1974 A.D), pp. 20-21; L.S.S. O'malley, Bengal District Gazetteers, Rajshahi (Calcutta: Bengal Sectretarial Book Report, 1916 A.D, pp. 1-3; Census of Agriculture-1996, Zila Series Bogra 2003 (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2003 A.D), p.17; Dr. Ashraf Siddiqui, Bangladesh District Gazetteers Bogra (Dhaka: Bangladesh Grovernment Press, 1976 A.D) p. 356; বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খ- (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৩০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খ- (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ ২৬; কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; খন্দকার আবদুর রশিদ, বগুড়ায় ইসলাম (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন, ২০০২খ্রি.), পৃ. ৫৩ঃ অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড (ঢাকা:বিজনেস পোষ্ট পাবলিকেশনস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৪. বাংলা পিডিয়া ৬ষ্ঠ খ-, পৃ. ১৮৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খ-, পৃ. ৬৮৯; অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, পৃ. ১৩; Sensus of Agricalture 1996 Zilla Series Bogra 2003. op.cit.,p.17.

৫. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ. ৯৩।

(ক) করতোয়া নদীর পূর্বাঞ্চল

এ অঞ্চলে নদী-নালা বেশী থাকায় বর্ষাকালে বেশীর ভাগ সময় ডুবে থাকে। এ অঞ্চলের মাটি সমতল এবং পলিযুক্ত। এজন্য এ অঞ্চলকে পলি অঞ্চল বলে। এ অঞ্চলের দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে বিভিন্ন ফসল জন্মে। যেমন ধান, পাট, আলু, মরিচ এবং অন্যান্য রবি শস্য।[৬] এখানকার মরিচ বিখ্যাত।

(খ) পশ্চিমাঞ্চল

নদীর পশ্চিমাঞ্চলের মাটি কিছুটা উঁচু লাল, এঁটেল ও কাঁকরময়। এ ভূমিগুলো অসমতল, এজন্য এ অঞ্চলকে খিয়ার বা বরেন্দ্র অঞ্চল বলে। বগুড়া জেলায় কোন প্রকার পাহাড় পর্বত নেই। এ অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। বর্তমানে এখানে ভুট্টার চাষও হচ্ছে।

জনসংখ্যা ২০০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী বগুড়া জেলায় মোট জনসংখ্যা ২৯,৮৮,৫৬৭ জন। পুরুষ ৫০.৮৪% ও মহিলা ৪৯.১৬%, মুসলামন ৯১%, হিন্দু ও অন্যান্য ৯%।[৭]

জলবায়ু ও আবহাওয়া

বাংলাদেশের ঋতু প্রকৃতিকে ছয় ঋতুর দেশ বলা হয়। এই ঋতুগুলো হল- গ্রীষ্মকাল (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), বর্ষাকাল (আষাঢ়-শ্রাবণ), শরৎকাল (ভাদ্র-আশ্বিন), হেমন্তকাল (কার্তিক-অগ্রাহায়ণ), শীতকাল (পৌষ-মাঘ) ও বসন্তকাল (ফাগুন-চৈত্র)। তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, আদ্রতা ও বায়ু প্রবাহের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশকে সমভাবাপন্ন আবহাওয়া অঞ্চল বলা হয়। সারা বছরে বিরাজমান গড় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১১.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.০৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট এর মধ্যে উঠানামা করে।[৮] বগুড়ার জলবায়ু সমগ্র উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতই সমভাবাপন্ন।

---

৬. অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, পৃ. ১৩; Census of Agriculture 1996 Zila Bogra, op.cit., p.18.

৭. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খ-, পৃ. ২৯; Population Census 2001 prelimimary Report (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 2002 A.D.), p. 18; Bogra District Statistics 1983, (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1984 A.D.) p.5.

৮. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খ-, পৃ. ২৯;

মার্চ মাসের শেষভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে এই অঞ্চলে গরমের প্রাদুর্ভাব হয় এবং অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অক্টোবরের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে উত্তরা হাওয়া প্রবাহের সাথে সাথে এই অঞ্চলে শীতের আগমন ঘটে এবং তা মার্চের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে এতদাঞ্চলে শীত ও গরম কোনটিই চরমভাবাপন্ন নয়। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। এ সময়ে এই অঞ্চলে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হয়। এপ্রিল-মে মাসে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হতে শুরু করে এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে কখনও অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে বন্যা দেখা দেয়। আবার অনেক সময় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে এ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ও হয়ে থাকে। বগুড়া জেলায় বছরে গড়ে ২০৭৪ মিলিমিটার (৮২.৯") বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।[৯]

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বগুড়া জেলায় যাতায়াতের জন্য সড়কপথ, নৌপথ ও রেলপথের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এ জেলা থেকে দেশের সকল স্থানে যাতায়াত করা যায়। বগুড়া জেলায় কাঁচা-পাকাসহ ২০৪০ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে, তম্মধ্যে ৩২৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৩৫৪ কিলোমিটার আদাপাকা রাস্তা, ১৭০৪ কিলোমিটার কাচা রাস্তা এবং ১৫০ কিলোমিটার নৌপথ রয়েছে। করতোয়া, দাওকোপা, বাঙ্গালী, নাগর তুলশিগঙ্গা, মানস, হলহলিয়া, বেলাই, গজারিয়া, ইছামতি, ভেলকা, সুখদহ, হারাবতী, ইটাখোলা, ইয়াবতী ও গাঙ্গনই নদীতে সারা বছর নৌকা, লঞ্চ চলাচল করে। ১০টি রেল স্টেশনসহ জেলাতে ৮১ কিলোমিটার রেললাইন রয়েছে।[১০] জেলা সদরের সাথে উপজেলা সদরের যোগযোগের সবকটি রাস্তাই পাকা।

নদ-নদী

বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই বাংলাদেশকে নদী বহুল দেশ বলা হয়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী। এই নদীগুলোর আবার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে

---

৯. Bogra District Statistics 1983, op. cit., p. 20; Dr. Ashraf Siddiqui, op.cit.,pp. 17-18; Cencus of Agriculture 1996 Zila Siries Bogra, op.cit.,p. 18.

১০. W.W. Hunter, op.cit., pp. 81-82; Dr Ashraf Siddiqui, op.cit.,p.141; কাজী মোঃ মিছের রাজশাহীর ইতিহাস, ২য় খ-, পৃ. ৯১-৯৪;

ছোট-বড়, খাল-বিল, ডোবা-নালার, সংখ্যাও অগণিত। একারণে সমগ্র বাংলাদেশটি বর্ষাকালে অসংখ্য দ্বীপমালার মত মনে হয়।[১১] দেশের উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জনপদ বগুড়া জেলার বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অনেকগুলে প্রাচীন ছোট বড় নদ-নদী। কোন্টি এখনও প্রবাহিত হচ্ছে আবার কোনটি এখন মৃত প্রায়। জেলার প্রধান নদ-নদীগুলো হলো- করতোয়া, দাওকোপা, যমুনা, বাঙ্গালী, নাগর তুলশিগঙ্গা, মানস, হলহলিয়া, বেলাই, গজারিয়া, ইছাপতি, ভেলকা, সুখদহ, হারাবর্তী, ইটাখোলা, ইবাবতী, গাঙ্গনই।[১২] নিম্নে উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর আলোচনা করা হল-

করতোয়া

প্রাচীনকালে করতোয়া বাংলার উত্তাঞ্চলের বা তৎকালীন পৌণ্ড্রবর্ধন জনপদের প্রধানতম নদী ছিল।[১৩] বর্তমানে করতোয়া ক্ষীণকায় হলেও অতীতে তেমন ছিল না। পবিত্রতায় পূর্ণ ও মহাত্মে এ করতোয়ার স্থান হিন্দুদের কাছে গঙ্গার পরই। তাই মহাভারতে বারবার একে ‘পূণ্যতোয়া’ নামে অভিহিত করা এবং ‘করতোয়া মহাত্ম’ নামে প্রাচীন পুঁথিতে এর অস্তিত্ব থেকেই প্রমাণিত হয়। মহাভারতে বনপর্বের প্লোতি প্রজাপতি কৃতো বিধিঃ।[১৪] অর্থাৎ প্রজাপতি এই বিধান করেছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করে করতোয়া তীরে গমন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ষোড়শ শতকের বঙ্গের খ্যাত নামা পতি রঘুনন্দন তাঁর তিঁথি তত্ত্বে করতোয়ার মহাত্ম বর্ণনা করে। এই তোয়া নদী ছিল বঙ্গদেশ ও কামরূপ রাজ্যের প্রাচীন সীমারেখা।[১৫] পরবর্তীকালে এ নদীকে বঙ্গদেশের সীমানা ধরা হত। কিংবদন্তী অনুসারে ‘কর’ অর্থ্যাৎ হাত এবং ‘তোয়া’ অর্থাৎ পানি শ্বদ দুটি থেকে করতোয়া নামটির প্রচলন হয়।[১৬]

---

১১. চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দৌজা, জিলা পাবনার ইতিহাস (পাবনাঃ গ্রন্থকার, ১৯৮৬, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২০-২১.

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খ-, পৃ. ৬৯৪; বাংলা পিডিয়া, ৫ম খ-, পৃ. ২৯।

১৩. মীনহাজ-ই-সিরাজ, তাবাকাত-ই-নাসির, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত ও সম্পাদিত (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৮৪

১৪. মহাভারত, বনপর্ব, ৮৫ অধ্যায়, তৃতীয় শে-াক।

১৫. অজয় রয়, বাংলাদেশঃ পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত, মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে গ্রন্থে সংকলিত (ঢাকাঃ সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৩-২৪।

১৬. সাইদ উর রহমান, করতোয়া নদী, শরীফ উদ্দিন আহম্মেদ সম্পাদিত, দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থে সংকলিত (ঢাকাঃ বাংলা ইতিহাস সমিতি, এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ১৮; মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সম্পাদিত, গাইবান্ধার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (গাইবান্ধাঃ গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন, ১৪০১ বাং/১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১৫।

করতোয়া নদীর উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যাক্ত করেন। মন্টগোমারী মারটিন লিখেছেন যে, সিকিমের নীচুতম পাহাড় গুলোতে অবস্থিত ব্রক্ষকু- নামক স্থানে নদীটির উৎপত্তি।[১৭] শ্রী প্রভাষ চন্দ্র সেন বলেন, করতোয়া নদী সিকিম রাজ্যের নিম্নতম পর্বত মধ্যবর্তী ব্রক্ষকু- নামক স্থান হতে বিনির্গত হয়ে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।[১৮] শ্রী প্রভাষ সেন বগুড়ার ইতিহাস গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন, নেপালে পর্বতমালা থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি।[১৯] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তানদী থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি।[২০] হান্টারের অভিমত হল, জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৈকুন্ঠপুরের জঙ্গাল মহল থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি।[২১] যাহোক হিমালয় পর্বতের পাদদেশে নেপালের পর্বতমালা হতে করতোয়া নদীর জন্ম। হিমালয় হতে নির্গত হয়ে এ নদী কিছু দূর পর্যন্ত নেপাল ও বৃটিশ ভারতের সীমা নির্ধারন করে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেছে। করতোয়া জলপাইগুড়ি ও পূর্নিমা জেলায় সীমা নির্ধারণ করে বুড়া তিস্তার সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছু দূর প্রবাহিত হবার পর ঘোড়াঘাট পর্যন্ত এসে সেখান হতে প্রায় ২৬ কিলোমিটার পর্যন্ত রংপুর ও দিনাজপুরের মধ্যসীমা নির্ধারণ করত: শিবগঞ্জ এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। বগুড়া শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে এ নদী নগুড়া জেলার মধ্যে প্রবেশ করেছে।[২২]

---

১৭. Montogomary Martin, History Antiquity-Tomography and statistics of eastern India, part-3 (London: 1838), p: 360.

১৮. শ্রী প্রভাষ চন্দ্র সেন, করতোয়া ও সদানীরা, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা (রংপুরঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রংপুর শাখা কার্যালয়, প্রকাশ কাল, ১৩১৬ বঃ), পৃ. ৬৯।

১৯. শ্রী প্রভাষ চন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস (ঢাকাঃ ১৩৩৫ বঃ), পৃ. ১৮।

২০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪১০ বঃ), পৃ. ৮৮।

২১. W.W Hunter, statistical Acount of Bengal, Jalpaiguri District, part-10 (London:1876), p-229.

২২. অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, পৃ. ১৪।

যমুনা

বুকানন হামিলটন ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে এ নদীকে ব্রক্ষপুত্রের শাখা নদী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ১৭৮১ খিস্টাব্দে মেজর রেনেল বঙ্গদেশের মানচিত্রে যমুনা নদীকে 'জানাই' নামে উল্লেখ করেছেন। সে সময় যমুনা ক্ষুদ্র নদী ছিল। দিনাজপুর জেলার করতোয়া নদী হতে যমুনা উৎপন্ন হয়ে হিলির নিকট বগুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে।[২৩] এটি বগুড়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে এ নদী বিরাট আকার ধারন করে। তিস্তা ও অন্যান্য নদীর পানিরাশি এ নদীতে এসে পড়ায় যমুনা নদী প্রবল ও বিস্তৃত আকার ধারন করে।[২৪]

বাঙ্গালী

বাঙ্গালী নদীর পূর্ব নাম ঘাঘোট। এ নদী রংপুর জেলা থেকে বের হয়ে সোনাতলা, সারিয়াকান্দি উপজেলার গড় ফতেহপুরের সন্নিকটে বগুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। সারিয়াকান্দি উপজেলার মধ্যে দিয়ে ধুনট উপজেলার বিলচাপড়ী গ্রামের পূর্বপাশ হয়ে বাঙ্গালী নদী হলহলিয়ার সংযুক্ত হয়েছে। করতোয়া নদীর পানি এ নদী দিয়েই প্রবাহিত হয়।[২৫]

ইছামতি

ধুনট উপজেলায় এই নদীটি প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীটি আঁচলাইয়ের কাছে ইছামতি নামের একটি শাখা নদী করতোয়া হতে বের হয়ে গজারিয়া নদীতে পড়েছে। এই নদীটি জেলার সামান্য অংশে প্রবাহিত হয়েছে।[২৬]

সুখদহ

সুখদহ নামক একটি নদী বয়রা গ্রামের নিকট বাঙ্গালী নদী হতে বের হয়ে হাটকরমজা ও ফুলবাড়ীর নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুর্গাহাটার কাছে ভেলকা নদীতে পড়েছে।

নাগর

করতোয়ার শাখা নদী নাগর বগুড়া ও শিবগঞ্জের বিভেদরূপে প্রায় ১১ কিলোমিটার অতিক্রম করেছে। মোগল নদীটি দক্ষিণ দিকে আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়ার মাঝে চাঁপাপুরের মধ্যে দিয়ে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেছে। এই নদীটি জেলার মধ্যে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। এ নদীর তীরে এলাহীগঞ্জ ও দুপচাঁচিয়া বন্দর অবস্থিত।

---

২৩. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ. ৩০; শফিকুল আলম সৈয়দী, জেলা পরিচিতি বগুড়া, ১ম খ-, পৃ.২২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃ. ৩০।

২৫. শফিকুল আলম সৈয়দী, জেলা পরিচিতি বগুড়া, ১ম খ-, পৃ. ২২।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; শফিকুল আলম সৈয়দী, জেলা পরিচিতি বগুড়া, ১ম খ-, পৃ. ২৩।

এ সকল নদ-নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, নগর, বন্দর, জনপদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রকেন্দ্র, বিদ্যাপিঠ প্রভৃতি। দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে জলপথ একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। এককালে বগুড়ার গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনায় ছিল এখানাকার প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর অবদান। রাজা-বাদশাহ, জমিদারগণ এই সকল নদী পথেই ভারতের মুর্শিদাবাদ হয়ে ঢাকার অভিমুখে যাত্রা করতেন।[২৭] দেশের প্রায় প্রতিটি প্রধান নদীর সাথে বগুড়ার সংযোগ রয়েছে। জেলার নদ-নদীগুলো উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করে আঁকাবাঁকা নানা পথে যমুনা নদীতে পতিত হয়েছে। জেলার ভূমি পশ্চিম তেকে পূর্ব থেকে কিছুটা ঢালু। জেলার প্রধান নদীগুলোর মধ্যে যমুনা, করতোয়া, দাওকোপা, বাঙ্গালী, নগর, তুলশিগঙ্গা, মানস, হলহলিয়া, ইছামতি, ভেলকা, সুখদহ, হারাবতী ও ইরাবতী বছরের সব সময়েই নাব্য থাকে। এখানে সারা বছর নৌকা, লঞ্চ চলাচল করে। এছাড়া অন্যান্য নদীগুলো বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে শুকিয়ে যায়।[২৮]

বগুড়া জেলাতে নদ-নদী ছাড়াও বেশ কিছু খাল রয়েছে। এই খালগুলো নৌপথে যাতায়াত, বর্ষার পানি নিষ্কাষণ ও চাষাবাদের সেচ সুবিধার জন্য কৃত্রিম উপায়ে খনন করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ একে জোলা নামে অভিহিত করে থাকে। এ জেলার উল্লেখযোগ্য খালগুলো হল- বুন্দান, বিলচাপড়ী, কেশপাথার, কালীদহ, পদ্মা, সাওরাইল, গড়াই, এরুইল, ভোমরাদহ, দামুকদহ, সাতা, গোরবচাপা, মহিবরণ, জিয়াদহ, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি।

বগুড়া জেলায় অনেক বিল রয়েছে। এগুলো ঋতুভেদে জেলার ভূ-প্রকৃতিকে দান করেছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে এই বিলগুলো একটি বিশাল আকারের জলাভূমিতে পরিণত হয়।অবশ্য অধিকাংশ বিল শীতকালে শুকিয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে অগভীর জলাভূমির কোন কোনটি বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও পদ্ম পাতা, শামুক, নুড়ি, ঝিনুক দ্বারা সুশোভিত হয়ে এক মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। আবার অন্যান্য জলাভূমিতে দীর্ঘকায় ধান চাষ হয়ে থাকে। ছোট বড় সব বিলই উপযুক্ত মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। এ সকল বিল এলাকার মানুষের মাছের চাহিদার এক বিরাট অংশের যোগান দিয়ে আসছে। এ জেলার উল্লেখযোগ্য বিলগুলো হল- রক্তদহ, নাড়াইল, জাবরকান্দি, কেশপাথার, মহিচরণ, বর্ধণকুঠি, রামচন্দ্রপুর, সুবিল, সারাইল, পোড়াদহ, ভেদগাড়ী, কইগাড়ী ও বিল চাপড়ীর টেপাগাড়ী প্রভৃতি। এছাড়াও এ জেলায় কয়েকটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ দীঘি রয়েছে। যেমন- আদমদীঘি, নিমাইদীঘি, বাদলদীঘি, শহরদীঘি, উদয় সাগরদীঘি, ফুলদীঘি প্রভৃতি।

---

২৭. শ্রী কালিনাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (কলিকাতাঃ স্কুল বুক প্রেস, ১৯০১ খ্রি.), পৃ.৬; সমর পাল, নাটোরের ইতিহাস, ১ম খ- (ঢাকাঃ পদাতিক প্রকাশনী, ১৯৮৫ খ্রি.) পৃ. ৫৯-৬২।

২৮. Dr. Ashraf Siddiqui, op.cit, p.6; অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, পৃ. ১৭।

বনভূমি ও গাছপালা

অতীতে জেলায় অনেক বড় বড় বনভূমি ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কালক্রমে কৃষি সম্প্রসারনের জন্য এসব বন এলাকা ক্রমশ হ্রাস পায়। তবে এখনও সকল এলাকায় কমবেশি বিভিন্ন শ্রেণির গাছগাছড়া আছে। এদের মধ্যে কড়ই, শীলকড়ই, শাল, বট, পিপুল, পাকুড়, ছাতিয়ান, কদম, দেবদারু, কৃষ্ণচুড়া, সেগুন, মেহগনি, সোনালু, গাব, তেঁতুল, শিমুল, জারুল, শেফালিকা, গামার, মনবাহিয়া, পানছুরা, ফালছা, বাবলা, বাললা পুয়া, সাঁইবাবলা ইত্যাদির নাম করা যায়। এ ছাড়া জেলার সর্বত্র আম, জাম, লিচু, কলা পেঁপে, আতা, সুপারি, বাতাবিলেবু, কাঁঠাল, আমরোজ, জামরুল, পেয়ারা, আমড়া, কলা, নারিকেল, বেল, ডালিম, খেঁজুর, ডুমুর, তাল প্রভৃতি ফলের গাছ জন্মে থাকে। এসব ফলের গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল ও কলাগাছের সংখ্যা খুবই বেশি।

উল্লিখিত গাছগাছড়া ছাড়াও বগুড়া জেলায় বিভিন্ন প্রকার ভেষজ বৃক্ষ ও লতা দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে : সজিনা, হরিদ্রা, তলিসী, বিশল্যকরণী, উলট-কম্বল, ভীমরাজ, মুথা, ভামুট বা ভাগী, শিমুল, বকুল হস্তীকর্ণ পলাশ, হাতসুরা, বাঁশমর্দ, কুকুর মুথা, গুলঞ্চ, জাউন, অশোক, করবী, সাঁটি, ভাট, লাটা গোলক, আকন্দ, পলাশ, ধুতরা, আমলকী, অনন্তমূল, জামরুল, নীলকলমী, ব্যাঁকুর, সোমরাজ, কুটরাজ, শ্যামলতা, হুর, হরিয়া, টীকাপানা, লেবু, পুদিনা, কলম্বী, হেলেঞ্চা, তিল, হরতকী, পিঠালী, কন্টিকারী, শতমূল, ভুঁইকুমড়া, ভূসামলকী, ক্ষেতপাঁপড়া, বাসক, ভেরেণ্ডা, জন্তি, পারুল, অপমার্গ, অশ্বগান্ধা, ইন্দুলকানি, আদ্রক, কাকঠুকরী, কালমেঘ, ওড়া, গোধাপদী, মসিনা, জয়ফুল, কচু, জয়ন্তিপল, শিয়ালকাঁটা, ছাতিম, অর্জুন, জগডুমুর, খোকসা ইত্যাদি।[২৯]

---

২৯. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, বগুড়া, পৃ.২৫।

২.২ জেলার গঠন প্রণালী

১২৮০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের ২য় পুত্র সুলতান নাসির উদ্দীন মুহম্মদ বুগরা খান গৌড়বঙ্গের শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি গৌড় থেকেই সমগ্র গৌড়বঙ্গ শাসন করতেন। তখনও এ দেশটির নাম বাংলা, বঙ্গ বা বাংলাদেশ হয় নাই। আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন নাম তথা গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্র রাঢ় ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বগুড়া জেলা যে এলাকা নিয়ে গঠিত, সে এলাকাটি তৎকালীন জান্নাতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৮১-১২৯০ খ্রিস্টাব্দে অত্র এলাকাটির প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও কর আদায়ের সুবিধার্থে গৌড় সরকারের একটি প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপিত হয়; যে স্থানে প্রশাসনিক কেন্দ্রটি ছিল-তার নাম হয় বগ্রা খানের নামানুসারে বগুড়া। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলার পত্তন হলে, এর প্রশাসনিক দপ্তরটি করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে উঠতে থাকে। ক্রমে এ এলাকা নিয়েই বগুড়া শহরের বিস্তৃতি ঘটে। জেলা শহর বগুড়া মৌজা থেকে এক মাইল পূর্বে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় বগুড়া মৌজাটির নাম হয় পুরান বগুড়া। বর্তমানে বগুড়া জেলা ঘোষণা করার সময় এর নামটিও ঐ বগুড়া মৌজাকে কেন্দ্র করেই করা হয়।[৩০]

বগুড়ার নামকরণ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনী, কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে মুগীছ উদ্দিন তুঘরিল বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান নিজে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করতে আগমন করেন। তুঘরিলকে পরাজিত করে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সময় বলবন তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ বগরা খানকে বাংলার শাসনভার অর্পন করেন। কথিত আছে। এই বগরা খানের নামানুসারে বগুড়ার নামকরণ করা হয়।[৩১] ১২৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এতদাঞ্চলে বগুড়া বা বগড়া নামে কোন গ্রাম বা মৌজা ছিল না; এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এমনও হতে পারে বগড়া খানের নামে প্রথম যে জনবসতি গড়ে উঠে তার নাম করা হয় বোগড়া বা বগড়া পাড়া। অপর এক অভিমতে

---

৩০. শফিকুল আলম সৈয়দী, জেলা পরিচিতি-বগুড়া, ১ম খ-(বগুড়াঃ গণ সাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ.৮-৯।

৩১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫খ-, পৃ. ২৬৫; কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী (ঢাকাঃ গতিধারা, ২০০৭ খ্রি.), পৃ.১৯; খন্দকার আবদুর রশিদ, বগুড়ায় ইসলাম (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৫৩;

জানা যায় যে, এই এলাকাটি জলাভূমি ছিল। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে বেড়াত। এই বক+উড়া=বকুড়া থেকেই স্থানটির নাম হয়েছে বগুড়া।[৩২] তবে প্রথম মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। উপরোল্লিখিত মতামতের মধ্যে কোনটি গ্রহণযাগ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে আমরা বগুড়া জেলা নামে যে ভূখন্ডে বসবাস করি, সুদূর অতীত, এমন কি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এর নাম কখনও বগুড়া ছিল না। এ জেলাটি বগুড়া নামে রূপান্তরিত হতে বহু বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

সুলতান নাসির উদ্দিন বগ্রাখান ১২৮১-১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়-বরেন্দ্র শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বগ্রাখানের শাসনামলে এতদাঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এবং রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে যেখানে দফতর খোলা হয়, সেই স্থানের নাম হয় বগ্রা পরবর্তীতে এ বগ্রা নাম থেকেই জেলাটির নামকরণ করা হয়েছে বগুড়া।[৩৩]

সুলতানী শাসনের অবসানের পর মোগল শাসন চালু হয়; প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্তে সম্রাট আকবরের পূর্বে শেরশহ সমগ্র সুবে বাংলাকে ২৪টি শিক ও ৭৮৭টি মহালে বিভক্ত করেন। এক একটি শিক ও মহালের জন্য শিকদার ও মহালদার (প্রশাসক) নিযুক্ত করেন। শেরপুর তখন শিক এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। বগুড়া অঞ্চল শেরপুর শিকের অধীনে ছিল। শেরশাহের পতনের পর পুনরায় মোগল প্রশাসন শুরু হলে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা তোডরমল ও সচিব মোজাফ্‌ফর আলী সমগ্র সুবে বাংলাকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত করেন।

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খান সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১২৫৬টি মহালে ভাগ করেন। তাঁর সময়েই রাজশাহী চাকলা গঠিত হয়। বগুড়া জেলার অধিকাংশ এলাকা রাজশাহী চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাংলার শাসনকর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে যাওয়ার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ডকর্ণওয়ালিশ মোগল প্রবর্তিত সরকার ও পরগনা ব্যবস্থা ভেঙ্গে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এবং সমগ্র বাংলাকে ২৮টি জেলায় রূপান্তর করেন; তখনও বগুড়া নামে কোন প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলনা।

---

৩২. খন্দকার আব্দুর রশিদ, বগুড়ায় ইসলাম, পৃ.৩৫

৩৩. শফিকুল আলম সৈয়দী, জেলা পরিচিতি-বগুড়া, ১ম খ- পৃ.১৩।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার ৩টি (আদমদীঘি, শেরপুর ও বগুড়া), রংপুর জেলার ২টি (গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ) এবং দিনাজপুর জেলার ৩টি (লালবাজার, ক্ষেতলাল ও বাদলগাছী) পুলিশ সার্কেল নিয়ে বগুড়া গঠিত হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া জেলার সূচনা মাত্র; পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে গড়ে উঠতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী সময় লাগে। বর্তমানে ১২টি উপজেলা নিয়ে বগুড়া জেলা। বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে বগুড়া জেলা অন্যতম জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

উপর্যুক্ত অভিমতগুলোর আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বগুড়া নামের এ জনপদটি বগুড়া নামকরণ অনেকগুলো যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমেই হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট বা একক সিদ্ধান্তে হয়নি।

কোন কোন স্থানের নামকরণ এলাকার বিশেষ কোন ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অধিকারী ‘বগুড়া’ বর্তমান বগুড়া নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

২.৩ জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ বগুড়া জেলা। বাংলাদেশের পৌরণিক এবং প্রাচীন কালের ইতিহাসে বগুড়া এক গুরুত্বপুর্ন স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন আমলে এ জেলা পৌন্ড্র অথবা পৌন্ড্র রাজ্যের অংশ ছিল যা পৌন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল।[৩৪] মহাভারত, রামায়ণ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণে পুন্ড্রবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বর্তমানে মহাস্থান নামে পরিচিত একটি প্রাচীন সুরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেসের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এই মহাস্থানগড়ই ছিল পৌন্ড্র দেশের মহাসমৃদ্ধশালী রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন নগর।[৩৫]

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এ জেলাসহ সমস্ত উত্তর বাংলা অর্থাৎ পুন্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাস্থানগড়ে অবস্থিত একটি পুরাকালের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, এ জেলা মৌর্য শাসনাধীন ছিল।[৩৬] মৌর্য বংশ পতনের পর সম্ভবত কুষাণ রাজারা পুন্ড্রবর্ধন কিয়দংশ অধিকার করেছিলেন।[৩৭] এ জেলায় কুষাণ বংশীয় প্রথম রাজা বাসুদেবের এক স্বর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। শুঙ্গযুগের পোড়ামাটির মূর্তি ও চিত্রফলক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, মৌর্য বংশের পতনের পরেও পুন্ড্রবর্ধন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুপ্তযুগ থেকে সেন আমল (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১২০০) পর্যন্ত প্রাচীন বাংলায় দুটি ভুক্তিই ছিল প্রধান। একটি পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং অপরটি বর্ধমানভুক্তি।

---

৩৪. R. C. Majumdar (ed): History of Bengal, Vol. 1, ঢাকা ১৯৪৩, পৃ. ২০

৩৫. প্রভাসচন্দ্র সেনঃ বগুড়ার ইতিহাস, রংপুর ১৯১২, পৃ-৩২

৩৬. R. C. Majumdar (ed): প্রগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, প্রথম খন্ড (প্রাচীন যুগ), কলকাতা, ১৯৪, পৃ. ২০

সাধারণত প্রদেশ বা রাজ্য অর্থে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রমন্ডল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির প্রধান এলাকা। পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে পদ্মা ও উত্তরে হিমালয় পাদদেশ এই চতুঃসীমা ভূ-ভাগ বরেন্দ্রী নামে পরিচিত। বরেন্দ্র অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মূল এলাকা হলেও ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ভুক্তির সীমানাও বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। গুপ্ত, পাল ও সেন আমল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি বরেন্দ্রঅঞ্চল ছাড়াও কামরূপ ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টলিপি থেকে জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে খাড়িমন্ডল (২৪ পরগণা), অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্তাধিকার ভুক্ত ছিল এবং পুণ্ড্রবর্ধন ছিল এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্কের সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ সর্বপ্রথম একক রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভ করে এবং কামরূপ পর্যন্ত তার সীমা বিস্তৃত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চেয়াঙ এই সময় (৬৩৮ খ্রিঃ) সমগ্র বাংলাদেশকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত দেখেন- কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট।[৩৮] একমাত্র সমতট ছাড়া বাকি চারটিই শশাঙ্কের রাজ্যান্তর্গত ছিল বলে তার বিবরণ থেকে জানা যায়। শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে কর্ণসুবর্ণে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেও পুণ্ড্রবর্ধন ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির রাজধানী। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের' মতে, এই সময় প্রাচ্যদেশের রাজা ছিলেন সোম; তার রাজধানী ছিল পুন্ড্র। শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যাবহিত পরেই কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ জয় করেন। ভাস্কর বর্মা বেশিদিন এই বিজয় ধরে রাখতে না পারলেও তার রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্ধারিত হয় করতোয়া নদী। ধর্মপালের সময় (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রিঃ) দেখা যায় কামরূপ পুনরায় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশ, কম্পোজ, উৎকল ও প্রাগজ্যোতিষরাজ্য। রামপাল (আঃ ১০৭২-১১২৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত পাল বংশের এই সম্রাজ্য বজায় ছিল। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায়, বিজয় সেন (আঃ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রি.) এর শামনামলে গৌড় (বরেন্দ্রী), পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ সেন শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা প্রায় সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষন সেন (১১৭৯-১২০১ খ্রি.) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রভাসচন্দ্র সেন 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থে জানাচ্ছেন 'করতোয়ানদীর পূর্ব ধারে অবস্থিত বগুড়া জেলার অংশ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল'।[৩৯] ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া জয়ের পর কামরূপ হয়ে তিব্বত অভিযানে অংশ নিলেও যতদূর জানা যায় তিনি কামরূপ দখল করেন নি। সেন শাসনের অবসানের পর থেকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) কর্তৃক কামরূপ বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৩ শত খ্রি. কামরূপ একটি স্বাধীন রাষ্ট ছিল।

৩৮. ড. বেলাল হোসেন, লোক সাহিত্যের কাঠামোগত স্বাতন্ত্র, পূর্ব বগুড়া; বাংলা একাডেমী, জুন-২০০৮, পৃ. ১৩
৩৯. প্রভাস চন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস, পুনমুদ্রণ ২০০০, পৃ-২৪০

এই দীর্ঘ সময় কামরূপের পশ্চিম সীমানা ছিল করতোয়া নদী। যোগিনীতিন্ত্রের মতে, কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমসীমা করতোয়া নদী। তাঞ্জুর বা তেঙ্গুরের মতে পুন্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের মধ্যে কলো-তু অর্থাৎ করতোয়া নদী অবস্থিত। সপ্তম শতকে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার সময়ও কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। ভাস্কর বর্মার (৬৪২ খ্রি.) সময় থেকে ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০খ্রি.) কর্তৃক কামরূপ বিজয় পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর কামরূপ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময়েও কামরূপের পশ্চিমসীমা ছিল করতোয়া নদী। গেইটের 'আসামের ইতিহাস' হতে জানা যায়- চতুর্দশ শতাব্দীতে কোচবিহারকে রাজধানী করে কামতা রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন দুর্লভ নারায়ণ। কোনো কোনো ঐতিহাসকের মতে, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের কিয়ংদংশ নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নীলধ্বজের নেতৃত্বে কামতা রাজ্যে সেন কিয়দংশ নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নীলধ্বজের নেতৃত্বে কামতা রাজ্যে সেন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্য ৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল কামপীট, ভদ্রপীঠ, সৌমাপীঠ ও রত্নপীঠ।[৪০] গেইটের ইতিহাসে বলা হয়েছে, করতোয়া নদী থেকে মানস নদী পর্যন্ত রত্নপীঠ; মানস নদী থেকে শীলঘাট পর্যন্ত কামপীঠ; ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীর ভদ্রপীঠ এবং ভারালী থেকে ডিকরং পর্যন্ত সৌমার পীঠ। করতোয়া নদী থেকে মানসনদী পর্যন্ত যে এলাকাটিকে আসামের ইতিহারে রত্নপীঠ বলা হয়েছে প্রায় সমগ্র পূর্ব বগুড়া তার মধ্যে পড়ে। সেনদের শেষ রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামতা রাজ্য দখল করেন। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'র জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। নুসরাত শাহ ঢাকার সোনারগাঁ পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন।[৪১] মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ১৫৮০ খ্রি. সমগ্র ভারতবর্ষকে ১২টি বিভাগে বিভক্ত করে সুবেবাংলা ১৮টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে (পরগণা) বিভক্ত করেন। এই ১৮টি সরকারের সরকার বার্ব্বকাবাদ সরকার বাজুহা, সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার পিঞ্জরার কতকগুলো মহাল নিয়ে পরবর্তীকালে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে সুবেবাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সারা বাংলায় পুরোপুরি মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে এখানে পূর্ণাঙ্গ মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৭-১৬৫৯ খ্রি.) বাংলার সুবেদারী পেয়ে ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সুরেবাংলার নতুন জমাবন্দি করেন। এ সময় সমগ্র বাংলাকে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৭-১৭০৭ খ্রি.) এর শাসনামলে ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বকীয় পৌত্র আজিম-উসসানকে সুবেবাংলার নবাবে নাজিম এবং মির্জা হাদি ওরফে মুর্শিদকুলী খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ানি লাভের পর ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্বের নতুন হিসাব প্রস্তুত করেন।

৪০. ড. বেলাল হোসেন, প্রগুক্ত, পৃ. ১৪।
৪১. পূর্বোক্ত।

এ হিসাবের নাম জমা কামেল তুমারী। এই নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে সুবেবাংলার সরকারগুলোকে ১৩টি চাকলায় এবং ২৫টি জমিদারিতে বিভক্ত করা হয়। এ সময় সমগ্র বগুড়া জেলা চাকলা ঘোড়াঘাট এবং রাজশাহী বা নাটোর ও শেলবর্ষ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ আমলে অধিকাংশ ভূ-ভাগ তিনটি প্রধান জমিদারি অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ পরগণা দিনাজপুর জমিদারির; দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগের পরগণা রাজশাহী জমিদারির এবং মধ্যভাগের শেলবর্ষ পরগণা শেলবর্ষ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে সমগ্র বাংলাদেশকে পূর্বোক্ত সরকার বা চাকলার পরিবর্তে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। এ সময় পশ্চিমে ভাগলপুর ও পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত এবং সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত হয়। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলা হতে আদমদিঘি, শেরপুর, নওখিলা ও বগুড়া থানা, রংপুর জেলা হতে দেওয়ানগঞ্জ ও গোবিন্দগঞ্জ থানা এবং দিনাজপুর জেলা হতে লালবাজারত, ক্ষেতলাল ও বদলগাছি থানা এই মোট ৯টি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়।[৪২] ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে যমুনা নদীর আকার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দাওকোবা (যমুনা নদী) বগুড়া জেলার পূর্ব সীমা নির্ধারিত হয় এবং দেওয়ানগঞ্জ থানা ময়মনসিংহ (পরবর্তীতে জামালপুর) জেলার অন্তর্ভক্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে লালবাজার পুলিশ থানা পাঁচবিবিতে এবং মানস নদী মরে যাওয়ায় নওখিলা পুলিশ থানা সারিয়াকান্দিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুনরায় জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও এ থানার ১০২টি গ্রাম সারিয়াকান্দি, ৪৭টি গ্রাম শিবগঞ্জ এবং ৯টি গ্রাম বগুড়া থানার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলা হতে ৩৯টি গ্রাম বিচ্ছিন্ন করে সারিয়াকান্দি থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম থানাকে রাজশাহী জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করে বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলার আয়তন প্রায় একইরূপ ছিল। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী বগুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের পাঁচবিবি, জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল ও কালাই থানা নিয়ে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়। বর্তমানে সারিয়াকান্দি, গাবতলী ধুনট, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, আদমদিঘি, নন্দীগ্রাম, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া সদর ও নবগঠিত শাজাহানপুর উপজেলাসহ ১২টি উপজেলা নিয়ে বগুড়া জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৪৩]

---

৪২. সোহেল রানা (সম্পাদিত), বগুড়া তথ্যকোষ, শাহবাগ, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ২০
৪৩. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.২৯।

তৃতীয় অধ্যায়
সমাজ

সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজসত্তার সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব পড়ে।[১] কোন দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা, ধ্যানধারণা, চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞ্যানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে শীলাচরন ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়।[২] তাই যে কোন স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তার সমাজ সংস্কৃতিকে জানতে গেলে তার প্রাত্যহিক জীবন যেমন জেলার অধিবাসীদের পরিচয়, বাসগৃহ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার এবং সামাজিক উৎসব প্রভৃতি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় দিকগুলির প্রতি আলোচনা করা প্রয়োজন। বগুড়া জেলার সামাজিক ইতিহাস ঐতিহ্য এই অধ্যায়ে তুলে ধরবে।

৩.১ অধিবাসীদের পরিচয়

ইতিহাস অনুসারে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, অ্যালপাইন প্রভৃতি নৃগোষ্ঠির সমন্বয়ে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত উৎস সম্ভবত আদি অস্ট্রালয়েড (Proto Asutroloid) জনধারা। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে দেখা যায়, আদি অস্ট্রালয়েড জনধারাই এ অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠন করে। এক সময় আদি অস্ট্রালয়েডদের ব্যাপ্তি উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বছর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ গিয়ে প্রথম পৌছায়। বাংলাদেশের ওরাও, মুন্ডা, কোল, সাঁওতাল, দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুড়ম্ব, পনিয়ান, উরুলু, মধ্যে ভারতের ভীল, করোয়া প্রভৃতি আদিবাসী আদি অস্ট্রালয়েড জনধারর উত্তরসূরি। পুন্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে জানা যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পার হয়ে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে অস্ট্রিকবাসী আদি অস্ট্রালয়েডরা। তারপর এখানে তিস্তা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র নদী বিধ্যেত অঞ্চলে তারা গড়ে

---

১. ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি-সংগঠন, সংস্কার-আন্দোলন, সাহিত্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, লোকগাথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, দল ও দলাদলি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা-এসবই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত। "ভূমিকা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খণ্ড (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩।

২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২) পৃ.৩।

তোলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা। এদেরকেই প্রাচীন বেদ-এ-নিষাদ, অনার্য বা অসুর বলা হয়েছে।[৩] বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেই যে অস্ট্রিকরা প্রথম বসতি স্থাপন করে তার সত্যতা মিলে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিকদের উত্তরসূরি ওরাও, মুন্ডা, কোল সাঁওতাল প্রভৃতির বসতির দিকে তাকালে। আজো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেই শুধু এদের বসতি দেখা যায়। বাঙালির ধান, ভাত, মাছ খাওয়া, লাঙ্গল ব্যবহার করা, কলা চাষ, তুকতাক, ঝাড়ফুক, সাপের বিষ নামানো, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, হিসেবে কুড়ি, গন্ডা, পণ ইত্যাদির ব্যবহার এবং অনেক বিচিত্র শব্দসম্ভার অস্ট্রিক সংস্কৃতির দান।[৪] ধান-পান-কচু, আম, কাঁঠাল, কলা নানা প্রজাতির কন্দ যেমন মাচআলু, মিষ্টিআলু, কেশুরআলু, ইক্ষু, গোলমারিচ, এসব তাদেরই সাংস্কৃতিক উৎপাদন। ধানেরই প্রায় পাঁচশত প্রজাতি তারা সৃষ্টি করেছিলেন। ফলমূলের ক্ষেত্রে যেমন কলা, কন্দ, আম কাঁঠাল ইত্যাদি আরো আছে রবি শস্য, মাসকালাই, খেসারি কালাই, মুগ-মসুরি, সরিষা, হলুদ, বচ, পিপুল, মরিচ, ধনিয়া, আদা, পিয়াজ, রসুন এবং অস্ট্রিক মানব গোষ্ঠিরই সাংস্কৃতিক অবদান বা মহৎ সৃজন। মাটির ঘর তৈরি কিংবা বাঁশ-কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি, ছন বা ধানের খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া এসব কিছুই উল্লিখিত মানব গোষ্ঠীরই অবদান।

বাংলাদেশ অস্ট্রিক মানব ধারার সংস্কৃতির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এরা এদের ভৌত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বাঁশকেই প্রধান উপকরণ বা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিলেন।[৫] বাঁশের হাজারো বিচিত্র ব্যবহার অজস্র হাতিয়ার তির, ধনুক, বর্মা, সলঙ্গা, কোচা, বাটুল, ফুকোনল, সাতনল, লাঠি ইত্যাকার হাতিয়ার তো বানিয়েছেনই, শস্য রাখার পাত্র ডোল, বেড়, ঘরের বেড়া, খুঁটি, ঝুড়ি-ঝাকা মাছ ধরার অজস্র ফাঁদ ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছেন। এককথায় বাঁশ-ধান-রবিশস্য-মাছ অস্ট্রিক সভ্যতার প্রধান উপাদান, ভৌত উপাদান। অস্ট্রিকরা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করতো। কারো মৃত্যু হলে তার আত্মা কোনো পাহাড় অথবা গাছ অথবা কোনো জন্তু বা পাখি বা অন্য কোনো জীবকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, এই ছিল তাদের ধারণা।[৬] এই ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দু পুনর্জম্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। এরা মৃতদেহ কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়িয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতো বা মাটির নিচে কবর দিয়ে তার উপর বড় বড় পাথর সোজা করে পুতে দিতো, মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহারও দান করতো। এ ধরনের রীতি কিছুটা পরিবর্তিত রূপ পূর্ব বগুড়ার মুসলমান সমাজে আজো লক্ষ করা যায়।

৩. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-বগুড়া, জুন-২০১৪, পৃ-২৯।
৪. ড. বেলাল হোসেন, লোকসাহিত্যের কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য পূর্ব বগুড়া, বংলা একাডেমী, জুন, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৮
৫. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ-৩০
৬. পূর্বোক্ত।

এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার পর কবরের ওপর মসুর, মাষ অথবা আড়হর জাতীয় কালাই বুনে দেয়া হয় এবং কবরের ওপর একটি বাঁশ মৃত ব্যক্তির সোজাসুজি শুয়ে রাখা হয়। এ ছাড়াও পূর্ব বগুড়ার কোথাও কোথাও কবরের ওপর তিনদিন, কোথাও বা সাতদিন সন্ধ্যাবেলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[৭]

অস্ট্রিকভাষীরা বিশেষ বৃক্ষ, পাথর পাহাড়, ফলমূল, কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ পশুপাখি ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার পূজা করতো। বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ে বৃক্ষপূজা আজো বহুল প্রচলিত, বিশেষ করে শেওড়াগাছ ও বটগাছ। তুলসী গাছ তো হিন্দুদের দৈনন্দিন পূজারই একটি অংশ। পূর্ব বগুড়ার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমজেই আজো বটগাছকে পূজা করতে দেখা যায়।[৮] আমাদের দেশে যে নবান্ন উৎসব এবং বাঙালির বিয়েতে ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায় তাও অস্ট্রিকদেরই দান। পূর্ব বগুড়ায় মুসলামানদের বিয়েতেও সিঁদুর ও কলাগাছের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশের হোলি বা চড়ক উৎসব এবং পূর্ব বগুড়ায় প্রচলিত ভুল্যা খেদানোর উৎসব প্রভৃতির আদি উৎস আর্যপূর্ব আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠী।[৯]

‘আর্যমঞ্জশ্রীমূলকল্প’ গ্রন্থে গৌড় ও পুন্ড্রের লোকদের বলা হয়েছে অসূরভাষী। অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুন্ড্রোদ্ভবা সদা। আসামেও এই অসুরবাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল। বাংলাদেশের কোল মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠির অন্যতম বুলির নাম এখনও অসুর বুলি। কাজেই এক সময় গৌড় পুণ্ড্রে যে এই বুলিই প্রচলিত ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। এ সত্যতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় কোল-মুণ্ডা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের দিকে তাকালে।

---

৭. ড. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

৮ পূর্বোক্ত-পৃ.১৮

৯ পূর্বোক্ত- পৃ.১৮

বাংলা ভাষার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্র হলো এর দ্বিস্বরধ্বনি। (Diphthongs) যেমন- ঐ, ঔ, অয়, ইই, ইউ, এই, এউ, এএ, এও, অ্যাএ, অ্যাও, ওএ, ওও ইত্যাদি।[১০] এই ধ্বনিগুলো শুধু বাংলা ভাষারই বৈশিষ্ট্য নয়, মুণ্ডা ভাষারও বৈশিষ্ট্যপূর্ব বগুড়ার ভাষায় এই দ্বিস্বরধ্বনির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। আসামে ও বাংলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে এক পণ অর্থ্যাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, এমনকি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্য এখানে এ ভাবেই গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং গণনা রীতি দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতাল ও মুণ্ডারী ভাষাতেও এই কুড়ি এবং একই গণনারীতি লক্ষ করা যায়। পূর্ব বগুড়ার জনসমাজেও এই একই গণনারীতি আজো প্রচলিত। এ অঞ্চলে ধানের বিছন (চারাগাছ), ধান, পাট, গম, প্রভৃতির আটি, পাট কাটা ও ধোয়ার হিসাব, বাঁশ, সুপারি, পান, কলা প্রভৃতির গণনা আজো গন্ডা, কুড়ি ও পনের হিসাবে করা হয়। এ অঞ্চলে গন্ডা, কুড়ি ও পণের হিসাব হলো ৪টি=১ গন্ডা, ৫ গন্ডা=১ কুড়ি, ৪ কুড়ি=১পণ। অস্ট্রিক ভাষীরাও ঠিক এভাবেই গণনা করতো। গন্ডা এখানো কুড়ি বা পণ হিসাবের একক। পুন্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানে প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে যে গ-কমুদ্রার কথা বলা হয়েছে, এই গন্ডা থেকেই সেই গ-ক মুদ্রার উৎপত্তি বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। অস্ট্রিক ভাষার কিছু শব্দ যেমন- ছোপ্তা (বাড়ি ঘরের চিকন গলি অথবা, ঘরের বারান্দা), ঠ্যাং (গোড়ালি হতে হাঁটু পর্যন্ত), জং (জঙঘা), পাগার (পুকুর) বরজ (পানের), দত্ত বা দহ (জলভরা গভীর গর্ত) প্রবৃতি শব্দ বগুড়ার জনসমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সম্ভবত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে অস্ট্রিকরাই প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন করে। এদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।[১১] কৃষি সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষি কর্মের দেবতা পৃথিবীর সর্বত্রই নারী। নারীরাই প্রথম কৃষির উদ্ভাবন করে। পূর্ব বগুড়ার কৃষিভিত্তিক জনসমাজে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের কিছূ ইঙ্গিত আজো লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলে ছেলের বিয়েতে অভিভাবক মহলে একটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো, কনে পক্ষের মাতৃকুল দেখা। এ অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো ‘নানেন কুল দেখে বিয়ে কর’ অর্থ্যাৎ পাত্রীর মায়ের কুল- এর খোঁজ নিয়ে তারপর বিয়ে কর। এ সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস হলো যদি কনে

১০. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

১১. ড. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

বা পাত্রীর মায়ের কুল ভালো হয় বা বড় বংশের হয় তাহলে পাত্রীটিও ভালে হবে। আর যদি পাত্রীর মায়ের কুল খারাপ বা ছোট বংশের হয় তাহলে পাত্রীটিও খারাপ হতে বাধ্য। পূর্ব বগুড়ার আরেকটি লোকবিশ্বাস হলো 'মামা কর্তৃক ভাগ্নেকে মারা হয় না, মারলে মামার হাত কাঁপে;' অর্থ্যাৎ যে হাত দিয়ে মামা ভাগ্নেকে মারে, মামার সেই হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সে কারণে এ অঞ্চলের মামারা আজো পারতপক্ষে ভাগ্নের গায়ে হাত তোলে না। এই বিশ্বাস এবং প্রবাদটি যেন এ অঞ্চলের প্রাচীন আদি অস্ট্রালয়েড মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করছে।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিকদের পর দ্রাবিড় বা ভেড্ডিদের কথা বলা হলেও উত্তরবঙ্গ তথা বগুড়ায় এদের প্রভাব খুব একটা নেই। অস্ট্রিকদের পরেই এ অঞ্চলে যে জনধারার প্রভাব লক্ষ করা যায় তা হলো মঙ্গোলীয় জনধারা।[১২] মঙ্গোলীয়দের দৈহিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠনের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। চেপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি মাথা, চোখের কোণে ভাঁজ, সাধারণভাবে এগুলোই হলো মঙ্গোলীয় চেহারার বৈশিষ্ট। উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলীয় জনধারায় যে শাখার ছাপটি সবচেয়ে বেশি নৃবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন প্যারোইয়ান। প্যারোইয়ানদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কোচ ও রাজবংশীদের চেহারার সাদৃশ্য বেশি। বগুড়াতেও এই শাখাটির কিছুটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। পূর্ব বগুড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘসময় কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসামের ইতিহাসে জানা যায় মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বোড়ো শাখা অতি প্রাচীনকালে (আর্য আগমনের পূর্বে) ব্রক্ষপুত্র উপত্যকায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সাম্রাজ্য আসামের পূর্ব সীমা থেকে পশ্চিমে করতোয়া নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীযুগে ইন্দো-মঙ্গোলীয় কিরাতজনের (কালিকাপুরাণ, অমরকোষ, যোগনীতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে ম্লে- চ্ছ নামে পরিচিত)। অন্যতম শাখা আহমদের সঙ্গে এরা মিলিত হয়েছি। উত্তরবঙ্গের কোচ-রাজবংশী প্রভৃতি এই বোড়ো ও আহমদেরই উত্তরসুরি। এ অঞ্চলে সংখ্যায় অল্প হলেও কোচ ও রাজবংশীয় উপস্থিত প্যারোইয়ান মঙ্গোলীয় জনধারার প্রভাব প্রমাণ করে। কোচ, রাজবংশীয় প্রভৃতি দীর্ঘ- প্যারোইয়ান মঙ্গোলীয় নৃবিজ্ঞানে চিহ্নিত হয়েছে

১২. পূর্বোক্ত, পৃ.১৯-২০,

long head Mongolotype বলে।[১৩] পূর্ব বগুড়ায় আদি- অস্ট্রালয়েড জনধারার সঙ্গে প্যারোইয়ান বা long head Mongolotype এর একটি মিশ্রণ ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ার মানুষের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে বগুড়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল মতিন আজকের বগুড়া (১৯৬৮) গ্রন্থে 'পৌণ্ড্রবর্ধনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' নামক প্রবন্ধে (পৃ. ৫৭) বলেছেন ঃ

পৌণ্ড্রবর্ধনের ক্ষেত্রে long head Mongolotype এর চাইতে Mongolo Austric type এর সাথে long head Mongolotype এর কিছুটা সংমিশ্রণ (intercource) হয়েছে; এবং সেও হাল জামানার কথা স্কুলে আড়াই থেকে তিন শতাব্দীর ব্যাপার মাত্র। পূর্ব বগুড়াকে বাদ দিলে গোটা পশ্চিম বগুড়া তথা পৌণ্ড্রবর্ধন ভূমির নরগোষ্ঠী Mongolo Austric type ধারার লোক।

আবদুল মতিন পূর্ব বগুড়ার long head Mongolotype এর প্রভাবকে হাল জামানার কুল্লে আড়াই থেকে তিন শতাব্দীর ব্যাপার বললেও এ অঞ্চলের ইতিহাস পাঠে আমাদের কাছে ব্যাপারটি আরও একটু প্রাচীন বলেই মনে হয়। আমরা মনে করি পূর্ব বগুড়ায় আদি- অস্ট্রালয়েডদের সঙ্গে দীর্ঘমুন্ডী মঙ্গোলদের সংমিশ্রনে ঘটে সপ্তম শতকের কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মার পরবর্তী সময়ে। কেননা ভাস্করবর্মার সময় থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত মাঝে পাল ও সেন আমল ব্যতীত দীর্ঘ প্রায় চারশত বছর পূর্ব বগুড়া ছিল মঙ্গোলীয়দের উত্তরসূরি কামরূপ শাসকদের অধীন। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ে পূর্ব বগুড়ায় মঙ্গোলীয় এবং তাদের উত্তরসূরিদের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক।

পূর্ব বগুড়ার লোকসংস্কৃতির দিকে তাকালে এই সত্যতার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে প্রথমেই তন্ত্র-মন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। বগুড়ার লোকজীবনে আজও তন্ত্র-মন্ত্রের একটি ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আর এ তন্ত্র-মন্ত্রের উৎপত্তি ও কেন্দ্রস্থল হলো কামরূপ কামাখ্যা। মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান ই-গায়েবী' (১৬৩২ খ্রি.) গ্রন্থে কামরূপ কামাখ্যাকে জাদুবিদ্যার কেন্দ্রস্থল বলেছেন। কামরূপ রাজ্যের একজন অত্যাচারিত শাসকের মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, খন্তাঘাট(কামরূপ) পরগণায় একজন ক্রোড়ী মুহম্মদ জামান

১৩. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

তাবরিজী স্বীয় অত্যাচারিত প্রজাদের দ্বারা যাদুটোনার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন ঃ

'আসল কথা হলো যে, কোনো ব্যক্তি (প্রজা) মুহম্মদ জামানকে যাদুটোনা করেছিল; ফলে দু'দিন দিন ধরে তিনি কুকুর, বিড়াল ও ঐ জাতীয় অন্যান্য জীবজন্তুর মতো শব্দ করেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'

বাংলার গুণীরা গুণশিক্ষার জন্য কামাখ্যা গমন করতেন। কামাখ্যার রমণীরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। লোকসমাজে এরা ডাকিনী পরিচিত। বগুড়ায় এক সময় এই ডাকিনী বা নারী ওঝার ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল। আজো বগুড়ায় পাতাখেলা নামে একটি খেলা প্রচলিত আছে, যা সম্পর্ণই মন্ত্রশক্তির খেলা। মন্ত্রশক্তিতে কে কতো বলীয়ান তারই পরীক্ষা হয় এ খেলায়। রংপুর অঞ্চলেও খেলাটির প্রচলন দেখা যায়। বগুড়ায় দেখা যায়, ফকিররা তুলারাশির লোকের ওপর মন্ত্র প্রয়োগ করে ভূতের 'আছর' ঘটায় এবং এদের সম্মোহিত করে রোগের কারণ ও চিকিৎসার উপায় জেনে নেয়।

পূজা পাতার অনুষ্ঠান কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যেও দেখা যায়। রাজবংশীদের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে পূর্ব বগুড়ার মানুষের লোকবিশ্বাসের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই প্রতিষেধক রূপে লোহা ও ঝাঁটার ব্যবহার দেখা যায়। রাজবংশী মহিলারা রাতে বাইরে বেরুনোর সময় লোহা সঙ্গে রাখেন। শিশু জন্মের পর বিছানার নিচে এক টুকরো লোহা এবং পাশে ঝাঁটা রাখা হয়।[১৪] বগুড়ার মানুষের মাঝেও অনুরূপ বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। রাজবংশী 'দ্যাওভূত' এবং বগুড়ার মানুষের 'দ্যাও' ধারনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত কৃষ্ণধামালী বগুড়ায় মালসী নামে পরিচিত। পূর্ব বগুড়ায় আজো মাদারের বাঁশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুরের কেল্লাকুশি এবং বগুড়ার প্রান্ত অঞ্চলে মাদারের বাঁশ উৎসবকে কেন্দ্র করে এখনো জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা বসে। 'নেপালে এবং তিব্বতেও ভিন্ন নামে এই বাঁশ উৎসব প্রচলিত আছে। বগুড়ার জনসমাজ আদি-অস্ট্রলয়েড এবং মঙ্গোলীয় জনধারার সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী বলে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিও একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিনত হয়েছে।[১৫]

---

১৪. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-৩৩।

১৫. ড. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩

৩.২ বাসগৃহ

বাড়ীঘর সাধারণত কাঠ, বাঁশ, টিন ও মাটির তৈরী । করতোয়া নদীর পূর্ব পার্শ্বস্থ এলাকায় মাটি সাধারণত : বেলে হওয়ায় এতদঞ্চলে মাটির বাড়ী বিশেষ হয় না। বাঁশের চাটাই, কাঠ ও টিন দিয়ে দেয়াল তৈরী হয়। উপরে খর টিন অথবা টালি ব্যবহার করা হয়। করতোয়া নদীর পশ্চিমাঞ্চলের এটেল জাতীয় মাটি দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে মাটির মজবুত ঘর করা যায়। মোটাকরে ভিদ দিয়ে বাড়ী করলে দীর্ঘদিন টিকে। এ অঞ্চলে মাটির তৈরী দোতলা বাড়ীও নজরে পড়ে। এছাড়া টিন, কাঠ ও বেড়ার বাড়ী দেখা যায়। উপরে সাধারণত টিন টালি অথবা খরের চালা ব্যবহার করা হয়। গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু বাড়ী ইটের তৈরী। সাধারণত দু,একটি শোবার ঘর, রান্নাঘর, বৈঠকখানা, গোয়ালঘর কোন কোন ক্ষেত্রে একটা ঢেকির ঘর। কলের পার, আঙ্গিনা, বাহির বাড়ী বা খুলি নিয়ে গ্রামের এক একটি বাড়ী শহরের প্রায় সবই দালান বা বিল্ডিং। বগুড়ার সভ্যতা অনেক পুরানো হওয়ায় এর বিভিন্ন অঞ্চলে ইটের তৈরী প্রাচীন মসজিদ, জমিদার বাড়ী অথবা রাজবাড়ী দেখা যায়।[১৬]

শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয় বাড়িঘরের প্রতিবেশগত পার্থক্য ও লক্ষ্য করা যায় দু অঞ্চলে। পূর্ব বগুড়ার অধিকাংশ বাড়িঘর একটি বাড়ির সঙ্গে আরেকটি বাড়ি সংযুক্ত। এ ধরনের বাড়িকে যৌথবাড়ি বলে পরিবারের বাড়তি সদস্যের আবাসন সমস্যা মোকাবেলায় অন্য কোন জায়গায় নতুন বসতি গড়ে ওঠলে সেখানে এককভাবে যে বাড়ি গড়ে ওঠে তাকে একক বাড়ি বলে। এ অঞ্চলের যৌথ ও একক উভয় বাড়িঘরের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি বাড়ি পূর্ব বা দক্ষিনমুখি।[১৭]

এ অঞ্চলে প্রতিটি বাড়ির ভেতরে ও বাইরে উঠোন থাকে এবং প্রতিটি ঘরের ভেতরে একটি মাঁচা থাকে। মাচায় ধান, চাল থেকে শুরু করে সব ধরনের দ্রব্য রাখা হয়। বাইরের উঠোনের সঙ্গে সড়ক বা রাস্তা সংুক্ত থাকে। উঠোনের এক পাশে গোয়ালঘর অন্যপাশে গরুর খাবার ঘরের পালা কিছুটা জায়গায় জলজ গাছপালা। সামর্থ্যবানের বেলায় বাইরের উঠোনের সামনে একটি পুকুর থাকে। প্রতিটি বাড়ির ভেতরের উঠোনের একপাশে রান্নাঘর অন্য পাশে টিউবওয়েল, গোসলখানা ও পায়খানা। রান্নাঘরের পেছন থাকে ডোবা, নালা যেখানে বাড়ির ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। ডোবার আশেপাশে থাকে বাঁশ ঝাড় এবং বিভিন্ন বনজ ও ফলজ গাছপালা। নিম্নে জেলার বাসগৃহ সমূহের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোক পাত করা হলো।

---

১৬. অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ, বগুড়া গাইড, বিজনেস পোষ্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ-২২

১৭. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

মাটির বাড়িঘর

পশ্চিম বগুড়ার অন্যতম লোকস্থাপত্যিক ঐতিহ্য হলো মাটির ঘর। হাজার হাজার বছর ধরে এ এলাকায় মানুষের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাটির বাড়ি ঘর। এ এলাকার মাটির যে বাড়িঘর চোখে পড়ে তার প্রায় একশো ভাগই মাটির দোতলা ঘর।

বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে পাকা রাস্তা ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকেই এখন বিশেষ করে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা মাটির ঘরের পরিবর্তে ইটের ঘর ব্যবহার করছেন। এ ক্ষেত্রে কাদা মাটির দেয়ালের পরিবর্তে পোড়া ইট ব্যবহৃত হচ্ছে। মাটির ঘরের মতোই ছাউনি হিসেবে টিন অথবা রড সিমেন্ট সহযোগে পাকা ছাদ ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে মাটির ঘরের তুলনায় ইটের ঘরের খরচ প্রায় একই হওয়ার এবং ইটের ঘর গ্রামীণ সামাজিক মর্যদাসূচক হওয়ায় এ ধরনের বাড়ি ঘরের সংখ্যা এখন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

মাটির ধরন

মাটির ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এঁটেল মাটি। জমি অথবা পুকুর থেকে এ মাটি সংগ্রহ করা হয়।

মাটির ঘরের নকশা

মাটির ঘর তৈরির জন্য ভূমি নক্শা সাধারণত পেশাদার নির্মাণ শ্রমিকরাই করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ নক্শা হয় রোমান বর্ণ আই (I) বা এল (L) এর মতো। কোথাও কোথাও ইউ (U) আকৃতির বাড়িঘরও থাকে। একটি আই বা এল আকৃতির বাড়িতে দুটি, তিনটি বা চারটি ঘর থাকে। ইউ আকৃতির বাড়িতে ঘর সংখ্যা আরো বাড়ে। প্রতিটি ঘরের মাপ (দেয়াল ব্যতীত ভেতরের অংশ) দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট থেকে ২০/২৫ ফুট এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১৫ ফুট। দেয়ালের মাপ চওড়া ৪/৫ ফুট।[১৮]

নির্মাণ কৌশল

ফিতা দিয়ে মাপ নেয়ার পর দেয়াল নির্মাণের জায়গাটি কোদাল দিয়ে এক ফুট পরিমান গর্ত করে নেয়া হয় এবং গর্ত খোঁড়ার পর তা দু'একদিন ফেলে রাখা হয় রোদে শুকানোর জন্য। জমি বা পুকুর থেকে সংগৃহীত মাটি উঠানে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। এ মাটি কয়েকদিন রোদে শুকানো হয়। ভালোভাবে শুকালে পানি দিয়ে দু-তিন দিন ভিজে রাখা হয়। মাটি ভালোভাবে ভিজলে উত্তম করে কাদা করা হয়। কাদা করার সময় পাট বা খড় ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে কাদার সঙ্গে মেশানো হয়। এবাবে দু-তিন দিন ফেলে রাকার পর কাদা একটু শুকনো শুকনো হলে তা বলের মতো করে মণ্ড বানানো হয়।

১৮. তথ্যদাতা: মো. গোলাম রাব্বনী (৫০) গ্রাম ভাটরা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া, পেশা শিক্ষকতা।

একেকটি মণ্ড বড় সাইজের একটি তরমুজের মতো দেখতে হয়। এ সব মণ্ড দিয়েই দেয়াল নির্মাণ করা হয়। একদিনে দু'সারির বেশি নির্মাণ করা হয় না। দু-তিন দিন বিরতি দিয়ে আবার এক সারি বা দু'সারি গাঁথা হয়। এভাবে একটি ঘর নির্মাণ করতে সাধারণত দু-তিন মাস লেগে যায়। দোতলা একটি বাড়ির জন্য প্রায় ৩০/৩৫ ফুট উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতে হয়। সম্পূর্ণ দেয়াল নির্মাণ শেষ হলে তার ওপর চারচালা বা আটচালা ছাউনি দেয়া হয়। যখন টিন ছিল না তখন ছাউনি হিসেবে ছন বা খড় ব্যবহৃত হতো। সাধারণত ১৫/২০ ফুট দেয়াল নির্মানের পর প্রথম ছাদ এবং পরবর্তী ১০/১২ ফুট নির্মানের পর দ্বিতীয় ছাদ দেয়া হয়। ছাদের ক্ষেত্রে তালগাছ লম্বা করে চিড়ে তা ডাঁসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডাঁসার ওপরে বাঁশ দিয়ে তার ওপর মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। প্রতিটি ঘরের বাড়ির ভেতরের অংশে বারান্দা থাকে এবং একাধিক জানালা থাকে। [১৯]

নির্মাণ সময় ও খরচ

সাধারণত কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাসে মাটির ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং তা চলে ফাগুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত। দু-তিন কক্ষ বিশিষ্ট দোতলা একটি মাটির ঘর নির্মাণে টিনের ছাউনি ও লেবার খরচসহ সর্বমোট প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়।

স্থায়িত্ব

এক একটি মাটির ঘরের স্থায়িত্ব এক দেড়শো বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সুবিধা

বসবাসের জন্য মাটির ঘর খুবই উপযোগী। গরমকালে এ ঘর ঠান্ডা আর শীতকালে গরম থাকে। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে এর খুব একটা ক্ষতি হয় না।

সৌন্দর্য

প্রায় প্রত্যেকটি মাটির ঘর লেপার সময় ঘর ও ঘরের বাইরে (ভেতরের অংশে) নানা ধরনের নক্শা করা হয়। নকশাগুলো অনেকটা আলপনা টাইপের। বিয়ের সময় অথবা বাড়িতে অতিথি আগমনের সময় এ রকম নক্শা বেশি করা হয়।

টিনের ঘর/বাড়ি

টিনের চাল ও টিন, বাঁশ, ছন বা পাটখড়ির বেড়া দেয়া ঘরকে সাধারণত টিনের ঘর বলা হয়। পূর্ব বগুড়ায় তিন ধরনের - দোচালা, চারচালা ও আটচালা টিনের বাড়িঘর চোখে পড়ে। এর মধ্যে চার চালা বাড়িঘরই বেশি। যারা গরীব দুস্থ তাদের বাড়িঘর দোচালা। আর যারা অভিজাত বা বনেদি পরিবার তাদের বাড়িঘর সাধারণত আটচালা হয়ে থাকে। আটচালা বলতে আটটা চালের সমন্বয়ে যে বাড়ি সেটিকেই আট চালা বলা হয়।

১৯. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, (৫১) গ্রাম নিউ সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

এ ঘরের চারপাশেই বারান্দার মতো চারটি চাল থাকে। এর ওপর মূল ঘরে আরো চারটি চাল থাকে। সাধারণত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় সবার ঘরই চারচালা টিনের ঘর। অধিকাংশ ঘহৈ টিনের বেড়া থাকে। যাদের টিনের বেড়া দেবার সামর্থ নেই কেবল তাদের ঘরেই বাঁশ, ছন বা পাটখড়ির বেড়া দেখা যায়। আজকাল অনেকেই বেড়ার টিনের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করছে।[২০]

নকশা ও মাপ

টিনের ঘর নির্মাণের পূর্বে যেখানে ঘর তোলা হবে সেকানে ফিতা ধরে চিহ্ন করে দাগ দেয়া হয়। প্রথমে চারকোণায় চারটি খুঁটি পোতা হয়। এরপর মাঝে মাঝে খুঁটি দেয়া হয়। পূর্ব বগুড়ায় সাধারণত ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪ বা ৩০, ৩২ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১০/১২ হাত প্রস্থ পর্যন্ত টিনের ঘর দেখা যায়। অধিকাংশ ঘর আই বা এল আকৃতির হয়ে থাকে। ঘরের দৈর্ঘ্যই এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক চিত্র বলে দেয়। যারা স্বচ্ছল বা একটু টাকা পয়সার মালিক তাদের ঘরের দৈর্ঘ্য ৩০/৩২ হাত বা তার বেশি হয়ে থাকে। এদের ঘরের বেড়া টিনের হলেও তা বিভিন্ন নক্শাকৃতরি হয়।[২১]

নির্মাণ কৌশল

যারা টিনের ঘর নির্মাণ করেন বগুড়ায় এদের বলা হয় ছুতার। ছুতার বাঁশ বা কাঠের টুকরো দিয়ে প্রথমে ঘরের একটি কাঠামো তৈরি করেন। এরপর এর ওপর বিভিন্ন মাপের টিন বসিয়ে তা লোহা বা পেরেক দিয়ে আটকে দেন।

নির্মাণ সময় খরচ ও স্থায়িত্ব

কাঠামোসহ চারচালা একটি টিনের ঘর নির্মানে দু থেকে তিনদিন সময় লাগে। ১৮/২০ হাত পরিমাণ একটি টিনের ঘর নির্মানে ২০/২৪ হাজার টাকা খরচ হয়। টিনের ঘর ক্ষণস্থায়ী। ঝড় বৃষ্টিতে যে কোন সময় উড়ে যেতে পারে। তবে বন্যার সময় এ ঘর সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়।

ছনের ঘর

সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা উপজেলায় যমুনার চরে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের ঘর চনের ঘর। ছনের ঘর সাধারণত দো'চালার হয়ে তাকে। যমুনার চরে যে কাশ বা শন জন্মে তা দিয়েই এর চাল ছাওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে একে কাশ্যা বলে ।[২২]

২০. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

২১. মোঃ মুকুল মিয়া, (৫৩) গ্রাম ধাওয়া পাড়া, পূর্ব বগুড়া, বগুড়া।

২২. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।

৩.৩ খাদ্যাভ্যাস

বাঙালীর প্রধান খাদ্য হল ভাত, মাছ ও ডাল। বগুড়া জেলার অধিবাসীরাও এর ব্যতীক্রম নয়। তাদেরও প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, ডাল, সবজি, মাংস, ডিম ও দুধ। অনেকে রুটি খেয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের খাবার প্রায় একই। তবে মুসলমানদের জন্য সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ পাঠা ও শূকরের মাংস আর হিন্দুদের জন্য নিষিদ্ধ গরুর মাংস।[২৩] অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিভিন্ন প্রকার পিঠা, দই, ঘোল, মাখন, মিষ্টি, ক্ষীর, পায়েস, খিরমা লালী, গুড়, আচার আমতা প্রধান। বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে 'বগনি' ও 'সিদল' উল্লেখযোগ্য।[২৪]

বিশেষ অনুষ্ঠানে পোলাও, কোরমা, কাবাবের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। চা সাধারণত শহরের লোকেরা পান করে। নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যে চা, পান সুপারি, জর্দা, গুল, বিড়ি ও সিগারেট প্রচলিত। পূর্বে বিড়ির স্থলে হুক্কার ব্যবহার ছিল অধিক। এখন উহা বিলুপ্ত প্রায়। এছাড়াও বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী কিছু খাদ্য দ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১.আলুঘাঁটি

আলুঘাঁটি শুধু গাবতলী নয় সমগ্র বগুড়াতেই অত্যন্ত প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী খাবার। তবে গাবতলী অঞ্চলের মানুষ এই ঘাঁটিকে নিজেদের বলেই মনেকরে। যেকোন অনুষ্ঠান পালা পার্বণে আলুঘাঁটি থাকতেই হবে। ভাত আলুঘাঁটি হলে অন্য কোন খাবার বিশেষ করে পোলাও বিরানি মুখেই তুলতে চায় না। আলুঘাঁটির সাথে বগুড়ার আরেক ঐতিহ্য দই থাকতেই হবে। ভাত- আলুঘাঁটি আর দইয়ের সম্মিলনে পরিপুর্ন উদর পূর্তিতে আর কোন বাধাই থাকে না। আলুঘাঁটি ছাড়া কোন খানা-দানার অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে পূর্ণতা পায় না। [২৫]

আলুঘাঁটির উপকরণ

ক. গরু বা খাসির মাংস। গরুর মাংসই বেশি প্রাধান্য পায়।
খ. আলু
গ. পেঁয়াজ, মরিচ ও মসলা সবকিছুই পরিমাণ মত দিয়ে আলুঘাঁটি রান্না করতে হয়।

২.বরির/বরের(কুল) আচার

বরের আচার তৈরি করার জন্য গাছ তেকে ডাগর বর নামানো হয়। এরপর তা ডালা বা চালুনে করে রোদে শুকানো হয়। বরগুলো যখন শুকিয়ে লাল বা খয়েরি বর্ণ ধারণ করে তখন তার অবস্থা কিছুটা চুপসিয়ে যায়। এরপর বরগুলো পানিতে ধুয়ে বোটাগুলো ছাড়িয়ে লবণ, তেল, মসলা মরিচ এবং গুড়া (আখের বা খেঁজুর) দিয়ে জ্বাল করা হয়। তারপর তা বয়ামে করে রেখে দিনে দিনে খাওয়া হয়।[২৬]

২৩. কাজী আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২৫. তথ্যদাতাঃ মোঃ আসাদুল আকন্দ,(৪০) গ্রাম-মেন্দিপুর, পোঃ নারুয়ামালা, উপজেলা-গাবতলী, বগুড়া।
২৬. তথ্যদাতাঃ অলেকা রানী (৩৭), গ্রাম- খানপুর, পোঃ- চৌমুহনী, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

৩.দুধপিঠা

দুধ পিঠা তৈরীর জন্য পরিমাণ মতো দুধ আর চালের আটার প্রয়োজন হয়। দুধ ঘন করে জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর তারমধ্যে চালের আটার তৈরি পিঠা বা কিছুটা আটা মিশিয়ে ঘন করে জ্বাল দিয়ে ঘন রসের পিঠা তৈরি হয়। এই পিঠা খেতে অনেকটা রসমালায়ের মতো লাগে।[২৭]

৪.রসবড়া

রসবড়া নন্দীগ্রাম উপজেলার কিছু হিন্দু পরিবারের পিঠা হিসেবে বেশ জনপ্রিয় লোকখাবার। তবে সব বাড়িতে বা সবাই এই পিঠা বানাতে বা তৈরী করতে পারে না। যারা আগে থেকে এই পিঠা খেতে অভ্যস্ত তারাই এটি তৈরি করে থাকে। এই পিঠা তৈরির জন্য প্রধান উপাদান হলো মাসকলাই ডাল। পিঠা তৈরির জন্য পরিমাণ মতো ডাল নিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তা জাতাতে ডলে দু'ভাগ করে নেওয়া হয়। এরপর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে সেগুলো বেশি পানিতে নিয়ে উপরের কালো ডালের খোসা পরিস্কার করে পাটাতে বেটে পেস্ট করা হয়। তারপর ঐ পেস্টগুলো একটা গামলাতে নিয়ে আরো ভালো করে ফাঁপা পেস্ট করা হয়। একটি নারিকেল ভেঙ্গে তার শাসগুলো দিয়ে গুড়ের সাথে জ্বাল দিয়ে নাড়ু বানানোর মত গোল গোল করা হয়। এরপর আগের মাসকলাই ডালের পেস্টগুলো চপ বানানোর মতো করে তৈরি করা হয় এবং তার ভিতর একটি করে নাড়িকেলের নাড়ু দেওয়া হয়। চপগুলো তেলে কড়া করে ভাজা হয়। ভাজার পর চপগুলো খেজুরের নতুন রসের পাতলা গুড়ের রসের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়ার এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা পর তা তুলে খাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভাল যদি পরের দিন খাওয়া যায়। কারণ বাসি রসবড়া খেতে সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু।[২৮]

৫.ছিন্নিপোড়া

ছিন্নি পোড়া এক ধরনের পিঠা। এই পিঠা নন্দীগ্রাম উপজেলার মুসলমান সমাজের মানুষেরা বেশি করে থাকে। এই পিঠা সাধারণত শীত কালেই বেশি তৈরি হয়। পিঠা তৈরির প্রধান উপাদানগুলো হলো চালের গুড়া, মসুর ডাল বাটা, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, লবণ, মসলা এবং সরিষার তেল। প্রথমে চালের গুড়ার সাথে উপাদানগুলো পানি দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর মিশ্রিত ময়দা ভালো করে ছানিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তা চেপ্টা করে কলার পাতাতে করে রাখা হয়। এর নিচে একটি এবং উপরে একটি কলার পাতা দিয়ে গরুর গোবরের শুকনো জ্বালানি দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এক থেকে দেড় ঘন্টা আগুন জ্বলতে থাকে এবং তা যখন লাল টকটকে হয় তখন খানিকক্ষন রেখে ভিতরে দেখে বের করা হয়। পিঠা বের করে তার উপর সরিষার তেল দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়।

---

২৭. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

২৮. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

এরপর তা সন্দেশের পিচের মতো করে কেটে খাওয়া হয়। এই পিঠা বেশ শক্ত হয় বলে অনেক দিন রেখে খাওয়া যায়। আর পুড়িয়ে তৈরি করা হয় বলে একে ছিন্নি পোড়া বলা হয়।[২৯]

৬. কুসলিপিঠা

এই পিঠা সাধারণত চালের আটা দ্বারা তৈরি করা হয়। আলো চালের আটা গরম পানির সাথে মিশিয়ে কাই তৈরি করা হয়। এই কাই থেকে পরিমাণ মতো আটা নিয়ে ছোট গোল গোল করে বানিয়ে নেওয়া। তারপর তা রুটি বানানোর মতো করে বানিয়ে নেওয়া হয়। এরপর নাড়িকেলের নাড়ুগুলো রুটিগুলোর মধ্যে দিয়ে সিঙ্গারার মতো করে তৈরি করা হয়। কিন্তু তৈরির পর পিঠাগুলোর আকৃতি হয় ঠিক অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তারপর এগুলো দুধের সাথে সামান্য চালের আটা মিশিয়ে যে রস তৈরি করা হয় তার মধ্যে ডুবানো হয়। এরপর খানিকক্ষণ আবারো জ্বাল দিয়ে নামানো হয়। এই পিঠা গরম বা ঠান্ডা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। তবে গরম অবস্থার চেয়ে ঠান্ডা অবস্থায় বেশি ভালো লাগে।[৩০]

৭. ভুনা

যত প্রকার খাবার আছে তার মধ্যে ভুনা অন্যতম। এই ভূনা সাধারণত হিন্দু পরিবারের মানুষ বেশি পছন্দ করে। তাই এটা তৈরিতে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের নৈপূণ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এই খাবারটার সাথে তাদের আচারের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। যেমন গোছরাখার (যেদিন প্রথম জমিতে ধান রোপন করা হয়) দিনে হিন্দু কৃষক পরিবারে ভুনা তৈরি করা হয়। এই ভূনা তৈরির কিছু প্রক্রিয়া আছে। তা হলো, প্রথমে পরিমাণ মতো চাল ভেজে নেওয়া হয়। তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সারারাত পর সকালে তা উঠিয়ে পানি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর তা কয়রা/পাতিলে করে পেঁয়াজ, রসুন মসলা, লবন, মরিচ ঘি/তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়। ভাজা হয়ে গেলে তা চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করা হয়।[৩১]

৮.বগুড়ার দই

দই বগুড়ার খাদ্য সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অংশ। ভোজনের শেষে শেষপাতে দই মিষ্টি ছাড়া বগুড়াবাসী অতিথি পরায়ণতার কথা ভাবতে পারেন না। খাবার শেষে পাতে একটু দই নিয়ে পোলাওর সাথে মাখিয়ে না খেলে অনেকের খাবারের পরিপূর্ণতা পায় না।

শুধু দইকে কেন্দ্র করেই বগুড়া পেয়েছে আলাদা পরিচিতি। স্বাদে অতুলনীয় বগুড়ার দই দেশের জনপ্রিয়তা ছাপিয়েও দেশের বাইরে সুনাম অর্জন করেছে। বছরের অন্যান্য সময়ে বগুড়ায় শতাধিক দোকানে প্রতিদিন দই বিক্রি হয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত। রমজান মাস ও বিভিন্ন উৎসবে বিক্রির হার কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দইয়ের শহর বলা হয় বগুড়াকে।

---

২৯. পূর্বোক্ত।
৩০. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৩১. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

বগুড়ায় দইয়ের ইতিহাস প্রাচীন। শুরু হয়েছিল প্রায় ২০০ বছর আগে। শেরপুর উপজেলায়। ঘেঁটু ঘোষ নামে এক ময়রা প্রথম দই বানান। প্রথম দিকে টক দই হিসেবেই বেচাকেনা হতো। রং ও স্বাদ ছিল বিচিত্র। টক দই থেকে বংশ পরম্পরায় তা চিনিপাতা বা মিষ্টি দইয়ে পরিণত হয়।

৬০ দশকে গৌরগোপাল পাল নামের এক ব্যবসায়ী বগুড়া শহরে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সরায় দই তৈরি করেন। গৌর গোপালের এই দই-ই জনপ্রিয় হয় বগুড়া শহরে। ঐতিহ্যবাহী নবাব পরিবার ও সাতানী পরিবার এই দইয়ের স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশি বিদেশি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন এদের আতিথ্য গ্রহণ করলে তাদের বগুড়ায় এই অভিনব খাবার দই দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। গৌরগোপাল এদের জন্য দই তৈরি করে সরবরাহ করতেন।[৩২]

সে সময় এই দইয়ের নাম ছিল নবাববাড়ির দই। গৌরগোপালের প্রতি মুগ্ধ হয়ে নবাব পরিবার তাকে কিছু জমি দান করে বসবাসের জন্য। এখনও নবাব বাড়ির পাশে গৌরগোপাল দধি ভান্ডার দই বিক্রি করছে।

পরবর্তীতে বগুড়ায় আরও অনেক দই প্রস্তুতকারকের নাম চলে আসে। মহরম আলীর দই, বাঘোপাড়ার রফাত আলীর দই, এশিয়া সুইট মিটের দই, শেরপুরের সাউদিয়ার দই, জলযোগের দই, শম্পার দই ও বৈকালীর দই উল্লেখযোগ্য।

দইয়ের স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে রয়েছে নানা মতবাদ। বগুড়া দইয়ের জনপ্রিয়তার কারণে অনেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দইয়ের কারিগর নিয়ে দই প্রস্তুত করছে। কিন্তু বগুড়ার দইয়ের মত স্বাদ পাওয়া যায়নি।

অনেক দই বোদ্ধাদের ধারনা এখানকার মাটি, জল বায়ুর একটা যোগসূত্র রয়েছে দইয়ের স্বাদের বিশেষত্বে। অনেকে বলেন তেঁতুল কাঠ ব্যবহার করলে দই ভাল স্বাদের হয়। অধিকাংশ সময় দই বানাতে আম বা অন্য কাঠও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শতাধিক দইয়ের কারখানায় দই প্রস্তুত হলেও স্বাদের ভিন্নতার কারণে একেক দোকানের দই একক রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি যে দইয়ের চাহিদা রয়েছে এশিয়া সুইট মিটের দই। এছাড়া মহরম আলীর দই, চিনিপাতা দই, আকবরিয়ার দই, গৌর গোপালের দই, সেলিম হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের দই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বগুড়ার প্রায় প্রতিটি রেস্টুরেন্টে দই প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয় গ্রাহকের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে। দই পূর্বে সরায় করে বিক্রি হলেও পরবর্তীতে সরার পাশাপাশি ডুঙ্গিতে করেও দই প্রস্তুত হচেছ। পাশাপাশি অনেক দোকান বড় হাড়ি বা খোরা ও ছোট মাটির কাপে দই প্রস্তুত করে বিক্রি করছে।

---

৩২. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫

এখন কয়েক প্রকার দই প্রস্তুত হচ্ছে। ক্রেতাদের স্বাদ ও সাধের কথা চিন্তা করে। দামের প্রকারভেদও রয়েছে। সাধারণত প্রতি দইয়ের হাঁড়ির দাম ১১০ টাকা, স্পেশাল দই ১৪০-১৬০ টাকা। টক দই ৮০-৯০ টাকা, ডায়াবেটিক দই ৯০-১২০ টাকা। বগুড়ার একটি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট সেলিম হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। একানে আজ থেকে বছর সাতেক আগে এক ধরনের স্পেশাল দই বানানো হতো। দইয়ের ভেতরে থাকতো রসমঞ্জুরী। খেতে সু-স্বাদু এ দইটির প্রচলন ছিল শহর ছাড়িয়ে গ্রামঞ্চলেও, কিন্তু পরবর্তীতে দামের কারণে জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এ দইটির প্রস্তূত বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এশিয়া সুইট মিটের দই বিখ্যাত। এ দই বিদেশেও গিয়েছে আত্মীয়-বন্ধুদের হাত ছুঁয়ে। বেশ কয়েকবার ভাল দই বানানোর জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি পুরস্কৃতও হয়েছে। বগুড়ায় দইয়ের জনপ্রিয়তার কারণে তা ইতোমধ্যেই স্থান করে নিয়েছে দেশের মানুষের খাদ্যতালিকাতেও। তাই নানা আকারের, নানা দামের বগুড়ার দই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সব স্থানে।

৯. লাচ্ছা ও চিকন সেমাই

বগুড়ার চিকও সেমাই দেশে বিদেশে সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতি রোজার ঈদে চিক সেমাই'র কদর বেড়ে যায়। শহর ছাড়াও শহরতলীর অনেক স্থানে চিকন সেমাই প্রস্তুত হয়। বেড়েছে কর্মসংস্থান বিশেষ করে নারীরা এ পেশায় জড়িত হন বেশি।

বগুড়া শহরতলির বেজোড়া গ্রামসহ, শহরের কাটনার পাড়া, কালিতলা, ফুলবাড়ি, জয়পুরপাড়া, বারপুর, এরুলিয়া, মাদলা, নারুলী, বানদিঘি, ঝোপগাড়িসহ বিভিন্ন গ্রামে চিকন সেমাই তৈরি হয় প্রায় সারা বছর। চিকন সেমাইয়ের চাহিদা প্রচুর। অনুকূল পরিবেশ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক থাকলে দিনে প্রায় ২০০ কেজি সেমাই তৈরি করতে পারে কারিগর। এখানে খাঁচি (২৫ কেজিতে ১খাঁচি) হিসেবে দৈনিক একজন ১৫-১৬ খাঁচি সেমাই তৈরি করে থাকে।

ঘন দুধে চিনি, গরম মশলা, বাদাম ও কিশমিশ সহযোগে এই সেমাই প্রস্তূত হয়। লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুতপ্রনালী বেশ কঠিন। দক্ষ কারিগর ছাড়া এ সেমাই প্রস্তূত করা যায় না। বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে লাচ্ছা সেমাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। সু-স্বাদু এই সেমাই দুধ ছাড়াও ঘি, চিনি, কিশমিশ ও বাদাম সহযোগে প্রস্তূত করা যায়।

লাচ্ছা সেমাইয়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় এর ইতিহাস বেশ পুরানো। প্রথমে এ সেমাই ছিল ধনীদের খাবার। পরবর্তীতে সাধারণের মাঝে এ সেমাই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে এ সেমাই উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেণির খাদ্য হিসেবে গণ্য হতো। এটি বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। কলকাতাতে পাওয়া যেত সৌখিন ব্যক্তিরা কলকাতা থেকে আনিয়া খেতেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কলকাতা ও হুগলী থেকে কিছু আবাঙালি লাচ্ছা বানানোর কারিগর বগুড়া শহরে আসেন।

যারা বেকারি ব্যবসার সাথে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি বেকারি ব্যবসার সাথে জড়িত না থেকেও লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতো।

আরও জানা যায় সে সময় লাচ্ছা সেমাই অত্যন্ত গোপনে হতো। বিশেষ করে বগুড়াবাসী যাতে এ সেমাই প্রস্তুতপ্রণালী না জানে। সেজন্য অত্যন্ত গোপনে লাচ্ছা সেমাই বানাতেন সে সময়কার অবাঙালি কারিগররা। যারা উৎসাহিত ছিলেন, এ সেমাই বানাতে ইচ্ছুক ছিলেন তারা এ সেমাই তৈরির কৌশল ও পদ্ধতি শিখতে সেই অবাঙালি কারিগরদের কাছে যেতে হতো। কারিগররা শর্ত জুড়ে দিতেন যে ঘরে লাচ্ছা তৈরি আগে ময়দা খামির করার কৌশলে তাদের লোক ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারবে না। এসব শর্তে অনেকে লাচ্ছা সেমাই বানানো শিখে নিতেন। ঘি ও ডালডা দিয়ে লাচ্ছা সেমাই তৈরি হতো। অনেকে বলেছেন, ডালডায় তৈরি লাচ্ছা সেমাই অনেকে খেতে পছন্দও করতেন না। তারা মনে করিতেন ঘি এর তৈরি লাচ্ছা সেমাই ভাল। বর্তমানে ঘি, ডালডা, সয়াবিন তেল দিয়ে লাচ্ছা সেমাই ভাজা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙালি কারিগরদের পাশাপাশি বাঙালি কারিগরদের উদ্ভব ঘটে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সৈয়দপুর অবাঙালি কলোনির কারিগররা বগুড়ায় এসে কারিগরদের দেখানো পদ্ধতিতে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতে আসত। এছাড়া তারা পুরো রমজান মাস মহাজনের অস্থায়ী কারখানায় থেকে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করত। এসময় স্থানীয় বাঙালিরা সৈয়দপুর থেকে আসা ব্যক্তিদের কারিগরের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো।

এক সময় ঐ ব্যক্তিরা তৈরির কৌশল শিখে দক্ষ হয়ে ওঠে। তারা নিজেরা দোকান নিয়ে প্রকাশ্যে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তর বগুড়ায় গত ত্রিশ বছর যাবৎ লাচ্ছা সেমাইর মানে উন্নয়ন ঘটে। এরমধ্যে বগুড়ার স্বনামখ্যাত আকবরিয়া গ্রান্ড হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও বেকারির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এরপর শ্যামলী ও ঢাকা বেকারির লাচ্ছা সেমাই তৈরি ও বিক্রিতে এগিয়ে আসে। লাচ্ছা সেমাইয়ে নানা পরীক্ষা চলে। স্থানীয়ভাবে লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুতের ও স্বাদের কারণে শুধু ঈদ মৌসুমেই নয় বগুড়া জেলার থানা, পাড়া মহল্লায় প্যাকেটজাত করেও বিক্রি করা শুরু হয়।

বর্তমানে বগুড়ায় লাচ্ছা তৈরির কারিগর প্রায় তিন হাজার। এরা শুধু বগুড়াতেই যে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করেন তা নয় বরং অনেক বিভিন্ন জেলায় গিয়ে লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুত করেও অর্থ উপার্জন করছেন। পাশাপামি পার্শ্ববর্তী অনেক জেলা উপজেলা থেকে মহাজনরা এসে বগুড়া থেকে অনেক কারিগর মাসিক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছেন। [৩৩]

---

৩৩. তথ্যদাতা: মোঃ মশিউর রহমান জোয়ারদার, (৫০) রামচন্দ্রপুর পাড়া, শেরপুর, বগুড়া।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি ঈদ মৌসুমে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মণ লাচ্ছা সেমাই তৈরি হয়। বগুড়া জেলায় এ সময় লক্ষ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হয়। প্রায় ৪৫ বছর আগে বগুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নারীর স্বামীর উপার্জনের পথ ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঘরে বসে চিকণ সেমাই বানাতেন।
শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ছিল এই সেমাইয়ের ক্রেতা। ৭০ এর দশকের শেষের দিকেও এই সেমাইয়ের কদর গ্রামে এবং শহরে নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণির মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি শহরের মানুষের কাচে চিকণ সেমাইয়ের কদর বাড়তে থাকে। বগুড়া জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলাগুলোতেও এর চাহিদা ছিল প্রচুর। ৯০ দশকের মাঝামাঝি এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে ৮০ দশকের দিকে রহিম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মালিক আমির হোসেন বগুড়ায় চিকন সেমাই বানানোর মেশিন তৈরি করেন। এরপরই বগুড়ার চিকন সেমাই তৈরিতে বিপ- ব আসে। এর আগে হাতেই তৈরি হতো এই সেমাই। আমির হোসেনের তৈরি চিকন সেমাই বগুড়া ছাড়িয়া সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের বাইরেও এটি যাচ্ছে। তবে চিক সেমাইয়ের কারিগরি ঐতিহ্য বগুড়াতেই রয়ে যায়। অন্য জেলায় এ সেমাই তৈরি হয়, তবে এর কদর তেমন একটা নেই।

১০. মহাস্থানের কটকটি

শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মহাস্থান মাজার, কেন্দ্রিক নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। তসবি, টুপি, আতর, ধুপকাঠি, গোলাপজল, ধর্মীয় বই পুস্তক ইত্যাদির পাশাপাশি মহাস্থানের কটকটির ব্যবসা অত্যন্ত জমজমাট। মহাস্থানের এই কটকটির জন্য এখানে রীতিমত কটকটি শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে। সারাদেশতো বটেই বিদেশি পর্যটক এবং প্রবাসীদের কল্যানে মহাস্থানের কটকটি এখন বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে। মহাস্থানের সবচেয়ে পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী কটকটি হল লাল মিয়ার কটকটি।

আঠরো'শ শতকের গোড়ার কথা। গোলপদি নামক এক দরিদ্র মুসলমানের দুই পুত্র জহর মাহমুদ ও দিল মাহমুদ। এদের মধ্যে জহর মাহমুদ মাযারের পাদদেশে পাতিল, বালতি কিংবা মুড়ির টিনের মতো উঁচু কোনকিছুর উপর বড় গামলা বা পে- টে সাজিয়ে রেখে খাগড়াই এবং বাতাসার ব্যবসা করতেন। রোদ বৃষ্টিতে সমস্যা হওয়ার কারণে মাথার উপর ছোট্ট একটি খড়ের ছাউনি তুলে নেন। মাযারের দর্শনার্থীরা অল্প বিস্তর খাগড়াই, বাতাসা কিনে শিন্নি বা তবরাক হিসেবে মাযারে দান করত। এই খাগড়াই বাতাসার ব্যবসা করে জহর মাহমুদের সংসারে অভাব অনটন কখনোই ঘুচত না। কিন্তু তবুও তিনি ব্যবসাটি ছাড়েন নি। অনেকটা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় জহর মাহমুদ মারা যান। সংসারে তেমন কোন উন্নতি করতে পারেন নি। জহর মাহমুদের ছেলে মোহাম্মদ আলী পৈত্রিক ব্যবসাটি চালিয়ে যেতে থাকেন। ঐ একই বাতাসা, খাগড়াই এর দোকান এবং ছোট্ট একটি ছনের ছাউনি আর মাযারের

পাদদেশ। কিন্তু পৈত্রিক এই ব্যবসায় তার পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর হওয়ার ফলে এতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করলেন। বাতাসা, খাগড়াই এর পাশাপাশি ময়দা দিয়ে তৈরি কটকটির উদ্ভাবন করেন মোহাম্মদ আলী নিজেই। প্রথম দিকে ময়দা খামরি (খামির) করে টুকরো টুকরো করে কেটে রোদে শুকাতে দিত। তারপর চিনিবালুতে ভাজতো এরপর গরম করে গলানো গুড়ের মধ্যে ভিজিয়ে বিক্রি করত। কিন্তু সমস্যা হল বালুতে ভাজার কারণে ভোক্তার কাছে সমস্যা দেখা দেওয়ায় পরবর্তিতে সরিষার তেলে ভেজে ঝোলা গুড়ে ভিজিয়ে বিক্রি করা শুরু হয়। এই নতুন ধরনের মিষ্টান্নটি রোদে শুকানো এবং শক্ত হওয়ার কারণে খাবারের সময় মুখের ভিতর কটকট আওয়াজ হওয়ার জন্যই লোক মুখ থেকেই এর নামকরণ করা হয় কটকটি।

ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে ১৯৪০-১৯৪২ সালের দিকের কথা। কিন্তু মোহাম্মদ আলীর হাতেও এই কটকটির ব্যবসাটি প্রসার লাভ করে নি। মোহাম্মদ আলীর ছেলে লাল মিয়া তাদের আদি ব্যবসার হাল ধরেন এবং কটকটিতে নতুনত্ব আনার জন্য এর উপাদানে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। লাল মিয়া ময়দার পরিবর্তে চালের আটা সরিষার তেলের বদলে পামওয়েল ও সয়াবিন তেল সেই সাথে কটকটিতে মসলা ব্যবহার শুরু করেন। ফলে কটকটি হয়ে ওঠে মুখরোচক ও সুস্বাদু। অতিদ্রুত এই কটকটির প্রসার ঘটতে তাকে। এটি আশির দশকের কথা । লাল মিয়া তার পৈত্রিক খড়ের ছাউনি বদলিয়ে টিনের ঘর তৈরি করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নতুন উদ্যমে কটকটির ব্যবসা শুরু করেন।

প্রথম দিকে লাল মিয়ার কাছ থেকে কিছু বিক্রেতা ৫/১০ কে.জি করে কটকটি কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘাড়ে কিংবা বাঁকে নিয়ে ফেরি করে বিক্রি করত। এই খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই লালমিয়ার কারখানার শ্রমিক ছিল। পরবর্তিতে এই শ্রমিকদের অনেকেই লালমিয়ার কাছ থেকে কটকটি বানানো শিখে নিজেরাই কটকটির ব্যবসা শুরু করে। ফলে এই কটকটির প্রচার ও প্রসার আরো বেড়ে যায় এবং লালমিয়ার মতো অন্যরাও মাযারের সামনে কটকটির দোকান খুলে বসে। সেই সাথে শুরু হয় কটকটির গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রতিযেগিতা।[৩৪]

বর্তমানে লালমিয়ার মতো নাসিরের কটকটি, হামু মামার কটকটি, জিন্নাহ কটকটি, মিলন কটকটি ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কটকটির এই নামকরণ মূলত মালিকের নামেই হয়ে থাকে।

লাল মিয়ার কটকটি প্রতিদিন বিক্রি ১০০-৩০০ কে.জি এবং শুক্রবারের এই বিক্রি বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০-৫০০ কেজিতে। প্রতি কেজির বর্তমান বাজার মূল্য ১০০ টাকা।

---

৩৪. তথ্যদাতা: মোঃ লাল মিয়া, (৬৫), গ্রাম- মহাস্থান, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

কটকটি তৈরির উপাদান

ক. চালের আটা
খ. ময়দা
গ. সয়াবিন, পামওয়েল, সরিষার তেল পরিমাণ মত
ঘ. গুড় পরিমাণ মতো
ঙ. তেজপাতা পরিমাণ মতো
চ. কালো জিরা পরিমাণ মতো
ছ. ছোট এলাচ
জ. দারুচিনি
ঝ. ঘি
ঞ. ডালডা

১১. কাউনের ভুরবুরি

সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাউন উৎপাদিত হয়। অসিদ্ধ কাউন ঢেঁকিতে পার দিয়ে এর আতপ চাল তৈরি হয়। এ চাল সামান্য একটু লবণ ও মরিচ দিয়ে মাটির হাঁড়িতে অল্পপানি দিতে রান্না করা হয়। আগুনের তাপে পাতিলে আটকে থাকা ভাত খেতে খুব সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন কাউন যখন ঘরে আসে তখন সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সকালের খাবার হিসেবে কাউনের ভুরভুরি রান্না করা হয়।[৩৫]

১২. কাউনের মলা

কাউনের আতপ চাল মাটির কড়াইয়ে ভেজে নিতে হয়। এরপর ভাজা চাল জাল দেয়া গরম পাতলা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় মজাদার মলা। এই মলা খেতে খুব সুস্বাদু।[৩৬]

১৩. হুড়াপুড়া খাওয়া

সারিয়াকন্দির চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বুট কালাই উৎপন্ন হয়। কালাইয়ের গাছ পোক্ত হলে ফাগুন-চৈত্র মাসের বিকেলের দিকে এ গাছ তুলে ফাঁকা জমির মধ্যে আগুন দিয়ে গাছ পোড়া দেয়া হয়। আগুনের তাপে কলাই কিছুটা সিদ্ধ হয়ে মড়মড়া হয়ে উঠে। গাছগুলো যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায়। তখন সবাই হুড়োহুড়ি করে আগুনের ছাইয়ের ভেতর পড়ে থাকা কলাই খুটে খাওয়া শুরু করে।

---

৩৫. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৩৬. পূর্বোক্ত।

১৪. বাদামের পায়েস

সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলে প্রচুর বাদাম উৎপাদিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন নতুন বাদাম ঘরে ওঠে, তকন কাঁচা বাদাম খোসা ছাড়িয়ে ঢেঁকিতে সামান্য থেতলা করে নিয়ে চিনি অথবা গুড় দিয়ে একটু চাউলের আটা মিশিয়ে রান্না করা হয়। বাদামের মৌসুমে অতিথির আগমন ঘটলে এ পায়েস দিয়ে আপ্যায়ন করা এখানকার বিশেষ রীতি।[৩৭]

১৫. চরের ভেতর ভূলক্যা খাওয়া

প্রায় সমগ্র শীত মৌসুম জুড়ে সারিয়াকান্দির চরের ভেতর প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ভূলক্যা খাওয়া হয়। সাধারণত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাংসারিক ব্যক্তিরাও এ ভূলক্যা খাওয়ার আয়োজন করে। চরের ভেতর হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে গিয়ে রান্না করা হয়। সাদা-ভাত ও পোলাও, মাছ, মাংস, পায়েস ইত্যাদি রান্না হয়। রান্না শেষে বালির মধ্যে মাদুর বা কাপড় বিছিয়ে বসে সবাই মিলে একসঙ্গে খাবার খায়। [৩৮]

১৬. তেলপিঠা

বগুড়ার প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শীত ও অন্যান্য মৌসুমে তেলেরপিঠা তৈরি হয়। চালের আটা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা করে গরম তেলে ভাজা হয়। গুড়ের তেলের পিঠা কেতে খেতে শরীর মাতিয়ে উঠে তখন কেউ তেলে ভাজা কয়েকটি শুকনা মরিচ চিবিয়ে খায়। এরপর আবার পিঠা খাওয়া শুরু করে। এভাবে ২০/২৫টি পিঠা কেউ কেউ খেতে পারে।[৩৯]

১৭. বকনি/বগনি

বকনি তৈরির জন্য দরকার আউশ ধান। ভাদ্রমাসে যখন আউশ ধান ঘরে উঠে তখন নতুন ধানকে ডালায় করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। ঢেঁকিতে কুটে আটা গুঁড়া করা হয় এ ধরনের চাল কে। এরপর এই ধানেরই সিদ্ধচাল নিয়ে ভাত রান্না করা হয়। ভাত রান্নারচাল কলার পাতাতে কিছু ভাত ও কিছু চালগুঁড়া রেখে তা হাত দিয়ে মাখানো হয়। এভাবে ভাত ও চালগুঁড়া ভালভাবে মাখা হলে তা একটা হাঁড়িতে রাখতে হয়। পাতিলটা হবে নতুন মাটির হাঁড়ি। সব চালগুঁড়া ও ভাত পাতাতে মাখানো হলে তা হাঁড়িতে দেয়ার পর সামান্য পানি নিয়ে হাত ধুয়ে একটু পানি দিয়ে তা চেপে রাখতে হয়। এভাবে হাঁড়িটি ঢাকনা দিয়ে সারারাত রাখতে হয়। সকালে নাশতা হিসেবে খাওয়া হয় বকনি।[৪০]

---

৩৭. পূর্বোক্ত।
৩৮. তথ্যদাতা: শশীবালা (৬৩), গ্রাম- পারশন, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
৩৯. তথ্যদাতা: জোসনা বেগম (৩৫), গ্রাম- পাচবাড়ীয়া, গাবতলী, বগুড়া।
৪০. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

গ্রামাঞ্চলে এর খাওয়ার প্রচলন কমে এসেছে। আজকাল প্রায়ই এই ঐতিহ্যবাহী খাবার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে বাবার বাড়িতে মেয়েরা নায়রী বা বেড়াতে এলে বগনি অবশ্যই রান্না হতো। মেয়ে জামাইকে খাওয়াতে শাশুড়ি বিকেল থেকেই এই খাবারের আয়োজন করতে থাকে। গরমকালে মেয়েরা বাপের বাড়ি অনেকেই বেড়াতে যায় বগনি খাওয়ার জন্য। ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই বগনি রান্নার ধুম পড়ত।

সারারাত ভাত, চালের গুঁড়া পানিতে ভেজার কারণে এর গন্ধ থেকে এক ধরনের মাদকতা তৈরি হয়। দিনে রোদ যত চড়া হয় ততই এর গন্ধ খানিকটা বাংলা মদের মতো গন্ধ হয়। এই খাবার খেলে ঘুম পায়। শরীরে একই ধরনের অলসভাব আসে বলে জানান।

১৮. মুঠা

চালের গুঁড়া করা হয় ঢেঁকিতে। এরপর তা মাটির চুলায় সিমটা (পাটখরিড়) বা খড় দিয়ে হঁড়িতে পানি গরম করে তাতে একটু লবন দিয়ে চালের গুঁড়া তাতে দেয়া হয়। লাকড়ি দিয়ে তা নেড়ে নামানো হয়। এরপর হাতের মুঠোতে নিয়ে মুঠা তৈরি করা হয়। এরপর অন্য একটি হাঁড়িতে পানি গরম করে তাতে মুঠোগুলো ছেড়ে দেয়া হয়। কিছুক্ষন পর নামিয়ে ঠান্ডা করে তা লালি বা নতুন খেঁজুর গুড়ের হালকা পাকানো গুড় (ঝোলা গুড়) দিয়ে খাওয়া হয় এটি। নতুন ধানের চাল দিয়েই এই পিঠা তৈরি হয়।[৪১]

৩.৪ পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার

বিশ্ব শতকের প্রথম পাদেও এ অঞ্চলের আদিবাসীদের পোশাকে তেমন কোনো বিশেষ বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের সর্ববিষয়ের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে অভিজাত বা উচ্চশ্রেণীর মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। শার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি, তহবন্ধ বা লুঙ্গী, চোগা চাপকান, আছকান, সিরওয়ানী, ছদরিয়া, জুব্বা, টুপি, ছাতা লাঠি প্রধানত বর্তমান যুগে বগুড়াবাসী মুসলমানের জাতীয় পোশাক।[৪২] প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান ধুতি চাদর পাঞ্জাবী ছাতা লাঠী প্রভৃতি ব্যবহার করিত। আধুনিক শিক্ষিতেরা বৈদেশিক পোশাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করিয়া থাকেন কিন্তু এক শ্রেণীর লোক যাহারা প্রকৃত দেশ প্রেমিক খাঁটি বাঙালি বলিয়া দাবি করেন; তাঁহারা সর্বদাই জাতীয় পোশাক হিসাবে উল্লিখিত পোষাক “বাঙ্গালী পোষক” রূপে ব্যবহার করেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশ গমন করিলেও জাতীয় পোশাক ত্যাগ করেন না। এ দেশীয় হিন্দুরা সাধারণত ধুতি চাদর শার্ট পাঞ্জাবি ছাতা লাঠী ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিশেষত বগুড়াতে হিন্দুদের মধ্যেও আজকাল পায়জামা ও লুঙ্গী চোগা-চাপকানের বেশ প্রচলন দেখা যায়। পুরুষেরা টাকা-পয়সা রাখিবার জন্য কোমরে জালি ব্যবহার করিত।[৪৩]

৪১. তথ্যদাতা: মোছা: সুলতানা বেগম (৩৭), মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৪২. কে. এম. মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, গতিধারা প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৯০।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

মফস্বলের হিন্দু মেয়ে সাধারণত লালপেড়ে শাড়ি, শাঁখা সিঁন্দুর পরিধান করিয়া থাকে। শহরের হিন্দু রমণীরা বিচিত্র রঙের শাড়ি, সেমিজ, ফ্রক, স্যান্ডেল, বিবিধ রঞ্জন প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকে আধুনিক মুসলমানী পাজামা, সালোয়ার প্রভৃতিও সখ করিয়া পরে। ইতিপূর্বে সাধারণতঃ হিন্দু বিধবা মেয়েরা ডোরা ও পাড়হীন পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত ও আলো চাউলের ভাত এবং কাঁচ কলা খাইত। বর্তমানে এই রীতি বড় দেখা যায় না।

গ্রামের মুসলমান মহিলারা সাধারণত শেওটা, দোপাট্টা, কোর্ত্তা ও মাঠা কাপড় ব্যবহার করে। গামছা বা সুতার জালিদ্বারা মাথা বাঁধে। পূর্বে রঙিন গামছা বা কাপড় পাওয়া যাইত না। জাম, গাব, কুল ও জিগা গাছের ত্বক বা পাতা সিদ্ধ করিয়া যে কষ বা ক্কাথ বাহির হইত, তাহাতে সাদা কাপড় 'কষ' করার রীতি প্রচলিত ছিল। ইহাকে কষের কাপড় বলিত।

বর্তমানে শহর ও মফস্বলের সমৃদ্ধশালী মুসলমান মেয়েরা বিবিধ বর্ণের রেশমী, পশমী শাড়ি, সেমিজ, বডি, ফ্রক, জ্যাকেট ব্লাউজ, ওরনা, ওভারকোট, গালফকোট, পাজামা, সালোয়ার, রুমাল, মোজা, জুতা, স্যান্ডেল বা বিবিধ প্রসাধনী (লিপস্টিক) ব্যবহারে অত্যন্ত পটু দেখা যায়। ভ্রমণে বাহির হইবার সময় অনেকে সখ করিয়া কৃষ্ণ বর্ণের চকচকে বোরকাও ব্যবহার করেন। হাতে একটি মানিব্যাগ, ফটোগ্রাফি, ফুলসাজি বা ঘড়ি হাতে থাকা অতি আধুনিকতার লক্ষণ। স্নো, পাউডার, পমেট প্রভৃতি মুখে মাখা ও বড় গ্লাসকেসের সামনে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়ান একটি বিশেষ ফ্যাসান। অনূঢ়া মেয়ারা চোখে কাজল, অঙ্গে আতর-এসেন্স, মুখে পাউডার, কপালে লাল টিপ (যদিও ইহা হিন্দু সধবার রীতি) ব্যবহারে অভ্যস্তা। গ্রামের মেয়েরা শাড়ীর আঁচলে এক গোছা চাবী বাঁধিয়া রাখে, দাঁতে মিশ্রি ও চোখে সুর্মা দেয়; পান দ্বার অধর রঞ্জিত করে। শহরের আধুনিকরা "পিন" দ্বারা শাড়ি আঁটিয়া রাখে, বামের দিকে ভাঁজাইয়া আর্মলেট পরিধান করে; গলায় বিভিন্ন হার (নেকলেস) দোলায়। খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া বেণী লটকান বা হেয়ার ক্লীপ ব্যবহার করাও উচ্চাঙ্গের রীতি।[৪৪]

পেশাজীবিগণ অফিস আদালতে কোর্ট, প্যান্ট, চোগা চাপকান পরিধান করতো। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চাপকান, রুমি টুপি এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুগত ধুতি, প্যান্ট, চোগা চাপকান মজলিস দরবারে ব্যবহার করতো। শীতকালে মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, শাল, আলোয়ান, দেশী চাদর ও খদ্দরের চাদর ব্যবহার করা হতো। অভিজাতদের মধ্যে জুতা-সেন্ডেল পরিধানের প্রচলন থাকলেও গবেষণাকালের প্রথম দিকে নিম্নবিত্তদের মধ্যে একটি প্রচলন ছিল না। তবে কেউ কেউ কাঠের তৈরি খড়ম ব্যবহার করতো।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পুরুষের পোশাকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও বিশ্ব শতকের প্রথমার্ধে এ অঞ্চলের নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে তেমন ভিন্নতা লক্ষ করা যায় না। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের মহিলাদের প্রধান পোশাক ছিল শাড়ি এবং অপ্রাপ্ত বয়সে শাড়ি ছাড়াও তারা 'বারা' বা 'ডুমা', 'সেমিজ' ইত্যাদি পরিধান করতো। তবে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়েরা বহিরাবরণ হিসেবে শাড়ির উপরে বোরখা পরিধান করতো। নিম্নে এ পোশাকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:[৪৫]

ডুমা: এটি ছিল গামছার চেয়ে একটু বড়; ছোট শাড়ির মত যা শরীরে পেঁচিয়ে পরতে হতো। সাধারণত মার্কিন কাপড়ে তৈরি ডুমা গামছার মত ডোরাকাটা বা চেক চেক হতো। ১২-১৩ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা এটা পরিধান করতো।

সেমিজ : এটি সাধারণত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হতো যা ব্লাউজ ও পেটিকোট উভয়ের কাজ করতো। সেমিজের উপর দিয়েই মেয়েরা শাড়ি পরতো। তৎকালীন সময়ে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরার চল খুব বেশি ছিল না তথাপি অভিজাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরতো দেখা যেতো।

শাড়ি : যেহেতু শাড়িই ছিল সে সময়ের মেয়েদের প্রধান পোশাক তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের শাড়িও পাওয়া যেতো। তবে শাড়িগুলোতে যে কোনো একটি রং ব্যবহার করা হতো ; বৈচিত্র্যতা আসতো পাড়-এর নকশায় এবং এ নকশার মাধ্যমেই এর নামকরণ করা হতো। যেমন, 'গাছপ্যারা শাড়ি', 'ব্রিজপ্যাড়া শাড়ি', 'গোল্লাপ্যাড়া শাড়ি', 'হরতনপ্যাড়া শাড়ি' ইত্যাদি। 'ব্রিজপ্যাড়া শাড়ি'র পাড়-এ ব্রিজের-এর মতো নকশা থাকতো। 'ক্রসপ্যাড়া শাড়ি'র পাড় ছিল ক্রসচিহ্নের মতো। অনুরূপভাবে 'হরতনপাড়া শাড়ি'র পাড়-এ তাসের 'হরতন'-এর নকশা থাকতে। আবার পাড়-এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করেও কোনো কোনো শাড়ির নামকরণ করা হতো। যেমন, 'দুইপ্যারা শাড়ি' 'পাছাপ্যাড়া শাড়ি', 'পাঁচপ্যারা শাড়ি' ইত্যাদি। 'পাছাপ্যাড়া' কাপড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর পাড় ছিল তিনটি যা পরিধান করলে একটা পাড় পরতো মজায়, একটা পাছায় এবং অপরটি পায়ে বা গলায় পরতো এবং এই শাড়ি বেশ জনপ্রিয় ছিল। শীতের সময়ে মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে আরেক খন্ড কাপড় ব্যবহার করতো।

৪৫. তথ্যদাতা: আছিয়া বেগম,(৫৫), পূর্ব রামচন্দ্রপুর, গাবতলী, বগুড়া।

অলংকার ও প্রসাধনী

বাঙালি মেয়েরা চিরদিনই অলংকার প্রিয়। এ অঞ্চলের সর্বস্তরের মেয়েরাই কিছু না কিছু অলংকার পরিধান করতো। তবে সাধারণ শ্রেণীতে স্বর্ণালঙ্কারের চেয়ে রূপোর অলংকারের অধিক প্রচলন ছিল। এসব অলংকার মস্তকের মধ্যমণি এবং কেশাগ্রভাগ থেকে শুরু করে পাদাঙ্গুলি পর্যন্ত রমণী অঙ্গের শোভা বর্ধন করতো।[৪৬] যেমন:

মাথার অলংকার : ক্লিপ, টিকলি বা সিঁথেপাটি ছিল সিঁথের বা মাথার প্রধান অলঙ্কার। এছাড়া ছিল রূপোর কাঁটা, খোঁপা বাঁধার জন্য।

গলার অলংকার : আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে গলার অলংকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন, 'কেসলি', 'চন্দ্রহার', 'ধান তাবিজ'। 'ধান তাবিজ'-এ ধানের মত আকৃতির পাঁচ থেকে সাতটা পর্যন্ত তাবিজ থাকতো যা সাধারণত সোনা বা পিতলের হতো।

কানের অলংকার : কানে সাধারণত 'কানমাকড়ী', 'কানপাশা', 'ঝুমকা', 'মাকর ফুল' ইত্যাদি পরতো। 'মাকর ফুল' ছিল মাকড়শার জালের মত ছোট ফুল বিশেষ ; 'ঝুমকা' দেখতে ছিল 'পলো'র মত।

নাকের অলংকার : নাকের প্রধান অলংকার ছিল 'নাকফুল'। বিভিন্ন আকৃতির এ নাকফুলগুলোর নাম ছিল 'ময়ূর', 'চাঁদতার', 'বাবলা ফুল', 'এস আকৃতি'র। এছাড়াও দু'নাকের মাঝে পরতো 'ফুরফুরী', 'সিন্দুবালা', 'বেশর' বা 'বুলাক'। অনেকে এত বড় 'বুলাক' পরতো যে খাওয়ার সময় বাম হাতে এটি উঁচু করে ধরে খেতে হতো।

হাতের অলংকার : হাতে বা বাহুতে পরতো রূপার 'কাঁটাবাজু', 'আমলেট', 'চুড়ি', এবং মোটা 'সোনপৌছি'। এছাড়াও ছিল 'চুর'। লোহার 'খাড়ু' সধবা হিন্দু বয়স্ক মহিলারা পরতো। স্বামীর কল্যাণার্থে হিন্দু সধবা মেয়েরা আবহমান কাল থেকেই 'শাখা' পরিধান করে আসছে।

আঙ্গুলের অলংকার : স্বর্ণাঙ্গুলী ছিল আঙ্গুলের অলঙ্কার। তৎকালে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা আঙ্গুলে স্বর্ণের অঙ্গুরি পরিধান করতো।

কোমরের অলংকার : কোমরের অলংকার ছিল 'বিছা', 'তারাহার'। এগুলো সাধারণত রুপার হতো।

পায়ের অলংকার : পায়ের অলংকার হিসেবে 'খারু' (খ্যারা) পরতো এবং তার উপরে পরতো 'পঞ্চম' যা ঝুন ঝুর করে বাজতো। এছাড়াও কোন কোনো মেয়েরা পায়ের আঙ্গুলে 'আঙ্গুটি' বা 'চুটকি' পরতো।

পুরুষের অলংকার : পুরুষদের তেমর কোনো অলংকার ছিল না। তবে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গুরি ও গলায় মালা পরতে দেখা যেত।

৪৬. তথ্যদাতা: শেফালী বেগম (৫২), বাসবাড়ীয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।

প্রসাধনী :

সৌন্দর্য প্রিয়তা সর্বকালের নারীদের মধ্যেই লক্ষণীয়। তৎকালীন সময়ে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তেমন কোনো প্রসাধনীর প্রচলন ছিল না। হিন্দু বিবাহিত মেয়েরা সকলেই এবং মুসলমান মেয়েদের অনেকেই 'সিঁদুর' পরতো। মেয়েরা চোখে পরতো 'কাজল' ও 'সুরমা' এবং 'আলতা' দিয়ে পা ও ঠোঁট রাঙাতো। কপালে পরতো 'সিঁদুর' ও 'কাজলের' টিপ। চুল বাঁধার জন্য ছিল নানা রঙের 'ফিতা' ও 'দোসি'। খোঁপা বাঁধতে ব্যবহার করতো 'খোঁপার কাঁটা', সুতার তৈরি 'জালি' আরও ছিল 'ব্যারচিরুনি'। হাড়ের তৈরি ধনুকের মত বাঁকানো এটির গায়ে ছিদ্র থাকতো যার মধ্য দিয়ে বেল কাঁটা ঢুকিয়ে খোঁপার সঙ্গে গুজে দেওয়া হতো। তেলের সঙ্গে মৌমাছির মোম গলিয়ে মাথার চুলের অগ্রভাগে লেপ্টে দেওয়া হতো যাতে চুল এলোমেলো না হয়। কেশ পরিচর্যায় ব্যবহার করা হতো নারিকেলের তেল এবং পরিপাটি করা হতো হাড়ের ও কাঠের চিরুনি (কাঁকই) দিয়ে। কেশ পরিষ্কারের জন্য 'কুমার মাটি', 'খইল', কলার থোর পোড়ানো 'ছাই', 'সোডা' ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। পুরুষদের তেমন কোনো প্রসাধনী সামগ্রী ছিল না। তবে অনেকে চোখে 'সুরমা' ও সুগন্ধী হিসেবে 'আতর' ব্যবহার করতো। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পোশাক পরিচ্ছেদের পরিবর্তন লক্ষনীয়। এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির ফলে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই যুগোপযোগী মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে।[৪৭]

৩.৫ সামাজিক উৎসব

বগুড়া জেলার সংস্কৃতির এক অনিবার্য বিষয় হলো সামাজিক উৎসব। এমনিতেই বাঙ্গালী জাতি উৎসব প্রবণ জাতি। এক্ষেত্রে বগুড়া জেলাও এর ব্যতিক্রম নয় । সমগ্র জেলাতেয় সারা বছর নানা ধরনের ইতিহাস ঐতিহ্যবাহী মেলা ও ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে বগুড়াবসী। নিম্নে এ জেলার বিভিন্ন প্রধান প্রধান উৎসব সমুহ তুলে ধরা হলোঃ-

১ নবান্ন উৎসব: প্রধানত হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে বগুড়ার হিন্দু সমাজে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। নবান্নের দিন সকালে জমি থেকে আখ (তিন থোপ ধানের গাছ ধানসহ কেটে আনা হয়) নিয়ে আসা হয়। নবান্নের দিন সকালে্লান করে বাড়ির ছোট ছেলেকে নিয়ে বয়োজোষ্ঠ্য কোন ব্যক্তি জমিতে যায়। যাওয়ার সময় গামছায় বা লাল সালু কাপড়ে করে আতপ চাল, গুড়, কলা, আগরবাতি, কাস্তে, প্লুার ফুল, সিঁদুর, কাজল, বাজানোর জন্য ঘন্টা বা শঙ্খ (বাচ্চাদের চোখে যা দেওয়া হয়) ইত্যাদি সাথে নেয়। এরপর যে জমি থেকে আখ আনা হবে সেই জমির মাস্তানা কোণায় (উত্তর পূর্ব কোণ) তিন গোছ ধান গাছকে এক সাথে দিয়ে বেধে উক্ত উপাচার দিয়ে নৈবদ্য সাজিয়ে পূজা করা হয়। তারপর পূজা শেষে প্রণাম করে তা কেটে ঐ ছোট ছেলের মাথায় মুড়িয়ে দেওয়া হয়।

৪৭. তথ্যদাতাঃ কামরুন্নাহার (৩৭), রাধানগর, শাজাহানপুর, বগুড়া।

ছেলেটি ঘন্টা বা শঙ্খ বাজাতে বাজাতে বাড়িতে চলে আসে। বাড়িতে আসার সময় ঐ ছেলেটির কারো সাথে কথা বলা যাবে না। বাড়িতে আসার পর তাকে বরণ করে নেওয়া হয় পরছা (উলু ধ্বনি সহযোগে বিশেষ ক্রিয়া) দিয়ে। এরপর তার মাথা থেকে আখ নামানো হয়। আর এরই মধ্যে বাড়িতে যারা থাকে তারা ঐ সময়ের মধ্যে ঘরের ভিতর, বারান্দায়, আঙিনায় বিভিন্ন রকম আলপনা আঁকে এবং নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করে[৪৮]।

নাবন্নের দিন পুকুর থেকে সবচেয়ে বড় মাছ ধরা হয় বা যার পুকুর নেই তারাও চেষ্টা করে বাজার থেকে বড় মাছ কিনতে। আর গৃহিণীরা বাড়িতে রকমারি রান্নার জোগার করতে থাকে। ঐ দিন প্রত্যেক বাড়িতে কমপক্ষে দশ রকমের তরকারি রান্না করা হয় কিংবা তারও বেশি। তবে এটা নির্ভর করে সাধ্যের উপর। মুসলমান সমাজে অবশ্যই একটু ভিন্ন রকমভাবে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। এ দিন তারা নতুন চালের পায়েস রান্না করে মসজিদে সিন্নি দেয়।

২ পৌষ পার্বণ উৎসব :

বগুড়া জেলায় পৌষপাবর্ণকে বলা হয় পুষণে। পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের আগের দিন পর্যন্ত গ্রামের ছেলেরা দল ধরে লাঠিতে ঘুঙুর বেধে মাগনের গান বা ছড়া গেয়ে মাগন তোলে। সন্ধ্যারপর পরই ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগন তোলা শুরু করে। সারা মাস ধরে সংগ্রহ করা মাগন দিয়ে পৌষ মাসের শেষ দিন ফাঁকা মাঠে গিয়ে খির, খিচুরি রান্না করে গ্রামের সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করে। বগুড়া জেলায় প্রচলিত একটি মাগনের গান:

অ্যালোরে ভাই উড়িয়ে
হাত্তির কান্দে দুল দুল করে
ন্যাপা বাগুন গাচে ধরে
ন্যাপা বাগুন চিরোল ভাত
তাই দে খাইলাম বাসিভাত
বাসিভাত খাইয়া রে
গরু চড়াইবার যাইয়া রে
হিজলতলি বাগের ভর
খায় আর কড়মড়ায়
দুই চোক দিয়ে ভরভরায়
দুই চোকেত দুই মুইলে

৪৮ শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৬

ধান ব্যাড় কর কুলে কুলে
ধান দিব না দিবু কড়ি
থাক কড়ি নড়ি ধরি
নড়িধরি সামরে
উপের ঘড়ি পামরে
উপর ঘরি কিষ্টমালা
এই খরা খান দেখতে ভালা
ঘর বড় আটুনি
গিন্নি বড় পাটুনি
ও গিন্নি হরেক মাল
আমাক দিবি কতক ধান
যাক ধান যেদদুর
আমার বাড়ি মধুপুর
মধুপুর পাইক পাড়া
তিন ছয় আটারো ঘুড়া
ঘুড়া ঘুড়া হিস্যাব দে
শ্যাল গুটা দুই মার‍্যা দে
শ্যালোর পিটোতে আজিগুজি
ভাত বাড়াইলে হালিচারি
ডাল ধরে মালল্যাম পাক
বামুন কয় যে বাপরে বাপ
ওরে খসোলা ভাই
মাগুন দ্যও গো ও ব্যাত যাই[৪৯]।

৪৯. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮

৩ নববর্ষ বা বৈশাখি মেলা উৎসব :

বগুড়া জেলার প্রায় সর্বত্র অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এ দিন সকাল থেকেই শহরের লোকজন নতুন বৈশাখি পোষাক পরে (ছেলেরা পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মেয়েরা বৈশাখি শাড়ি) দলে দলে স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের বৈশাখি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শহরে এ দিন সাতমাথায় বগুড়া থিয়েটার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ একত্রিত হয়ে বিশাল মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। মঙ্গলশোভাযাত্রার মিছিল প্রায় দুই কিলেমিটার ব্যাপী দীর্ঘ হয়ে থাকে। এতে হাতি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, গরুর গাড়ি, পালকি, লাঙ্গল- জোয়াল কাঁধে কৃষক, রাখাল, গৃহিণী, জমিদার, লাঠিয়াল, রাজা-প্রজা, বিভিন্ন মুখোশ-যেমন- বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি সহযোগে ঢাক, ঢোল, খরতাল, বাঁশি, কাসার শব্দে নিত্য গীতের তালে তালে শোভাযাত্রা পুরো শহর ঘুরে এসে পৌরপার্ক বা সাতমাথায় শেষ হয়।[৫০]

এদিন বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় পৌর পার্কে বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় বগুড়া থিয়েটারের উদ্যোগে প্রতি বছর পালিত হয় পাঁচদিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা। ভোর ছয়টা হতে রাত বারোটা পর্যন্ত চলে মেলা। বগুড়া শহরের প্রায় সকল মানুষ উপচে পরে এই মেলায়।

বিকেলে পার্কের উন্মুক্ত মঞ্চে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান প্রতিদিন মেলায় থাকছে বিভিন্ন সংগঠন সমূহের নান ধরনে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বলতে লোকনৃত্য, মহিলাদের বিয়ের গীত পরিবেশন, বৈশাখি গান, লোক সঙ্গীত, লোকনাটক, বউবন্ধক পালা, লছিমনের পালা ইত্যাদি পরিবেশন। গভীর রাত (রাত ১২টা থেকে ১ টা) পর্যন্ত চলে এসব অনুষ্ঠান।

৪ কাহালুর নিশানের মেলা উৎসব : বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম আরেকটি মেলা নিশানের মেলা। প্রতিবছর জৈষ্ঠ্য মাসের দ্বিতীয় রোববার কাহালু উপজেলার দাড়িয়াল গ্রামে এ মেলা বসে। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ নিশান (পতাকা) খেলা। বর্তমানে এ্টি ঘুড়ি মেলা নামে পরিচিত। লক্ষাধিক লোকের সমাগত হয় এ মেলায় । প্রায় ৪'শ বছর ধরে চলা এ মেলাকে ঘিরে গ্রামগুলোকে আত্নীয় পরিজন ও মেয়ে নতুন জামাইকে নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মেলা থেকে প্রতিটি পরিবার সাধ্যমত মিষ্ঠান্ন কেনে। [৫১]

---

৫০. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

৫১. পূর্বোক্ত

৫ গাবতলী পোড়দহ মেলা উৎসব:

বগুড়া তথা পূর্ব বগুড়ার অন্যতম বৃহত্তম মেলা পোড়াদহ মেলা। একদিনের মেলা এটি । প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বুধবার মেলা বসে এখানে। প্রায় চার পাঁচ লাখ লোকের সমাাগম হয় মেলায়। মেলাটির আসল নাম অবশ্য 'সন্ন্যাসীর মেলা' মেলার আগের দিন সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো হয়। এবং পুজো উপলক্ষ্যে পরের দিন বুধবার মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান সব ধর্মের লোকই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে মানস করে।[৫২] মঙ্গলবার দিন পুজো উপলেক্ষ্যে বিভিন্ন ভোগ দেয়া হয় ঠাকুরকে। এদিন সাধারণত হিন্দুরাই আসেন ভোগ দিতে। মুসলামানরা আসে মেলার দিন। হিন্দুরা সাধারণত কবুতর, মিষ্টি, কলা, দুধ, ক্ষির ইত্যাদি ভোগ দেন। মুসলমানরা দেন কবুতর, চিনি, সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি। মেলার প্রধান আকর্ষন মাছ। সে কারনে অনেকেই এমেলাা কে 'মাছের মেলা' বলে থাকেন। সাধারণত বড় বাঘার, রুই, চিতল, পাঙ্গাস, কাতল ইত্যাদি মাছ ওঠে মেলায় । মাছের আকর্ষণে বগুড়া ছাড়াও অন্য জেলা থেকে লোকজন আসে এ মেলায়।

বাংলার ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভবানীপাঠক এই মেলা প্রতিষ্ঠা করে বলে স্থানীয়ভাবে জনশ্রুতি রয়েছে। ভবানীপাঠকের আস্তানা ছিল এখানে। তিনি তার সন্ন্যাসীদের নিয়ে এখানে একটি মেলা প্রতিষ্ঠা করেন।

৬ শেরপুরের কেল্লপোষী মেলা উৎসব :

বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন কুসুম্বি ইউনিয়নের কেল্লপোষী স্থানে এ মেলা বসে।[৫৩] স্থানীয় নামানুসারেই এ মেলার নামকরণ হয়েছে কেল্লপোষী মেলা। বৈশাখের শেষ রবিবার থেকে এ মেলার লগ্ন শুরু হয় তবে মেলার সমাগত ঘটে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় রবিবার থেকে আর এ মেলা চলে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত। স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে এ মেলা জামাই মেলা নামেও পরিচতি। এ মেলার প্রধান পণ্য মাছ ও কাঠ। শেরপুরের আশে পাশে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মেলা উপলক্ষ্যে নুতন পুরাতন সব ধরনের জামাইকে দাওয়াত করা হয়। জামাইরা বউ বাচ্চাসহ শ্বশুর বাড়ি আসে। শ্বশুর-শাশুড়ি জামইয়ের হাতে টাকা দেন। জামাই মেলা থেকে বড় মাছ ও মিষ্টি কিনে শ্বশুর বাড়ি আসে। অবশ্য জামাইকেও খরচ করতে হয়। শ্বশুর-শাশুড়ির আত্নীয়-স্বজন, শ্যালক-শ্যালিকা সবার জন্য জামাইকে খরচ করতে হয়। কে কতো খরচ করতে পারে শ্বশুর-জামাইয়ে চলে তার প্রতিযোগিতা। এ মেলার উদ্ভব এবং নামকরণ নিয়ে লোকমুখে প্রচলিত আছে নানান গল্প। প্রধানত গাজী পীরের মাহাত্ন জনসম্মুখে উপস্থাপনের নিমিত্তে এ মেলার আয়োজন।

---

৫২ শামসুজ্জাম খান (প্রধান সম্পাদক) প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৮

৫৩. অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

কেল্লপোষী মেলা সম্পর্কে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ 'সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত (১৮৬১) গ্রন্থে লেখক কালীকমল সার্ব্বভৌম জানাচ্ছেন-

''বগুড়া হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব দক্ষিণ দিকে ক্যালনাকুশী নামে এক স্থান আছে ঐ স্থানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে যে মেলা হয় তাহার নাম নিশানের মেলা। এই মেলা সপ্তাহের অধিক থাকে না। ইহাতে অনেক দূর হইতে দ্রব্য সামগ্রী ও লোকজন আইসে ও ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেশে যে সকল মুসলমানের সন্তান হয় না তাহারা ঐ স্থানে গাজির নিশানের সহিত সন্তান কামনা করিলে পরে যদি প্রথম কন্যা সন্তান জন্মে তবে ঐ মেলার সময় গাজির নিশানের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়া ঐ কন্যাকে গৃহে আনিয়া রাখে। যতদিন ঐ কন্যা জীবিত থাকে ততদিন ঐ বালা অন্য কোন লোকের সহধর্মিনী না হইয়া ঐভাবে অতি কষ্টে কাল যাপন করে।''

বর্তমানে এ ধরনের চল না থাকলেও এখনো মেলায় গাজির বা মাদারের নিশান তোলা হয়।

৭ মহাস্থানের সন্ন্যাসী মেলা উৎসব :

বৈশাখের শেষ বৃহস্পতিবার মহাস্থান মাযারকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যাা থেকে ভোর পর্যন্ত মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে শত শত বাউল-সন্ন্যাসী আশেকানরা আসে মেলায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। তাই এ মেলাকে কেউ বলে বাউল মেলা, কেউ বলে সন্ন্যাসী মেলা, কেউ বা বলে গাজার মেলা। মেলায় এক রাতে শত শত মণ গাজা বিক্রি হয় বলে এমন নাম। মেলার প্রধান পণ্য গাজা।[৫৪] মেলায় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও কটকটি বিক্রি হয় প্রচুর।

৮ মহিষাবানের বউমেলা উৎসব :

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার একটি গ্রাম মহিষাবান। সাতাশ পাড়ার এই গ্রামে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় বউমেলা। 'বউ' শব্দটির মধ্যেই এ মেলার মূল আকর্ষণ বা তাৎপর্যটি নিহিত। 'বউ' রা অর্থ্যাৎ নারীরাই এ মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তারাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা। স্থানীয় পোড়াদহ মেলার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় মহিষাবনের বউমেলা। এই বউমেলার সঙ্গে রয়েছে পোড়াদহ মেলার এক অবিচ্ছেদ্য সংশি- ষ্ঠতা । মূলত মেলাকে কেন্দ্র করেই মহিষাবানের বউমেলা উৎপত্তি। মহিলাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও সাংসারিক সকল পণ্য পাওয়া যায় এ মেলায়।[৫৫]

---

৫৪ ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

৫৫ পূর্বোক্ত।

৯ রথযাত্রা উৎসব :

বগুড়া জেলার শেরপুরের জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে প্রতিবছর আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় তিথিতে রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রথই শেরপুরের সবচেয়ে বড় রথ । রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দিরের পাশে শেরপুর ডিজে হাইস্কুল মাঠে বিরাট মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ মেলায় যোগ দেয়। রথের যে গাড়িটি বেরোয় তাতে পুরোহিত বসে থাকেন। শতশত লোক রথের দড়ি ধরে টানতে থাকে। পুরোহিত তাদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রথের দড়ি ও রথ স্পর্শ করা পূর্ণ্যির কাজ বলেই হিন্দু সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করেন।[৫৬]

১০ চড়ক উৎসব :

শেরপুরের চড়ক উৎসব এখানকার হিন্দুরে অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। চৈত্রসংক্রান্তির দিন শেরপুর উপজেলায় চার/পাঁচটি চড়ক উৎসব হলেও শেরপুর শহরের বরোদুয়ারী এবং পৌরপার্কের চড়ক দুটিই সর্ববৃহৎ। এ দুটি চড়ককে ঘিরে সকাল থেকেই বারোদুয়ারী প্রাঙ্গণ এবং পৌরপার্কে মেলা বসে।

বারোদুয়ারীর চড়ক গাছটি প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। পৌর পার্কের মেলাটা এর থেকে একটু ছোট। একটি গর্তের মধ্যে চড়ক গাছ পোতা হয়। গাছের মাথায় একটি লম্বা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে বসানো থাকে। বাঁশের দু প্রান্তের রশিতে সন্ন্যাসী জাতীয় মানুষের পিঠে বড়শি লাগিয়ে চতুরদিকে বাঁশ ঘুরাতে থাকে।[৫৭] ১০ থেকে ১৫ মিনিট এভাবে বাঁশ ঘোরানো হয়। যখন বাঁশ ঘোড়ানো হয় তখন অনেকেই মন্ত্র পড়তে থাকে বিশেষ করে পুরোহিত এবং তার সঙ্গীরা দ্রুত মন্ত্র পড়তে থাকে। এছাড়াও হিন্দু মহিলারা এসময় উলুধ্বনি দেয়। চড়ক ঘোরানোর আগে শিব ঠাকুরের পুজো করা হয়। এছাড়া নন্দী গ্রামের মাটিহাঁসের চড়কটিও বিখ্যাত।

১১ শবেবরাত উৎসব:

বগুড়া জেলায় শবেবরাত ‘রুটি দেওয়ার রোযা’ নামে পরিচতি । এ দিন সকাল থেকেই মহিলারা চালের রুটি, হালুয়া পায়েস ইত্যাদি রান্না করে এবং বিকেলে তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করে। প্রতিটি পরিবার সাধ্যমত রুটি হালুয়া তৈরি করে।[৫৮]

---

৫৬. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৫৭. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৫৮. তথ্যদাতা: রহিমা বেগম (৬৭), গ্রাম-বুজরুগবাড়িয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া

১২ ঈদ উৎসবঃ-

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। বগুড়ার ঈদ-উল-ফিতরকে (রোযার ঈদ) এবং ঈদ-উল-আযহাকে কোরবানির ঈদ বলে। রোযার ঈদে এক মাস রোযার রাখার পর নতুন জামা কাপড় পরে ছেলে বুড়ো সকলেই ঈদের জামাতে যায়। নামজে যাওয়ার আগে সেমাই, ফিরনি বা পায়েস এবং নামাজের পর আত্নীয় স্বজনসহ পোলাও কোরমা ইত্যাদি খাওয়া হয়। কোরবানি ঈদে সকলেই সাধ্যমতো কোরবানি দেয়ার চেষ্টা করে। সাধারণ গরু হলে এক, তিন , পাঁচ ও সাতভাগে এবং খাসি বা ছাগল একক ভাবে কোরবানি দেয়া হয়। [৫৯]

১৩ ইছালে সওয়াব উৎসব :

বগুড়া জেলায় প্রায় সর্বত্রই ইছালে সওয়াব হতে দেখা যায়। তবে পূর্ব বগুড়ার তুলনায় পশ্চিম বগুড়ায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এই বাৎসরিক ইসলাম-ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রাহায়ণ থেকে শুরু করে ফাগুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে ধর্মীয় জলসার আয়োজন হলে সে উপলক্ষে প্রতি পরিবারেই আত্নীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হয়। সভাস্থলের অদূরে একটি ছোটখাটো মেলাও বসে। এসব মেলায় বাচ্চাদের নানান খেলনা,

নারীদের নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী এবং মিষ্টি বিক্রি হয় প্রচুর। প্রতিটি পরিবার সাধ্য অনুযায়ী কিনে থাকে। এই ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই আত্নীয়-স্বজনের মাঝে বাৎসরিক মিলন ঘটে। [৬০]

১৪ সুন্নাতে খাৎনা (মুসলমানি) :

সাধারণত মুসলমান ছেলেদের বয়স ৪/৫ হলে তাদের খাৎনা বা মুসলমানি করনো হয়। এটি একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। খৎনার দিন সংশ্লিষ্ট ছেলেকে সকাল বেলা গোসল করানো হয়। এরপর হুজুর এসে দোয়া -দরুদ পড়ে তাকে ফু দেন। ঘরের মেঝে বা বারান্দায় একটি বড় পিড়িতে ছেলেকে বসিয়ে দেয়া হয়। এরপর ছেলের চাচা বা মামা জাতীয় আত্নীয়রা একজন দুহাত দিয়ে ছেলের চোখ আরেক জন পেছনে বসে দুহাত পা শক্ত করে ধরে থাকে। আর মুহুর্তের মধ্যে ওস্তা (বগুড়ার কোথাও কোথাও এদেরকে যেমন সারিয়াকান্দি, ধুনট,গাবতলী শুটকাও বলা হয়) তার ধারালো চাকু বা ছুরি দিয়ে লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলে। চামড়া কাটা হয়ে গেলে ছেলের কান্না শুরু হলে আত্নীয় স্বজনরা সবাই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। এর পর তাকে একটি বিছানায় শুইয়া দেওয়া হয় এবং তাকে নানান খাবার দেয়া হয় যেমন চালভাজা, নারকেল ইত্যাদি।

৫৯. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৬০. তথ্যদাতাঃ আজিমুদ্দিন সাকিদার (৭০), গোবিন্দুপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া।

আত্নীয়স্বজন বা প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ করা হয় পায়েস। ওস্তাকে পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা , এছাড়াও লুঙ্গি বা গামছা দান করতে হয়। ওস্তা মাঝে মাঝে এসে ঘা দেখে যান এবং তেলপরা দেন।[৬১] আজকাল অবশ্য খৎনার দিন থেকেই শিশুকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়। কেউ কেউ ডাক্তারকে দিয়েও খৎনা করান। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো ওস্তা বা গুটকার প্রচলনই বেশি।

১৫ মহরম উৎসব:

বগুড়া শহরের কলোনীতে বিহারিরা (আটকেপরা পাকিস্তানি) মহরমের দিন সকালে তাজিয়া মিছিল বের করে। মিছিলে অংশ নেয়া অনেক কিশোর বা যুবকেরা তাদের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে হাসান-হোসেনকে স্মরণ করে কারবালার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করে।[৬২]

১৬ দুর্গোৎসব :

হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় বগুড়া জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা কম হলেও এ জেলার প্রায় প্রতিটি হিন্দু পাড়াতেই দুর্গাপূজার আয়োজন হয়ে থাকে। বগুড়া জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্গাপ্রতীমা ওঠে শেরপুরে।

১৭ চেহলাম (চল্লিশা) উৎসব :

বগুড়ায় চেহলামকে চল্লিশা বলা হয়। কোনো মুসলমান মারা গেলে ইসলামি বিধান মতে চল্লিশ দিনের মধ্যে যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয় তাকে চল্লিশা বলে। বগুড়ার তিন ধরনের চল্লিশা হতে দেখা যায়। বড়, ছোট ও মাঝারি। বড় চল্লিশায় সাধারণত দশ-বারো হাজার হতে পনের বিশ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। মাঝারি চল্লিশা দুই তিন হাজার থেকে আট-দশ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। দেড়-দুই হাজার লোকের নিচের লোক খাওয়ানোকে ছোট চল্লিশা বলা হয়। চল্লিশায় সাধারণত সকাল থেকে কোরান খতম চলে। এরপর মিলাদ শেষে দুপুরে জুম্মার নামাজের পর লোকজনকে খেতে দেয়া হয়। সাধারণত শুক্রবার দিনেই চল্লিশা করা হয়।[৬৩] চল্লিশার দিনে সাদা ভাতের সাথে গরুর মাংস, মাছ দিয়ে আলুঘাটি এবং পাতলা দই থাকে। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও ধুনট এলকায় অবশ্য মাংস রান্না হয় পিটুলি দিয়ে। চালের আটা আলুর সঙ্গে মাংসের মধ্যে দিয়ে পিটুলি হয়। এটি খেতে খুব সুস্বাদু।

---

৬১. তথ্যদাতা: বেলাল হোসেন (৫৫), সনিপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।
৬২. তথ্যদাতা: রাজ মিয়া (৬৫), মুরুইল, দুপচাচিয়া, বগুড়া
৬৩. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

১৮ গোছ আকা বা রাখা উৎসব ঃ

বগুড়া জেলায় হিন্দু সমাজের একটি অন্যতম কৃষিভিত্তিক লোকাচার হলো গোছআকা বা রাখা। শ্রাবণ মাসে আমন ধান লাগানোর আগে প্রথম যেদিন ধানের বীজ জমিতে লাগানো হবে সেদিন জমির মালিক তার নিজের জমিতে কয়েকটি গোছ দিয়ে ধান লাগানো শুরু করে। এই সময় যার জমি তার পরিবারে যেকোন পুরুষ সদস্য জমিতে গোছ রাখতে পারে। গোছ রাখার জন্য একটি ছোট পাট গাছ এবং একটি কালো কচুর গাছ দরকার হয়। প্রথম যে গোছটা দেওয়া হয় তার সাতে পাট এবং কচু গাছ সহকারের জমির মাস্তানা (উত্তর পূর্ব কোণে) কোণায় রোপন করা হয়। তারপর তার সাথে ৫ টা কিংবা ৭টা গোছ দেওয়া হয়। এর সাথে জমির মাটিতে তেল সিদুরের তিনটা ফোঁটা দেওয়া হয়। ঐদিন গেরেস্তের বাড়িতে নানা রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে কিছু খাবার বাধ্যতামূলক ভাবে খেতেই হবে যেমন পাটের শাক, ভূনা (চাল দ্বারা তৈরি এক প্রকার খাবার) ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এমন বাধ্যতামূলক না মানলেও সাধারণত পাটের শাক সব বাড়িতেই দেখা যায়।[৬৪]

১৯ গাই দেওয়ান উৎসব:

নন্দীগ্রাম উপজেলার সনাতন ধর্মালম্বীদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বাড়িতে কোন গরুর বাছুর হলে প্রথম প্রথম বাড়ির কোন সদস্য ঐ গরুর দুধ খায় না। কারণ গাই দেওয়ান না হলে ঐ গরুর দুধ খাওয়া যাবে না। কোন বাড়িতে গরুর বাছুর হলে তার ৭ দিন বা প্রথম সপ্তাহের প্রথম রবিবার যে গাইয়ের বাচ্চা হয় সেই গাইকে গোসল করানো হয়। তারপর বাড়ির বয়োজ্যৈষ্ঠ মহিলা বা বাড়ির বধূ যে কেউ একজন সকালে কিছু না খেয়ে আমের সার (আম্র পল্লব), ধান দূর্বা, ইঁদুর মাটি, শীল, তেল , সিঁদুর দিয়ে গরুকে এবং বাছুরকে বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড় করিয়ে গাই এবং বাছুরের মাথায় তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। বাছুরকে গাইয়ের সামনের পায়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনের পায়ের মাঝখান দিয়ে বের করা হয়। আর গাই ও বাছুরের মুখ এক জায়গায় করে দুধ ঢেলে দেওয়া হয় নিচের ঘটে। এই সময় একটি ছড়া উচ্চারণ করা হয়-

‘হটো হটো হটো পারশন গাঁয়ে (যে গাঁয়ের গাই)

ঘাস নাই মুখ করো খাটো। [৬৫]

৬৪. তথ্যদাতাঃ রহিম উল্লাহ (৬৭), চানপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।

৬৫. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

২০ গোয়াল পূজা উৎসব ঃ

বগুড়া জেলায় হিন্দু সমাজে প্রচলিত আর একটি লোকাচার হলো গোয়াল পূজা। আষাঢ় মাসের ৭দিন গেলে আমুত (অম্বসূচি) লাগে। এই আমুত আড়াই দিন থাকে। এই আড়াই দিনের শেষ দিনেই গোয়াল পূজার আয়োজন করা হয়। গোয়াল পূজা আসলে গোরক্ষনাথ দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়। পূজার দিন সকালে মাটি দিয়ে গোয়ালের উত্তর দিকে বা কোণায় (উত্তর পূর্ব কোণ) গোরক্ষনাথের থান করা হয়। পূজার উপচার হিসেবে বাঁশের পাতা, কলমী শাকের আগা, ফুল, কলার পাতা, তুলষী পাতা, বেল পাতা, গাঁড়া ঘাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পরিবারের যেকোন সদস্য এই পূজা করতে পারে। তবে বেশিরভাগে ক্ষেত্রে মেয়েরাই করে থাকে। পূজার নৈবদ্য দেওয়া হয় আলো চাল, গুড় আর কলা দিয়ে। পূজার মন্ত্র হিসেবে গরু বাছুরের মঙ্গল কামনায় উচ্চারণ করা হয়। কেউ কেউ আবার গীতার দু একটি শ্লোক উচ্চারণ করে থাকে।

পূজার দিনে কোন কোন বাড়িতে নিরামিষ খাবারের আয়োজন করা হয় এবং পায়েস রান্না করা হয়। ঐ দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি যেয়ে পূজার ফুলগুলো মাটিতে পুঁতে আর পায়েস খায়। পূজার ফুলগুলো গোয়ালের দুয়ারে পুঁতা হয়। গর্ত করার জন্য কোদাল ব্যবহার করা হয়। কোদাল দিয়ে যখন মাটি খোড়া হয় তখন তিন জন মিলে বা তিন জনের হাতের স্পর্শে ৩ কোপ দেওয়া হয়। তারপর যেকোন একজন ভাল করে গর্ত করে। এরপর ফুলগুলো গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। পুঁতার সময় কোন একজন রাখাল বালক মাথা দিয়ে তিন বার গর্তে মাটি নামিয়ে দেয়। তারপর সবাই মিলে মাটি নামিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এরপর পূজার প্রসাদ হিসেবে আতপ চালের সাথে গুড় আর কলা মিশিয়ে এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। একে চাউল মাখা বলে। তারপর সবার হাতে হাতে পায়েস দেওয়া হয়। এভাবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি চলতে থাকে।[৬৬]

২১ ভুল্যা খ্যাদানোর উৎসব:

পনের বিশ বছর আগেও পূর্ব বগুড়ার বিশেষ করে সারিয়াকান্দি,ধনুট ও গাবতলী এলাকায় এ উৎসবটি ব্যাপকভাবে পালিত হতো। কিন্তু বর্তমানে খুব একটা পালিত হতে দেখা যায় না। কার্তিক মাসের শেষ দিন সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে শিনটে (পাঠকাঠি) অথবা বাঁশের চুঙ্গির মশাল জ্বালিয়ে ছেলে-যুবক-বৃদ্ধ সবাই উৎসবে মেতে উঠতো। এরা মশাল নিয়ে বাড়ির উঠোনে, ফাঁকা মাঠে বা সড়কে এলোমেলো ভাবে দৌড়াতে আর ছড়া বলতো-

কাতি গ্যালো আগুন অ্যালো

কয়ড়াপুটি মাচ দিয়েরোত পলো।

---

৬৬. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯

এখানে কার্তিক মাসকে বিদায় জানিয়ে অগ্রাহায়ণ মাসকে বরণ করা হয়েছে। অগ্রাহায়ণ মাস ফসলের মাস। এ মাসেই কৃষকের ঘরে নতুন ফসল ওঠে। নবান্ন শুরু হয়। তারই আগমনি বার্তায় মানুষ আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। পূর্ব বগুড়ার মানুষের কাছে কার্তিক মাস হলো (মড়া কাতি)। নিস্ফলা কার্তিকে অভাবে তাড়ানায় এ অঞ্চলের মানুষ নিরণ্ন থাকে। অগ্রাহায়ন মাস তাই তাদের কাছে আর্শিবাদ স্বরুপ। সে কারণেই মাছে- ভাতে বাঙ্গালির স্বাপ্নিক আশা আকাক্ষা ব্যক্ত হয়েছে এখানে। মধ্যযুগ পর্যন্ত অগ্রাহায়ন মাস ছিল বাংলার বছরের প্রথম মাস। সুতরাং একই সঙ্গে অগ্রিম ফাসলিক উৎসব ও বর্ষবরণ এই দুইয়ের সমন্বিত ঐতিহ্যের ধারা ছিল কার্তিক সংক্রান্তির এই ভূল্যা খ্যাদানোর উৎসব।[৬৭]

২২ শেরপুরের মনসা বা পদ্মাপূজা উৎসব:

শ্রাবণ মাসের শেষ অথবা ভাদ্র মাসের মঙ্গলবার শেরপুর শহরের সান্যলপাড়ায় বিরাট জাঁকজমক ভাবে পদ্মা বা মনসা পূজা করা হয়। এ পূজাকে কেন্দ্র করে ছোট–খাটো একটি মেলাও বসে। এখানে যে ভাবে মনসাপূজা হয় বগুড়ায় বা উত্তরবঙ্গের আর কোথাও এভাবে মনসা পূজা হয় না । এখানকার মনসা পূজায় একসঙ্গে ২৬টি মূর্তি ওঠে। মূর্তিগুলোর কেন্দ্রস্থল থাকে মনসা। চারপাশে আছে পদ্মা- বা মনসার মাথার ওপরে শিব, শিবের মথার ওপরে (দুপাশে) নাগ নাগিন,তার নিচেই আছে অষ্টপক্ষমুণি,জরৎকারুমুণি, আস্তিকমুনি, বাসুকি, নাগ নারদমুণি, বঙ্ক নাগ, কমলা,সনকা লখিন্দর, বেহুলা, সাই সওদাগর,যুবরাজ, কালিয়দমনকৃষ্ণ, চাঁদসওদাগর, গদা, নেতাইধোপা, ব্রাক্ষণী, ব্রাক্ষণ প্রমুখ। মনসার আসন-হাঁস , চাঁদ সওদাগরের আসন-হাতি। দুধ-কলা সহ মৌসুমি ফলমূল সহযোগে (কাঁঠাল ব্যতীত) পূজায় ভোগ দেয়া হয়।[৬৮]

২৩ গোরক্ষনাথের পূজা উৎসব :

যোগীর ভবনের অদূরে মাটির ঢিবির মত একটি প্রত্ন মন্দির হলো গোরক্ষানাতের মন্দির। এই মন্দিরে সপ্তাহে দু'দিন রবি ও বৃহস্পতিবার ভোগ দেয়া হয়। গোরক্ষনাথের এই মন্দিরকে স্থানীয় লোকজন ঘোপার মন্দিরও বলে থাকে। গোরক্ষনাথ মূলত কৃষকের গোয়াল ঘরের দেবতা । গরুর সুরক্ষা ও মঙ্গল কামনায় গোরক্ষনাথের পূজা করা হয় গাই বিয়ালে গাইয়ের শাল দুধ দিয়ে ক্ষীর রান্না করে গোরক্ষনাথের মন্দিরে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। এখনো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই গাইয়ের শাল দুধের ক্ষীর রান্না করে ভোগ দিয়ে থাকেন।

৬৭. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৬৮. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-৭০

২৪ মুঠ আকা (রাখা) উৎসব:

সারিয়াকান্দি উপজেলায় প্রচলিত একটি অন্যতম লোকজ কৃষি আচার হলো মুঠ আকা বা রাখা। ফাগুন মাসে জমিতে প্রথম কাউন ছিটানোর দিন এ আচার পালিত হয়। যে দিন জমিতে কাউন বপন করা হবে তার আগের দিন রাতে একটু আতপ চাল এক বাটি পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। রাতে জাত লাউ দিয়ে (একটু লবণ, মরিচ, তেতুল ও গুড়) খাট্রা এবং কাউনের আতপ চালের খিড় রান্না করা হয়। এরপর ভেজা আতপ চাল গুড় দিয়ে কলা পাতায় করে

মেখে কৃষক এবং তার সঙ্গে আসা দু তিন জন একসঙ্গে বসে খেয়ে নেয়। খাওয়া শেষে একটু খানি চাল ও গুড় হালের গরু কে খেতে দেয়া হয়। একইভাবে খিড় ও খাট্রা খাওয়া হয়।[৬৯]

২৫ বিবাহ উৎসব:

বগুড়া জেলায় প্রচলিত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়। বিবাহপূর্ব, বিবাহকালীন এবং বিবাহত্তোর পর্ব। এ সকল পর্বের মধ্যে ফুরুল ভরানো, হলদিকোটা, খাততা ভাঙ্গানে, সরষে উদরানো, কনে সিংরানো, শানজর, কনে বিদায়, বাসীগোছল ইত্যাদি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। বিবাহপূর্ব পর্বের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বর ও কনে নির্বাচন। ঘটক এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে । সাধারণত বর বা কনের অভিভাবকেরা বর ও কনে নির্বাচনের দায়িত্বটি পালন করে থাকে। কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলের মুসলামান সমাজে কনের মাতৃকুলকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সম্পর্কে প্রচলিত একটি্ প্রবাদ হলো, কন্যার নানেনকুল দেখে বিয়ে কর’। অর্থ্যাৎ যে কন্যার মাতৃকুল ভালো সে কন্যা অব্যশই ভালো হবে । কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাতৃকুলের পাশাপাশি কনের সৌন্দর্য, শিক্ষা-বুদ্ধিমত্তা, পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা , যৌতুকের সামর্থ ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনা করা হয়। কনের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অবয়ব, হাত-পা বা অঙ্গের গড়ন, মাথার চুল, কথাবার্তার ধরণ ইত্যাদি গুরুত্ব পায়। এ অঞ্চলের পরুষদের কাছে সাধারণত দৈহিক রং ফর্সা, মাথার লম্বা চুল (চুল খাটো হলে তাকে বলা হয় বাউনি) হাত-পা অঙ্গের সুন্দর গড়ন এবং খরম পায়ি মেয়ের চাহিদা বেশি। এ ধরনের মেয়ের বিদ্যাবুদ্ধি একটু কম হলেও পাত্র পক্ষের কাছে তার অগ্রাধিকার থাকে। কনের বিদ্যাবুদ্ধি যাচাইয়ের জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হয়। কখনো কখনো ধাঁধাঁও ধরা হয়। বিয়ের দিন বর আত্নীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কনের বাড়ি আসে বিয়ে করতে। বিয়েতে বরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো- কনের নাকফুল ও সিংরিসহ কনের জন্য শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি সহযোগে ডালা (বক্স) সাজিয়ে নিয়ে আসা। বর কর্তৃক প্রদত্ত নাকফুল ও সিংরি এ দুটো জিনিস তার দিতেই হয়। বিয়ে পড়ানোর পর শা’নজরে সময় কনের ভাবি বা বন্ধবী কর্তৃক বরের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয়।

৬৯. তথ্যদাতা: কিশোর লাল (৬৭), মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

নানাভাবে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। যেমন বরকে শরবত খেতে দেয়া হয় তিন বা চারটি গ-াসে। প্রতিটি গ-াসেই থাকে রঙ্গিন পানি। এর একটিতে শরবত এবং বাকী গুলোর কোনটিতে লঙ্কা অথবা মরিচের পানি। এর মধ্যে যেটি শরবত সেটি বেছে নিয়ে বরকে খেতে হয়। কখনো

দিয়াশলাইয়ের দুটো কাঠি লম্বভাবে দাঁড় করিয়ে তার নিচে একশো বা পাঁচশো টাকা রাখা হয়। বর টাকাটা নিতে পারবে কিন্তু কাঠি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে না এবং কাঠিটি পড়া চলবে না। কখনো বা বরের সামনে একটি ছোট কৃত্রিম গাছ রাখা হয়। গাছে নকল ও আসল পানের খিলি সাজিয়ে রাখা হয বর আসল পান পেরে খেতে হয় ইত্যাদি। বরের বন্ধুরা এক্ষেত্রে বরকে সাহায্য করে থাকে। বিয়ের দিনই বর বউ নিয়ে নিজ বাড়ি চলে আসে। কখনো কখনো বর বিয়ে করে বউ শ্বশুর বাড়ি রেখে আসে। পরে সময় সুযোগ মতো বউকে নিয়ে আসে। বউ শ্বশুর বাড়ি প্রথম আসার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় বউভাত। বউভাতের পরদিন কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় বরভাত। বরভাতকে বলা হয় পাকফিরেনি। বউভাত ও বরভাত উভয় অনুষ্ঠানেই বর ও কনে উভয় পক্ষের আত্নীয়-স্বজন নিমন্ত্রণ করা হয়। এ দু' অনুষ্ঠানেই পরস্পরকে ডালা দেবার একটি রীতি এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কনে পক্ষ যখন বরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে আসে তখন তারা ডালা সাজিয়ে নিয়ে আসে। পরদিন বরপক্ষও কনের বাড়ির অনুষ্ঠানে অনুরূপ ডালা পাঠায়। দু'পক্ষেই ডালা নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করে গ্রামের চৌকিদার। বর ও কনে উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি যে ডালা পাঠায় সে ডালা (বাঁশের তৈরী) লাল, নীল, সবুজ কালি দিয়ে রং করার পর বিভিন্ন রঙ্গের কাগজ দিয়ে মুড়ানো হয়। ডালার ভেতর বর বা কনের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র যেমন- সুতিশাড়ি, ব-াউজ, পেটিকোট, লুঙ্গি ,গেঞ্জি, গামছা বা তোয়ালে, পঞ্জের সেন্ডেল, তেল, সাবান, শ্যাম্পু পান-সুপারি,শুকানো মিষ্টি (সাধারণ লাড্ডু বা বাতাসা) একটা দুটো তেলাপোকা অথবা বেঙ ইত্যাদি সহযোগে পরস্পরের প্রতি ডালা পাঠানো হয়ে থাকে। ডালা পাঠানোর ক্ষেত্রে কে কাকে কতো বোকা বানাতে পারে তার একটি প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গেই নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়। এ অঞ্চলে দেখা যায় বিয়ের দিনের দু একদিন আগে থেকেই বিয়ে বাড়ীতে বর ও কনের নিকট্ আত্নীয়-স্বজনরা এসে উপস্থিত হয়। বিয়ের আগের রাতে বর ও কনের নারী আত্নীয়-স্বজনরা প্রায় সারা রাত গীত গায়। কখনো একক কখনো বা সমবেত কণ্ঠে গীতগুলা পরিবেশিত হয়। গীতের সঙ্গে কথক বা শ্রোতাকে নৃত্য করতেও দেখা যায়। কেবল মুসলমান সমাজেই বিয়ের নৃত্য-গীতের প্রচলন রয়েছে। বগুড়া জেলার প্রচলিত একটি বিয়ের গীত নিুরূপঃ

বই পুস্তক নিয়ে লো লতিফুন
হাই ইস্কুলে যায় গো

রেলু রামের বেলুন যে
হাই ইস্কুলে যায়া লতিফুন
বাবার দালানে যায় গো
বাবার দালানে যায় গো লতিফুন
ইয়ো চিঠি ন্যাকে গো
চিঠি খানিক নেকে লতিফুন
কাকের ঠুটে দ্যায় গো
যেটি মাস্টার গুছুল করে
সেটি ন্যাযায়া চিঠিখানি
ফালাইও গো
রেলু রামের বেলুন গো
চিঠি খানি পড়ে দেকি
লতিফুন যুবতী নারী গো। [৭০]

২৬ হুদমা দেও উৎসব:

অনাবৃষ্টির সময় এ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে গ্রামের ছেলে মেয়েরা মিলে কোন একটি বাড়ির উঠোনে কলাগছ পুঁতে কলাগাছটির শরীরে সাদাকালো ছোপ ছোপ দাগ কেটে দেয়। ছেলে মেয়েরা কলাগাছের চারপাশে কলসি দিয়ে পানি ঢেলে কাঁদা করে। এরপর সেখানে তারা লুটোপুটি খায়। বয়স্ক মহিলাদের কেউ কেউ কখানো বা মেয়রা কলাগাছের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে নৃত্য করে হুদমার গান গায় এবং ঘরের চালে ও উপস্থিত লোকজনের গায়ে পানি ছিটে দেয়। পূর্ব বগুড়ার কোথাও কোথাও হুদমা দেওয়ার পরিববর্তে ব্যাঙ বিয়ে ও বদনা বিয়ের প্রচলন রয়েছে। ব্যাঙ বিয়ের ক্ষেত্রে পুকুর নদী বা খাল- বিল থেকে দুটি হোলা ব্যাঙ (পুরুষ ও স্ত্রী) ব্যাঙ ধরে নিয়ে এসে হুদমা দেও এর কলাগাছ পুতে ব্যাঙ দুটির বিয়ে দেয়া হয় এবং চালুনে করে উপস্থিত ছেলে মেয়েদের গায়ে পানি ছিটে দেয়া হয়।বদনা বিয়ের ক্ষেত্রে কলাগাছকে মাঝখানে রেখে দুটি বদনার বিয়ে দেয়া হয়।[৭১]

---

৭০. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৭১. পূর্বোক্ত।

২৭ গাছ বিয়ের উৎসব :

গাছ বিয়ের উৎসবে সাধারণ এক গাছের সাথে আরেক গাছের বিয়ে দেয়া হয়। কয়েক বছর আগে শেরপুরের শশ্মানঘাটে বট ও পাকুড় গাছের বিয়ে দেয়া হয়েছিল ঘটা করে। সেখানে বটগাছ গাছ ছিল বর আর পাকুড় গাছ ছিল কনে। বরকে দেড়শ হাত ধুতি আর কনেকে ৫টি নতুন শাড়ী মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রায় কয়েক হাজার লোক ঢোল বাদ্যসহ বিয়েতে অংশ নিয়েছিল। বর ও কনে পক্ষ ছাড়াও ছিল পুরোহিত। উভয় পক্ষের মাঝে প্রায় দেড়মণ বাতাশা বিতরণ করা হয়।বট ও পাকুড় গাছের বিয়ে ছাড়াও পারিবারিক ভাবেও গাছ বিয়ের উৎসব হতো। সাধারণ নিষ্ফলা বৃক্ষের সাথে ফলদ বৃক্ষের বিয়ে দেয়া হতো। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন বাড়ির কয়েকজন ছোট ছেলে (যাদের বয়স ১০/১২ বছরের বেশি নয়) হাতে একটি কুড়াল নিয়ে নিস্ফলা বৃক্ষের কাছে গিয়ে একজন বলতো ‘অ্যাক (একে)– কাটেক (কেটে ফেল)। কুড়াল হাতে ছেলে তখন কোপ দিয়ে উদ্দ্যত হতো। অন্যারা তখন সমস্বরে বাঁধা দিয়ে বলতো ‘এই এই কাটিস নে। অ্যাক (একে) বিয়ে দে। তখন গাছের গোড়ায় ছোট করে একটা কোপ দিয়ে পাশের ফলদ বৃক্ষের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হতো। এভাবে প্রতিটি নিষ্ফলা বৃক্ষের (আম-জাম-কাঠাল) ইত্যাদি বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ছেলে মেয়েরা মাতোয়ারা হয়ে খই, মুড়ি, গুড়ের পায়েস অথবা বকনি খেত। সারিয়াকান্দি উপজেলায় কোন কোন গ্রামে খুবই ক্ষীণ আকারে এই উৎসবটি এখনো পালিত হতে দেখা যায়।

২৮ মাদার বাঁশ উৎসব :

সাধারণত মাদারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মাদার বাঁশ উৎসবে মেতে ওঠে। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম বুধবার বাঁশ কাটা হয় । এরপর বাঁশের রং করে লাল কাপড়ে আবৃত করে চমড় লাগানো হয়। বাঁশ নিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে মাদার ভক্তরা টাকা পয়সা উত্তোলান করে। শারীরিক কসরতের মধ্যে লাঠিখেলা, ছুড়িখেলা, জিহ্বা ফুটা করা ইত্যাদি প্রধান। মাদারের বাঁশ খেলাকে কেন্দ্র করে শেরপুরে কেলাপোষী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগে যেভাবে এ উৎসব হতো এখন সেভাবে না হলেও মেলার কারণে উৎসবটি টিকে আছে। [৭২]

২৯ বেড়া ভাসান উৎসব :

সাধারণত সারিয়াকান্দি ও ধুনটের যমুনা নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বেড়া ভাসান উৎসব হতো। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বর্ষাার সময় কলাগাছের ছোট একটি ভেলা বানিয়ে মাটির সরাইয়ে দুধ, দুটি কলা,

৭২. তথ্যদাতা: রেনু খাতুন (৫৮), নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া।

ক্ষির, কয়েকটি বাতাশা, একটি তাবিজ (যাতে দোয়া লেখা থাকে) বেঁধে দিয়ে ভেলাটি পানিতে ভেসে দেওয়া হয় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে। এ অঞ্চলে প্রচলিত লোক বিশ্বাস হলো পানি ও নদীর লৌকিক পীর হলেন খোয়াজ খিজির। তার ইচ্ছোতেই নদীতে বান আসে, নদী ভাঙ্গে। এক হাজার সেনা সোনার কুড়াল দিয়ে নদী খুড়ে দেয় ফলে নদী ভাঙ্গে। এরা কোন পর্যন্ত ভাঙ্গবে তা রাতে সোনার শিকল দিয়ে মেপে নেয়। আর সকাল হলেই তা কাটা শুরু করে। তাই খেয়াজ খিজিরকে থামানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। বেড়া ভাসানোর দিন শত শত লোক উৎসবে মিলিত হয়। তারা এক সঙ্গে কলাগাছ কাটে, ভেলা বানায়। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক যে যার সাধ্যমত চাল, টাকা পয়সা দেয়। এসব দিয়ে ক্ষির-খিচুড়ি রান্না হয়। গ্রামের সব লোককে দাওয়াত করা হয়। একজন মৌলভী (হুজুর) মিলাদ পড়ান এবং খোয়াজের বন্দনা করেন। তিনিই আবার কোরআনের আয়াত লিখে একটি তাবিজ বানায়, যা ভেলায় ভেসে দেয়া হয়। এখনো সরিয়াকান্দি ও ধুনট এলাকায় এই উৎসবটি মাঝে মধ্যে দেখা যায়।[৭৩]

৩০ খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসবঃ

বগুড়া খ্রিষ্টান জনশক্তি কমহলেও তারা যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন তথা ২৫ শে ডিসেম্বর জাঁকজমকভাবে বড় দিনের উৎসব পালন করে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল বড়দিন উদযাপন বা Cristmas day. [৭৪]

৩১ বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবঃ

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব। বগুড়ায় খুব কম সংখ্যক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস। তারা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের সাথে বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে।

উল্লেখিত উৎসব ছাড়াও বুড়ো শিবের মেলা উৎসব, গাড়িদহের বারনীর মেলা উৎসব। জামুন্যা মেলা উৎসব, ছাইহাটার পৌর মেলা উৎসব, হরিণার মেলা উৎসব, শ্রী পঞ্চমীর মেলা উৎসব, পুনটের মেলা উৎসব, টেংগামাগুর মেলা উৎসব, নুনগোলার মেলার উৎসব, ঘোলাগাড়ি মেলা উৎসব, মুরইলের মেলা উৎসব, পোয়াল গাছার ঘৌড়দৌড়ের মেলা উৎসব, বেলকুচির মেলা উৎসব, খারুয়ার মেলা উৎসব, দারিয়ালের মেলা উৎসব সহ অন্যান্য উৎসবলীর সমূহ পালন করতে দেখা যায় বগুড়াবাসীকে।

৭৩. ড. বেলাল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৭৪. রোজারিও পেস্তা (৬৮), বগুড়া সদর, বগুড়া।

চতুর্থ অধ্যায়
সংস্কৃতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বগুড়া জেলার অধিবাসীদের সামাজিক কার্যাবলী তথা অধিবাসিদের পরিচয়, বাসগৃহ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ অলংকার প্রসাধনী, এবং সামাজিক উৎসব সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে বগুড়া জেলার সাংস্কৃতিক জীবন তথা ভাষা ও সাহিত্য, মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্প, লোকসংগীত ও যাত্রা এবং সংবাদপত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৪.১ ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা ঃ বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে। অর্থ্যাৎ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠন কে ভাষা বলা হয়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মানুষ্য জাতি অর্থবোধক যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন কোন ও বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়।

এক-এক গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলাজাত ধ্বনি পুঞ্জকে বলা হয় এক একটি ভাষা। দেশ-কাল-মানুষ ভেদে ভাষা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অর্থ্যাৎ ভাষায় পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। সব দেশে, সব কালে, সব মানুষ যদি একই ধ্বনি উচ্চারণ করে একই মনোভাব প্রকাশ করতে পারত, তবে সমস্ত পৃথিবীতে সৃষ্টির শুরু থেকে একই ভাষা প্রচলিত থাকত। কিন্তু তা কখন সম্ভব হয়নি। এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে হাজার বছর আগেরকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।[১]

১.বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা, জুন-২০১৩,পৃষ্ঠা- ০১।

জেলার ভাষা বৈশিষ্ট্য/জেলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য/আঞ্চলিক ভাষা। যে কোনো স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে সেই জনগোষ্ঠীর ভাষা বিশ্লেষণ অতীব জরুরী । কেননা মানুষ ভাষার মাধ্যমেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটিয়ে থাকে প্রয়োজনে গড়ে তোলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানাবিধ কর্মকান্ডে পটভূমি। আবার যেহেতু সমাজবদ্ধ মানুষ প্রকৃতিকেও উপেক্ষা করতে পারে না। সেহেতু তার কণ্ঠ নিঃসৃত ভাষা উপভাষার রূপপায় প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশের সুস্পষ্ট ছাপ। সেহেতু কোন অঞ্চলের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের ভাষা উপভাষার ব্যবিচ্ছেদ সরূপ উন্মোচন করা জরুরী। বগুড়া জেলার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এ পর্যায়ে এই জেলার আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক ভাষাঃ-

আঞ্চলিক ভাষা "উপভাষা" হিসেবে সুপরিচিত মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দই হলো আঞ্চলিক ভাষার প্রাণ। ম্যাক্সমুলার/Makmular বলেছেন, The real and natural life of language is in its dealects. অর্থ্যাৎ ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষা গুলিতে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, কোন স্থানের খাটি উপভাষা জানিতে হইলে সেই স্থানে অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্থানে আর একটি বিষয় জানা কর্তব্য যে, যে স্থলে দুইটি ভাষার সীমানা আসিয়া মিলিত হয়, সেই স্থানে উভয় ভাষার মধ্যবর্তী একটি উপভাষা সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকে দুই ভাষারই উপভাষারূপে গণ্য করা যাইতে পারে [২]।

ড. সুকুমার সেনের মতে, কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা ছাঁদ কে উপভাষা (Dialect) বলে [৩]।

বগুড়া জেলার "করতোয়া" নদী বগুড়া জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছে। ফলে এ দু অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র বিদ্যমান। এই ভিন্ন ধর্মী সাংস্কৃতিক ভাষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আজকের বগুড়া (১৯৬৮) গ্রন্থে কে এম শমশের আলী বগুড়া জেলার কথ্য ভাষা প্রবন্ধে (পৃঃ ২৪৫) পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ার ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে বলেন।

পূর্ব বগুড়া ও পশ্চিম বগুড়ার অধিবাসীদের বাচনিক ভাষার লক্ষণীয় পার্থক্য প্রচুর পরিমানে রহিয়াছে। পশ্চিম বগুড়ার কথ্য ভাষায় শব্দের উপরে একটা ঝোক (Stress) ও বাক্য শেষে টান (Lingering Tune) আসিয়া যায়। ইহাই তাহাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন- যাবু না ক্যারে এ-এ?

---

২. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত. পৃ-৬২

৩. ড. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত-পৃ-২৩

বগুড়া জেলা বর্তমানে ১২টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। বগুড়া জেলার উপজেলাগুলো হলো- বগুড়া সদর, গাবতলী, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, আদমদিঘী, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, শাজাহানপুর ও ধনুট। এই বারো উপজেলার মানুষ তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে একই ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে না। অঞ্চলভেদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বগুড়া জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত বগুড়া সদরের মানুষের আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারন বা টানের মঙ্গে পূর্ব বগুড়ার গাবতলী উপজেলার মানুষের কথায় উচ্চারণে পার্থক্য আছে। আরো পূর্বে সারিয়াকান্দি বা ধনুট উপজেলার মানুষের শব্দোচ্চারণে গাবতলী উপজেলার মানুষের উচ্চারণে পার্থক্য দেখা যায়। আবার পশ্চিম বগুড়ার (কাহালু, নন্দীগ্রাম, দুপচাচিয়া, ও আদমদিঘী পর্যন্ত মানুষের উচ্চারিত শব্দ এবং পূর্ব বগুড়ার মানুষের উচ্চারিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কেননা অঞ্চলভেদে একই জনগোষ্ঠীর বাচনিক অভ্যাস ও উচ্চার ভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যায়। একই ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা উচ্চারনে যেমন ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। ভাষার বাক্য গঠনে পদ বিন্যাসেও তেমনি পার্থক্য সূচিত হয়। বাংলাদেশের মানুষ একই সম্প্রদায়ের হলেও বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাক্য গঠন কাঠামোর কারনে ভাষাগত আঞ্চলিক বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে।[৪]

আঞ্চলিক ভাষা: শ্রেণীকরণ/প্রকারভেদ/রীতিভেদ-

কলকাতা থেকে প্রকাশিত "সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকায় ১৩০১ সাল থেকে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দ সংকলনের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকায় বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ নামে একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংকলকের নাম সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশ কাল ১৯১২। তিনি বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষাকে উত্তরবঙ্গীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন।

বগুড়ার ভাষা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন স্যার জর্জ গিয়ারসন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৩-১৯২৮ সালের মধ্যে উপমহাদেশ ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা বিবরণী প্রকাশ করেন The Linguistic Survey of India গ্রন্থে Vol-5-1903.152.156 (প্রকাশ কাল ১৯৩০)। এই গ্রন্থটিকে প্রথম আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও বলা হয়ে থাকে। তিনি শব্দ, প্রতিশব্দ, বাংলা ও অসমি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিবরণী প্রকাশসহ বাংলার উপভাষাগুলির অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীকরণও করেছেন।

স্যার জর্জ গিয়ারসন বাংলা ভাষার উপভাষাগুলিকে পাশ্চত্য বিভাগের উদীচ্য শাখা হিসেবে দিনাজপুর, পূর্ব মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলাকে গন্য করেছেন ।

৪. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-পৃ. ৩৫

.বাংলা আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে যিনি গবেষণাকর্মের মাধ্যমে আভিধানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত পন্ডিত, বহু ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, তাঁর সম্পাদিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত দুই খন্ডে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লা স্যার জর্জ গিয়ারসনের গ্রন্থটিকে বিজ্ঞান সম্মত হয় নাই বলে মত দিলেও স্বীকার করেছেন।

"এই ভাষা বিবরণীই আমাদের উপভাষা সমন্ধে জ্ঞান লাভের সোপান না হইলে-ও আমাদের প্রধান অবলম্বন"। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুভাষাবিদ জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের উপভাষা সমূহের যে শ্রেণীকরণ করেছেন তা নিম্নরূপ। [৫]

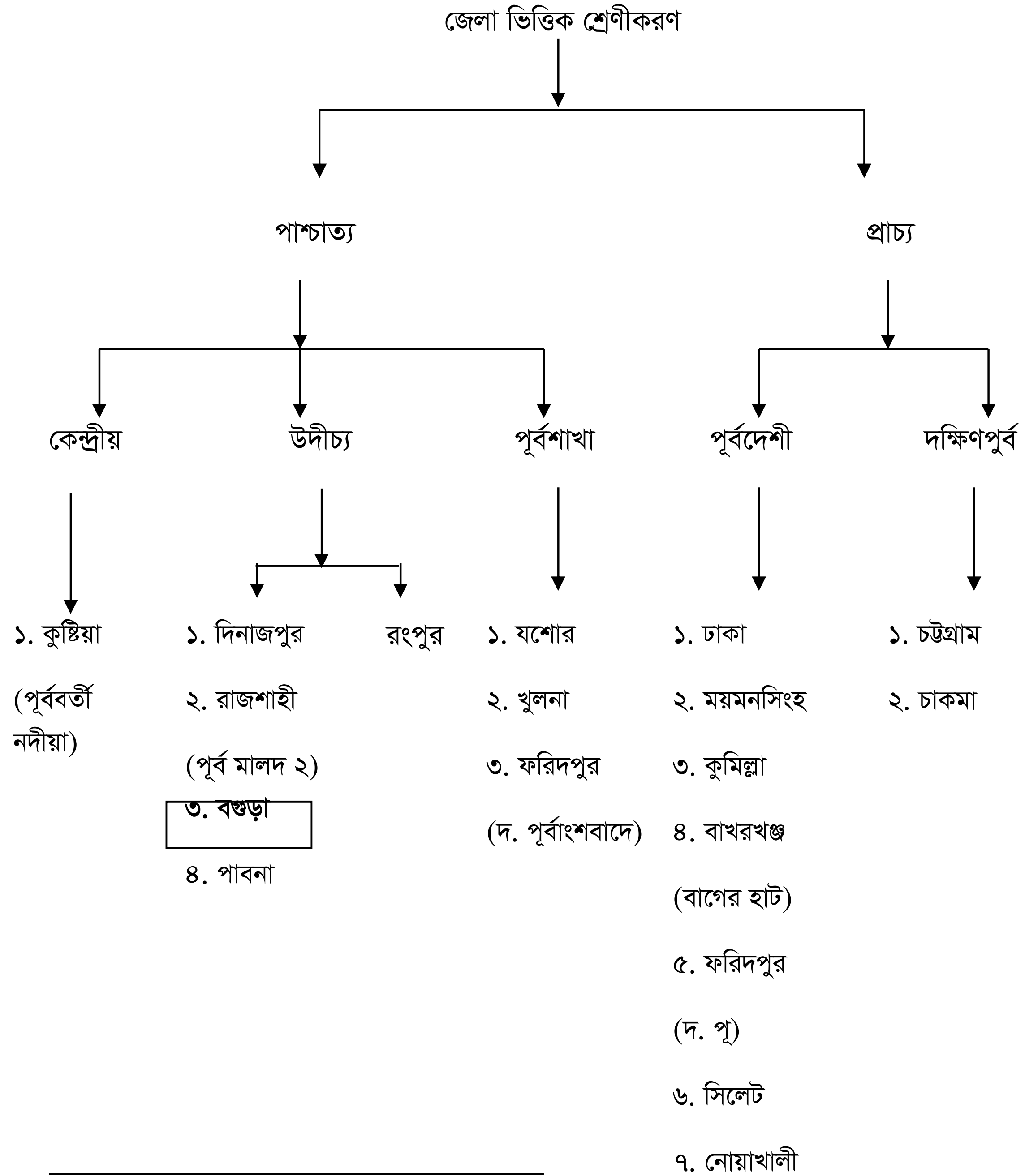

৫. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষাঃ প্রসঙ্গকথা, নামক প্রবন্ধ, পৃ-০২

পাশাপাশি ড. সুকুমার সেন কৃত উপভাষার শ্রেনীকরণ নিম্নরূপ-৬

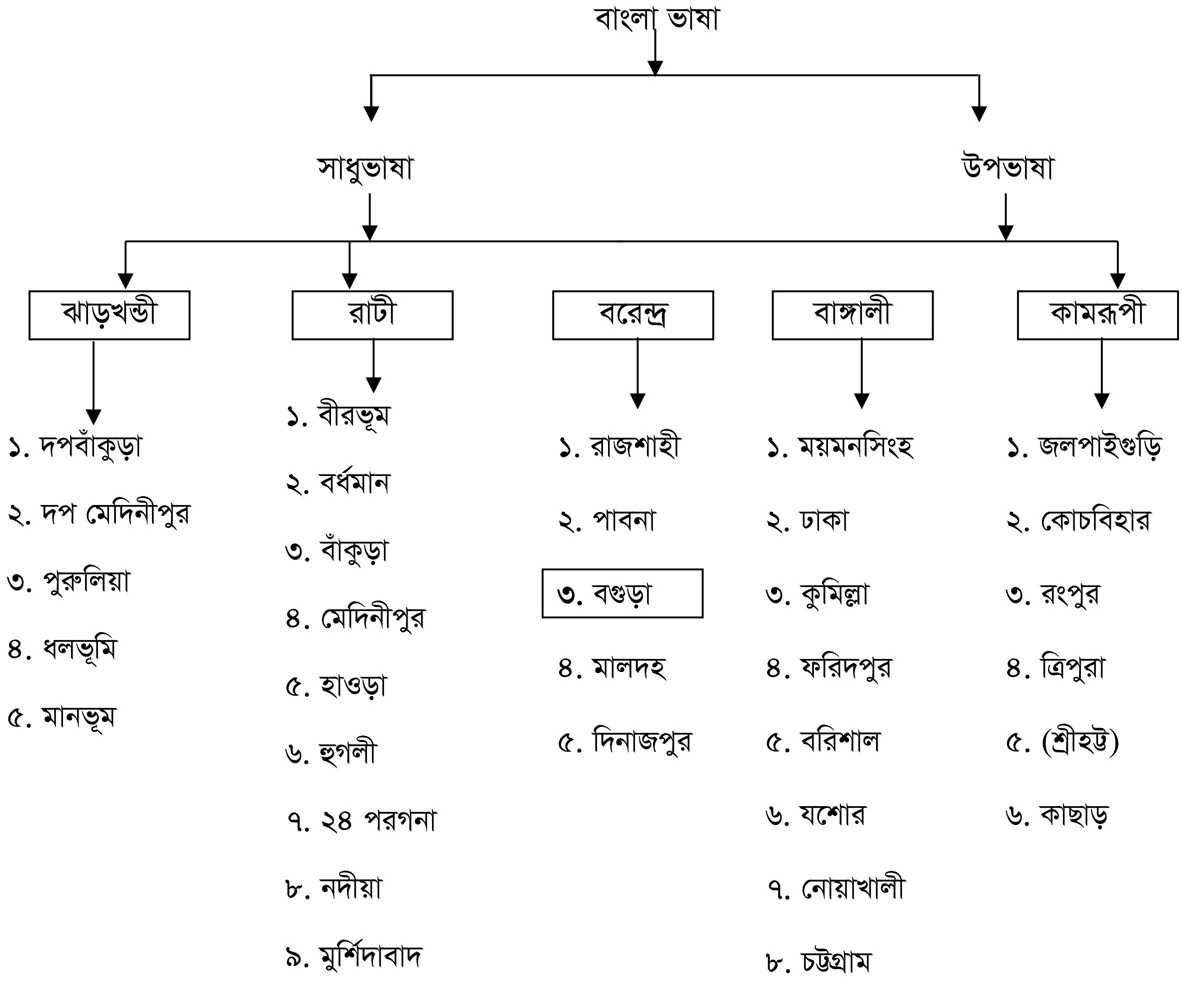

স্যার জর্জ গিয়ারসনের (১৯০৩) প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে ভাষাতত্ত্ববিদ আবুর কালাম মনজুর মোরশেদ বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষাকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীকরণ করেছেন।

ক. উত্তরবঙ্গঃ দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনার প্রচালিত উপভাষা।

খ. রাজবংশীঃ রংপুরের উপভাষা।

গ. পূর্ববঙ্গীয়ঃ (অ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বরিশাল ও সিলেটের উপভাষা।

ঘ. দক্ষিণাঞ্চলীয়ঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও চাকমা উপভাষা। [৭]

উল্লেখিত শ্রেণীকরণ থেকে উল্লেখ করা যায় যে, বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা উত্তরবঙ্গীয়, উদীচ্য বরেন্দ্রী শাখার অন্তর্ভূক্ত। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বগুড়াকে রংপুর তথা কামরূপী উপভাষার পরিবর্তে উত্তরবঙ্গীয় বা বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্ভূক্ত বলেছেন (মনিরুজ্জামান ১৪০১: ১৯২১) আলমগীর জলীল এর "বগুড়ার লোকভাষা" (মোহম্মদী ৩৪:৫ ১৩৬৯ ও ৩৫:১, ১৩৭০) এ হান্নান এর "বগুড়ার কথ্যভাষা" (করতোয়া গতিপথে ১৩৫৭) প্রভৃতি প্রবন্ধে বগুড়ার উপভাষা আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও কাজী মোহাম্মদ মিছের তার বগুড়ার ইতিকাহিনী (১৯৫৭) ও খোদেজা খাতুন এর "বগুড়ার লোকসাহিত্য (১৯৭০) গ্রন্থে বগুড়ার উপভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত আলোচনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বগুড়ার দু অঞ্চলের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পশ্চিম বগুড়ার বরেন্দ্রী এবং পূর্ব বগুড়ার কামরূপী ও বাঙ্গালী উপভাষার প্রভাবটি বেশি।

---

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৭. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব- পৃ-১৩২।

এ দু অঞ্চলের ভাষার ভিন্ন উপভাষা প্রভাবের নেপথ্যে অঞ্চল দুটির ভৌগোলিক প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণ নিহিত রয়েছে। পূর্ব বগুড়ার ইতিহাসে জানা যায় দীর্ঘদিন এ অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুতারাং প্রান্ত অঞ্চল হলেও এ অঞ্চলের ভাষায় কামরূপী উপভাষার প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। সুতারাং দেখা যাচ্ছে বরেন্দ্রী, কামরূপী ও বাঙালী এই তিন উপভাষা পরিবারের একটি মিশ্র প্রভাব পড়েছে পূর্ব বগুড়ার ভাষায়।[৮] নিম্নে পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হলো এবং কোন অঞ্চলের ভাষার কোন উপভাষা পরিবারের কতখানি প্রভাব পড়েছে তা দেখানো হলো:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

(ক) বরেন্দ্রী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থ্যাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন- ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে। শব্দের মধ্যে ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্প প্রাণ হয়ে গেছে। যেমন- বাঘ>বাগ ইত্যাদি)। এটি কামরূপী উপভাষারও একটি বৈশিষ্ট্য (রামেশ্বর শ ১৩৯৯:৬৫৮-৬৫৯) পূব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। যেমন- বাঘ>বাগ, সাঁঝ>সাজ, সভা>সবা, তুফান>তুপান ইত্যাদি। এছাড়াও পূর্ব বগুড়ায় বর্গের দ্বিতীয় মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণতা প্রাপ্তি দেখা যায় যেমন- চোখ>চোক, দেখা>দেকা, গাছ>গাচ, মাছ>মাচ, গামছা>গামচা, কাঠ>কাট, পাঁঠা>পাটা, পাথর>পাতর ইত্যাদি। কামরূপী উপভাষাতেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় (নির্মল দাশ ১৯৪৮:১৭)

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আাদি ''র'' ধ্বনির লোপ (রামেশ্বর শ ১৩৯৯:৬৫৮)। পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- রস>অস, রাজা>আজা, রাণী>আনী, রংপুর>অংপুর, রাস্তা>আস্তা, রাত>আত, রাজ্জাক>আজ্জাক ইত্যাদি। তবে পূর্ব বগুড়ায় "র" এর "অ" ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি "উ" এবং "ও" ধ্বনিতেও রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- রুটি>উটি, রুই>উই, রোজা>ওজা বা উজা, রসুন>ওসুন ইত্যাদি।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই "এ" ধ্বনি প্রায়ই "অ" ধ্বনিত রূপান্তরিত হয়। যেমন- বস্যা পড় (বসে পড়) হাট্যা হাট্যা যাও (হেটে হেটে যাও), খ্যাতা গায়ে দে (খেতা খায়ে দে), উল্লেখিত বাক্যগুলোতে 'লক্ষণীয়' এ ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

(ঘ) পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই অনেক সময় ধ্বনি স্থিতিপরিবৃত (Metathesis) লক্ষ করা যায়। যেমন বদনা>বনদা মুরগী>মুগ্রি, লোকসান>লোস্কান, বাক্স>বাস্ক, ইত্যাদি।

(ঙ) পশ্চিম বগুড়ায় শব্দের আদি 'ন' প্রায়ই 'ল' ধ্বনির রূপান্তরিত হয়। যেমন- নয়>লয়, নারী>লারী, নাও>লাও (নৌকা), নাক>লাক, নজর>লজর, নয়া>লয়া ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্য পূর্ব

৮. ড. বেলাল হোসেন, লোক সাহিত্যের কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য পূর্ব বগুড়া, বাংলা একাডেমি, জুন-২০০৮, পৃ-৮।

বগুড়ার খুব একটা দেখা যায় না। তবে পূর্ব বগুড়ায় আদি 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন লাল>নাল, লোহা>নোয়া, লাউ>নাউ, লবণ>নবন ইত্যাদি।

(চ) পশ্চিম বগুড়ার তুলনায় পূর্ব বগুড়ার 'ও' ধ্বনি অধিক পরিমাণে 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- দোষ>দুষ, লোকা>নুকা, ওল>উল, হোল>হুল (পুরুষ লিঙ্গ), খোল>খুল, কোলে>কুলে, তোমার>তুমার, কোন>কুন ইত্যাদি। এটি কামরূপী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য (পূর্বোক্তঃ ৬৫৯)

(ছ) পশ্চিম বগুড়ায় উচ্চারিত ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্থ 'ই' ধ্বনি পূর্ব বগুড়ায় 'ও' এবং 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন-

পশ্চিম বগুড়া	পূর্ব বগুড়া
০১. উই হামাক্ কি করবি?	০১. উই আমাক/হামাক কি করবো?
০২. উই ভাত খাবি না?	০২. উই ভাত খাবো না?
০৩. ক্যারে মাচ ধরব্যার যাবি?	০৩. ক্যারে মাচ ধরব্যার যাবু?
০৪. তুই পড়বি না?	০৪. তুই পড়বু না?

উল্লেখিত বাক্যগুলোয় ক্রিয়াপদে লক্ষণীয়। পশ্চিম বগুড়ার 'ই' ধ্বনি পূর্ব বগুড়ায় 'ও' (১-২ বাক্য) এবং উ '৩-৪ বাক্য) ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

(জ) পশ্চিম বগুড়ায় শব্দ অন্ত্যধ্বনির ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্বর বা টান লক্ষ করা যায়। যেমন- যাবি-ই-নে, খাবি-ই-নে ইত্যাদি। পূর্ব বগুড়ার ভাষায় এ ধরনের ভাষায় এ ধরনের দীর্ঘস্বর দেখা যায় না।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ

(ক) বরেন্দ্রী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অধিকরণ কারণে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ। বাঙ্গালী কামরূপীতেও এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিলক্ষিত হয় (রামেশ্বর শ ১৩৯৯:৬৫৮ ও ৬৬০) পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। যেমন ঘরে>ঘরত্, বাড়ি>বাড়িত,হাটে>হাটোত, বগুড়া, বোগড়েত, ইত্যাদি।

(খ) কামরূপী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো সম্বন্ধপদ ও গৌন কর্মে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার (পূর্বোক্তঃ ৬৬০) পশ্চিম বগুড়ার তুলনায় পূর্ব বগুড়ায় এই বৈশিষ্ট্য ব্যাপক ভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন- আমাক্ বা

হামাক, দাদাক্, নানাক্, বাপক্ ইত্যাদি। কখনো কখানো 'ক' বিভক্তির পরিবর্তে 'এক' ও 'ইক' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন ভায়েক, মায়েক, বাপেক, ভাবিক, দাদীক, নানীক ইত্যাদি।

(গ) উত্তম, পুরুষে একবচনে 'হামি' (আ স্থলে হা) এবং বহুবচনে 'হামরা' সমন্ধপদে একবচনে 'হামার' এবং বহুবচনে 'হামাকেরে বা হামাগেরে কর্মকারকে একবচনে 'হামাক' এবং বহুবচনে 'হামাকোরক বা গোরক' ইত্যাদি পশ্চিম বগুড়ার ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পূর্ব বগুড়ায় উত্তম পুরুষে 'হামি' ও 'আমি' উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। সম্বন্ধ ও কর্মে 'হাংগে বা হাংগেরে এবং আংগে বা আংগেরে। যেমন- আংগে মত্তেপাড়া আংগে মামুগে বা'ত গ্যাচিলাম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

(ঘ) পশ্চিম বগুড়ায় 'এখন' স্থলে 'হিনি' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- যামো হিনি, খামো হিনি, করমো হিনি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে পূর্ব বগুড়ায় 'হিনি' শব্দের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'নি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমনঃ যামুনি, খামুনি, করমুনি ইত্যাদি।

(ঙ) সম্বোধন-বাচক শব্দে পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই 'ক্য' বারে ক্যা রে বা রে এবং স্ত্রীলিঙ্গে বা 'রো' এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ক্যা রে কি করোস? ক্যা বারে তুমাক যে ডাক্ল্যাম তা তো শুনলো না? ইত্যাদি।

(চ) পশ্চিম বগুড়ায় সাধারণত উত্তমপুরুষে সামান্য অতীত বুঝাতে কনু গেনু খানু ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব বগুড়ায় এদের পরিবর্তে যথাক্রমে কোল্যাম, গ্যালাম, খাল্যাম ইত্যাদির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হলো 'লাম'। যেমন আমি খেলাম বা খাইলাম, আমি গেলাম ইত্যাদি (পূবোর্ক্তঃ ৬৫৭)। পূর্ব বগুড়ার ভাষার বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(ছ) বাঙ্গালী উপভাষার উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যত কালের বিভক্তি হলো 'উম' ও 'ম' (পূর্বোক্তঃ ৬৫৭) যেমন- যামু, খামু, ধরমু, করমু, সাবমু। পূর্ব বগুড়ায় এ বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায় [৯]। যেমন-

০১. আমি ভাত খামু;

০২. আমি মাছ ধরবার যামু;

০৩. আমি গুসুল করমু;

০৪. তক্ ধরা মারমু;

৯. ড. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত পৃ-২৫-২৮

নিম্নে পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ায় প্রচলিত কিছু শব্দের উদাহরণ দেয়া হলোঃ

সাধারণ শব্দ	পশ্চিম বগুড়া	পূর্ব বগুড়া
০১. বাড়িতে	০১. বাড়িত	০১. বা'ত
০২. নৌকা	০২. লাউ	০২. নাও/নাউ
০৩. বললাম	০৩. কনু	০৩. কোল্যাম
০৪. আমি	০৪. হামি	০৪. হামি/আমি
০৫. আমার	০৫. হামার	০৫. আংগো/হাংগো
০৬. অভিমান	০৬. কোদ্দ	০৬. কুদ্দ
০৭. নাক	০৭. লাক	০৭. নাক
০৮. নারী	০৮. লারী	০৮. নারি
০৯. লাউ	০৯. লাউ	০৯. নাউ
১০. কোথায়	১০. কুনটি	১০. কুটি-

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করছে কারা?

আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলী কাদের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা সাধারণভাবে ধরে নিই সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণী, গ্রামাঞ্চলের সব পেশা মানুষ যার অধিকাংশ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। তাদের মুখেই ব্যবহৃত হচ্ছে আঞ্চলিক শব্দাবলী। কাজী মোহাম্মদ মিছের রচিত 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' গ্রন্থে বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলীকে অশিক্ষিত সমাজের বোলচাল এবং পল্লী অঞ্চলের সাধারণ কথ্য ভাষার বোল চাল বলে অভিহিত করেছেন।[১০] শহরে বসবাসকারী মানুষেরা (বিভিন্ন পেশার) সাধারণত শুদ্ধ ভাষায় শব্দ উচ্চারন করতে আগ্রহী তারা মার্জিত বা শিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতে চান। কিন্তু শহরের বাসা-বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ভৃত্য বা চাকরদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছেন। আবার অফিস বা কর্মস্থালে গিয়ে সহকর্মী বা অধঃস্থন কর্মচারীদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছেন। মূলত গ্রামের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী গোষ্ঠীয় এই আঞ্চলিক ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

"বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার উদাহরন/নমুনা স্যার জর্জ গিয়ারসন তার Linguistic Servey of India গ্রন্থে বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার সংকলিত অংশ বিশেষ নিচে উদ্বৃত করা হলোঃ

১০. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, গতিধারা প্রকাশনী, জুন-২০০৭ পৃ-১৪৬।

"আমি নিজের জমিতে হাল বই, সেই সময়েতে চিমনা গিরি কোচ। আর উপী কোঁচ আস্যা, উপী কোঁচ সুকুম দিল ওর হাল এড়েদে। তে আমার চাকর হাল বচ্ছিল। তখন সে হাল ছাড়ে দিয়া আলো। আমি য্যায়া আবার হাল ধরনু। তে আমাকে য্যারা লাখি গুড়ি দিয়া কেলে দিলো ভিএতে। লাঙ্গল ভেঙ্গে ফেলে দিল। জোঁআলটা আর এক দিকে ফেলে দিল। ফেলে দিলে অন্তর আমি কি করমুহ পড়ে থাকনু। ওখানে ঢের মানুষ আয়ে আছিল। সাম খাঁ একজন তাই মানা করলো, বাপুরে কাজিয়া করো না। আর একজন ফয়েজ সর্দ্দার আর একজন জমীর সেখ ইত্যাদি মারে কিসের বিষেতে।

ঐ আজ কিশোর চৌধুরীর যোগেতে। তারই চাকর ওরাভি যে কারে নিবে এই জন্য। চিমনা আমার ভাস্তে হয়। আমার জাঠাতো ভাইয়ের বেটা। বছর ১৬, ১৭ পৃথক। জোত জমা সব বাঁটা আছে। ভিটা বারপন,। আমি বছর ২০/২৫ এর জোয়াদা, কম নয় আমি দখল করি। আর বচ্ছর শামলা খান আবাদ করছি, সে ধান আমি নিয়েছি। শনিবারে মারা মারি হয়েছে। এক প্রহর বেল হতে হতো তখন জমিতে কোন ফসল ছিল না। সেই দিনই ওমো" [১১]

বগুড়া জেলার কৃতি সন্তান প্রয়াত কথা সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার "খোয়াবনামা" উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন বগুড়ার আঞ্চলিক শব্দাবলী। যেমন-

০১. "লাল কাটনু তো হামি এ্যাকলা। হামি কনু, তুই চ্যাংরা মানুষ, পারবু না। হামি এ্যাক লীহ কাটনু। (খোয়াবনামা, পৃ: ১৩৮)

অর্থ্যাৎ নালা কাটিলাম তো আমি একা। আমি বললাম তুমি ছোট (অল্প বয়স্ক) মানুষ পারব না। আমি একাই কাটলাম।

০২. তুমি ইগল্যান ধান ব্যামাক, খুলির মধ্যে মেল্যা দ্যাও। আর এ্যানা ওদ দেওযা লাগবি (খোয়াবনামা, পৃ: ১৩৯)

অর্থ্যাৎ তুমি এই মোট ধান, উঠানের মধ্যে বিলিয়ে দাও। আরও একটু রোদ দিতে হবে।

০৩. বগুড়ার সাংস্কৃতিক সংগঠন বগুড়া ইয়ুথ কথ্যার এর কর্ণধার তৌফিকুল আলম টিপুর বিপুল জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান।

১১. ব্রিগেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ) (সম্পা), বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বগুড়া, ঢাকা সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৮৯, পৃ-২২৭।

"হামরা বোগরার ছোল
পুঁটি মাছ ম্যারবার যায়্যা
ম্যারি আনি বোল
হামরা বোগরার ছোল"

অর্থ্যাৎ

আমরা বগুড়ার ছেলে
পুঁটি মাছ মারতে গিয়ে
মারে আনি বোয়াল
আমরা বগুড়ার ছেলে

বগুড়ার আঞ্চলিক প্রবাদ বাক্য:

মানুষের চিরন্তন স্বভাব হলো তার মনের ভাবকে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা। সে কারণে প্রত্যেক ভাষা উপভাষাতে কথা বলার ক্ষেত্রে অলংকার প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। বগুড়ার উপভাষাতেও মনের ভাবকে আরও সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য কতকগুলো শব্দাবলী প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেগুলোকে প্রবাদ বাক্য বলা হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এ অঞ্চলের মানুষদের মুখ নিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত এ আঞ্চলিক শব্দ ভান্ডারকেই সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নিম্নে বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এরূপ প্রবাদ বাক্যের উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

০১. ই কতা উ কতা দেবু অ্যানা আলাপাতা (তামাক পাতা) ।

অর্থ্যাৎ নানা অপ্রধান কথায় অবতারণা করিয়া পরিশেষে কাম্য বস্তূর দাবী করা।

০২. নামের ভাতার (স্বামী) কথায় দোসর, বিছানাৎ ব'স্যা কাসুক মাতার।

অর্থ্যাৎ স্বামী সাক্ষী গোপাল মাত্র। এইরূপ অর্থে ইহা প্রযোজ্য।

০৩. যার মনৎ যা লাপ্ দ্যা ওটে তা।

অর্থ্যাৎ যার মনে যে ভাবনা আছে সেটাই সে বলে।

০৪. আদরিতে বউ কাঁটোল খায় না কাঞ্চির পারে যায়্যা ভোতা চাটে।

অর্থ্যাৎ কাউকে কোন কিছুর জন্য জোর জবর দোস্তি করলে তখন সে তা করে না, কিন্তু পরে সে জন্য আফসোস করে।

০৫. বাপ জলমে (জন্মে) নাই গাই, চোঙ্গা লিয়্যা দোবার যাই।

অর্থ্যাৎ যার যা নাই তা বেশী করে দেখানো প্রচেষ্টা।

০৬. উড়ে আলো পানা, তাই হ'লো গায়ের সাঁনা।

অর্থ্যাৎ হঠাৎ আগন্তুকের প্রভাশালী হয়ে উঠে।/উরে এসে জুড়ে বসা।

০৭. ভাত দিব্যার ভাতার লয়। কিল মাববার শক্ত।

অর্থ্যাৎ অন্ন-বাসস্থান দেওয়ার ক্ষমতা নাই কিন্তু শাসন করার ক্ষমতা দেখালে।

০৮. জীয়ৎ পানি আ'লো

অর্থ্যাৎ আশ্বস্ত হওয়া গেল।

০৯ ঘোড়ার আন্ডা

অর্থ্যাৎ অবাস্তব কথা বলা

১০. অবস্থা কেরাসিন

অর্থ্যাৎ খারাপ অবস্থা

১১. গাঁও জ্বল্যা যাওয়া

অর্থ্যাৎ প্রচন্ড রাগ হওয়া

১২. ভুতের ব্যাগাড

অর্থ্যাৎ বৃথা শ্রম/বৃথা কষ্ট[১২]

সাহিত্য

সাহিত্য হলো জাতির মানদন্ড। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতির উত্থান ও পতন নির্ভর করে। যুগে যুগে জাতির সৃষ্টিগত ঐক্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে এই সাহিত্যকে নির্ভর করে।[১৩] ইহা অনুসরণ করে পরবর্তী জাতির লোকেরা সজাগ হয়েছে এবং পূর্বেকার ভূল ত্রুটি মোচন করে উন্নতির শিখরে (ক্রমাগত) উঠেছে। অন্যভাবে বলা যায় সাহিত্য হলো জাতীয় জীবনের আয়না বা দর্পন স্বরূপ। আয়নায় যেমন কোন কিছুর প্রতিবিম্ভ ভেসে উঠে। তদ্রুপ কোন জাতির সমকালীন সাহিত্য অধ্যায়ন করলে তৎকালীন সময়ের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি অর্থনৈতিক তথা মানব জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সাহিত্য এক অমল চিত্তাকর্ষক ভেতর বাইরে যার সমপর্যায়ী আঘ্রাণ। এক অনিত্য অবস্থা থেকে নিত্যকালের হয়ে ওঠা সাহিত্যের মাধ্যমে সম্ভব। চিত্তবৃত্তির এমন বহিঃপ্রকাশ অন্য কোন শিল্পে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধান যোগ্য-

১২. আমানউল্লাহ খান, আজকের বগুড়া (অতীত ও বর্তমান), গ্রন্থমেলা প্রকাশনী, বগুড়া, আগষ্ট ১৯৬৮

১৩. কে. এম. মেছের, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭

'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ। যুগে যুগে মানবের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বিরহ-আনন্দ, ব্যাথা-বেদনা ও তার অনন্ত আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যান কবি-সাহিত্যিকগণ। আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলেই তার বেঁচে থাকা। সাহিত্যের বিশাল ভূবনের অংশীদারিত্ব নিতে গিয়ে কেউ সফলতার চূড়ায় আরোহন করেন, কেউ ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে বেড়ান। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের যে ঐতিহ্যের কথা আমরা বলে থাকি, সেখানেও রয়ে গেছে সেই বহিঃপ্রকাশের ইঙ্গিত'

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে বর্তমান কাল-অবধি সাহিত্যের বিস্তৃত ভূ-ভাগ জুড়ে প্রতিনিয়তই যে সৃষ্টির উম্মাদনা লক্ষ্য করে আসছি, তাকে একটি ধারাবাহিক সৃষ্টির ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনভাবে অভিহিত করা যায় না। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থ্যাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এগুলো যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের অন্তহীন প্রচেষ্ঠার এক একটি সাক্ষ্য, এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি, তা ভুললে চলে না। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ অর্থ্যাৎ তার সমগ্রকে জানতে হলে তার সাহিত্যের ইতিহাসকে অনিবার্যভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয়।

বগুড়ার সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা-

করতোয়া নদীর তীরসংলগ্ন যে ভূমিটি ছিল হিন্দু আমলের গৌড়েশ্বরের রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন। হযরত শাহ সুলতান বলখী মাহীসাওয়ারের তীর্থভূমি আজকের মহাস্থান, একদা অনেক মনীষী, পর্যটক, পীরবঙ্গ ফকির-আউলিয়ার পদপাতে ধন্য হয়ে উঠেছিল এই ছোট্ট জনপদ বগুড়া।[১৪] বর্তমান সময়ের আগেও প্রাচীনকালে এ বদ্ধভূমিতে বিশেষতঃ বগুড়ার প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।

প্রাচীন আমল, সুলতানি আমল, নবাবী আমল, বৃটিশ আমল পাকিস্থান আমল পেরিয়ে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পর্যন্ত বগুড়ার ইতিহাস বৈচিত্র্যের ইতিহাস, বহু শাসকের উত্থান-পতনের ইতিহাস, অত্যাচার, শোষনের ইতিহাস, বিদ্রোহ আন্দোলনের ইতিহাস, বহু রক্ত-ত্যাগ-তিতিক্ষার-যুদ্ধ-স্বাধীনতার ইতিহাস। সব মিলিয়ে বগুড়া জেলার ঐতিহাসিক ভূমিকা অনিবার্যভাবে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিশাল ইতিহাসের পরিধিতে করতোয়াস্নাত বগুড়ার ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন প্রোথিতযশা খ্যাতিমান অনেক কবি, সাহিত্যিক, উপনাস্যিক, প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক।

১৪. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার সাহিত্য: ইতিহাসের ধারাক্রম, আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), মল্লিকা (একটি সাহিত্য সাময়িকী), ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৬৯

তাদের অনবদ্য লেখনী একদিকে যেমন একই জেলার গৌরবময় ভূমিকাকে সমুজ্জ্বল করেছে তেমনি এদেশের সাহিত্যঙ্গনকে করেছে গতিশীল, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত। বগুড়ার প্রাচীনকালের কবি সাহিত্যিকদের লেখনিতে যেমন আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বারবার ফিরে পাই, তেমনি আধুনিককালের কবি সাহিত্যিকদের রচনাবলী দেশের তথা সাহিত্যের বিশ্ব-ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের অনুপ্রানিত করে।

১৯৪৭ পূর্ববর্তী বগুড়ার সাহিত্যচর্চা-

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রাচীন কালে সর্বপ্রথম ১১৩৪ সাল থেকে ১১৮৭ সালের মধ্যে বগুড়ার দু'জন কবির সাক্ষাৎ পাই। গৌড়ের রাজা মদন পালদেবের সময়ে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এবং রাজা বল্লাল সেনের সময় কবি অনিরুদ্ধ ভট্ট ঐতিহাসিক প্রভাব চন্দ্র সেন সন্ধাৎকর নন্দীর জন্মস্থান উল্লেখ করেছেন মহাস্থান সন্নিকটবর্তী পৌন্ড্রবর্ধনপুর। তবে কে. এম. মেছের বলেন-

তাহার পিতা কায়স্থগনের অগ্রনী ছিলেন। মহাগুণবান পিনাক নন্দী তাহার পিতামহ ছিলেন।[১৫]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র সেন সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী বলে উল্লেখ করেছেন।

সন্ধ্যাৎকর নন্দীর কাব্য গ্রন্থের নাম 'রামচরিতম'। রামচন্দ্রের সীতাউদ্ধার কাহিনী গ্রন্থটির মূল বিষয়। ঐতিহাসিকগণ তার কাব্যের ভাষাকে মার্জিত ও সুরুচিকর বলে অভিহিত করেছেন। অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্যর জন্মস্থান শিবগঞ্জ থানার বিহার গ্রামে। তার কাব্যগ্রন্থের নাম 'হারলতা'। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'পিতৃদয়িতা' নামে আরেকখানি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি রাজা বল্লাল সেনের 'সাহিত্যগুরু' ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন।

বগুড়ার ইতিহাসবিদ কাজী মোহাম্মদ মিছের, প্রাচীন কালে বগুড়ার সাহিত্যিকদের মাঝে মহাস্থানের অধিপতি স্বয়ং পরশুরামের নাম উল্লেখ করেছেন। পরশুরাম, তাহার 'উত্তর পুন্ড্র খন্ড' নামক গ্রন্থে মহাস্থানের গুরুত্ব ও অবস্থানের বিষয় বর্ণনা করিয়েছেন। উক্ত প্রাচীন পৌরানিক গ্রন্থের ভাষা ও ভাব এইরূপ-

'অর্থ পৌন্ডক্ষেত্র মাহাত্ম্যং' শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ অপরাং কথ্যতাং; দেব নদী-নাম্ঞ বিশেষতঃ, শ্রীপৌন্ড্র বর্দ্ধন্যং ক্ষেত্রং নৈব মুঞ্চিতি কেশবঃ; ধরিত্রা গাভী কমলং প্লতং করজলৈস্কল'[১৬]

১৫. কে. এম. মিছের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

সুলতানী আমলে ১৪০৮ সালের দিকে উদয়নাচার্য ভাদুড়ী নামে একজন গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জন্মস্থান কাহালু থানার নিশিন্দ্রা গ্রামে। কারো কারো মতে, নন্দীগ্রাম থানার নিশ্চিন্দ্রা গ্রামে তার জন্ম। উদয়নাচার্যের গ্রন্থের নাম 'কুসুমাঞ্জলি'। কাশীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৭]

নবাবী আমলে বগুড়া জেলায় বেশ কিছু কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ১৫৭৬ সাল থেকে তাদের পদচারণা। সেই সময়ে যাঁদের পাওয়া যায় তাঁরা হলেন গদাধর ভট্টাচার্য, রামনারায়ণ ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ আচার্য, কবি বল্লভ এবং জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, গদাধর ভট্টাচার্যের নাম প্রসঙ্গে বগুড়ার দুই ঐতিহাসিক দুই ধরনের নামোল্লেখ করেছেন। বগুড়ার ঐতিহাসিক প্রভাব চন্দ্র সেনের গ্রন্থে তাঁর নাম

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কিন্তু কে. এম. মেছেরের গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচর্য বলা হয়েছে। বগুড়া জেলা চাপড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। গদাধর ভট্টাচার্যের পিতার নাম জীবনচার্য্য, গদাধর নবদ্বীপ টোল হইতে রাম নারায়ণ ন্যায়শাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করেন। গদাধর ভট্টাচার্য "ব্রক্ষানির্ণয়" ও "গদাধরী টীকা" নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার "তালসন" গ্রামে রামনারায়ণ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "কৃতভাষ্য" রচনা করেন। রস কদম্বের কবি বল্লভের জন্ম বগুড়ার মহাস্থানের কাছে আড়োয়া গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ ও মাতার নাম বৈষ্ণবী। ১৫৯৯ সালে তাহার "রস কদম্ব" কাব্যগ্রন্থটি ফাগুনী পূর্ণিমায় রচনা করেন। তার এ কাব্য গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের শৃঙ্গার রসে পরিপূর্ণ।[১৮] তার এ গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে এতদ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, কবি বল্লভ "রসকদম্ব" নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। কবি নিত্যানন্দ সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে আদমদীঘী উপজেলার বড় বাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। তার রচিত "অদ্ভুত রামায়ণ" প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থটি রচনার পরে কবি নিত্যানন্দ আচার্য 'অদ্ভুতাচার্য' নামে পরিচিত লাভ করেন।

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন মহাস্থানের লাহিরীপাড়া গ্রামের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মনসা মঙ্গলের কবি হিসেবে পরিচিত। তার অবদান "মনসা মঙ্গল" (বেহুলার ভাসান) "বিষহরি পদ্মপুরান" 'উষা হরণ' 'মাক্কারস' 'যোগীকাছে' নামক কাব্য গ্রন্থাবলী রচনা করেন। বিষহরি পদ্মপুরানে কাব্য গ্রন্থে তিনি চাঁদ সওদাগর, নাগরানী মনসা ও বেহুলা লখিন্দরের বিয়োগান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি তার বংশ পরিচয় দিয়েছেন এভাবে- শ্রী বংশীবাদন মৈত্র নাম মহাশয় চৌধুরী অনন্ত রায় তাহার তনয়/অনন্ত নন্দন কবি শ্রী মৈত্র জীবন/লাহিরী পাড়াতে বাস 'বরেন্দ্র বাহ্মন'। কবির পিতার নাম আশুরাম। পিতামহের নাম বংশীবদন। কবির মাতার নাম স্বর্ণমালা ও স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। কবির জীবন ছিল দারিদ্রতায় পূর্ণ।[১৯]

---

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

তিনি "পাগলা জীবন" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন রসিক কবিও ভাসান যাত্রার গায়ক ছিলেন। একবার বগুড়ার আড়িয়া গ্রামে ভাসান গাইতে গিয়ে তাঁকে অনাহারে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। মনের দুঃখ ও অভিমানে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি রসিকতা করে গেয়েছিলেন।

"আইড়া গাঁয়ের গাইড়া মরদ মাগীর কামাই খায়

জীবন মৈত্র গাইতে আ'স্যা উবাস পাড়্যা যায়"।

(প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, তৎকালে আড়িয়ার বাসিন্দাগন ছিল 'পাল' তাদের পাতিল তৈরীর বারে। আনা কাজ করতো মেয়েরা।[২০] নিজস্ব কাব্য প্রতিভার দ্বারা জীবন মৈত্র সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। জীবন মৈত্রের কর্ম প্রতিভার কারণে আজও বগুড়াবাসী গৌরব বোধ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনকালীন সময়ে বগুড়ার সাহিত্যোঙ্গনে কবি সাহিত্যিকদের পদচারণার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ উপনেবেশিক শাসন আমলের মধ্যভাগ ও শেষ ভাগে যে সকল কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনাকর্মের দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন তাদের মধ্যে মুসলিম লেখকদের অবদান ও কম ছিল না। বৃটিশ আমলের শেষ পর্যায়ে যারা সাহিত্যক্ষেত্র প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশ আমলেও তাদের খ্যাতি একেবারে ম্লান হয়নি। বৃটিশ আমলের মধ্যপর্যায় থেকে যাঁরা সাহিত্য রচনা শুরু করেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পওয়া যায়। এঁরা হলেন হরগোপাল দাস কুন্ডু, প্রাণগোবিন্দ দেব, প্রভাস চন্দ্র সেন, দেববর্মন বি এল, সারদানাথ খাঁ বি এল. মুনশী হামেদ আলী, শহরউল্লা, কাজী কলিমুদ্দিন, সৈয়দ বাহার উদ্দিন, কোব্বাদ হোসেন ও ডাঃ কহরউল্লা। হরগোপাল দাস কুন্ডুর জন্মস্থান শেরপুর। তিনিই সর্বপ্রথম "সেতিহাস বগুড়া" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বগুড়ার ইতিহাস রচনায় পরবর্তী ইতিহাসবিদদের দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ হলো 'সেতিহাস বগুড়া। প্রভাসচন্দ্র সেন মূলত ঐতিহাসিক। তিনি কাহালু থানার মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ সেন ও মাতার নাম গঁয়ামুণি দেবী। তিনিই মহাস্থান তথা পুন্ড্রনগরের মহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে "বগুড়ার ইতিহাস" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "বগুড়ার ইতিহাস" নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা বগুড়ার পূর্বাপার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র হিসাবে আজও সর্বজন স্বীকৃত।[২১] ১৯১২ সালে 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি 'বরেন্দ্র কাহিনী কৃষ্ণচরিত' "কায়স্থ তত্ত্ব, প্রভৃতি গ্রন্থ" পুথি রচনা ও প্রকাশ করে তিনি স্বমহিমায় ইতিহাসের পাতার চিরস্বরণীয় হয়ে আছেন।

---

২০. অধ্যক্ষ এম এ হামিদ, বগুড়ার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবন্ধ, "স্বল্পদৈর্ঘ" একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গবেষণার কাগজ, বর্ষঃ ৬, সংখ্যা- ১০, ফেব্রুয়ারী- ২০০২, পৃ. ২৫

২১. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার সাহিত্য: ইতিহাসের ধারাক্রম, আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), মল্লিকা (একটি সাহিত্য সাময়িকী), ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৭৩

সারদানাথ খাঁ বি. এল "অশোক কাব্য" নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি কাব্য রচনা করেন। 'সতী বিমলা' নামে তিনি একটি উপন্যাসও রচনা করেন। কাহালু থানার নারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মুনশী হামেদ আলী। তিনি ফৌজদারী আদালতের পেশাকার ছিলেন। তিনি 'মুসলিম কর্মবীর চরিত-মালা' ও 'মহসীনচরিত্র' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গদ্যের ভাষা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। হাজী কলিমুদ্দীন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি 'লায়লী' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। ডা. কহর উল্লাহ পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তাঁর গ্রামের বাড়ী মহাস্থানের রামশহরে। তিনি 'মহাস্থান' নামে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তাতে

মহাস্থানের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। সৈয়দ বাহার উদ্দীন খোন্দকার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যের সংরক্ষক হিসাবে পরিচিত। তিনি কবি জীবন মৈত্রেয় 'বিষহরি পদ্ম পুরাণ' নামক গীতিকাব্য স্বহস্তে লিখিয়া (সংকলন) ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সৈয়দ কোব্বাদ হোসেন বগুড়া শহরের সূত্রাপুরে বসবাস করতেন। তিনি সরকারের পুলিশ বিভাগের চাকুরী করতেন। তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে 'মক্কা ও মদিনার তীর্থ ভ্রমণ' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। মৌলভী আবদুল গণি মোজাদ্দেদী একজন সুবক্তা ও হিন্দু শাস্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি বগুড়া শহরের এরুলিয়ার সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জামসেদ আলী খন্দকার। তিনি 'আম্বিয়ানামা' ও 'মারেফত তত্ত্বের' গ্রন্থকার। লেখক জামাল উদ্দীন তালুকদার বগুড়া-সদর উপজেলার শিকারপুর গ্রামের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'সোনার খনি' ও 'হীরক হার নাম' গজলের বই রচনা করেন। এছাড়াও এ সময় যাঁদের নাম পাওয়া যায়। শাহ মাসুদ খন্দকারের রচনা 'শাহ কলন্দর' (১৮৭৯)। নাজের মোহাম্মদ 'মোনাইযাত্র' (১৮৭৯)। মোহাম্মদ আরিফ 'রঙিন বাহার কাব্য' (১৮৮১)। আজমতুল্লাহ খন্দকার 'ফাতেমার জহুরনামা' নামে হযরত মুহাম্মদ (সা:) কন্যা হযরত ফাতেমা (রা:) এর জীবনী (১৮৯৩)। খলিল উদ্দীন গাইনের 'ভানুমতীর লড়াই' ১৮৯৮। দুর্গতিয়া সরকার সম্ভবত তাঁর নিবাস পূর্ব বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানায়। তাঁর রচনা 'ইমাম যাত্রা' গ্রন্থ। মোহাম্মদ রহিম বক্স 'শোকার্ণব' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করেন। গাবতলী উপজেলার জয়ভোগা গ্রামের হাজী হাফিজ উদ্দিন আকন্দ 'মজমায়ে নছিমত' নামক দোভাষী কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। বগুড়া সদর উপজেলার বারপুর গ্রামের চাঁদ মোহাম্মদ 'নীল সমাধি' (গদ্য) ও 'চাঁদের মেলা' (কবিতা গ্রন্থ) রচনা করেন। গাবতলী উপজেলার মফিজ উদ্দিন খন্দকার 'ফুলের তোড়া' নামক একটি মনোরোম কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গাবতলীর মহির উদ্দিন মন্ডল একজন পল্লী কবি ছিলেন তিনি 'সওয়াল ও ধুয়াগান'

সংকলন এবং সানা উল্লাহ সরকার ‘পরশুরাম বধ’ নাটক রচনা করেন। এছাড়া এ সময়ের আরও উল্লেখ্যযোগ্য কবি সাহিত্যিক হলো মৌলভী নুরুল হোসেন কাশিমপুরী, রমনীকান্ত ভট্টাচার্য, আবদুল ওয়াহেদ, ব্রক্ষ্মানন্দ, মহাতাব উদ্দিন সরকার, মছলত খান, মসিওত উল্লাহ মোক্তার, ডা. এলাম উদ্দিন, মুনসী মানিক উদ্দিন আহমদ, কেরামত আলী মোক্তার, রণমহাম্মাদ সরকার, মৌলভী রইছ উদ্দীপ আহাম্মদ, কুতুব উদ্দীন খাঁ, হেদায়েত উল্লা মিয়া খন্দকার ও ওসমান গণি প্রমুখ।

বৃটিশ শাসন আমলের শেষ ভাগে যে সকল কবি সাহিত্যিকদের নাম পাওয়া যায় তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সোনাউল্লা সরকার। বগুড়া সদর উপজেলার ছাগলজানি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘পরশুরাম বিজয়’ নামক নাটক রচনা করেন। কাজী বহর উল্লাহ কাহালু উপজেলার ‘কাহলা’ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি “ফুলের ডালা” নামক একটি গজলগীতি রচনা করেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজী বহর উল্লাহ নিম্মোক্ত কবিতাটি রচনা করেন।

[১]

শিক্ষার উন্নতি যদি করিবার চাও,
সু-শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে চাও।
সু-শিক্ষার শুভ ফল যদি ভোগ কর,
যত্ন করে মাতৃভাষা আগে শিক্ষা কর।

[২]

সু-শিক্ষিত হয়ে যারা উন্নতি ক’রেছে,
খুঁজে দেখ মাতৃভাষা ভাল শিখিয়াছে
অন্যান্য ভাষায় জ্ঞান যদি ইচ্ছা কর,
সযতনে মাতৃভাষা আগে শিক্ষা কর।
মাতৃভাষাতে যার পূর্ণ জ্ঞান আছে,
অপরাপর ভাষা সোজা হবে তার কাছে’।[২২]

২২. কে.এম. মেছের প্রাগুক্ত পৃ. ১৫২।

হাজী জামাল উদ্দীন তালুকদার বগুড়া সদর থানায় শিকারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "হীরকহার" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার গজল গীত নিম্নরূপ-

"তুমি হে জগৎ স্বামী,
আদি অন্ত সব তুমি,
পতিত পাবন তুমি,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

অন্য এক রচনায় তিনি লেখেন-

"আগে পাছে দরুদ পড়
শেরক, বেদাত ছাড়,
ইমান বহাল কর
মোহাম্মদ ইয়া রাসুলাল্লা! ২৩

সাদত আলী আখন্দ শিবগঞ্জ থানার চিঙ্গাসপুরে জন্মগ্রহণ করেন। চাকুরী করতেন পুলিশ বিভাগে, চাকুরী থেকে অবসর গ্রহনের পর ওকালতি পেশা শুরু করেন। তাঁর 'তের নম্বরে পাঁচ বছর' ও 'অন্যদিন অন্য জীবন' তার সুলিখিত অভিজ্ঞতাখন্ডিত গ্রন্থ। বগুড়ার দুই স্বনামখ্যাত লেখক ভ্রাতৃদ্বয় ড. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম এবং 'চরমপত্র' খ্যাত এম. আর আখতার মুকুলের পিতা ছিলেন সাদত আলী আখন্দ। ১৯৭১ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৭ পরবর্তী বগুড়ার সাহিত্য চর্চার গতিপ্রকৃতি বৃটিশ পরবর্তী বগুড়া ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অংশ। পকিস্তান আমলে বগুড়ার সাহিত্যিক ও কবিগণের মধ্যে মীর আতাউর রহমান ভুতপূর্ব প্রফেসর (এ. এইচ. কলেজ বগুড়া) তার প্রগতিশীল নাটক "শেষ চাওয়া" সে সময়ে বিশেষ আলোড়ন তোলে। বেণু বনের কবি সৈয়দ আফতাব উদ্দীন খলিস্বরী "মনের ভূলের" লেখক মহী উদ্দীন 'পরিণাম' উপন্যাসের লেখক মত্তলবী আয়েন উদ্দীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রী মনীন্দ্র চাকী এম. এ, তাঁর স্ত্রী সান্তনা চাকী এম. এ প্রমুখ অন্যতম।

২৩. কে. এম মেছের, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩

পাকিস্তান আমলে বগুড়ায় যে দু'জন কবি খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হলেন এস. কে. এম. রোস্তম আলী কর্ণপুরী এবং কে. এম. শমশের আলী। কবি এস. কে. এম. রোস্তম আলী ১৩০৮ সালে ১৭ই মাঘ ১৯০২ সালের ১লা নভেম্বর বগুড়া সদর উপজেলার কর্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৪] তার পিতার নাম আকবর আলি খন্দকার মাতার নাম হাজেরা খাতুন। তিনি খেলাফত ও কংগ্রেস আন্দোলনের যোগদানের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন এবং সে সময় তাঁহার মাতা-পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়াশোনার ইতি ঘটে। কবি কর্ণপুরী আমৃত্যু সাহিত্যকে ভালবেসে গেছেন। কোন সাহিত্যসভায় ডাক পড়লে সুদূর গ্রাম কর্ণপুর থেকে পায়ে হেটে চলে আসতেন। সাদাসিদে জীবনের অধিকার কর্ণপুর গ্রামের এই মানুষটি কাব্য ভাবনায় নিজেকে উজাড় করে দেন। তিনি 'বিশ্বনবী' 'বগুড়ার ফুলমালঞ্চ'

'তকবিরাতে পাকিস্তান' 'তসবিরাতে পকিস্থান' 'সোহরাব রুস্তম' সহ অনেক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। 'সোহরাব রুস্তম' কাব্য খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তার কবিতার মধ্যে নজরুলের ও সিরাজীর প্রভাব বিদ্যমান। তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হত। তার লেখা প্রকাশ করার সাময়কী হলো 'বগুড়ার কথা' করতোয়া 'প্রজাবাহিনী' সুন্নত অলজামাত ও নেদায়ে ইসলাম। কবি এস. কে. এম. রোস্তম আলী কর্ণপুরী একজন সুবক্তা বটে। কবি বিশ্বনবী নামক কবিতা স্তবক নিম্নরূপ-

"নাসির উদ্দীন বগরা খাঁ যে জেলা গড়িল

তার মাঝে করতোয়া খরতর বৈল॥

তার তীরে মজলিশ পুর আর ফুলবাড়ি।

তার পরে মাটিডালি-আম্র বৃক্ষ সারি॥

ফুলবাড়ী রাজাপুর পাইলে বিলয়।

দেখা যায় কালীবালা কালীর নীলয়"

তার পূবে মানিকচক মানিকের ধাম।

তার পূর্বে কর্ণপুর কবির মোকাম॥

পিতা মোর আকবর, আকবর সম

মাতা সে হাজারো বানু হাজেরার ক্রম॥[২৫]

২৪. কে. এম মেছের, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩
২৫. কে. এম মেছের, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫-৫৬
কবি কে. এম. শমসের আলী বগুড়া সদর উপজেলার মন্ডল ধরম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডা. রমজান আলি খাঁ সাহেবের জ্যোষ্ঠ সন্তান। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি কাব্য রচনার প্রয়াস পান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলিঙ্গন' ছাত্র জীবনে প্রকাশ প্রায়। এটি তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন এবং পরে কবির আশীর্বাদ লাভ করেন। "স্বাক্ষর" সনেট গ্রন্থ লিখিয়া অল্পসময়ে তিনি 'সনেট বিশারদ' হিসাবে সারাদেশে সুনাম অর্জন করেন। "কল্লোল" আর একটি সনেট সংকলন। আধুনিক কবিতা, যাকে অনেক গদ্য কবিতা বলে আখ্যায়িত করেন। সেই গদ্যকবিতা লেখার প্রচেষ্ঠায় 'স্বাক্ষর' তার আরেকটি গ্রন্থ "রমনার কবি"। তিনি কাব্যে এক নিবেদিত প্রাণ কবি ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। বগুড়ার সাহিত্য চর্চা পঞ্চাশের দশক চল্লিশের দশকের অনেক কবি লেখক নব নব রচনায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশের দশকের বগুড়া জেলার যে সব সাহিত্যিক লেখক নতুন চেতনায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন তাঁদেরই একজন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান। তিনি ১৯০৬ সালে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজশাহী টিসার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার রচিত 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ভিন্নমতের সন্ধান দিয়েছে। তিনি ড. সুনীতিকুমার, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতকে গ্রহণ না করে নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান।[২৬] তবে তাঁর এই মতকে সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা কেউই সমর্থন না দেওয়ায় তাঁর বইটি সুধীমহলে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ষাটের দশকের আরও একজন খ্যাতমান লেখকের আবির্ভাব ঘটে। যিনি মূলত ঐতিহাসিক হিসাবে বগুড়ায় অধিক পরিচিত তিনি কাজী মোহাম্মদ মিছের 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' (বৃহত্তর বগুড়াজেলার ইতিহাস)প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭ তাঁর অবদান। 'রাজশাহী জেলার ইতিহাস এছাড়াও দাওয়াত-ই-ইসলাম নামে একটি গ্রন্থ আছে তাঁর।

পঞ্চাশ দশকে এদেশের সাহত্যি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল তথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা মোটামুটি সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। এসময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাহিত্যাঙ্গন কেউ ব্যাপক ভাবে নাড়া দেয়। মাতৃভাষার দাবিতে গড়ে উঠা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং আটান্নতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন সব মিলিয়ে রাজনীতির প্রেক্ষাপট ছিল বিস্তৃত। ফলে এ সময়ে যারা সাহিত্যচর্চা করেছেন এই সময় তাদের রচনার চলে এসেছে সমাজ, মানুষ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। এই সময় বগুড়ায় যারা সাহিত্যচর্চা করেছে তারাও এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ সময়ে বগুড়ার সাহিত্যঙ্গনে যাদের পদচারণা লক্ষ্য করা যায় তারা হলেন কবি আতাউর রহমান, লুৎফর রহমান সরকার, তাজমিলুর রহমান, এম, শামসুর হক, মুহাম্মদ আব্দুল মতীন, সাইফুল বারী, রোমেনা আফাজ,

২৬. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার সাহিত্যঃ ইতিহাসের ধারাক্রম, আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), মল্লিকা (একটি সাহিত্য সাাময়িকী), ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৭৪

বেগম আনোয়ারা রহমান, আনোয়ার রহমান এ্যানা, টিপু সুলতান, জহুরুল ইসলাম, আমানুল্লাহ খান, রহীম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, প্রসাদ বিশ্বাস, আমজাদ হোসেন, শেফালী রহমান, ডা. আব্দুল করিম, একে মজিবর রহমান, সৈয়দ ওমর আলী চৌধুরী, মতিয়র রহমান কবিরাজ, বিলোবা চৌধুরী, সৈয়দ আফতাব হোসেন, আধ্যাপক মোহসীন আলী। শাহ আনিসুর রহমান, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, মাফরুহা চৌধুরী, মাহমুদা আখন্দ, জাহানারা হক, জেব-উন-নেসা জামাল, ড. এনামুল হক, আবু হায়দার সাজেদুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, আসাফ-উদ-দৌলা রেজা, ডাঃ ননী গোপাল দেবদাস, হাসনা আকরাম, গাজীউল হক, জগলুল হায়দার, আফরিফ, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, আব্দুল মজিদ, আতাউল হক, সুলতানা রহমান, শামসুদ্দীন তরফদার, আব্দুল মজিদ ফকির, আব্দুর রহমান ফকির, আবেদ আলী আহমদ প্রমুখ। এঁরা সবাই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

বগুড়ার সাহিত্য অঙ্গনে উল্লেখিত কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যে অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন ১৯১৭ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি কবি কে এম শসশের আলীর ছোট বোন। তিনি বগুড়া জেলার প্রথম মুসলিম মহিলা এম. এ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি।[২৭] তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী “ বেদনায় এই বালুচরে (কবিতা গ্রন্থ) গল্প গ্রন্থ, ‘সাগরিকা’ ‘রূপকথার রাজ্যে’ ‘শেষ প্রহরের আলো’ ‘একটি সুর একটি গান’। প্রবন্ধ- ‘বগুড়ার লোকসাহিত্য’, সাহিত্য ভাবনা, আমার দীর্ঘতম ভ্রমন, রম্যরচনা, অরন্যমঞ্জরী, এছাড়া তিনি শতপুষ্পা নামে তিন খন্ডে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদনা করেন। ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বগুড়া আরেকজন খ্যাতিমান মহিলা লেখক রোমেনা আফাজ। তিনি ১৯২৬ সালে ২৭শে ডিসেম্বর বগুড়ার জন্মগ্রহণ করেন। মূলত তিনি ‘দস্যু বনহুর’ সিরিজ কাহিনী লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। দস্যু বনহুর সিরিজের মোট সংখ্যা ১৩২।[২৮] তিনি ‘কাগজের নৌকা’ ‘মায়ার সংসার’ ‘মোমের আলো’ ‘মধুমিতা’ ‘মাটির মানুষ’ ‘শেষ মিলন’ ‘আলেয়ার আলো’ ‘জানি তুমি আসবে’ ‘প্রিয়ার কন্ঠসর’ ‘ভুলের শেষে’ ‘রক্তে আঁকা ম্যাপ’ ‘মান্দিগড়ের বাড়ী’ ‘হারানো মানিক’ ‘হুসনা’ ‘নীল আকাশ’ ‘কুন্তিরাই’ ইত্যাদি প্রায় ষাট টি উপন্যাস রচনা করেন। “কাগজের নৌকা” সহ প্রায় ছয়টি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। সাহিত্যে সদা নিবেদিত প্রাণ রোমেনা আফাজ ২০০৩ সালে মৃত্যুবরন করেন। তাজমিলুর রহমান ১৯২৫ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি বগুড়া জেলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও শিক্ষাবিদ হিসেবে সুধীমহলে সুপরিচিত।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৬
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৬

তাঁর রচিত অসংখ্যা নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কলির জ্বীন' 'রুপচাদ' 'অনেক আধার পেরিয়ে' 'ভাই' 'সুবহে উম্মিদ' 'কারিগর' 'টোপ' 'যেমন খুশী সাজো'। কিশোরদের জন্য তিনি লিখেছেন উপন্যাস 'জুলফিকারের অভিযান' 'সুন্দরবনে জুলফিকার' 'ভূতের কবলে জুলফিকার'। রম্যরচনা অমৎসর, লঘুগুরু। তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থের নাম প্রবন্ধ সংগ্রহ। তাঁর অনেক নাটক বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে বগুড়া নাট্যগোষ্ঠীর তিনি ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি ২০১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কবি আতাউর রহমানের জন্ম গ্রহন করেন ১৯২৫ সালে বর্তমান জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর। অধ্যাপনা পেশার পাশাপাশি তার লেখা কবিতা এবং প্রবন্ধ ঢাকা ও কলকাতার পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কবি ও নজরুল বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমাধিক পরিচিত। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'দুই ঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'একদিন প্রতিদিন' 'নিষাদনগরে আছি' 'ভালবাসার চিরশত্রু' 'ইদানিং রঙ্গমঞ্চ' তার গবেষণাগ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। নজরুল কাব্য সমীক্ষা, নজরুল জীবনে প্রেম ও বিবাহ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে নজরুল স্মৃতি পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, হিলালী স্মৃতি পুরস্কার, শেরেবাংলা জাতীয় পুরস্কার ও বগুড়া লেখক চক্র কে পুরস্কার। কবি আতাউর রহমানের কবিতায় কেন্দ্রে রয়েছে সংগ্রামী মানুষের আশা-আকাঙ্খা, দু:খ-বেদনা। তিনি ১৯৯৯ সালের ২৭ জুন পরলোক গমন করেন। লেখক আতাউল হকের জন্ম ১৯১৯ সালে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানায়, তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ 'অঙ্গীকার' 'মহানবীর অমর বাণী' 'রক্তশিখা' 'মুসলিম দর্শন' ইত্যাদি। লেখক শামসুদ্দীন তরফদারের ১৯৪১ সালে সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে। তিনি 'দুই শতাব্দীর বুকে' বগুড়ার ইতিহাসে গ্রন্থটিতে বগুড়ার ইতিহাস ও জেলার জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিদের পরিচিত তুলে ধরেছেন। তিনি 'পল্লীচিত্র' নামে একটি নাটক ও লিখেছেন। শামস্ রশীদ ১৯২০ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি অজস্র উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি প্রায় ১৫ টি উপন্যাস লেখেছেন তন্মোধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'নীলাঞ্জনা', 'প্রাণ বসন্ত', উপল উপকূলে প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ড. মমতাজুর রহমান তরফদার ১৯২৮ সালে বগুড়া সদর উপজেলার মেঘাগাছা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর রচিত গবেষনা গ্রন্থ 'জেনারেল গাইড টু দি ঢাকা মিউজিয়াম' (১৯৬৪), 'হোসেনশাহী বেঙ্গল' 'এগ সোসিও পলিটিক্যাল স্টাডি' (১৯৬৫), ইতিহাসের দর্শন (১৯৬৯)। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর সরকার

সমাজে একজন প্রথিতযশা ব্যাংকার হিসাবে পরিচিত লাভ করলেও তিনি এক নিজস্ব চেতানায় সাহিত্য পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিলেন। রম্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর হাত ছিল তীক্ষ্ম। সামাজিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য, নানা অসঙ্গতি তিনি তার রম্য রচনায় তুলে ধরতেন। "দৈনন্দিন জীবন যেখানে যেমন" গ্রন্থ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। মীর্জা আমজাদ হোসেন সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি অর্জন করলেও লেখক হিসাবে সুনাম কুড়িয়েছেন। শিশুতোষ রচনা 'কচিদের মহানবী', 'কচিদের আবু বকর', 'কচিদের ওমর ও আলী' 'হিরা মানিকের দেশ', 'বড় হওয়ার গোপন কথা', 'মরু ভাস্কর', 'পাহাড়ী দেশে স্বপন কুমার', 'অবন্তীপুরে স্বপন কুমার' ইত্যাদি। রঙের বাজারে পয়তাল্লিশ বছর, আত্মজীবনীমূলক রচনা লেখার সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আনোয়ারা রহমান এ্যানা ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আতাউর রহমানের স্ত্রী। তাঁর রচিত উপন্যাস আমার বধুয়া, গল্পগ্রন্থ ঐকতান, অন্তর্লীন, গল্পমঞ্জরী, পুষ্পবাগ এবং কাব্যগ্রন্থ প্রিয় পঙক্তিমালা, জননী আমার অহঙ্কার। তিনি 'উত্তর নক্ষত্র' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। খন্দকার মুহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি ১৯৩৬ সালে বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া উপজেলার তালোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। 'হয়তো নক্ষত্র নয়' তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। তাঁর গবেষনা গ্রন্থ ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত ও আধুনিক ভাষা তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রযুক্তি। কাব্যগ্রন্থ অনুপম দিনগুলির মাঠে স্বর্ণঘোড়া। তিনি ভাষার সরলতায় তুলে ধরতে অভ্যস্ত। 'দৈনন্দিন জীবন যেখানে যেমন' গ্রন্থগুলো তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। কবি সাইফুল বারী কবিতা নাটক এবং ছোটগল্প লিখেছেন। কবিতা গ্রন্থ 'দুই বিপরীত মেরুতে একটি জীবন', 'জীবনের দৃষ্টিকোণ' 'ভাগ্য কে ফেরাবে আমার', 'ক্রমাগত আমি', টেলিভিশনের জন্যে তিনি নাটকটি লিখেছেন। 'জোনাকী জ্বলে' সিরিজ নাটক অন্যতম। তিনি গানও রচনা করেছেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন। বগুড়া সাহিত্যে কুটির এর কর্নধার এম শামসুল হক নাটক ও উপন্যাস লিখেছেন বেশ কয়েকটি। 'একদিনের কাহিনী' 'মিথ্যার খেসারত' তাঁর রচিত নাটক। একজন নাট্যমোদী এবং নাটকসহ অনেক গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। তার উপন্যাসের নাম 'ফরিয়াদি' 'প্রেমের শেষ চিঠি' পলাতকের চিঠি। মুহাম্মদ আব্দুল মতীন সাংবাদিক হলেও তিনি একজন ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু। প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষনে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আকর্ষণ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁর 'দাঁড়কাকের ডায়েরী', 'বুড়ো পৃথিবী' উল্লেখযোগ্য রচনা।

ড. মুস্তফা নূরউল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত 'মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র' একটি সুলিখিত গ্রন্থ। স্বাধীনতার পূর্বে রাজশাহী থেকে তিনি এবং অধ্যাপক ড. জিল্লুর হমান সিদ্দিকী যৌথ সম্পাদনায় বের করতেন ত্রৈমাসিক 'পূর্বমেঘ' পত্রিকা যা সাহিত্যমোদী পাঠকদের

মধ্যে দারুন আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।[২৯] তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদ অলংকৃত করেন।

২৯. "মল্লিকা" একটি সাহিত্য সাময়িকী ৩৬ তম সংখ্যা ২০০৭, পৃ ১২২।

রওশন আখতার, যিনি এম. আর আখতার মুকুল নামে পরিচিত। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' পাঠক। যাঁর কণ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের মনে উৎসাহ যোগাতো। সেই এম.আর আখতার মুকুল স্বাধীনতার পরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একজন স্পষ্টবাদী লেখক হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আমি বিজয় দেখেছি' 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।[৩০] শাহ আনিসুর রহমান প্রথমে অধ্যাপনা ও পরে সাংবাদিকতার আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজশাহী থেকে 'দৈনিক বার্তা'র সিনিয়র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। 'আড্ডা' নামে তাঁর গল্পগ্রহ আছে।

ড. এনামুল হক ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ষাট দশকের প্রথমাবধি সিকান্দার আবু জাফরের 'সমকাল' সাহিত্য পত্রিকার পাশাপাশি 'উত্তরণ' নামে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'উত্তরণের দেশে' 'হাজার তারের বীনা'সহ তাঁর প্রায় ১২টি কাব্যগ্রন্থ এবং ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ক বেশকিছু গ্রন্থ বিদ্যমান। বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) তাঁর উপস্থাপনায় 'দেখা যায় নাই চক্ষু মেলিয়া'। বাংলাদেশের 'পুরাকীর্তি বিষয়ক' চমৎকার অনুষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল। ইঞ্জিনিয়ার আমানুল্লাহ খান মূলত সাংবাদিকতার সাথে জড়িত তবু একটি ক্ষেত্রে তার অবদান তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বগুড়ার প্রথম 'দৈনিক বাংলাদেশ' এ সাহিত্য পাতায় অনেক লেখককে একত্র করতে পেরেছিলেন। শহীদ মহসিন আলী দেওয়ান এবং তিনি যৌথ সম্পাদনায় বের করতেন 'বগুড়া বুলেটিন', 'আজকের বগুড়া' আমানুল্লাহ খানের একটি বগুড়া সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রহীম চৌধুরী আমানুল্লাহ খানের সমসাময়িক তুখোড় ছাত্র নেতা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। মহসিন আলী সম্পাদিত 'অতএব' পত্রিকায় লিখতেন। তার একটি কাব্যগ্রন্থ 'প্রতীক্ষা'। আধুনিক কবিতার যুগ লক্ষণ তার কবিতায় নেই। কবি জেব-উন-নেসা জামাল ১৯২৬ এ জন্মগ্রহন করেন। তিনি মূলত গীতিকার হিসবো সুপরিচিত। তিনি কণ্ঠশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগমের বড় বোন এবং কণ্ঠশিল্পী জিনাত রেহানার মা। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আমার যত গান' 'গান এল এর মনে', 'সাগরের তীর থেকে'। গল্পগ্রন্থ 'হারানো দিনের গল্প'। গাজীউল হক ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং রাজনীতিবিদ। পেশায় একজন আইনজীবী হলেও তিনি 'জেলের কবিতা' লিখে সুনাম অর্জন করেন। তার অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' 'বাংলাদেশ আন চেইনড' ইত্যাদি। স্বভাব কবি আবেদ আলী আহমদ। ১৯৩৬ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জন্মগ্রহন করেন।

তার কাব্যগ্রন্থ প্রেমের বাঁশরী (১৯৬২), ‘স্বর্গের মত বেঁচে থাকা’। ‘রক্তে ভেজানো বাংলা’, ‘আমার গীতিমঞ্জুরী’, আমার প্রিয়া আর আমি দু’জনে একজন ইত্যাদি।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ১২২

বগুড়ার সাহিত্য চর্চা ষাট এর দশকঃ ১৯৬২ সালের পর পরই এদেশের সাহিত্যে একটি মোড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত গল্প এবং কবিতার মধ্যেই এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশ দশকের কবিতা এবং গল্পকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন আঙ্গিক এবং বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে প্রানবন্ত একদল তরুন হাত রাখেন সাহিত্যের উত্তপ্ত ভূমিতে। ষাট দশকের সাহিত্যের এই পালাবদলে নি:সন্দেহে চমক ছিল, ছিল ভিন্নতর স্বাদ। নতুনদের এই জয়যাত্রা ছিল অপ্রতিরোধ্য। বগুড়ায় ষাট এর দশকের প্রথমার্ধে অধ্যাপক মোহসিন আলী দেওয়ানের ‘অতএব’ পত্রিকাকে ঘিরে একটি সাহিত্য পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। ‘এতএব’ আধুনিক সাহিত্যরীতিকে পুরোপুরি ধারন করেনি।[৩১] রহীম চৌধুরী, কমলেশ সেন, খাজা জহুরুল হক, মহীউদ্দিন, আবু আফতাব, মোহসিন আলী দেওয়ান, শাহ আনিসুর রহমান এবং পরবর্তীতে ষাটের শক্তিধর কবিদের মধ্যে ফারুক সিদ্দিকী, মহাদেব সাহা, বজলুল করিম বাহারের লেখা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৬২ তে ‘অতএব’ সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষনা করা হয়েছিল এবং বগুড়া জেলার কবি সাহিত্যিকদের জীবনী সংগ্রহের এক মহতী উদ্যোগ ‘এতএব’ এর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ জাতীয় উদ্যোগ সার্থক হয়েছিল কিনা সে সর্ম্পকে বেশি কিছু জানা যায় না।

১৯৬২ তে মোহসীন আলী দেওয়ান সম্পাদিত ২টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একটির নাম ‘গল্পের চিড়িয়াখান ও প্রথমা’। ‘গল্পের চিড়িয়াখানা’ সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পঠিত। এই গ্রন্থে মোট ৯টি গল্প আছে। প্রফেসর মুহ. মাহফুজুর রহমান বগুড়া জেলায় ধুনট থানার ঝিনাই গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার লেখা ‘ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন ও বগুড়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বগুড়ার কিছু সাহিত্যকর্মী ষাট দশকের মধ্যবর্তী সময়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। বয়সে তাঁরা ছিলেন সবাই তরুন। তারুন্যের সেই রক্তিম উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে নিজেরই পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তাদের শক্তিমত্তা জানিয়ে দিতে থাকেন। বগুড়ার সাহিত্যের অঙ্গন হয়ে উঠে মুখরিত। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ষাট দশকে যারা আত্মপ্রকাশ করেন তারা হলেন ফারুক সিদ্দিকী, কাজী রব, সাহেদুর রহমান, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনোজ দাশগুপ্ত, বজলুল করিম বাহার, সাইফুল ইসলাম, সাম হেদায়াতুল্লাহ, রেজাউল করিম চৌধুরী, খন্দকার আব্দুর রহীম হীরু। এখানে আরো দু’জন তরুনের নামোল্লেখ করতে হয়। তারা ভিন্ন জেলার অধিবাসী হলেও তাদের সাহিত্যযাত্রা শুরু বগুড়ায়। তারা হলেন বর্তমান সময়ের সুপরিচিত

কবি মহাদেব সাহা এবং প্রয়াত কবি শাহনূর খান। বগুড়ায় নতুন কাব্যান্দোলনে তাঁরাও ছিলেন সক্রিয়।[৩২] ষাট দশকের মধ্য দিয়েই বগুড়ায় নতুন কাব্যযাত্রা শুরু হয়।

৩১. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার সাহিত্যঃ ইতিহাসের ধারাক্রম, আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), মল্লিকা (একটি সাহিত্য সাময়িকী), ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৮০
৩২. "মল্লিকা" একটি সাহিত্য সাময়িকী ৩৬ তম সংখ্যা ২০০৭, পৃ ১২৫

'বিপ্রতীক' সম্পাদনা করেছেন ফারুক সিদ্দিকী, কাজী রব এবং মহাদেব সাহা। পরবর্তীতে শুধু ফারুক সিদ্দিকী। 'পদধ্বনি' সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মনোজ দাশগুপ্ত। আরো কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন এই সময় বের হয়। নূর মোহাম্মদ তালুকদার সম্পাদিত। 'স্বরক্ষেপ' রেজাউল করিম চৌধুরী ও সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত 'অপরাহ্ন' শাহনূর খান ও আরেফুল ইসলাম সম্পাদিত 'অবেলা'। ফারুক সিদ্দিকীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বরচিহ্নে ফুলের শব' প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন রেজাউল করিম চৌধুরী। তাঁর কবিতা জটিল হলেও স্বভাবে 'রোমান্টিক' শব্দতাড়িত। এই কবির আর কোন কাব্যগ্রন্থ বের হয় নি। অনুবাদ কর্মেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধে তাঁর সমান দক্ষতা। ফারুক সিদ্দিকী পত্রিকা সম্পাদনার জন্য ১৯৮৯-এ বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার পেয়েছেন।

একজন বহুল পরিচিত কবি হিসাবে কাজী রবের পরিচয়। তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে রাজনীতি, প্রেম, আন্তজার্তিকতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে তাঁর ৫টি কাব্য গ্রন্থ বেরিয়েছে। গ্রন্থ গুলোর নাম 'মনিমনসার সানগ্লাস' 'তুমি হে দুধের মাছি' 'আবাবিল' ও 'বিশল্যকরনীয় মার্চ' এপ্রিল পাখির পার্লামেন্ট ও নক্ষত্রের নিকোটিন মৃত্যুর পর তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'চোখ একজনের সংসার' প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালে বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

বজলুল করিম বাহার বগুড়ার সাহিত্যঙ্গনের একজন সক্রিয় লেখক। অনুবাদেও তিনি সমান পারদর্শী। তাঁর কোন কবিতার বই বের হয়নি। তিনটি প্রবন্ধের বই আছে 'সমকালীন কবিতার দিগবলয়'। 'নানা অনুভবে' ও 'কথার সেওয়াসকল'। ছোট গল্পও লিখেছেন। গদ্য লেখক হিসাবে ১৯৮৯ সালে বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার লাভ করেন।[৩৩] সাহেদুর রহমান ছাত্রাবস্থায় 'বিপ্রতীক' কবিতাপত্রে বগুড়ার পাঁচজন কবির ৫টি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আছে। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কবিতা প্রবন্ধ রচনা করেন। তার সাতটি কাব্যগ্রন্থ 'ভিজে মাঠের রাখাল বালক' (১৯৯০), 'দুই প্রহরের রোদ' (১৯৯৯), 'বাদামী বৃক্ষলিপি' (১৯৯৪), 'বিচূর্ন কবিতা' (১৯৯৬), কবিতা ইত্যাদি।

মনোজ দাশগুপ্ত ষাট দশকের একজন রোমান্টিক জীবনবাদী কবি। তাঁর একমাত্র কবিতাগ্রহন 'সজল বৃক্ষের দিকে' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৯৭ সালে ৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গল্প ও কবিতা লিখতেন।

৩৩. পূর্বোক্ত পৃ. ১২৫।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে আতাতায়ীর গুলিতে নিহত হন। 'বাংলা সাহিত্য সারনি' তার একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম। সাহিত্যের কাল নির্নয়ের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক। মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স. ম হেদায়েতুল্লার। হেদায়েতুল্লাহ এবং রেজাউল করিম চৌধুরীর মিলিত প্রচেষ্টা সাহিত্য পত্রিকা 'অপরাহ্ন'। স, ম হেদায়েতুল্লার কবিতা ও আলোচনার তীক্ষ্ম হাত ছিল। রেজাউল করিম চৌধুরী ষাট-এর দশকের আরেক শক্তিশালী কবি। কবিতার ভাষা ও শব্দচয়নে তিনি পরিশ্রমী। 'ভালমন্দের অপরাহ্ন' 'পরাজিত শালিকের অনুশোচনা', 'চাঁদের হাতে তরবারি' সহ ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বলিষ্ঠ সম্পাদনায় 'অর্কেস্ট্রা' সাহিত্যপত্র ইতোমধ্যে পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। খন্দকার আব্দুর রহিম ছোটগল্প লেখক। ষাট দশকে বগুড়া জেলার লেখক যাঁরা জীবিকাসূত্রে বাইরে অবস্থান করেছেন তাঁদের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আন্ওয়ার আহমদ অন্যতম। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিক। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চার ঃ 'অন্যঘরে অন্যস্বর', 'খোঁয়াড়ি', 'দুধেভাতে উৎপাত' এবং 'দোজখের ওম'। উপন্যাসের নাম 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াব নামা'। তিনি ১৯৯৪ সালে মারা যান। আন্ওয়ার আহমদ কবি এবং ছোটগল্প লেখক এবং সর্বোপরি একজন সম্পাদক। তাঁর বারোটি কাব্যগ্রন্থ এবং পাঁচটি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও সাতটি সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে- 'রিলকের গোলাপ', 'মানবসম্মত বিরোধ', 'নির্মাণে আছি', 'হঠাৎ চলে যাবো', 'শেষ সম্বল শেষ দান', 'অঙ্গ তোমার কাব্য করে', 'নীল কষ্টের ডাক', 'প্রেম পদাবলী', 'উনষাটের পদাবলী', 'ষাটের প্রান্ত ছুঁয়ে', 'অটল থাকা ধীর সন্যাস', উড়ো খই গোবিন্দ নমঃ। 'গল্পগ্রন্থ-অন্ধকারে সীমানা', 'আন্ওয়ার আহমদের গল্প'। 'অন্ধ অন্ধকার', 'সতর্ক প্রহরা' ও অন্যান্য গল্প। সম্পাদিত গ্রন্থ-পঞ্চশর, আজকের কবিতা, সিলেক্টেড পয়েমস অব আবদুল মান্নান সৈয়দ, একজন কবি দিলওয়ার, কবি আতাউর রহমান, একজন কবি আহমদ রফিক, একজন গল্পকার (আবদুল মান্নান সৈয়দ) । তিনি সুদীর্ঘ ৩৮ বছর যাবৎ কবিতা পত্রিকা 'কিছুধ্বনি', গল্প পত্রিকা 'রূপম' সম্পাদনা করেছেন এবং মৃতুঅবধি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রূপম প্রকাশনী থেকে শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে এদেশের অসংখ্য তরুণের প্রথম বই তাঁর রূপম প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। আন্ওয়ার আহমদ ২০০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪

ডিসেম্বর লোকান্তরিত হন। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বগুড়া আযিযুল হক কলেজে অধ্যয়নকালীন সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ষাদ দশকের একজন গল্পকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'বহে না সুবাতাস', 'দুর্বিনীত কাল', 'সিতাংশু তোর সমস্ত কথা' অন্যতম গল্পগ্রন্থ। এখন আমেরিকা প্রবাসী। রবি ভট্টাচার্য, শ্যামল ভ্রাতৃদ্বয় মূলত নাটক রচনায় পারদর্শী। রবি ভট্টাচার্যের দাইনেম ইজ, মেডেল, আলোয় খুঁজে ফেরা মঞ্চ সফল নাটক, শ্যামল ভট্টাচার্য নাট্য রচনা, নির্দেশনার পাশাপাশি অভিনয়েও সমান দক্ষ।

আলাউদ্দীন অনেক নাটক রচনা করেছেন। 'বোবা কান্না', 'নকল মানুষ', 'বিষের পেয়ালা', 'মন্টুর পাঠশালা' সুনাম অর্জন করেছে। তিনি ক্ষেতলাল থানার অধিবাসী। মৃণালকান্তি সাহা একজন সঙ্গীতশিল্পী হলেও নাটক রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। নাট্য বিষয় আলোচনাও তাঁর আছে। তাঁর রচিত নাটক- 'ককটেল।'

রবিউল আলম জন্ম বারপুর, বগুড়া ১ লা মার্চ ১৯৪৮। নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা এবং গল্পকার। চাকরি সুবাদে ঢাকায় বসবাস করছেন। তাঁর অনেকগুলো নাটক বেতার ও টিভিতে প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। টেলিভিশন ও বেতারে উল্লেখযোগ্য নাটক-নাপুস, সমাপ্তি অন্য রকম, এক যে ছিল দুই হুজুর, কখনো সৈকতে, আরো একজন রাবেয়া, পরবাসী, সবুজিয়া, বিপ্রতীপ, আমি যখন বন্দী, এক সকালে, যার সাথে যার, উল্টো ফাঁদ, একজন মিশার ঈদ, তোমরা আমরা ইত্যাদি।[৩৪]

৫.৩ ষাটের দশকে আরো যাঁরা

ষাট-এর দশকে আরো যাঁরা সাহিত্যভূমিতে পা রেখেছিলেন তাঁরা হলেন- নূর মোহাম্মদ তালুকদার, মুহম্মদ রহমতুল বারী, মোস্তফা নূরউল ইসলাম, মিনতি কুমার রায় প্রমুখ। নূর মোহাম্মদ তালুকদার ছাত্রাবস্থায় ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে 'স্বরক্ষেপ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ- 'বিরাগী কাল' ও 'শুক্লাতিথির চিঠি'। উপন্যাস- জঠরে আগুন জ্বলে। মুহম্মদ রহমতুল বারী পেশায় ডাক্তার, শেরপুর নিবাসী। তিনটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর- স্বপ্নের সোনালী আবীর, জেগে থাকি, সুখ-দুঃখ পদাবলী। একমাত্র গল্পগ্রন্থ-বিকাউ। অধ্যাপক মিনতি কুমার রায় লিখেছেন দু'টি গবেষণাগ্রন্থ- সমালোচনাতত্ত্ব ও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ষাটের একেবারে শেষ পর্যায়ে আরো দু'একজন লেখকের নাম পাচ্ছি- এঁরা হলেন- আব্দুর রফিক খান, তাঁর গ্রন্থ- তবুও মানুষ (১ম ও ২য় খন্ড) , তিনি কবি কে এম শমশের আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ফজলুল আলম-এর

গ্রন্থ-সাহসিনী নারী, মনের ব্যভিচার, পরবাস, প্রশ্ন থেকে যায় ইত্যাদি। আরেকজন লেখক সালেহা চৌধুরী বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী। তিনি উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া লিখেছেন। 'যখন নিঃসঙ্গ', 'উষ্ণতার প্রপাতে', 'তাহিতি' এবং অন্যান্য। উপন্যাস- 'আনন্দ', 'বিন্নি ধানের খই', 'ময়ূরীর মুখ', প্রবন্ধ- সাহিত্য 'প্রসঙ্গে', 'পরমা', 'প্রবাস চিন্তা' ইত্যাদি।

৩৪. প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার সাহিত্যঃ ইতিহাসের ধারাক্রম, আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), মল্লিকা (একটি সাহিত্য সাময়িকী), ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৮৩

৬. সত্তর দশকে বগুড়ায় সাহিত্য চর্চা ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশে শুরুতেই নতুন লেখকদের আমরা পাইনি। দেশের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা, চারদিকে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিকে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে স্বজন হারানোর হাহাকার সাহিত্যের ভুবনকে স্তিমিত করে রেখেছিল। ১৯৭২-এ ৬ জুন আমাদের এক কাব্যসহচর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কনিষ্ঠ অধ্যাপক ষাটের দশকের অন্যতম তরুণ কবি হুমায়ুন কবির আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। আগষ্টে কবি ফারুক সিদ্দিকী 'বিপ্রতীক' কবিতাপত্রের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং সেখানে কবি হুমায়ুন কবিরের মৃতুতে শোকজ্ঞাপন করা হয় এভাবে- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক ও তরুণ কবি 'বিপ্রতীক' গোষ্ঠীর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী হুমায়ুন কবিরকে ৬ই জুন রাত্রি ন'টায় রহস্যজনকভাবে হত্যায় আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছি, মর্মাহত হয়েছি। সব সময় সকল হত্যাকান্ড নিন্দনীয়।

১৯৭৪-এ 'অনুকাল লেখ গোষ্ঠী'র ছায়াতলে বেশ কিছু তরুণ লেখক একত্রিত হন। সমাজ, প্রেম এবং যুদ্ধোত্তর নতুন স্বদেশ চেতনায় তাঁদের লেখালেখি এগুতে থাকে। এই দশকে যাঁরা সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তাঁরা হলেন-মনজু রহমান, রায়হান রহমান, আবদুর রাজ্জাক, শোয়েব শাহরিয়ার, জি,এম হারুন, মাহমুদ হাসান, পুটু আখতার, মোস্তফা আলী, সজীব শান্তা হীরু, আফরুজ জাহান, সুজন হাজারী, অমিয় সাহা, খালিকুজ্জামন ইলিয়াস, ফারুক ফয়সল প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকে লেখালেখি থেকে সবে গেছেন, কেউ নতুন চেতনায় গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছেন।

মনজু রহমান কবিতা চর্চায় এখনও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'জলের নুপুর'। 'পান্ডব' নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত আছেন। তাঁর সম্পাদনায় এই দশকে অনড়, এ্যালবাম, যুগল জানালা, নির্বাচিত কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। রায়হান রহমান কবিতা চর্চায় নিজেকে একাগ্রভাবে নিমগ্ন রেখেছিলেন। তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ এখনও বের হয়নি। এই সময়

তাঁর সম্পাদনায় অনড় এবং যুগল জানালাসহ বেশ ক'টি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। শোয়েব শাহরিয়ার তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ- শোকগুচ্ছ শ্লোক গুচ্ছ (১৯৯১), মনীষার জন্য পঙক্তিমালা- ২ প্রত্নরোদে শরীর পোড়ে, কোরতে লদীর বুকের উসুম (বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষার কবিতা)। প্রবন্ধগ্রন্থ- আখতারুজ্জামান ও খন্ডিত চেতনার নান্দীপাঠ। তাঁর সম্পাদনায় 'মনোসরনী' নামে একটি চমৎকার পত্রিকা প্রকাশ পায়।[৩৫]

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৪।

সরকার আশরাফ-সম্পাদিত 'নিসর্গ পত্রিকাটির প্রকাশকও তিনি। আবদুর রাজ্জাকের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ কে গ্রহণ করে 'অস্তিত্ব আমার'। তাঁর সম্পাদনায় 'শতবর্ষী' পত্রিকাটির ৭টি সংখ্যা প্রকাশ পায়।

১২ টি উপন্যাস, ৪টি গল্পগ্রন্থ, ৮টি কবিতাগ্রন্থ, ৫টি ছড়াগ্রন্থ ও একটি সম্পাদিত গ্রন্থসহ প্রায় ৫০টি গ্রন্থের জনক জি,এম হারুন। উপন্যাস-নীল চোখে নীল যন্ত্রণা, যে ছিল মনে, তুমি আসবে বলে, যে ছিল অন্তরে। গল্পগ্রন্থ-সরবে অধিবৃত্তে আঁধার, স্মৃতি নির্ভর, চোখের আয়তনে। কাব্যগ্রন্থ- ভালবাসা একদিন, মগ্ন বর মাটির প্রেমে, বিষ্টি নামে নমে না ইত্যাদি। ছড়াগ্রন্থ- হেই সামালো, কেচ্ছাকান্ড, এক বস্তা ছড়া। তাঁর সম্পাদিত 'স্মৃতিতে জলপড়ে 'টুপটাপ' নামে বগুড়ার কবি লেখকদের জীবনীমূলক গ্রন্থ। তিনি তৃণ নামে একটি পত্রিকা সম্পদনা করেছেন। 'মল্লিকা' বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার পেয়েছেন। অবসর ও আঁচল নামেও দুটো পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, প্রয়াত কথাসহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুজ। খালিজুজ্জামান ইলিয়াস গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী, রসোমন, মিখাইল সালোকভের প্রথম জীবনের গল্প, মিথ্যের শক্তি নামে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ২ খন্ডে 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমগ্র' সম্পাদনা করেছেন।

সুজন হাজারী কবি হিসেবেই উত্থান। তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ছড়াগ্রন্থ আছে। একজন জীবনবাদী কবি হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি জয়পুরহাট উচ্চারণ সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-কৃষ্ণপক্ষ সংক্রান্ত ও ভালোবাসে রাজা হবো। অমিয়সাহা-আযিযুল হক কলেজে পড়াশুনাকালে প্রচুর কবিতা লিখতেন। তার অনেক কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। এই কবি পরবর্তীতে আইন ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। এই কবি আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন।

শহীদ অধ্যাপক মোহসিন আলী দেওয়ানের জ্যেষ্ঠপুত্র ফারুখ ফয়সল ছোটবেলা থেকেই পিতার অনুপ্রেরণায় লেখালেখি শুরু করেন। পেশা বেছে দেন সাংবাদিকতা। ছোটগল্প ও উপন্যাস তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। উপন্যাস- তার নীল চোখ এবং প্রবন্ধ রাজধানীর রাজনীতি। দীর্ঘকাল কানাডায় প্রবাস জীবন শেষে এখন দেশে অবস্থান করছেন। পুটু আখতা এ সময়ের এক তরুণ লেখক। নাটিক ছোটগল্প লেখক।

নাটক-বিভ্রাট, আমি কে, স্বয়ং ভূত ইত্যাদি তাঁর নাটক। বিশেষ রচনা 'বগুড়ার নবাববাড়ীর, সেকাল-একাল ও একজন মুক্তিযোদ্ধার ডায়রি থেকে।

মোস্তফা আলী, প্রবন্ধ ও নাটক লিখেছেন বেশ ক'টি। মানিক চেতনাঃ ভিন্ন প্রেক্ষিতে, মানিক ও জীবনানন্দ, নৈঃশব্দের কোলাহল, হেনরিক ইবসেন ও তাঁর শিল্পচেতনা, উপন্যাস- 'নীলকণ্ঠ পাখি' গল্প সংকলন-সময়ের শেষ প্রহর, কাব্যগ্রন্থ-প্রত্ন হৃদয়ের জ্বালা (যৌথ) ইত্যাদি।

৭. বগুড়ার সাহিত্য চর্চা আশির দশক :

আশির দশকে এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ লেখকের সাহিত্য অঙ্গনে সদম্ভ পদপাত আমাদের আশান্বিত করলো। এই সময়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা হলেন- শেখ ফিরোজ আহমদ, আশীস-উর-রহমান শুভ, আজিজার রহমান তাজ, সুকুমার দাস, প্রদীপ মিত্র, সাজাহান সাকিদার পলাশ খন্দকার, ফখরুল আহসান, জয়ন্ত দেব, শিবলী মোকতাদির, বিদ্যুৎ সরকার, আব্দুল্লাহ ইকবাল, মাহমুদ হোসেন পিন্টু, পিয়াল খন্দকার, রোহন রহমান, সৈয়দ মাহবুব, পান্না করিম, হাবীবুল্লাহ জুয়েল, শের আফগান শেরা, ড্যারিন পারভেজ, মিঠু হোসেন, বায়েজীদ মাহবুব, আরিফ রেহমান, সুপাস্থ মল্লিক, মনসুর রহমান, তৌফিক হাসান ময়না, ফরিদুর রহমান, রোকেয়া মাহবুব, রেজাউল করিম মন্টু, সরকার সাইফুল মাহমুদ, নবী নাজমুল হক তালুকদার, (ন, না, হক তালুকদার), তাঁর সম্পাদিত শিশু-কিশোর পত্রিকার 'ভোর হলো দোর খোল'। প্রদীপ মিত্রের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-পতাকার অহংকার (১৯৯৯), দেখি সেই দগ্ধগ্রাম, তার হাতে দীর্ঘ এক হাত, আকাশের সুবিস্তার, অগ্নিত অঙ্গার ও জনতার সিংহনাম ।[৩৬]

শেখ ফিরোজ আহমদের জন্ম চাঁদপুরে কিন্তু অধ্যাপক পিতার বদলীসূত্রে তিনি আশির দশকে বগুড়াতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সময়ে বগুড়ার সাহিত্য জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ষাট ও সত্তর দশকের লেখকদের সঙ্গে তিনি সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হন। ছাত্রাবস্থাতেই প্রচুর লেখালেখি এবং পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পাতকীর ছায়া' প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি রক্তারুণ, চত্বর, ঈক্ষণ নামে লিটন ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'বগুড়া লেখক চক্র' প্রতিষ্ঠা এই সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার পিছনে শেখ ফিরোজ আহমদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি বগুড়া লেখক চক্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা। অসীম উদ্যোগ ও নিষ্ঠায়, শ্রমে, ঘামে গড়ে তোলেন বগুড়া লেখক চক্র।

সাজাহান সাকিদার একজন প্রতিশ্রুতিশীল গল্পকার ও ভিন্নমাত্রার ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রকাশিত বই- উপন্যাস : শ্মশানযাত্রীর নরক উল্লাস-১৯৯৫, বত্রিশ বিঘা ধানী জমি-২০০০, স্বপ্ন বিক্রেতাদের গল্প-

আবারও জেগে উঠবে এই ডুবোচর-গল্পগ্রন্থ: পাতালে এক বর্গ-উল্টোরথ বলি ও অন্যান্য তীরের সমীকরণ।

ফখরুল আহসান এক তরুণ কবিতাকর্মী। কোনো কবিতাগ্রন্থ বেরোয়নি, তবে প্রকাশ অপেক্ষায়- আছে। সম্পাদনা করেছেন 'মর্মর' এবং 'পথ' কবিতা পত্রিকা। পান্না করিমের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ : আকরিক সুখ-দুঃখের জার্নাল।

---

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৬।

জয়ন্ত দেব কবিতায় নিবেদিত প্রাণ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'করতোয়ার জল ছুঁয়ে বেড়ে ওঠে বেহুলার ছেলে'। 'দ্যুতি' নামে একটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

পিয়াল খন্দকার ছোটগল্প এবং উপন্যাসই বেশি লিখেছেন। তাঁর ছয়টি উপন্যাস-শুধু তোমাকেই ভালবাসি, প্রেম তুমি তোমাকে, ভালবাসার তিন রং, ফিরে এসো হৃদয়ে আমার, ধন্যবাদ, হে ভালবাসা, শ্রাবণে শ্রাবণে তোমাকে চাই। গল্পগ্রন্থ- প্রেম ও স্বপ্নের পাখিরা। আব্দুল্লাহ ইকবালের একটি কাব্যগ্রন্থ-গোল গোলা রাত। সম্পাদনা করেছেন-মাইলস্টোন, অতিক্রম, নোয়াজার্ক। মাহমুদ হোসেন পিন্টুর কাব্যগ্রন্থ কেউ নেয় না গোলাপ, এসো একাকীত্বের অরণ্যে। উপন্যাস- কষ্ট বিলাস।

আজিজার রহমান তাজ আশির দশকে বগুড়ার সাহিত্য জগতে যার সরব পদচারণা। লেখালেখির বিষয় 'আশয় গদ্য, কবিতা, ছড়া। প্রকাশনা গ্রন্থের সংখ্যা সাত। মল্লিকা সাহিত্য পত্রিকা ৩০ বছর ধরে প্রকাশনা অব্যাহত রেখেচেন। মল্লিকার প্রকাশনা সংখ্যা ৫২টি। এত দীর্ঘজীবী সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাঞ্চলে আর নেই। ছড়ায় তার হাত খোলে চমৎকার। 'জননেত্রীর প্রতিকৃতি' ও 'আমাদের হুমায়ুন আহমেদ' নাম দু'টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কবিতার বই-ইস্যু সংকট, কবিতা কার্ড, 'ভালোবাসা সোনার হরিণ' 'ভালোবাসা বুকের বকুল'। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা- মল্লিকা, তুমি, কবি এবং মানবতার কবি নজরুল ইত্যাদি।[৩৭] কবি আতাউর রহমানের কন্যা হোমায়রা নাজনীন সোমা কবিতা ও গল্প দুই-ই লিখে থাকেন। তার কবিতা গ্রন্থ অরন্যের ভেতরে পা, বিষাক্ত ফুলের মধু, জননী আমার অহঙ্কার। গল্প গ্রন্থ ঃএক্যতান, গল্পমঞ্জুরী। খন্দকার রেজাউল করিম হিরু। বিশবাটি সেবক সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নাটক লিখেছেন। 'মানুষ না মূর্তি' 'আত্মত্যাগ, কারদোষে, পিপাসা, তাঁর রচিত মঞ্চসফল নাটক। অকলাপ্রয়াত খন্দকার আমিনুল করিম দুলাল। বগুড়া কারুপল্লীর প্রতিষ্ঠাতা। মূলত কারুশিল্পী ও শিল্পকর্মের ফাঁকে ফাঁকে লিখতেন ছড়া, নাটক, কবিতা। অতৃপ্ত অন্ধকার, অথচ চলছে, স্বয়ং ভূত, তাঁররচিত মঞ্চসফল নাটক। বগুড়াসহ বাংলাদেশের অনেক লেখকের প্রচ্ছদ তিনি করেছেন। শিল্পকর্মের জন্য তিনি ভারতে অশোকা ফেলোশিপ লাভ করেন। খাদিজা এলমিস। তাঁর একটিকাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই ফুলবন,

অন্য জনম। খন্দকার বজলুর রহিম কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। শিশু সাহির্তে তাঁর বেশ দখল আছে। কাব্যগ্রন্থ- হৃদয়ের কাছাকাছি, আজো ভালবাসি। গল্পগ্রন্থ, প্রিয় বান্ধবী। উপন্যাস-হৃদয়ের স্পন্দন, ইডিয়েট, ইয়েস ম্যাডাম, একটু ছুঁয়ে দেখি। ছোটদের বই-কুরীদের রাজ, ভূতের বাড়ি। সুকুমরার দাস সাহিত্য নিবেদিত প্রাণ মানুষ। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে লেখা আর লেখা। আশির দশকে তার লেখা। আশির দশকে তার লেখা নাটক মঞ্চস্থ হত শহরতলী ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।

তার দর্শক নন্দিত নাটক- 'আবার ফিরে গেলাম' কে বড় চোর, জরিনার পেটে কার পোলা, কার কান্না, বিচারের বাণী ইত্যাদি মঞ্চ সফল নাটক। তার নাটক 'আবার ফিরে গেলাম, ৩৬ বার মঞ্চস্থ হয়। তার সম্পাদিত পত্রিকা 'রক্তিম সূর্য' ১১ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তার কবিতা গ্রন্থ 'বুভুক্ষ মানুষের মিছিল' একফোটা বিষ দাও ইত্যাদি ।

গাজী সারোয়ার কবিতা, গল্প রচনা করেন। 'বৈশাখী মেলা' নামে একটি কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেছেন। তিনি বগুড়া লেখক সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। 'লেখক' নামে পত্রিকা তাঁর সম্পদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। আব্দুস সামাদ মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর তিনটি উপন্যাস মেঘে ঢাকা শশী, মেঘে ঢাকা রবি এবং প্রকাশকের মৃত্যু। তাঁর ইংরেজীতে একটি কাব্যগ্রন্থ- 'টু পোয়েমস টু বিল ক্লিনটন হাবীবুল্লাহ জুয়েল-এর কাব্যগ্রন্থ 'কুয়াশার চাষ'। আব্দুর রহিম বগরা, তঁর ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বেশি। প্রবন্ধগ্রন্থ- এঞ্জেলিক ভয়েস, মহাপ্রলয়, ফতোয়া, রক্তাক্ত ইতিহাস, বগুড়ার নওয়াব বাড়ীর ইতিহাস, হযরত শাহ ফতেহ আলী (রাঃ), জিয়াউর রহমানঃ জীবন থেকে নেওয়া। ফেরদৌসুর রহমান রিটার একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থ- 'লাল চিঠি'। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর আকস্মিক তিরোধান কাব্যাঙ্গনের জন্য সত্যিই শোকাবহ ঘটনা। আব্দুর রশীদ। তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ-রূপসী প্রান্তর আকাশ গ্রামের পাখি, বর্ষার দেহে কাব্যের আগুন। তিনি পুন্ড্রতোয়া' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। তৌফিক হাসান ময়না মূলত সংগঠক ও নাট্যকার। তিনি বগুড়া থিয়েটার প্রধান সংঘঠক। অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তার নাটক যে গল্পের শেষ নেই, যুদ্ধ স্বাধীনতা, সোনাভানের পালা, হল্লাবোল, স্বাধীনতা কাঁদে আজো। তাঁর রচিত নাটক টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারিত হয়েছে। আশির দশকে অন্যান্যরা এখনও বই প্রকাশ করেননি। তাঁরা লিখছেন, কেউ কেউ লেখার জগৎ থেকে দূরে সরে গেছেন। এসময় শেরপুর সাহিত্যে চক্রের মাধ্যম স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু লেখকের উত্থান ঘটে। এদের মধ্যে আজিজুল হক, সুব্রত ঠাকুর, দীপংকর চক্রবর্তী, কাজল দত্ত, সদানন্দ লাহিড়ী, আব্দুর রউফ, গৌতম সরকার প্রমুখ।

৮. বগুড়ার সাহিত্য চর্চা নব্বই ও তার পরবর্তী :

নব্বই-এর দশক এই দশকেই সাহিত্য পথযাত্রায় এক নতুন চেতনা আমাদের বুদ্ধিবিভায় তুলেছে ঝড়ো হাওয়ার মাতম। যে প্রক্রিয়ায় আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব এযাবতকালের ধ্যান-ধারণায় অভিঘাত সৃষ্টি করলো, যার সূচনা ষাট-সত্তরদশকে। এই নতুন সাহিত্যতত্ত্বে অভিমুখীন যাত্রায় ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, মনোসমীক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নারীবাদী, তত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান একাকার হতে চা-এসবেরই একটি উল্লেখযোগ্য নামকরণ 'উত্তর আধুনিকতা' যা বলা বার্থের সাহিত্য সমালোচনা, আলথুসারের মার্কসের রচনাপাঠ, লেভিস্ট্রসের নৃতত্ত্ব, মিখাইল বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব, জাঁক লাকাঁ, মিশেল ফুকো,ইহাব হাসান ও এ্যাডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যতত্ত্বে পুষ্ঠ হয়ে জাঁক দেরিদার বিনির্মাণের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছে।[৩৮] এসবেরই ধারাবাহিকতা রাজধানী ঢাকাসহ সব জেলাতেই উত্তর আধুনিকতার তথ্য তালাশ চলছে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। বগুড়াতে বেশ কিছু লেখা উত্তর আধুনিকতার তত্ত্বে পুষ্ট হয়ে সে ধারণা থেকে লিখছেন, কেউ কেউ প্রথাগত সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছেন। নব্বই দশকের কম্পমান তরুণ লেখকদের মধ্যে শামীম কবীর, আপলু, কামরুজ্জামান মাসুম, মামুন রশীদ, অমিত রেজা চৌধুরী, আবু রায়হান চঞ্চল, লিটন সাহা, টুটুল রহমান, নীলুফার নাসির নীলা, শাহান-ই-জেসমিন ডরোথী, মতলেবুর রহমান, সায়রাহেলাল, এস, এম শাজাহান, মহল আরা, হিমেল সরকার, সাইফুল ইসলাম, সিরজুল হক মন্টু, মোহসিম বিল্লাহ সবুজ, সেলিম রেজা সেন্টু, স্বাতী রহমান, মুমিনুর স্বপন, অরবিন্দ দাস, নূরুন্নবী খান জুয়েল, সাহাব উদ্দিন হিজল, কামরুল নাহার, রায়হান রানা, কাজল আহমেদ প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেকেই কমবেশি লেখার জগতে বিচরণ করছেন।

তরুণ কবি শামীম কবরি নীরিক্ষামূলক কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'শামীম কবীর কবিতা সমগ্র'। আপলু কামরুজ্জামান মাসুম রশীদ, অমিত রেজা চৌধুরী, আবু রায়হান চঞ্চল, লিটন সাহা, টুটুল রহমান, নীলুফার নাসির নীলা, শাহান-ই-জেসমিন ডরোথী, মতলেবুর রহমান, সায়রা হেলাল,এস এম শাজাহান, মহল আরা, হিমেল সরকার, সাইফুল ইসলাম, সিরাজুল হক মন্টু, মোহসিম বিল্লাহ সবুজ, সেলিম রেজা সেন্টু , স্বাতী রহমান, মুমিনুর স্বপন, অরবিন্দু দাস, নূরুন্নবী খান জুয়েল, সাহাবউদ্দিন হিজল, কামরুন নাহার, রায়হান রানা, কাজল আহমেদ প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেকেই কমবেশি লেখার জগতে বিচরণ করছেন। তরুন কবি শামীম কবির নীরিক্ষামূলক কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'শামীম কবীর কবিতা সমগ্র'। আপলু লিখেছেন কয়েকটি উপন্যাস হৃদয়ের কথা, কষ্টে কষ্টে ভালোবাসা, জ্যোস্না রাতে একা, অভিমানী একজন, তবুও তুমি আমার ,সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে, ও একটি যৌথ কবিতার বই' সেই তুমি এবং একটি কবিতার কার্ড 'তোমাকে স্পর্শ করবো বলে। কামরুজ্জামান মাসুমের যুগল সংলাপ, নীলুফার নাসির নীলার গল্পগ্রন্থ-আপন বলয়, মহল আরার উপন্যাস সুখের সন্ধানে, স্বাতী রহমানের গ্রন্থ-বিউগিল বনভূমি, গল্পমঞ্জুরী এ সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। অন্যরা এখনো লিখে যাচ্ছেন, সম্ভাবনাময়

প্রতিশ্রুতিশীল লেখকগণ আগামী দিনে বগুড়ার সাহিত্যাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়। নব্বই দশক সম্পর্কে এখনই চরম মন্তব্য করাউচিত নয় বলে মনে করি। তবে সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র তৈরিতে তারা সচেষ্ট আছেন। তিরিশের পরে ষাটে যেমন ছিল চমকে দেবার প্রবণতা, সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার উদ্দাম আকাঙ্খা, অনুরূপ সত্তর আশি পেরিয়ে নব্বই-শূন্য দশক আমাদের সাহিত্যের বিলোড়নের দশক বলে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

৩৮. "মল্লিকা" একটি সাহিত্য সাময়িকী ৩৬ তম সংখ্যা ২০০৭, পৃ ১৩০।

৪.২ মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্প

মৃৎশিল্প

প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণের ভেতরেও কোনো কোনো সময় মানুষের শৈল্পিক সত্তা নিজেকে উন্মোচনের সুযোগ অন্বেষণ করে থাকে। ঘরগেরস্থলির নিত্যকার সামগ্রী হাঁড়ি-পাতিল সরার সঙ্গে একত্রে নির্মিত হয় শৈল্পিক গড়ন ও চিত্রায়ন সমৃদ্ধ শখের হাড়ি ও সরা। লক্ষণীয়, যারা হাড়ি গড়েন তারা আবার চিত্রনের কাজও করেন। একই মানুষ আবার ধর্মজ প্রতিমা ও খেলনা দুই-ই গড়েন সমানতালে। তাঁদের সৃজনকর্ম কেবল আকার সদৃশ না থেকে হয়ে উঠে বাস্তবের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। জীবন্ত মানুষের চেয়েও কখনও কখনও তা বহন করে গভীর ভাব- গড়িমা। জীবন, ধর্ম, প্রয়োজন, আনন্দ, বেদনা সবই যেন এ শিল্পের ঘূর্ণায়মান চাকার বৃত্তে ঘুরে ফিরে সঞ্চারমান। এরই ভেতর সমাজ মানসিকতা চরিত্র ও কৃষ্টি পরিচয় নিহিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে এ চক্রে সমাজের জীবন ও কর্মপ্রবাহ পরিচালিত। বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম নিদর্শন মৃৎশিল্প মাটি দিয়ে প্রস্তুতকৃত শিল্প বস্তুই হচ্ছে মৃৎ শিল্প। বাংলার লোকশিল্পের আওতায় যেসব মৃৎশিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়,তন্মধ্যে মাটির পুতুল,ঘট, প্রতিমা, তৈজসপত্র, রন্ধনপত্র, চিত্রিত সরা, ফুলদানী ও বিভিন্ন খেলনাসামগ্রী উল্লেখ্যযোগ্য।

লোকশিল্পের উদ্ভব ও বিস্তারে ক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত এ শিল্প গড়ে উঠে সহজলভ্য উপাদান উপকরণ প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে। এজন্যে দেখা যায় যেখানে বাঁশ বেতের সহজলভ্য আছে সেখানে এ জাতীয় শিল্প গড়ে উঠেছে। আর যেখোনে কাঠ, শোলা বা শাঁখের সহজ প্রপ্তি সেখানে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। এজন্য দেখা যায় যে সব পরিবেশে সব শিল্প গড়ে উঠে না। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটির সহলভ্যতার কারণে বাংলার নদী বিধৌত অঞ্চলে এ শিল্পের প্রসারতা ঘটেছে। তবে বর্তমানে তা নিম্নমুখী। মাটির কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসমাজ বাংলার কুমার বা কুম্ভকার নামে পরিচিত।[৩৯] এদের উপাধি পাল এবং বাঙলার প্রায় সব অঞ্চলে এদের বসতি পালপাড়া এবং কুমার পাড়া নামে অভিহিত। এরা ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। বর্তমান ভিন্ন ধর্মালম্বী অনেকেই পেশা হিসেবে মৃৎশিল্পকে বেছে নিয়েছে, তবে তার সংখ্যা নগণ্যই।

বগুড়া জেলার নব্যতম উপজেলা শাহজানপুর আড়িয়া ইউনিয়নের পালপাড়া মৃৎশিল্পের জন্য অত্র অঞ্চল উল্লেখ্যযোগ্য। পাতিল, ঠিলা, পূজার ঘট, ধুপতী, প্রদীপ, গাছা, রসের হাঁড়ি, ঠিলা, কলস, দইয়ের গ্লাস, সরা, ডুকি, ডুঙ্গি, ঢাকনা, কাসা, ঢোকসা, গামলা, চারী, তাওয়া, সাতখুপি, ছাইদানী, ফুলদানী, হরেক রকম খেলনা আরও অনেক ধরনের মৃৎপাত্র তৈরিতে এখনকার মৃৎশিল্পীরা পারদর্শী। কোনো ডিজাইনের যেকোনো সাইজের দ্রব্য দেখলে হুবহু সেই দ্রব্য/পণ্য তৈরি করতেও তারা সমান দক্ষ।

৩৯. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক) প্রাগুক্ত পৃ- ১৬৪।

মৃৎশিল্পে পরম্পারায় বহমান একটি গোষ্ঠী শিল্প। কুমার পরিবারের নারী পুরুষ বৃদ্ধ সকলেই এর সাথে সংশি▯ষ্ট। জন্মের পর থেকে খেলার ছলেই কাদা মাটির গোলা হাতে পাল পরিবারে সন্তানরা নিপুণ এই মৃৎশিল্প কর্মের অংশ হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যিক পেশাকে টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে এরা বিবাহ প্রথা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। কুমার পরিবারের যেসব মেয়ে হাতের কাজে (মাটির কাজকে বলা হয়েছে) যত পারদর্শী বিয়ের ক্ষেত্রে সেই মেয়ের কদর তত এবং চাহিদা বেশি।[৪০] কারণ মৃৎশিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক যে পর্যায়গুলো আছে তার মধ্যে ভারি ও শারীরিক শ্রমের কাজগুলো ছাড়া বাকি সব কাজে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পুতুল ও খেলনা সামগ্রী তৈরি ও রং করার কাজগুলো অধিকাংশই ঘরের মেয়ারাই করে।

বাংলাদেশের সবস্থানেই মৃৎশিল্প প্রস্তুতের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন: মাটি প্রস্তূতকরণ, চাকে মাটির মণ্ডের আকৃতি দান, ভাটায় পোড়ানো, রং করার প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রায় একই রকম। তথাপি আড়িয়া পালপাড়ার কুমারদের রয়েছে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রক্রিয়া, রয়েছে প্রত্যেকটি পর্যায়ের পৃথক পৃথক স্থানিক বৈশিষ্ট্য। এখানকার কুমাররা চিলের বিল থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় মাটি স্থানীয় ভাষায় যাকে বলি মাটি বা এতি মাটি বলা হয়, সে মাটি সংগ্রহ করে। স্থানীয় নদী এবং বিলসমূহ তাদের

প্রয়োজনীয় নাব্যতা হারানো এবং স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে অগভীর স্তরের মাটির কারণে বর্তমানে মৃৎশিল্পে মাটি সংকট তৈরি হয়েছে ফলে কাঙ্খিত মাটির ব্যয়ও বেড়ে গেছে। যে মাটি পূর্বে প্রতি ভ্যান ২০-৩০ টাকায় কেনা যেত সেই মাটি এখন কিনতে হয় ১৫০-৩০০ টাকায়। মাটি সংগ্রহের পর তাতে বালুর মিশ্রণে পা দিয়ে কোচা হয়। এরপর মিশ্রিত মাটি থেকে আকিড়, খোলাসহ অপ্রয়োজনীয় সকল উপাদান বেছে বাদ দিয়ে মসৃণ মন্ড তৈরি করা হয়। তৈরিকতৃ মন্ড থেকে ম্যাগ (কাঠ দিয়ে তৈরি ধারালো অস্ত্র বিশেষ) দিয়ে কেটে প্রয়োজনানুপাতিক গোলা বানানো হয়।

মাটির দ্রব্য উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার চাক বা চাকা। গোলাকৃতির ঘূর্ণায়মান এ প্রযুক্তি একান্তই কুমার সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ। বর্তমানে সময়ের সত্বর গতিকে সঙ্গ করতে কুমারাদের চাকে যুক্ত

হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত মটর। ফলে বেগ পেয়েছে উৎপাদনকার্য। মাটির মন্ড চাকে স্থাপন করে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উদ্দিষ্ট দ্রব্যের আকার দিয়ে এবং সুতা দিয়ে কেটে চাক থেকে পৃথক করা হয় এভাব এক ভ্যান মাটি থেকে ২০০টি মাঝারি আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি অথবা ১০০০ টি গ্লাস তৈরি করা যায়। আকৃতির তারতম্যে এ সংখ্যা কম-বেশি হয়। চাক থেকে নামানো পাত্রগুলো রাখা হয় ঘরের ঝাপায়।

---

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৫।

গোলাকৃতির পাত্রের আকার বেইলা নামক কাঠের তৈরি একধরনের দ্রব্যের ব্যবহার করা হয়। সর্বাঙ্গ সমান করা হয় ফ্যাশন নামক বস্তূ দিয়ে। নকশার প্রয়োজনে বাঁশের তৈরি কাইন ব্যবহার করা হয। সাধারণত মৃৎশিল্পে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়।[৪১] রঙের জন্য ইটের গুড়া , তেঁতুল বিচি, বেলের আঠা, মেঠে সিদুঁর, পিউরি, চকের গুড়ি, ইত্যাদি সহযোগে মৃৎদ্রব্যাদি রং ও গে- জের কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক এসব দ্রব্যের অপ্রতুলতার কারণে অনেকে বাজারে কৃত্রিম রঙ ও ব্যবহার করছেন। মুখ্যত আড়িয়া পালপাড়া অত্র অঞ্চলের দধি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পাত্র সরবরাহ করে তাঁদের শিল্পকর্ম এবং জীবনযাপন সচল রেখেছে। তৈরিকৃত পাত্র সমূহ দু'দিন রোদে রেখে শুকানো হয়। তারপর বড় আকৃতির দধি পাত্র ১০০০-১৫০০০ টি অথবা ছোট আকৃতির গ-াস হলে ৪০০০-৫০০০ টি একত্রে ভাটায় পোড়ানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্যাত্রগুলো সাজাতে সময় লাগে দু'দিন , পোড়াতে হয় একদিন ধরে এবং নামাতে সময় লাগে আরও দু'দিন। অবশেষে পাত্রগুলো বাজারজাতকরণের জন্য খরিদ্দারের সম্মুখীন করা হয়। তুলনামুলকভাবে বাজারে প্রাপ্ত অপরাপর উপকরণজাত পণ্যের চেয়ে কম ব্যয়বহুল হওয়ায় ক্রেতা সাধারণ বিশেষত অত্র অঞ্চলের দধি প্রস্তুতকারী এবং বিক্রেতা পর্যায়ে মৃৎপাত্রর চাহিদা আজ অবধি একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। কিন্তু নগরসভ্যতার বিস্তার এবং শহরমুখিতার কারণে সাধারণ মানুষ শেকড় প্রকৃতিজাত দ্রব্যের

থেকে ক্রমশ যন্ত্রসভ্যতা এবং কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। ফলে বিমুখ হয়েছে মৃৎশিল্পের

বংশানুক্রমিক মৃৎকর্মের সাথে যুক্ত অনেকেই আজ পেশা ছেড়ে বিকল্প পেশায় যাওয়ার প্রয়াসে নিয়ত। এর কারণ অনুসন্ধানে দৃশ্যমান হয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিকল্প পন্যের সহজলভ্যতা, যোগান অনুযায়ী চাহিদা পণ্য সরবরাহে ঘাটতি, অর্থনৈতিক দীনতা, পুঁজির অভাব, মাটির মূল্য বৃদ্ধি অন্যতম। আগে জলাভূমি, খাল, হাওড়, বিল ইত্যাদি স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করা যেত। বর্তমানে দ্রুত নগরায়নের ফলে জলাশয় ও নিাঞ্চল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতো প্রতিকূলতার মাঝেও যারা তাদের ঐতিহ্যিক পেশার চাকা সচল রেখে সমাজ দেশ তথা জাতিগত ঐতিহ্যের ধারা বহমান রেখেছেন তারা সত্যিই বাহবা পাবার দাবি রাখেন। বৈশ্বিক আবহাওয়াার বিরূপ প্রভাবে পৃথিবীতে আজ যে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে

চলেছে তার অন্যতম উপাদান-উপকরণ যেমন: প-াস্টিক, পলিথিন, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ঐতিহ্যিক মৃৎশিল্পের ব্যবহার সম্পর্কে

স্থাপত্য শিল্প: ইতিহাস,ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির স্মারক চিহ্ন হল স্থাপত্য শিল্প। স্থাপত্য শিল্পের মাধ্যমে ঐতিহাসিক কাল বিভাজন নির্ণয় করতে আমরা সক্ষম হই। পুরানো স্থাপত্য শিল্প সে যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাক্ষর বহন করে। বগুড়া জেলা অত্যন্ত পুরাতন জনপদ হওয়ায় এ জেলার স্থাপত্য শিল্পের ঐতিহ্য ঐশ্বর্যমন্ডিত, নিম্নে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থাপত্য শিল্পের বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৬

তারাপুর মসজিদ:

সান্তাহার ইউনিয়নের তারাপুর গ্রামে একটি ছোট বর্গাকৃতির ৮-৩´ এবং উচ্চতা ১৩´ উচ্চতা বিশিষ্ট পুরোনো মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি সান্তাহার স্টেশন থেকে ৪ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত। মসজিদটির পূর্বাপাশে একটিমাত্র দরজা ও পশ্চিম পাশে একটিমাত্র মেহরাব রয়েছে।

বাবা আদমের মাজার:

সান্তাহার রেলওয়ে জংশন থেকে প্রায় ৪ কি.মি পূর্বদিকে আদমদীঘি উপজেলা সদরে প্রখ্যাত তাপস বাবা আদম (রহঃ) এর কথিত মাজারটি অবস্থিত। মাজারের পাশেই রয়েছে বাবা আদম কর্তৃক খননকৃত বিশাল একটি দিঘী। এখানে মাজার সংলগ্ন সুদৃশ্য একটি মসজিদও রয়েছে।

যোগীর ভবন :

বগুড়া শহর থেকে ১০ কি.মি. উত্তর- পশ্চিমে এবং মহাস্থনগড় থেকে ৬ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে কাহালু উপজেলায় অবস্থিত ''যোগীর ভবন" নামে একটি ঐতিহাসিক গ্রাম আছে।গ্রামটি নাথ- সম্প্রদায়ের শৈব (শিবের উপাসক) এবং বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে সতের-আঠার শতকে জাত একটি ধর্ম মত।) শৈব সন্ন্যাসীদের আবাসিক এলাকা ও প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। ১৯৪৯ খ্রিস্টাবেদ্ ইবনে মফিজ পৌন্ড্র (মহাস্থানের ইতিহাস প্রণেতা) স্বয়ং এলাকাটিকে প্রাণবন্ত অবস্থায় দেখেছেন। যোগীর ভবনের স্থাপনাগুলো (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান) একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে একটির নাম

'ধর্মডুঙ্গি' এবং তাতে একটি লিপিমালা উৎকীর্ণ আছে লিপিটিতে সর্বসিদ্ধ সন ১১৪৮, শ্যী সুফলা (১৭৪১ খ্রি:) কথাটি লেখা আছে।[৪২] 'গদার ঘর' নামে এখানাকার একটি মন্দিরে দিবারাত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার ভক্তগণ ছুৎমার্গ সংস্কারহীন এবং সাম্যবদী। পূজার পরিবর্তে সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনই ছিল নাথ-সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। বিভিন্ন দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত কালভৈরব, সর্বমঙ্গলা ও গোরক্ষনাথের মন্দির নামে এখানে আরো চারটি মন্দির আছে ।''ক্যালভৈরব মন্দিরে একটি শিব লিঙ্গ ও একটি লিপি ছিল। লিপিটিতে শ্রী রাম সিদ্ধ সন ১১৭৩ সালে (১৭৬১ খ্রি:) আমলে শ্রী জয়নাথ ''নর-নারায়ন' কথাটি লেখা ছিল। সর্বমঙ্গলা মন্দিরে তিনটি 'হর-গৌরি মূর্তি" একটি মহিষ-মর্দান মূতি, অষ্টমাতৃকা মীূর্ত সম্বলিত পাথরের ভগ্নাংশ, একটি

ত্রিমুখী নারী মূর্তির ভগ্নাংশ ও বীণাবাদনরতা চতুর্ভূজা সরস্বতী মূর্তি ছিল। [৪৩] প্রবেশদ্বারের উপর ১০৮৯ মেহেরনা সদক অভিরাম মেহাতর (১৬৮১ খ্রি:) লেখা ছিল। দূর্গা মন্দিরে পাতরের একটি চামুণ্ডামূর্তি ও গোরক্ষনাথ মন্দিরে একটি শিব লিঙ্গ বিদ্যমান। শেষোক্ত মন্দিরের সন্নিকটে তিনটি ইট নির্মিত সমাধি আছে। এখানে অনেকগুলো পুকুর আছে। তার মধ্যে কূলদীঘি ও দুধিসাগরএর নাম উল্লেখযোগ্য।

কাহালু শিবমন্দির:

৪২ বিগ্রে. এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা): বাংলাদেশ জেলা গেজেটায়ার বগুড়া, ১৯৮৯, পৃ:৩৩২।
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩২।

উপজেলা সদর থেকে ১ কি.মি দক্ষিণে শিবমন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটির আকৃতি ১৪ বর্গফুট এবং উচ্চতা ২০´। জনশ্রুতি আছে ১৯ শতকের শেষ ভাগে স্থানীয় জমিদার কালিপদ মজুমদার মন্দিরটি স্থাপন করেন। মন্দিরটির অর্ধাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বড় বৃক্ষ দ্বারা আচছাদিত। এখানকার ঘরের আকৃতি ৮-৫´´×৬´´×২´´। মন্দিরটির পাশের জমিদার বাড়িটিও বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

মহেশপুর মসজিদ :

কাহালু উপজেলা পরিষদ থেকে ২ কি.মি দক্ষিণ পূর্বে মহেশপুর গ্রামে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত তিন গম্বুজ মসজিদ আছে, যা মহেশপুর মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটির মাত্র দুটি দেয়াল বর্তমান। পশ্চিম দেয়াল ৩০´ লম্বা এবং ১৪´ উঁচু এবং ৩´ পুরু এবং দক্ষিণ দেয়াল ৯´-৫ লম্বা ৮´-৩´ উঁচু এবং ২´-৫´´ পুরু। এই গ্রামে ''মহেশমন্ডপ '' নামে একটি মন্দির আছে এবং সেখানে স্মরণাতীত কাল হতে ''মহেশ'' নামক একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

গুলাবাদিপুকুর মসজিদ:

কাহালু থেকে ৩ কি.মি দক্ষিণ- পশ্চিমে গুলাবাদিপুকুর নামে একটি ছোট পুকুর আছে। পুকুরটির পাড়ে অবস্থিত পুরোনো মসজিদটি ''গুলাবাদিপুকুর মসজিদ'' নামে পরিচিত। মসজিদটির আয়তন ২৭´×১০´-৪´×১৬ । মসজিদটির সম্পূর্ণই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর চারপাশে চাষাবাদ হয়। গ্রাম থেকেও এটি এখন বিচ্ছিন্ন।

ঢাকন্তা রাজবাড়ি:

কাহালু থেকে ৬ কি.মি দক্ষিণ-পশ্চিমে মালঞ্চ ইউনিয়নের ঢাকন্তা গ্রামে ৩৬০´×২০০´ আকৃতির একটি প্রাচীন উঁচু ভূমি আছে যা স্থানীয়ভাবে রাজা হরিষ চন্দ্রের রাজবাড়ি নামে পরিচিত। ছোট ছোট ইটের স্তূপ ছাড়া এখন আর্ এখানে তেমন কোন স্থাপনা পরিদৃষ্ট হয় না। ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেনের মতে ঢাকন্তা গ্রামে সেনবংশীয় ''নিয়োগী'' উপধিধারী বৈদ্যজাতীয় এক ঘর প্রাচীন জমিদারের বাস ছিল।

গোকর্ণ শিবমন্দির:

কাহালু থেকে ১২ কি.মি দক্ষিণ জামগ্রাম ইউনিয়নের শোকর্ণ গ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি শিব মন্দির রয়েছে। এই ছোট মন্দিরটির আয়তন ১৪×১৩×১২। এখানে ১৫´´×১১´ আকৃতির কালো পাথরের একটি্ বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। মন্দিরটির ভেতরে উপরের অংশে কালো পাথরের এক্টি শিব লিঙ্গ রয়েছে।

সালভান রাজার কাছারী ও রাজবাড়ি:

মহাস্থান থেকে ৮ কি.মি দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঘোহালি গ্রামে ১০৭৫×১০৫০ আয়তনের ও ২৯ উচ্চতার একটি বড় ধ্বংসস্তুপ রয়েছে। ধ্বংসস্তূপটি 'সালভান রাজার কাছারী' নামে পরিচিত। স্থাপনাটি উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশটি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দক্ষিণাংশটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং ঢালু। এ অংশে বড় বড় ইট দৃশ্যমান। ঐতিহাসিক প্রভাস চন্দ্র সেনেরে মতে রাজা সালভান এবং তার পুত্র দেব যার উপাধি ছিল 'কারিঘাটা ভার্শা' মিলে এই স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। [৪৪]

আরো ৩ কি.মি দক্ষিণ-পশ্চিমে আরোরা গ্রামে বিশাল 'মাচানদিঘীর' পাড়ের ধ্বংস্তূপটি সালভান রাজবাড়ি নামে খ্যাত। রাজবাড়িটির আকৃতি ৩৬৫×৩৫৬×১৬ কিছু দেয়ালের চিহ্ন ছাড়া বাড়িটির অবশিষ্ট আর কিছু নেই।

বাইগনি মসজিদ:

বগুড়া শহর থেকে ১৩ কি.মি পূর্ব দিকে এবং গাবতলী থানা থেকে ২ মাইল পূর্বদিকে বাইগনি গ্রামের খ্রিস্ট্রিয় ১৮ শতকের শেষার্ধে অথবা ১৯ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত একটি পুরোনো মসজিদ রয়েছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৬ ও উচ্চতা ২০।[৪৫] মসজিদটির উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ৫-৩´´×২-৪´ আকৃতির একটি করে দরজা আছে। পশ্চিম পাশে গোলাকৃতির একটি মেহেরাব আছে। সমস্ত মসজিদটির ইট-সুরকির প্লাস্টার দ্বারা আচ্ছাদিত।

সোন্দারবাড়ি ওহাবী মসজিদ:

বগুড়া সদর থেকে ৪ কি.মি পূর্বে এবং গাবতলী উপজেলা হতে ২ কি.মি পশ্চিমে সোন্দারবাড়ি গ্রামে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত একটি পুরোনো মসজিদ আছে। মসজিদটির ঐতিহাসিক ব্রিটিশ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ওহাবী মসজিদ নামে পরিচিত। বলা হয় মসজিদটি আন্দোলনের সৈন্য রিক্রুট ও ট্রেনিং সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হত। মসজিদটির পাশে কিছু কবরের মত স্থান রয়েছে। এগুলো

আসলে কবর নয় এসব স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহৃত অস্ত্র মজুদ রাখা হত বলে অনুমান করা হয়। [৪৬]

৪৪ Archaeological Survery Report of Bogra, District ১৯৮৬, চ-৯৮
৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৯
৪৬ মো: জহুরুল ইসলাম , প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ, বগুড়া- ২০১১, পৃ: ১১

বিবির দরগা:

গাবতলী উপজেলার জোড়গাছা ইউনিয়নের নওদাবাঘা গ্রামে স্থানীয়ভাবে 'বিবির দরগা' নামে পরিচিত তিনশো বছরের একটি পুরোনো স্থাপনা ও মসজিদ আছে। বর্তমানে তিন ফুট উঁচু ইট নির্মিত প্লাটফর্মের উপর ৪৭ ×২৬ আকৃতির দেওয়াল রয়েছে এর ছাদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। পাশে একটি নতুন মসজিদ আছে। স্থানীয়দের মতে আনারুদ্দিন নামের কোন এক ব্যক্তি তার পরিবারে বিশ্রাম কেন্দ্র হিসাাবে এ স্থাপনাটি নির্মাণ করেছিলেন।

দাসা প্রধান মন্দির:

বগুড়া শহর থেকে ২২ কি.মি পশ্চিমে দুপচাঁচিয়া পুলিশ স্টেশন হতে ১ কি.মি দক্ষিণে খ্রিস্টিয় ১৮ শতকে নির্মিত একটি ছোট দ্বিতল মন্দির পরিদৃষ্ট হয় যা স্থানীয়ভাবে দাসা প্রধান মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটির প্রতি তলায় দুটি করে ছোট ঘর আছে। ঘরগুলোর আকৃতি ৯-২´´ × ৭। এর ছাদ নাতিদীর্ঘ চোঙাকৃতির। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেয়াল ময়ুর,হাতি ও ঘোড়ার প্লাস্টার নির্মিত প্রতিকৃতি রয়েছে।

ধাপেরহাট ধ্বংসস্তূপঃ

বগুড়া থেকে ২০ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে দুপচাঁচিয়া থানা থেকে ৩ কি.মি উত্তরে সুলতানগঞ্জ গ্রামে বগুড়া-সান্তাহার রাস্তার বাম পাশে 'ধাপেরহাট' ধ্বংসস্তূপটি অবস্থিত। এটি সমতল ভূমি থেকে ৮ উচুঁ ৩০০×২৫০ আয়তনের বিশাল ডিম্বাকৃতির একটি ধ্বংস্তূপ। স্থানীয় লোকেরা একে ধাপ বলে এর পাশেই বিশাল ধাপের হাট (বাজার) ধাপটির পূর্ব-পশ্চিম পাশে দেয়ালের ধ্বংসাবেশেষ রয়েছে। এখানকার প্রাপ্ত ইটের আকৃতি ৮´´×৭.৫´´× ১.৫´´। ধাপের পূর্বপাশের ৪০× ৭০ অংশটি বর্তমানে ঈদগাহে রুপান্তরিত হয়েছে। ধাপটির ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কথিত আছে শাহ সুলতান বলখী মহীসওয়ারের একটি আস্তানা এখানে ছিল।তিনি মাঝে মাঝে এখানে আসতেন।

ডিমশহর মসজিদঃ

দুপচাঁচিয়া ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন ডিমশহর গ্রামে অবস্থিত একটি পুরোনো মসজিদ। মসজিদটির আয়তন ৩৪×১৯×৪´। মসজিদটি স্থানীয়ভাবে ''ডিমশহর মসজিদ 'নামে পরিচিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির ছাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত এর দেয়াল গুলো শুধু বর্তমান। ১৮৮০ খ্রিঃ নির্মিত ভবনটির দেয়ালে হাতি,ময়ূর, ঘোড়ার আকৃতির চিত্র রয়েছে তাতে মনে হয় এটি আদৌ মসজিদ ছিলনা। তাছাড়া এই স্থাপনায় কোন মেহরাবও নেই। তাই এটিও একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির হওয়ায় সম্ভাবনাই বেশী। [৪৭]

৪৭ Archaeological Survery Report of Bogra, District 1986, p.168

বেরুঞ্জা মসজিদঃ

দুপচাঁচিয়া থানা থেকে ৮ কি.মি পশ্চিমে চামরুল ইউনিয়নে বেরুঞ্জা গ্রাম একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে, যা স্থানীয়ভাবে ''বেরুঞ্জা মসজিদ'' নামে পরিচিত। মোঘল আমলে নির্মিত প্রাচীন এই মসজিদটির আকৃতি ৫৪×২২ এর দেয়াল ৪-৩ পুরু। ছাদে অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজ আছে। পশ্চিমে দেয়ালে তিনটি ৫-৯×৩-৪ আকৃতির ছোট মেহরাব আছে মসজিদটির স্থাপনের তেমন কোন ইতিহাস জানা যায় না।

গোবিন্দপুর মন্দির :

দুপচাঁচিয়া উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে ১২ বর্গাকৃতির একটি ছোট মন্দির রয়েছে। স্থানীয়ভাবে মন্দিরটি 'শিবমন্দির'' নামে পরিচিত। মন্দিরটি ২.৫ ফুট উঁচু বেদির উপর স্থাপিত। দক্ষিণে একমাত্র দরজা রয়েছে মন্দিরটির উর্ধাংশ চৌঙাকৃতির। ভিতরের দেয়ালে মূর্তি

রাখার দু'টি (১৯.৫´´×১১.৫) খোপ রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গনটি বর্তমানে পুরোটাই জঙ্গলে ঘেরা। ৮´´×১.৫ আকৃতির ইট দৃষ্টে মনে হয় মন্দিরটি ১৯ শতকের কোন এক সময়ে নির্মিত। [৪৮]

নাগেশ্বর কান্তি গ্রামের মসজিদঃ

ধুনট উপজেলা চৌকিবাড়ি ইউনিয়নের নাগেশ্বর কান্তি গ্রামে একটি পুরোনো মসজিদ রয়েছে। ধুনট সদর থেকে ১২ কি.মি দক্ষিণে শেরপুর থেকে ২০ কি.মি দক্ষিণ-পূর্বে এবং চান্দাইকোনা বাজারের ৫ কি.মি উত্তরে এই নাগেশ্বর কান্তি গ্রামটি অবস্থিত। বর্গাকৃতির ছোট মসজিদটির আয়তন মাত্র ১৬ ভিতরে ১১´। উচ্চতা ১৫.৫ এবং দেয়ালের পুরুত্ব২.৫। মসজিদটির পূর্বপাশে ৬×২.৫ একটি মাত্র দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ পাশে ৩.৫×২.৫ দুটি জানালা আছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটির মেহরাবের আয়তন ৩-৬´´×১-৪´। মসজিদটির কোথাও কোন স্থাপন-তারিখ না থাকলেও গঠনপ্রকৃতির বিবেচনায়

সতের বা আঠার শতকে নির্মিত মহাস্থানগড়ের ফররুক শিয়ার মসজিদটির সমসমায়িক মসজিদ বলেই অনুমিত হয়।

রাজবাড়ি মসজিদ:

বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের কল্লাইনগর গ্রামে মোঘল আমলে স্থাপিত একটি অতি পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে 'রাজবাড়ি মসজিদ'' নামে পরিচিত।

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২

১১ প্রশস্ত এবং ১৭ উচ্চতার ধ্বংসস্তূপটিতে মোঘল আমলের ৫×৫×১.৫ আকৃতির পাতলা ইট-সুড়কি নির্মিত ১-৬ পুরুত্বের পুরোনো দেয়াল পরিদৃষ্ট হয। পুরো স্থাপনাটি একটি বড় পাকুড় গাছে আবৃত।

তালতেশ্বরী মন্দির :

নন্দীগ্রাম উপজেলা থেকে প্রায় ৩০ কি.মি দক্ষিণে তালতা-মাজগ্রাম ইউনিয়নের তালতা গ্রামে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঁচটি স্থাপনা রয়েছে। যার মধ্যে তিনটি পুরোনো মন্দির ও দুইটি বসতবাড়ি। ধ্বংসপ্রাপ্ত এলকাটি প্রায় ২২০×১৫০ বিস্তৃত। এর দক্ষিণ-পূর্ব পাশে একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ১৩ প্রশস্ত ও ২০ উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরগুলোর গাত্রদেশ বৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত। মোঘল আমলের ছোট আকৃতির পাতলা ইট দ্বারা নির্মিত ইমারতগুলো আজো প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। এখানে প্রাপ্ত বেশকিছু কালো পাথরের মূর্তি ও শিব লিঙ্গ মহাস্থান যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৯]

সাতমাথা বা সপ্তপদী:

স্টেশন রোড, গোহাইল রোড, শেরপুর, রোড, নবাববাড়ি রোড, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, মোতাহার আলী খাঁন রোড এবং পাওয়ার হাউজ রোড সপ্তয়ের সংগমস্থলকে সাতমাথা বা সপ্তপদী নামে অভিহিত করা হয় এবং এই সাতমাথা বগুড়া শহরের ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থল। বর্তমানে সাতমাথার বিস্তৃত শূন্যভাগে নির্মিত একস্তম্ভে'৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মদানকারী সাত বীরশ্রেষ্ঠের মূর্যাল স্থাপন করে একে 'বীরশ্রেষ্ট চত্বর' বা বীরশ্রেষ্ঠস্তম্ভ' নামের ঐতিহাসিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

নবাববাড়ী :

নবাববাড়ী বগুড়া শহরের অন্যতম মর্যদাশীল একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা যা বর্তমানে 'নওয়াব প্যালেস' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনের দোর্দন্ড প্রতাপপর্বে এটি ছিল কুঠিয়ালদের বাংলো। পরবর্তীকালে কুন্ডুগ্রামের জমিদার নবাব আব্দুস সোবাহান চৌধুরী এই বাংলোটি ক্রয় করেন এবং ১৮৮৪ সালের ২০ শে মার্চ তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর এটিকে নবাববাড়ী বা নবাব প্রাসাদে রূপান্তরিত করেন। যুক্ত-বাংলার অর্থমন্ত্রী এবং যুক্ত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী অনন্য

সাধারণ কীর্তিমান পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বা বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এই বাড়িরই সন্তান এবং এটিও এ বাড়ির আরেকটি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র তথা মোহাম্মদ আলী চৌধুরীল কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবাব সৈয়দ ওমর আলী চৌধুরীর(জ্যাকির) বদান্যতায় জমিদারি ঐতিহ্যের এই নবাববাড়িটি হালে প্যালেস মিউজিয়াম বা 'এ্যামিউজমেন্ট পার্ক' হিসেবে গড়ে উঠেছে।[৫০]

---

৪৯. মোস্তাফা আহাদ তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৫০. পূর্বোক্ত

এডওয়ার্ড পার্ক:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বগুড়ার তদানিন্তন জমিদারদের সহযোগিতায় এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমার রামেন্দ্র কৃষ্ণদেব বাহাদুরের প্রচেষ্টায় শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথার সন্নিকটে গোহাইল রোডের পশ্চিম ধারে এই পার্কটি প্রতিষ্টিত হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে কাজলার তৎকালীন সেন বংশীয় জমিদার আনন্দচন্দ্র সেনের অর্থানুকূল্যে পার্কের কেন্দ্রস্থলে 'আনন্দ সরোবর " নামে একটি চমৎকার পুকুর খনন করা হয়। মনে করা হয এ ঘটনার প্রায় কাছাকাছি কোন এক সময়ে বাঙ্গালি মুসলামানদের মধ্যে সর্ব প্রথম মন্ত্রীত্ব অর্জনকারী এবং সাময়িক সময়ের জন্য বঙ্গ প্রদেশের লাটের দায়িত্ব পালনকারী বগুড়ার জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব কোণায় তদান্তিন ব্রিটিশ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের একটি্ আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপন করেন। সম্ভবত তখন থেকেই এই পার্কের নামকরণ হয় 'এডওয়ার্ড পার্ক'। এর পর পার্কের মধ্যস্থিত কৃত্রিম ঝরনাটি তৈরি করেন আদমদীঘির তৎকালের জমিদার সতীশচন্দ্র নিয়োগী আর ১৯১৩ সালে পার্কের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রীন হাউজ ও কৃত্রিম টিলাটি নির্মাণ করেন সেই সময়কার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নন্দলাল বাগ্চী। বর্তমানে পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় আধুনিক সরঞ্জামাদি সজ্জিত একটি ব্যায়ামাগারও রয়েছে।

উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরী:

বগুড়ার স্বনামধন্য জমিদার নবাব সৈয়দ আব্দুস সোবহান চৌধুরীল উদ্যোগে ১৮৯০ সালে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯০২ সালে বাংলা - আসাম সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মি. উডবার্ণ সাহেবের নামে এর নামকরণ হয় উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যাক দেশি-বিদেশী গ্রন্থাদি সংগৃহীত রয়েছে এবং বর্তমানে এটি সরকারের রাজস্ব খাতভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এডওয়ার্ড পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় একটি সুরম্য ত্রিতল ভবনে এর কার্যক্রম

পরিচালিত হয়। এখানে মনসামঙ্গলের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণের পান্ডুলিপিসহ আরো কয়েকটি প্রাচীন পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

সাতানী বাড়িঃ

এটি বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী একটি জমিদার বাড়ি। বাড়িটি ঐতিহাসিক সাতমাথা থেকে কিয়দ দক্ষিণে বগুড়া জেলার স্কুলের সন্নিকটে শেরপুর রোডে অবস্থিত। খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বানামধন্য রাজীনীতিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব হাবিবুর রহমান চৌধুরী এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হন।

স্বাধীনতা ভাস্কর্যঃ

১৯৭৬-৭৭ সালে বিশিষ্ট ভাস্কর সুলতানুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য স্মরক চিহ্ন এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন এবং বগুড়া শহরের ঐতিহাসিক সাতমাথায় তা স্থাপন করেন। প্রত্যয়, মুক্তি ও শান্তির অন্যন্য প্রতীক এই ভাস্কর্যটি বর্তমানে শহরের দক্ষিণপ্রান্তে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বনানী নামক স্থানে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

ভীমের জাংগালঃ

জাঙ্গাল > জাঙাল. জাংগাল শব্দটির অর্থ = বাঁধ মহাস্থানগড়ের উত্তর পশ্চিমে ভীমের জাংগাল নামে দর্শনীয় একটি মাটির প্রাচীর আছে।মহাস্থানগড়কে বহিঃশত্রুর আক্রমন হতে রক্ষার জন্য জাংগালটি নির্মিত হয় বলে ধারনা করা হয়। এ জাংগালটি বগুড়া শহরের উত্তরপূর্ব কোন থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ কিঃমিঃ উত্তরে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত দামুকদহ বিল হয়ে ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত। লালমাটির তৈরী এ জাংগালটি স্থানে স্থানে সমতল ভূমি হতে প্রায় ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু।

কথিত আছে, ভীম নামক কোন এক ব্যক্তি এই জাংগালটি নির্মাণ করেছিলেন। খুব সম্ভবত একাদশ শতকের কৈর্বত রাজ ভীম ও জাংগালটির নির্মাতা ভীম একই ব্যক্তি ছিলেন। ঐতিহাসিক প্রভাস চন্দ্র সেন অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

তার মতে, *''যতটুকু মনে হয় এ জাংগালটি কৈবর্তবাজ ভীমের বহু আগে সৃষ্ট'*[৫১]

পুন্ড্রবর্ধন /মহাস্থানগড় ঃ

বগুড়া শহর থেকে ১৩ কি.মি উত্তরে শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত রায়নগর ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা সমৃদ্ধ অঞ্চল মহাস্থানগড়। স্থানটি

বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন (৪র্থ খ্রিস্ট পূবার্ব্দের নগরী গঙ্গাররিডি) পুণ্ড্র বা পুণ্ড্র বর্ধন, আদিম 'পোদ' নৃগোষ্ঠীর বসতি, প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির উৎসস্থল, আর্যভাষা ও চর্যাপদের অন্যতম রচনাস্থল, প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার (বিশ্ববিদ্যালয়– মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলিম আমলের রাজা-শাসকগণের প্রশসনিক কেন্দ্র (রাজধানী)ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইতিহাসে অতীব গুরুত্বহ।

মহাস্থান ধ্বংসাবশেষের বিবরণ সর্বপ্রথম বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে লিপিবদ্ধ করেন পরবর্তী কালে ডোনেল, বেভারিজ, ওয়েস্টমাকট ও কানিংহাম প্রমুখ ঐতিহাসিকের বিবরণেও এই প্রাচীন নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৫১. Probas Chandra Sen B.2. Mahasthan and Envirions, Rajshahi 1929, P- 14

তবে মহাস্থানকে পুন্ড্রনগর হিসাবে সনাক্ত করার প্রথম কৃতিত্ব আলেকজান্ডার কানিংহামের। তিনি বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ এর বিবরণের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেন। হিউ এন সাঙ ৬০৯ থেকে৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'পন্ন–ফতন'' বা পুন্ড্রবর্ধণ পরিদর্শন করেন। পন্ডিত পরশুরাম লিখিত খ্রিস্টিয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ''করতোয়া মাহাত্ম্যা'' নামক একটি কাব্যেও মহাস্থান বা পুন্ড্রনগরকে অভিন্ন বলে দেখানো হয়েছে। তবে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আবিস্কৃত সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের (খ্রিঃ পূর্ব: ৩য় শতক) একটি ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে মহাস্থান বা পুন্ড্রনগরের অভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এই শিলালিপিতে তৎকালীন বাংলার দুর্ভিক্ষের চিত্র ও তার জন্য পুন্ড্রনগরের 'মহামাত্য'' কর্তৃক সম্রাটের নির্দেশে গ্রহীতব্য ব্যবস্থাদির উল্লেখ্য আছে। [৫২]

বৈরাগীর ভিটা ঃ

মহাস্থান ধবংসাবশেষের অন্যতম হল বৈরাগীর ভিটা। ডাঃ কহর উল্লাহ রচিত মহাস্থান (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থসুত্রে জানা যায়। বর্তমান বৈরাগীর ভিটাটিই প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত রাজত্বকালে পুন্ড্রবর্ধন রাজ্যের উপরিক মহারাজ বা গর্ভনরের এবং স্বাধীন পাল রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। ৩০০ ফুট দীর্ঘ ও ২৬ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তকার এই ধবংসস্তূপটির চারিদিকে ভূমি থেকে প্রায় ১০ ফুট উচু। স্তূপটি দক্ষিন ও পূর্বদিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গিয়েছে। ১৯২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দের খনন এর ফলে উত্তর দিকের খোলা অঞ্চলে আরও অট্টালিকার ধবংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রথম পাল যুগের মন্দিরটি পূর্ব পশ্চিমে ৯৮ ফুট লম্বা এবং উত্তর দক্ষিনে প্রায় ৪২ ফুট বিস্তৃত। [৫৩] মন্দিরটির ভিত্তির চতুর্দিকে নকশা করা ইট দ্বারা অলংকৃত ছিল। এরুপ অলংকার সাধারণত গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ে (৬ষ্ট-৭ম শতক) প্রচলিত ছিল। দক্ষিন অংশের প্রায় ধবংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত । এ মন্দিরটি পূর্ব পশ্চিমে ১১১ ফুট লম্বা ও উত্তর দক্ষিনে ৫৭ ফুট প্রশস্ত।[৫৪]

বৈরাগীর ভিটার অপরাপর ধবংসাবশেষ এর মধ্যে ভিটাটির উত্তরে কতগুলো কুঠুরি, দক্ষিন- পশ্চিমে চতুস্কোণ মেঝে বিশিষ্ট একটি মন্দির, উত্তর পশ্চিম কোণে ৮ ফুট বর্গাকারে মেঝে চতুস্পার্শে ২́-৩́ চওড়া রাস্তাযুক্ত মন্দির এবং রাস্তা সংলগ্ন ৭́ x২́ পরিমাপের ৫টি কক্ষের একটি সারি লক্ষ্য করা যায়।[৫৫] এ ভিটার উত্তর প্রান্তে ইট নির্মিত ১৭৫ফুট দীর্ঘ ও ৩ ফুট চওড়া একটি প্রাচীরের ধবংসাবশেষ বিদ্যমান। এ বেষ্টনীর মধ্যে ৪́ x৩́-৬́ মাপের কয়েকটি ক্ষুদ্র কুঠুরি আছে।

---

৫২. বিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ)(সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৮
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৮
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৯

এ ছাড়া খননের সময় প্রথম প্রথম পাল যুগের ইমারত এর নিচে কমপক্ষে দুটি অট্টালিকা ও আট থেকে ১০ ইঞ্চি ব্যাসের দশ- বারো ফুট দীর্ঘ ডজন খানেক নকশা খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ আবিস্কৃত হয়। প্রত্নবিভাগ স্তম্ভগুলোকে গুপ্ত রাজত্বকালের বলে সনাক্ত করেছেন। বৈরাগীর ভিটা থেকে ২০০ গজ দক্ষিণ পূর্বে আর একটি ৩০́-৬́ x৩০́ আকৃতির একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ধবংসাবশেষ পাওয়া যায়। মন্দিরের প্রবেশের জন্য পূর্বাপাশে পাথরের বাধানো ৫টি সিড়ি রয়েছে। মন্দির গাত্রে অলংকৃত ইট ও পোড়ামাটির ফলকগুলো পাহাড়পুর প্রাপ্ত অলংকৃত ইট, চিত্র ফলকের অনুরুপ।

গোকুল/বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসরঘর ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় নিকটবর্তী করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মহাস্থান থেকে প্রায় ২ কিঃমিঃ দক্ষিণ -পশ্চিমে ও গোকুল গ্রামের পশ্চিম পাশে লক্ষীন্দরের মেড় নামে ভূমি থেকে প্রায় ৪০ ফুট উচু একটি স্থাপনার ধবংসস্তূপ রয়েছে। ধবংসস্তূপটি স্থানীয়ভাবে বেহুলা লক্ষীন্দরের বাসরঘর নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কাব্যধারা মনসামঙ্গলের (পদ্মাপুরান) প্রখ্যাত কবি জীবন মৈত্রের নিবাসস্থল বগুড়া হওয়ায় এবং এতদঅঞ্চলে মনসা মঙ্গলের কাহিনীর জনপ্রিয়তা *বাঙলা* লোকগাথায় নায়ক নায়িকা বেহুলা লক্ষীন্দরের নামানুসারে ধবংসস্তূপটি এরুপ নাম করণ করা হয়েছে।

১৯৩৪-৩৬ সালে খননের ফলে এ ঢিবিতে নানা মাপের ১৭২টি মাটি ভরাট কুঠুরি আবস্কিৃত হয়। কুঠুরিগুলো বিভিন্নতলে একই সারিতে নির্মিত। সুউচ্চ এই ধবংসাবশেষটির ক্রশাকার ও বহুতল বিশিষ্ট ভিত্তি দেখে মনে হয় এটি বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল। এখানে খননের ফলে যেসব ফলকচিত্র ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায় সেগুলেকি গুপ্তযুগের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের) বলে মনে করা হয়। [৫৫]

সেন আমলের (একাদশ- দ্বাদশ শতকে) এখানে একটি ২৬ -১৫´´ বর্গাকৃতির একটি মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। পশ্চিম পাশে এর প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশ পথের সামনে সিড়ি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরটির অভ্যন্তরে একটি ছোট কুঠরি আবিস্কৃত হয়। এ মন্দিরটিকে শিবমন্দির বলে মনে করা হয়। এর কাছাকাছি নিতাই ধোপানীর পাঠ নামের আর একটি ধবংসস্তূপ রয়েছে।[৫৬]

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১১
৫৬. ড.নাজিমুদ্দিন আহমেদ, মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকা- ১৯৬৬, পৃঃ ৪২

মুনীর ঘোন ঃ

মহাস্তানগড় দুর্গটির মহাপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দূর্গ প্রাচীরের পূর্ব অংশ সাধারণভাবে উত্তর - দক্ষিনে প্রসারিত কিন্তু প্রায় উত্তর প্রান্তে পৌছে এটি পশ্চিমমুখী হয়ে ১০০ ফুট অগ্র হওয়ার পর পুনরায় উত্তর মুখী হয়েছে। এই স্থানটির স্থানীয় নাম মুনীর ঘোন। সম্রাট রামপালের সময়ে এখানে হয়তো কোন মুনী যপতপ করতেন সেজন্য স্থানটির মুনীর ঘোন নামে আখ্যায়িত হয়েছে। মহাস্থানগড়ের দূর্গ প্রাচীর ও এর বুরুজগুলোর আকার জানতে পূর্ব দিকের রক্ষা প্রাচীরের প্রবেশদ্বার উচু ঢিবিতে (মুনীর ঘোন) খনন কার্য পরিচালিত হয়। প্রাচীরের ২ প্রান্ত ইটের গাথুনি এবং মাঝের অংশ কাদার সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দিয়ে ভরাট করা। খননজনিত প্রাপ্ত এ স্থানের প্রাচীন দ্রব্যাদি ও স্থাপন কৌশল দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ দূর্গ প্রাচীরটিকে পাল আমলের থেকে নির্মান বলে মনে করেছেন। এখানে একটি বুরুজ রয়েছে। প্রহরীদের রক্ষামঞ্চ (Watch Tower) রুপে বুরুজটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।[৫৭]

মাজার ও মসজিদ এলাকা ঃ

মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ পূর্ব কোণে সুলতান বলখী মাহী সরওয়ারের মাজার, কতগুলো সমাধি এবং ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। গড়ের এ অংশটি বগুড়া- রংপুর,বিশ্বরোড সংলগ্ন এবং ভূমি থেকে প্রায় ২৫ ফুট উচু । টিলার মত উচু স্থানটিতে উঠার জন্য রীতিমত সিড়ি আছে। এর পশ্চিমে অল্প উচু দেওয়াল ঘেরা একটি সমাধি আছে। কিংবদন্তি অনুসারে এ সমাধিটি রাজা পরশুরামের ঝাড়ুদার হরপালের (মুসলমা নাম হাফিজুর রহমান) । এর কিছু দুরে সারিবদ্ধভাবে আরো কয়েকটি সমাধি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল দরবেশ শহীদুল ইসলামের ও অন্যটি শেলবর্ষ পরগনার (বগুড়ার পুরানো একটি পরগনা) জমিদার হামদে আলী চৌধুরীর। অপর কয়েকটি সমাধিমসজিদের খাদেমদের বলে জানা যায়।[৫৮]

সমাধি সংলগ্ন ২৩ -৩´´ বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে আয়তাকার খোপের মাঝে বহুখাঁজ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত একটি দরজা (৩-২´´ X ৫ ৮.৫´´) আছে। দরজাটির দুপাশে একই খাঁজবিশিষ্ট আরেকটি দরজা আছে। ভেতরদিকে দেওয়ালে খাঁজকাটা খিলানযুক্ত তিনটি মেহরাব আছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মেহরাবটি আকারে বড়। খিলানের উপরিভাগে প্লাষ্টার লতাপাতা ও পুষ্প প্রতিকৃতি দিয়ে অলংকৃত। সাধারণ প্লাষ্টার করা গম্বুজটি মৌচাকের খোপের মত খিলানের উপর স্থাপিত। এর শীর্ষদেশে চাকচিক্যময় উজ্জল পোড়ামাটির পাত্রখন্ড দ্বারা শোভিত।

---

৫৭ বিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ)(সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০।
৫৮ মোস্তফা আহাদ তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পাড়ুলিপি।

মসজিদটির প্রবেশ দ্বারে ফারসি অক্ষরে খোদিত প্রস্তরফলক থেকে জানা যায় মসজিদটি ১১৩০ হিজরীতে ১৭১৯ খ্রিঃসম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বের ৭ম বর্ষে খোদাদিল নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটির ঠিক উত্তর পুর্ব দিকেই প্রাচীর ঘেরা উন্মুক্তস্থানে তাপস শাহসুলতান বলখী সওয়ার (রহঃ) এর মাজার অবস্থিত। মাজারের প্রবেশ পথে পাথরের চৌকাঠে খ্রিষ্ট্রিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন বাংলা লিপিতে শ্রী নরসিংহ দাস্য নামটি উৎকীর্ণ আছে। এই নরসিংহ দাসের সঠিক পরিচয় কিংবা এই নামে এখানে খোদিত করার কারণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

মাজার প্রাঙ্গনের নিকট একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ আছে। কথিত আছে যে, রাজা পরশুরামের অনুমতি পাওয়ার পরই এখানেই তাপস মাহী সওয়ার প্রথম নামায আদায় করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমান নেই।

মাজারের প্রায় ৫০ ফুট পশ্চিমে ১২-৭´ লম্বা ৪ ৫´´ চওড়া ও ৪ ফুট উচু একটি তোরণ দেখা যায়। তোরনটির চৌকাঠে ইটের গাথুনির মধ্যে চারকোণা কালো পাথর বসানো আছে। চৌকাঠের গাথুনির উপরে ও দুই পাশে ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত। তোরনটি স্থানীয়ভাবে সালামী দরজা নামে পরিচিত। এর নির্মানকাল খ্রিষ্ট্রিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার বলে মনে হয়না।

১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার কানিংহাম গড় পরিদর্শনের সময় এ অঙ্গনে একটি ভগ্ন জৈনমূর্তি দেখতে পান। মূতিটিকে তিনি ২৪ তীর্থঙ্করের মধ্যে অন্যতম বলে শনাক্ত করেন। এতে অনুমিত হয় মহাস্থান এর কাছাকাছি কোথায় হয়ত কোন জৈনধর্মের ও প্রতিষ্ঠান ছিল। উল্লেখ্য যে, হিউন সাং তার বিবরণীতে এ নগরীতে জৈন প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন।

খোদার পাথর ভিটা ঃ হযরত শাহ সুলতানের (রহঃ) মাজার থেকে প্রায় ২০০ গজ উত্তর পশ্চিমে যে টিবিটি অবস্থিত তা স্থানীয় ভাবে খোদার পাথরভিটা নামে পরিচিত। এ টিবিতে প্রাপ্ত একটি বড়

পাথরের নামনুসারে ভিটাটির নামকরণ হয়েছে খোদার পাথর ভিটা। এটি একটি গ্রানাইড পাথর। পাথর খন্ডটির আয়তন ৯-৪×২-৪×২-৫ । পাথরটিতে ফুলের নকশা দেখা যায়। কানিংহামের মতে পাথরটি একটি হিন্দু মন্দিরের দেয়ালে সংস্থাপিত ছিল। পাথরটির চারদিকে ৫ ফুট গভীর মাটি সরানোর পর ২৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থ মন্দিরটির পাথর বাঁধানো মূল মেঝে উন্মোচিত হয়। খননের ফলে এ স্থানে অনেকগুলো খোদাইকৃত পাথরের টুকরো ও একই সারিতে উপবিষ্ট তিনটি উৎকীর্ণ বৃদ্ধমূর্তি দেখা যায়। মধ্যস্থানের মূর্তিটি ধ্যানামুদ্রায় ও দু'পাশের মূর্তি দুটি ভূস্পর্শ মুদ্রায় চিত্রিত ছিল। প্রত্যেকটি মূর্তিই খিলান করা কুলগির মধ্যে সংস্থাপ্তিত ছিল। পাথরটির বাম প্রান্তে করজোড়ে উপবিষ্ট একটি উপাসক মূর্তি খোদিত আছে। মূর্তি সম্বলিত এ পাথরটি বর্তমানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

মানকালীর কুন্ডঃ

খোদার পাথর ভিটা থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে একটি প্রাচীণ ধ্বংসস্তূপ (Mound) আছে। স্তূপটির পশ্চিমদিকে একটি প্রাচীন শুষ্ক পুকুর আছে। এ স্থানটি স্থানীয়ভাবে যথাক্রমে মানকালীর ভি্টা ও কুণ্ড নামে পরিচিত।[৫৯] এখানেও একটি অসমাপ্ত জৈন মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি বর্তমানে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

এ স্থান হতে আলেকজান্ডার কানিংহাম অনেকগুলো অলংকৃত ইট সংগ্রহ করেন। এসব ইটের উপরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে মানুষের মূর্তি, চাকা, মেষ , ষাঁড়, বাঘ, ঘোড়া, তোতা, উপবিষ্ট সিংহ এবং প্রষ্ফুটিত পদ্ম খোদাই করা আছে। এছাড়াও তিনি এখান থেকে একটি ব্রোঞ্জের গণেশ ও গরুর মূর্তি এবং নীলাভ পাথরের একটি বেদী আবিষ্কার করেন। ভগ্নবেদীটির একপ্রান্তে নাগরী লিপিতে 'নগরাহার' কথাটি উৎকীর্ণ ছিল । কানিংহামের মতে এই মানকালী কুণ্ডটি খুব সম্ভব প্রাচীন 'অগ্রহার' অর্থ্যাৎ ব্রাক্ষ্মণদের অধিকারভূক্ত ভূমির অংশ বিশেষ ছিল। ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে খননের ফলে এখানে শুঙ যুগের কয়েকটি ফলকচিত্র (খ্রিঃ পৃঃ ২য় শতক) ও প্রাক সুলতানী যুগের একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হয়। আয়তাকার এ মসজিদটির আয়তন ৮৬-৬´´×৫২ এবং এর দেয়ালের পুরুত্ব ৪-১´´ থেকে ৫ । দু'সারি ইটের স্তম্ভ দেয়ালকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ও আড়াআড়িভাবে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে পাঁচটি মেহরাব আছে তন্মাধ্যে মাঝেরটি সর্ববৃহৎ এবং অলংকরণ সমৃদ্ধ। পাঁচটি মেহরাব বরাবর পাঁচটি দরজা রয়েছে। মসজিদটির কেন্দ্রীয় মেহরাবের উত্তরে ৫-১০´×৫-৩´ মাপের একটি বিদ্যান। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মেহরাবের ৫-৪´ দূরৈ মেম্বারের পাশে একটি ক্ষদ্র প্রাচীর বেষ্টনী দিয়ে জায়গাটিকে পৃথক করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে মেঝে থেকে ৬-৯´´ উঁচু তিনটি মঞ্চ রয়েছে। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ঠ্য দুটি মসজিদটির অভিনব ও জটিল গঠন বৈচিত্রের পরিচয় বহন করে। মসজিদের

ভগ্নস্তুপের মধ্যে ফুল, লতাপাতা, পাপড়ির প্রতিকৃতি সম্বলিত অনেকগুলো অলংকৃত ইট আবিস্কৃত হয়েছে।

৫৯. অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

পরশুরামের প্রাসাদ :

মানকালী কুণ্ডের প্রায় ২০০ গজ উত্তরে আর একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আছে। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ২০০ ফুট লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০০ ফুট চওড়া। কথিত আছে এটি মহাস্থানের সর্বশেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন দ্বিতীয় পরশুরাম পাল সম্রাট রামপাল। এই বৌদ্ধ রাজা রামপালের (১০৭৮ খ্রিঃ ১১২২ খ্রিঃ সময় শাহ সুলতান বলখী (রহঃ) আগমন করেন। সেনাপতির নাম ছিল পরশুরাম।

রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আংশিক খননে এখানে পরস্পর সংযুক্ত দুটি কক্ষের নির্দেশন পাওয়া যায়। কক্ষগুলোর আয়তন যথাক্রমে ১৭-২´´×১১-১´´ এবং ৯-৬´´×১১-২´´।[৬০] ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননের ফলে এখানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক (সপ্তদশ-অস্টাদশ শতক) একটি পাকা বসতবাড়ির সম্পূর্ণ নকশা আবিস্কৃত হয়। বাড়িটি প্রাচীর ও তোরণ বেষ্টিত ছিল তোরণটি উভয় পাশে ১৬×৮´ ও ১৬×১০´´×৮´´ মাপের দুটি রক্ষীঘর ছিল। প্রাচীরের উত্তরে দু'টি কক্ষ ছিল। কক্ষদুটির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সিড়িযুক্ত দুটি জীর্ণ বারান্দা ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণেও দুটি কামরা ছিল।

যার আয়তন যথাক্রমে ১৯-৬´´×৯ এবং ২১-৩´ ×১১-´৬ । এ চারটি কামরা ছাড়াও প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৮-৯´´ × ৭-৪´´ মাপের একটি ছোট কামরা দেখা যায়। এ কামরাটির দক্ষিণ দিকে ২-৮´´ চওড়া একটি দরজা রয়েছে।

এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনে মধ্যে বহু সংখ্যক কড়ি, প্রস্তর নির্মত বিষ্ণু পট্রের ভগ্নাংশ, নীল সবুজ, বেগুনী ও হলুদ রঙ্গের চাকচিক্যময় মৃৎপাত্রদির টুকরা, কিছু সংখ্যক ধাতবদ্রব্য এবং ১৮৩৫ ও ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ছাপ অঙ্কিত ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির দু'টি মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীয়ৎকুণ্ড বা জীবনকূপ:

পরশুরামের প্রাসাদ কথিত ধ্বংসাবশেষের ঠিক পূর্বদিকে মহাস্থানগড়ের মিথ-খ্যাত জীয়ৎকুণ্ড বা জীবনকূপ অবস্থিত। কিংবদন্তী অনুযায়ী শাহ সুলতান বলখী মাহী সওয়ারের (রহঃ) সঙ্গে যুদ্ধের সময় রজাা

পরশুরাম এ কূপের পানিতে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের পুনর্জীবন দান করেন। ফলে কিছুতেই পরশুরামকে পরাজিত করা যাচ্ছিল না। তাপস শাহ সুলতান (রহঃ) কূপটির পানির সাহায্যে জীবন ফেরতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে একটি চিলের সাহায্যে এক টুকরা গোমাংস এর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এতে কূপটির অলৌকিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং পরশুরাম যুদ্ধে শাহ সুলতান (রহঃ) এর নিকট পরাজিত হন।

---

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

ধাপে ধাপে নিচের দিকে ক্রমশ সংকুচিত হওয়া এ কূপটির ভিতরের উপরিভাগে পরিধি যথাক্রমে ১২-৮´´ এবং ১৫-৮´´। কূপের পূর্বধারে একটি চারকোণা ৬-১০´´×১-৮´´× ১-৬´´ মাপের গ্রানাইট পাথর পাওয়া গিয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এ কূপটি আধুনিক কালের অর্থ্যাৎ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীল তৈরি। বর্তমানে ইট-পাথর ও অন্যান্য আবর্জনায় কূপটি প্রায় ভরাট হয়ে গিয়েছে।[৬১]

শীলাদেবীর ঘাট:

মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ২০০ গজ পূর্বদিকে করতোয়ার তীরে শীলাদেবীর ঘাট নামে একটি ঐতিহাসিক স্থান আছে। কিংবদন্তী অনুসারে, শীলাদেবী নামের রাজা পরশুরামের এক পরমাসুন্দরী কন্যা (কারও মতে বোন) ছিল। যখন মুসলমানগণ শাহ সুলতানা বলখী মাহী সওয়ারের নেতৃত্বে মহাস্থানের সর্বশেষ হিন্দু রাজা পরশুরামকে পরাজিত ও নিহত করে গড় অধিকার করেন তখন শীলাদেবী অন্যান্যদের সঙ্গে মুসলমানদের হস্তগত হন। তখন শীলাদেবী আপন মর্যাদা রক্ষার্থে করতোয়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করেন। যেস্থানে শীলাদেবী নদীতে ঝাঁপ দেন, সেস্থানটি শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। স্থানীয় হিন্দুদের নিকট এটি একটি পবিত্র স্থান। এখাানে তারা ‘পৌষ-নারয়নীরস্নান ও মেলার আয়োজন করে।

মি. ডোনেলের অনুসরণে কানিংহাম গোবিন্দ ভিটা সংলগ্ন পাথরঘাটে শীলাদেবীর ঘাট বলে সনাক্ত করেন। অবশ্য মি. বেভারিজ এবং মি. বটব্যাল মনে করে, একটি্ নামের উচ্চারণ সমস্যা থেকেই এরূপ প্রবাদের জন্ম হয়েছৈ। তাঁদের মতে খুব সম্ভব স্থানটির আসল নাম শীলা দ্বীপ। পণ্ডিত পরশুরাম লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সংস্কৃত কাব্য ‘করতোয়া মাহাত্ম্য’ গ্রন্থের কোন কোন শ্লোকে ‘পুণ্ড্রে কোটি শিলা দ্বীপে’’ বাক্যাংশের উল্লেখ এ মতের পরিপোষক। মি. ও ডোনেলের মতে মহাস্থানের এক মাইলের মধ্যে স্থাপিত‘১শত সহস্র’ শিব লিঙ্গের অবস্থিতির কারণে ‘শীলাদ্বীপ’নামের উৎপত্তি বাচষ্পতি মিশ্রের ‘কৃতা চিন্তামনি’ তেও স্থানটির নাম ‘শীলাদ্বীপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২]

গোবিন্দ ভিটা:

মহাস্থান দূর্গের বাহিরে এবং দূর্গের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত শিবগঞ্জ উপজেলার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থাপনা হল গোবিন্দ ভিটা। ১৯২৮-২৯ খ্রিঃ খননের ফলে আবিস্কৃত ধবংসাবশেষের মধ্যে গোবিন্দ ভিটা উল্লেখ যোগ্য। করতোয়া নদীর বেষ্টনীতে অবস্থিত এ ভগ্নাবশেষটি মহাস্থান দূর্গ প্রাচীরের বর্হিদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত। এর মধ্যস্থলে ৫ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট লম্বা একটি বারান্দার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এরপরই রয়েছে বেষ্টনী প্রাচীর।

৬১. মোস্তফা আহাদ তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া এর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।
৬২. পূর্বোক্ত

প্রথম পাল যুগে(খ্রিঃ অষ্টম- নবম শতকে) এখানে দ্বিতীয় পর্যায় নির্মিান কাজ শুরু করা হয়। এ পর্যায়ে দালানের ভিত্তিমূলকে কয়েকফুট উচু করে মধ্যস্থলে বহুতল বিশিষ্ট একটি সু উচ্চ ইমারত নির্মান করা হয়েছিল। ইমারতের কেন্দ্রস্থলে ইটের একটি বেদীর তিনপাশে পাঁচটি কুঠুরি নির্মিত হয়েছিল।

১৯২৮-২৯ খ্রিঃ খননের ফলে এখানে দুটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল আবিস্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে পূর্ব মন্দির ও পশ্চিম মন্দির হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে ১৯৬০ সালে খননের ফলে এখানে বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতান শামছুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৫৭খ্রিঃ) থেকে শামছুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৮০ খ্রিঃ) পর্যন্ত সময়ের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রাগুলো শহর- ই- নৌ টাকশাল থেকে মুদ্রিত। খুব সম্ভবত গোবিন্দ ভিটাই সেই শহর- ই- নৌ টাকশাল। এখানে প্রাপ্ত সুন্দর বোতাম, কানের দুল, নাকফুল, চকচকে রেখা যুক্ত মুল্যবান পাথর, এগেট (Aget) কর্নেলিয়ান, ল্যাপিজ, মার্বেল , স্কটিক, কাঁচ, ক্যালসেডনি, অনিকস মনি, ফাইয়েন্স প্রভৃতিই প্রমান করে যে, এটি (গোবিন্দভিটা) মূলত উপ-সামুদ্রিক নৌ বন্দর এবং বিদেশজাত সৌখিন দ্রব্যাদির বাজার ছিল।

বিহার, ভাসু বিহার বা বিশ্ব বিহার বা নরপতির ধাপ ঃ

'বিহার শব্দের অর্থ বৌদ্ধ দেবালয়, সুগতালয়, মঠ, মন্দির। [৬৩] শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ও ভাসুবিহার গ্রামটি একইসঙ্গে ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা হিসেবে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থান গড়ের ৬ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে বিহার এবং বিহার বৌদ্ধস্তূপ হতে ২ কি.মি উত্তরে ভাসুবিহার বা বিশ্ব বিহার অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে গ্রামটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বৌদ্ধবিহার বা বিশ্ববিহার নামে অভিহিত ছিল। পরবর্তীকালে নামটি ভাসু- বিহারে পরিণত হয়েছে।

স্যার এ, কানিংহাম বিহার ও ভাসু বিহারের বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপকে চীনা পরিব্রবাজক হিউ, এন. সাঙ বর্ণিত পো-শি- পো (মহাযনী[৬৪] বৌদ্ধ ধর্মে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে 'পো–শি-পো এর স্থানীয় প্রতিশব্দ হয়েছিল বিশ্ববিহার, তথা বিশ্ববিদ্যালয়) বিহারে ধ্বংসাবশেষবলে সনাক্ত করেছেন। বিহার গ্রামের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নাগর নদীর পশ্চিম তীরে বিশাল আয়তনের একটি প্রাচীন ঢিবি দেখা যায়। এই ঢিবিটিই ভাসুবিহার বা স্থানীয়ভাবে 'নরপতির ধাপ 'নামে পরিচিত। বলা হয় যে, এগার শতকে শৈবধর্মের

উত্থানের ফলে বৌদ্ধদের প্রতি তাদের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও শত্রুতায় বৌদ্ধরা ধর্মহীন সমাজে পরিণত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিহারের চারতলা প্রসাদটি পরিত্যক্ত হয়।

৬৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাথ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য একাডেমী কলাকাতা, ২০০৮, পৃ ১৫৯১

৬৪. মহাযান= বৌদ্ধ ধর্মের দু'টি মত বা দর্শন সহজযান বা হীনযান ও মহাযান। খ্রি: পৃ: ১৮৫ অব্দে মেসোপিটেমিয়ার আর্যযবন ব্রাক্ষ্মণ পুষ্যমিত্র সুঙ্গ কর্তৃক রাজপ্রভুর সিংহাসন দখল এবং ব্রাক্ষণ রাজত্ব কায়েমের সাথে সাথে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে যুপকাষ্টে বেঁধে বলিদান, বৌদ্ধ উপসানলয় সমূহ ধ্বংস এবং বৌদ্ধ জনগণের বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের পর ব্রাক্ষ্মণের দেবী অস্বীকারকারী বৌদ্ধধর্ম আর্যযবন ব্রাক্ষ্মণ পুষ্যমিত্র সুঙ্গকে নিষিদ্ধ করেন। ফলে হিন্দু দেবদেবীর স্বীকৃতি প্রদানে মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম যে দর্শন বা মত গ্রহণ করে তারই নাম মহাযান বৌদ্ধধর্ম। আর সাবেক বৌদ্ধধর্ম আখ্যায়িত হয় হীনযানা বা সহজযান নামে। এ সম্পর্কিত আর একটি তথ্য হল: নাগর্জুন নামক বৌদ্ধশ্রমণ কর্তৃক প্রবর্তিত বৌদ্ধদর্শন ও তার সমর্থিত সম্প্রদায়কে মহাযানী বলা হয়। সূত্র: সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ: ৬৯১

দুর্বল সর্বশেষ পালরাজাদের কেউ কেউ হয়তো রাজত্ব ছেড়ে শেষ জীবনে এখানে সেবক হিসাবে বসবাস করতে থাকেন যেজন্য এটির নাম হয়েছিল 'নরপতির ধাপ'। কানিংহামের মতে এটি রাজা অশোক নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর সামান্য দক্ষিণে ঝিঝরাইলেল দীঘি নামে একটি প্রাচীন জলাশয় সৃষ্ট হয়। জলাশয়টির উত্তর- পশ্চিমে 'সন্ন্যাসীর বাড়ি' নামক একটি কারুকার্যময় মন্দিরে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

কানিংহাম এটিকে হিউএন সাঙ বর্ণিত' অবলোকিতেশ্বর মন্দিরের'' ধ্বংসাবশেষ বলেছেন। এরও দক্ষিণে শশাং দিঘী বা 'শশাঙ্কদিঘী' অবস্থিত। কথিত আছে, রাজা শশাঙ্ক (৬০৩-৬৩৭ খ্রি:) এ দিঘীটি খনন করেন।

ভাসুবিহার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি বিরাট সংঘারাম ছিল বলেও জানা যায়। সেকালের চীনা তীর্থ যাত্রীদের মতে এখানে মাহযান মতাবলম্বী কমপক্ষে ৭০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন এবং পূর্বাঞ্চল হতে আগত বহু পন্ডিত ও জ্ঞানীব্যক্তিরা এখানে আগমন করতেন। মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বল্লাল সেনের শুরু মহোপ্যাধ্যায় শ্রীমৎ অনিরুদ্ধ ভট্র এই বিহার গ্রামবাসী ছিলেন।

ভাসুবিহার গ্রামের নরপতির ঢিবির আয়তন ৮০০´×৭০০´ । ১৯৭৩.-৭৪ খ্রি: প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননে এখানে দু'টি মধ্যম আকৃতির বৌদ্ধবিহার ও একটি ক্রশাকৃতির মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে বড় বৌদ্ধ বিহারটির আয়তন ১৮৮´×-৬´×১৬২´-৬´´। অপেক্ষাকৃত ছোট বিহারটির আয়তন ১৬২´×১৫২´। এখানে ২৬ টি ক্ষুদ্র কক্ষ চিল। চার বাহুতে বিভক্ত এসব কক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন বলে মনে করা হয়। বিহার সংলগ্ন মন্দিরটি আয়তন ১২৫´×৮৭´। এ মন্দিরের প্রবেশদ্বার উত্তর দিকে। মন্দিরের অভ্যন্তরে মধ্যযুগের মণ্ডপ বা পূজাকক্ষটি বর্গাকৃতির এর প্রত্যেকদিকই ১৫ ফুট। মন্দিরের দেয়ালে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। এ স্থাপনাসমূহ আনুমানিক খ্রিস্ট্রিয় দশম থেকে একাদশ শতকে নির্মিত বলে মনে করা হয়।

সাম্প্রতিক খননের ফলে ভাসুবিহারে প্রায় ৮০০ টিরও অধিক প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গেছে। এসব প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে ৮৬ টি ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্য, ৩৪টি পোড়ামাটির ফলকচিত্র এবং মৃত্তিকা নির্মিত বহুসংখ্যক সীল। ৮৬ টি ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্রের মধ্যে ৪০টি হচ্ছে বৌদ্ধদের ধ্যানী মূর্তি। এসব মূর্তিগুলোর মধ্যে 'ধ্যানী বুদ্ধ' 'বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর' , 'তারা' এবং মঞ্জুশ্রী' এই চার প্রকারের মূর্তিই পরিদৃষ্ট হয়।

পরশুরামের সভাবাটি ঃ

শাহ সুলতান বলকী মাহী সওয়ারের (রহঃ) মাজার ও খোদার পাথর ভিটার মধ্যদিয়ে বিস্তৃত রাস্তাটি গড়ের পশ্চিমের রক্ষাপ্রাচীর থেকে মথুরা গ্রাম তথা ভাসু বিহার পর্যন্ত প্রসারিত। এ রাস্তার পাশে পরশুরামের সভাবাটি নামে একটি ধবংসস্তূপ আছে এখানেই মহাস্থানের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা হিসেবে খ্যাত পরশুরামের রাজসভাগৃহ ছিল বলে অনেকেই অনুমান করছেন।

স্কন্দের ধাপ:

মহাস্থানের ৩ কি.মি দক্ষিণে পাকা সড়কের পূর্বপাশে বাঘোপাড়া গ্রামের উত্তর সীমায় স্কন্দের ধাপ নামে আর একটি ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন , এ ধ্বংসস্তূপটি পণ্ডিত পরশুরাম রচিত 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নাম গ্রন্থে বর্ণিত স্কন্দ মন্দির ও কলহন মিশ্র রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বর্ণিত পুণ্ড্রনগরে 'কার্ত্তিকের মন্দিরে' র ধ্বংসাবশেষ। কাশ্মীর রাজকুমার জয়পীড় কার্ত্তিকের মন্দিরে নিয়োজিত দেবদাসী কমলাকে বিয়ে করেছিলেন। এ মন্দিরে স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এটা ছিল অবাঙ্গালীদের মন্দির। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে খননের পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ ধ্বংসস্তূপটিকে সম্ভাব্য স্কান্দ মন্দির অনুমান করেছেন।

খেরুয়া মসজিদ।

শেলপুর উজেলার ঐতিহাসিক প্রাচীন (মোঘল আমলের) স্থাপনাসমূহের মধ্যে 'খেরুয়া মসজিদ'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শেরপুর শহর থেকে প্রায় ৩ কি.মি পশ্চিমে খেরুয়া গ্রাম শেরপুরের প্রাচীনতম মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের পূর্বপাশের মূল দরজার উপর খোদিত কালো পাথরের ফারসি শিলালিপি থেকে জানা যায় , জনৈক জওহর আলী খান কাকশালের পূত্র মির্জা মুরাদ খানে পৃষ্ঠপোষকতায় ৯৮৯ হিজরির ২৫ শে জিলহজ্ব(২০ শে জানুয়ারি, ১৫৮২ খ্রি:) সোমবার মসজিদটির নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করা হয় এবং ঐ মাসের ২৬ তারিখ মঙ্গলবার মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। জনৈক ফকির আব্দুস সামাদ মসজিদটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তৎকালীন শেরপুর মোর্চার জায়গীরদার মির্জা মুরাদ খান তাঁকে আর্থিক পৃষ্ঠাপোষকতা দান করেন।

এ সমজিদের দৈর্ঘ্য ৫৭ এবং প্রস্থ ২৪-৬। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দরজা আছে। দরজাগুলো আয়াতাকার। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালেও সরু দুটি প্রবেশপথ আছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে অভ্যন্তরভাগে কেন্দ্রীয় মেহরাবসহ তিনটি অর্ধগোলাকার মেহরাব আছে। অভ্যন্তরভাগের

কক্ষটি তিনটি বর্গ অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির উপর একটি করে গোলাকার গম্বুজ আছে। মসজিদের চার কোণায় চারটি মজবুত স্তম্ভ আছে এবং মসজিদের ভিতর ও বাইরের দেয়ালের গায়ে পত্র-পুষ্পের মনোহর নকশা রয়েছে। এগুলো পান্ডুয়ার `Eklakhi Tomb'' [৬৫] এর সঙ্গে তুলনীয়। মসজিদটিতে এখনও নামাজ পড়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

৬৫.Archaeolofgical Survey Reoprt of Bogra District, First published-1976, Published by the Directiorate of Archaeology and Musuem, 22/1, Block, Babar Road, Mohammadpur, Dhaka-1207,P-196

১৬ বিবির মসজিদ:

বিবির মসজিদ বা বিবির মসজিদ শেরপুরের আর একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। মোঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১০৩৮ হিজরি (১৬২৮ খ্রি:) এই ছোট মসজিদটি জনৈক সায়ীদ আলী মুতাওয়াল্লী কর্তৃক নির্মিত হয় বলে মসজিদের প্রধান ফটকের উপরে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায়। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির মসজিদ। প্রত্যেকদিকেই দৈর্ঘ্য ছিল ২২´। মসজিদটির চারকোণে চারটি অষ্টকোণী বুরুজ ছিল। প্রবেশের জন্য উত্তর , দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে তিনটি দরজা ছিল। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি ছোট আকারের মেহরাব ছিল। বর্তমানে মসজিদটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদ নেই। শুধু চারদিকের জরাজীর্ণ দেয়াল দৃষ্ট হয়। এই দেয়ালের উচ্চতা ৫´-১০´।

খন্দকার টোলা মসজিদ:

শেরপুরের আর একটি প্রাচীন স্থাপনা হচ্ছে খন্দকার টোলা মসজিদ। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। শেরপুর শহরের অদূরে খন্দকার টোলা নামক স্থানে অবস্থিত বলে মসজিদটি খন্দকার টোলা মসজিদ নামে পরিচিতি। মসজিদ থেকে উদ্ধারকৃত একটি লিপি থেকে জানা যায় মোঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নিয়োজিত সুবেদার মোয়াজ্জেম খানের সময়ে (১৬৩২ খ্রি:) এ মসজিদটি নির্মিত হয়। আয়তনের দিক দিয়ে মসজিদটি খেরুয়া ও বিবি মসজিদের চেয়ে বড়। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৭৮´ এবং প্রস্থ ৩০´ । এ মসজিদেও চার কোণায় চারটি অষ্টকোণী বুরুজ ছিল। পূর্বদিকে খিলনাযুক্ত তিনটি প্রবেশ দ্বার ছিল। পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় মেহরাবের উভয় পাশে চারকোণা ছোট মিনার (Tuires) আছে। মসজিদটির ছাদ নেই। এখন এটি একটি ধ্বংস্তূপমাত্র। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এখানে একটি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। [৬৬]

১৮ ভবানীপুর মন্দির:

ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা দু'এর জন্যই ভবানীপুর বিখ্যাত। বর্তমানে ভবানীপুর শেরপুর উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে একটি ইউনিয়ন। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান (মহাপীঠক্ষেত্র) এই ভবানীপুর। স্থানটি দেবী ভবানীর ধাম বা থান হিসাবে পরিগণিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের পীঠের মধ্যে কামখ্যার পরই ভবানীপুর স্থান। কারণ কথিত আছে প্রেমাবতার যোগীন্দ্র এখানে নিজে উপবেশন করে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। দেবীর সর্বশেষ পীঠ এখানেই পতিত হয়েছিল জন্যে তিনি অন্যকোন পীঠে এমনভাবে তপস্যা করেননি। ভবানীপুর সম্পর্কিত মিথটি হল-

৬৬. A.H. dani, Muslim Architecture in Bengal, Dacca, 1961, P-17

'করতোয়া তটে গুলফং, বামে বামেশ ভৈরব,: অর্পণা দেবতা তত্র ব্রক্ষ্মরূপা করোদ্ভবা।'

অর্থ্যাৎ- পূত করতোয়ার তটে সতীর গুলফ অঙ্গ পতিত হওয়ায় ঐ স্থান পীঠক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ক্ষেত্রস্থ দেবী অর্পণা বামে ভৈরব বামেশ এবং ক্ষেত্র মাহাত্ম্য জন্য স্রোতাস্বিনী করতোয়া ব্রক্ষ্ম রুপিনী।[৬৭] হিন্দুপুরাণ মতে, দাক্ষায়নী সতী পতিনিন্দা শ্রবণে পিতা দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞকুন্ডানলে প্রাণত্যাগ করলে সতগিত প্রাণ মহাদেব (শিব) মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সে সময় ভগবান বিষ্ণু দেবকার্য সাধন উদ্দেশ্যে মর্ত্যবাসীদের কল্যাণ নিমিত্ত সুদর্শনচক্রে সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত করে যেসব স্থানে নিক্ষেপ করেন, সেসব স্থানেই আলাদা আলাদা পীঠস্থান হিসাবে পর্যবসিত হয়েছে। কথিত আছে, বর্তমান সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার গুলটা গ্রামে সতীর গুলফ অঙ্গ (Heel) (গোড়ালী) পতিত হয়েছিল। গুলফ্ থেকেই গ্রামের নাম গুলটা হয়েছে। এ গুলটা গ্রামে দেবীর মূল আসন ছিল। দেবীর আসনকে পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী ভবানীপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে করতোয়া তটে দেবীর বাম 'কর্ণ' নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি স্থানটি সম্পর্কে লিখেছেন,

''করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অর্পণা তাহার।''

বাংলার বারভূইয়া খ্যাত সাঁতৈলাধিপতি মহারাজা রামকৃষ্ণ দেবী অর্পণার ভক্ত ছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের নিকট হতে ভবানীপুর দেবীর পুরী নির্মাণার্থে সনদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৪.৩ লোকসংগীত ও যাত্রা

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এ জেলা সমৃদ্ধ। লোকসংগীত ও যাত্রার জন্য বরাবরই এ জেলার সুখ্যাতি আছে। জারি, সারি, মারফতি, ভাটিয়ালী এবং গ্রামীন নর-নারীর প্রেমকাহিনী নিয়ে যাত্রা সকল সম্প্রদায়ই উপভোগ করত।[৬৮] এছাড়া এ জেলায় বাউলগান, মাজারের গান, কর্মসংগীত, গাইনের গীত,

লোকগান, মেয়েলি গীত, বিয়ের গীত, বিরহগীত, ও নারী এবং পুরুষের পালাগান ইত্যাদি লোকসংগীতও প্রচলিত আছে। মহররম কাহিনী, কবিগান, কীর্তন, খেমটা এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেম উপখ্যান এবং অন্যান্য উপকথা নিয়ে যাত্রা গ্রাম বাংলার অবসর বিনোদনের মাধ্যম।[৬৯] আর্থিক ও নানাবিধ সামাজিক বিবর্তনের ফলে কবিয়াল এবং অন্যান্য বিনোদনমুলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে বগুড়া জেলার উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের পরিচয় ও যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ-

৬৭. অধ্যক্ষ মুহম্মদ রোস্তম আলী, শেরপুরের ইতিহাস (অতীত ও বর্তমান) বিমূর্ত প্রকাশনী, থানা রোড, বগুড়া, এপ্রিল- ১৯৯৯, পৃ-৭১।

৬৮. বিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ) (সম্পা) প্রাগুক্ত , বগুড়া, পৃ.৭২।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৭২।

বাউলগান

সারিয়াকান্দি উপজেলার চরপাড়া (মাথুরাপাড়া) গ্রামের শখের বাউল আশরাফ আলী। পেশা- কৃষিকাজ কিন্তু শখের বশে গান করেন, গান বাঁধেন, নিজেই সুর করেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে লেপ তোষকের ব্যবসা করছেন। আগের মতো এখন খুব একটা গান করেন না। তবে কেউ ডাকলে গানের মায়ায় ছুটে যান। তার দুটি গান এখানে উপস্থাপিত হলো।

১

আর ঝুপ সাগের ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
এবার তালা মারচো কালেমাতে চাবি রইলো মুরশিদের হাতে।
হরে মুরশিদ বিনে খুলবে কেমন করে
আর ঝুপ সাগের ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
আর ঘরে তোমার ভাঙ্গা বেড়া।

সব জায়গাতে হইয়াছে টেরা
ওরে মনের বেড়া লাগাও শক্ত করে
আর ঝুপ সাগের ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
হরে সাগরে যদি না নামিস মুক্তা তুলার কোনো আশা নাই
কি করি তুলব মুক্তা পাগল আশরাফ ভেবে কয়।
ঝুপ সাগের ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)

২

ও দয়াল আল্লা গো ও দয়াল মওলা গো
এক বার পার করো মোরে (২)
আমি আয়লাম কোথায় যাবো কোথায় (২)
নেও গো আমায় সেই জাগায় আর (২)

আমায় দিলা তুমি পারের তরী পাইলাম না বাইতে তরি

তুমি নওগো দয়াল পর পারে

পার করো আমায় আর

ও দয়াল আল্লা গো ও দয়াল মওলা গো

একবার পার করো মোরে (২)[৭০]

৭০. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮-৮৯।

ছকমান বয়াতির গান

সারিয়াকান্দি এলাকায় একসময় নামকরা বাউল শিল্পী ছিলেন ছকমান বয়াতি। আমাদের সংগৃহীত তার একটি গান এখানে সংকলিত হলো।

১

দিনের দিন গত হলো এমন দিন আর হবেনা,

আলেম লোকের মছলা শুনে ভেবে বাঁচি না।

আমি বারে বারে বারণ করি হরে ছকমান শোননা,

জাহান্নামে যাইবা রে ভাই জারি গাইও না।

ছকমান যদি গাও হে জারি

কাজে কামে মোল্লা পাইবা না।

আলেমেরা বলছে ওর হাতের খানা খাইও না,

বাপের ধর্ম করলেও ওর বাড়ি যাইও না

ছকমান হাদিস মানে না।

শুনে কথা মর্ম ব্যথা ভয় লাগে মোর অন্তরে

আলেমেরা দলিল দেখে কি জব দিবা আখেরে,

ও ভাই কি জব দিবা আখেরে।

মাজারের গান (আধ্যাত্মিক)

শাহ সোলতান বাবা তুমি-ই-ই-ই

দরবারে লি -ই-ই-ই

ইসলাম প্রচারে বাবা

মহাস্তান আইলি-ই-ই-ই

ধর্ম যুদ্ধ কইরা শাহা-

নাম হইয়াছে শাহ-সোলতান

তোমার নামে মানত করে-এ-এ-এ-এ

হিন্দু মুসলমান

ইসলাম প্রচারে বাবা

মহাস্তান আইলি

কত পাপী তাপী আলো
তোমার কাছে দোয়া চাইল
দুর হইল মনের ব্যাথা।
মুশকিলো আছান
কত পাগল বাবা তোমার সংসার ত্যাগী পাগলতো নাই
বাউল মুকুল বিনয় করে

চরনে দিও ঠাঁই।[৭১]

কর্মসংগীত

ঢেঁকিতে চাল বা আটা কোটার গীত

এ অঞ্চলে বিয়ে উপলক্ষ্যে বর বা কনের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিভিন্ন পিঠা-চিড়ার আয়োজন থাকে। এ জন্য ঢেঁকিতে আটাকুটা হয়। ঢেঁকিতে আটাকুটার সময় চলে আটাকুটার গীত। এমনি একটি গীত হলো ঃ

এক

আমতলা, জামতলা, কাঁঠালতলা গেছলাম গো,

সেটি (সেখানে) না যাইয়া দেকি দুই সতীনের আন্ধন (রান্না) গো,

দুই সতীনের আন্ধন হামি একলাই আন্ধিনু গো,

তাও জানি ফিরে স্বামী সতীন তোলে না ঘরে গো।

লোকগান

১. ওহে আমার মনগো আল্লা
দুধ জোগাদে দুই বেলাতে

খাবি দাবি পরকে দিবি

আসল দুধ আমাকে দিবি

ওহে আমার মনগো আল্লা

দুধ জোগাদে দুই বেলাতে ॥

ঐ

দুধ তুসনা তুই আলগা করে

হিংসা বিড়াল পিছে ঘোরে

সুযোগ পালে খাতে পারে

তেবে কি দুধের মান থাকিবে ॥

---

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ.১৯২।

ঐ

এক জায়গায় ছয় বাছুর ঝোলে
কাম বাছুরে দড়ি ছেড়ে
লাল কয় দুধ শুকালে
খাওয়াইবি কামের ঘরে

তেবে সে দুধের মান থাকিবে ॥

ঐ

ঘরে আছে ধর্মের গাভি

যখন ইচ্ছা তখন পাবি

কামের ঘরে খাওয়াইবে

তেবে দুধের মান থাকিবে ॥

ঐ

২. সত্য জবান তক্তা গড়া

ঈমানে লাগাইছে গোড়া

অহংকারে ময়লা পড়া

তোবাতে সাবান লাগাও

গাও সকলে নবির গুনগান ॥

ঐ

এলো নবি পৃথিবীতে এই দুনিয়া দেখতে পেলো

উম্মতের লাইগ্যা নবি কান্দে জারো জার
গাও সকলে নবির গুণগান ॥[৭২]

ঐ

<u>মেয়েলি গীত</u>

<u>আদমদিঘির মেয়েলি গীত</u>

আমি গেঁথেছিলাম ফুলের মালা

ফুলের মালা দুলাভাই
পড়াইবো তোমার গলে- ॥

রাস্তার মানান হুন্ডা দেবো দুলাভাই

চড়িয়া চড়িয়া ঘুরিয়ো।

হাতের মানান ঘড়ি দেবো দুলাভাই

---

৭২ পূর্বোক্ত পৃ.২০০।

টাইম দেইখ্যা বেড়াইয়ো
গেঁথেছিলাম ফুলের মালা দুলাভাই
পড়াইবো তোমার গলে।
ঘরের মানান বুবু দেবো দুলাভাই

দেখিয়া দেখিয়া থাইকো।[৭৩]

<u>কাহালুর মেয়েলি গীত</u>

১. হামার ঘরে আছেরে বেলোয়া (কন্যা) সাহেব কেমনে জানে।

হামার ঘরে আচেরে বেলোয়া কেমনে জানে।

কাগারায়ে (কাক) শুনেছি বেলোয়া আছে ঘরে।

পঙ্খি কয় (পাখি) শুনেছি খবর বেলোয়া

একো কথা দুয়ো কথা তিনো কথার পরে

লায়েব মটোরে তুলা লিল

হামার মঞ্জিলের শোভা কারেবা মঞ্জিলে গেলো।

হামার আগিনার শোবা কারেবো আগিনার ঘরে।

একো দিন দুয়ো দিন তিনো দিনকার বেলা

হামার বেলোয়া আর লায়েব ঘুরে আসল বাড়ি

তোমার মঞ্জিলের শোভা কেমন ভালো হলো

হামার মঞ্জিলের শোভা দেখিয়া হামার কলিজা ভরিয়া গেলো

একো দিন দুয়ো দিন তিনো দিনের বেলা আবার আসিবো ঘুরে

মা দুঃখ যেন করো না মনে।

২. আজার (রাজা) বেটা হরিলাল সাদা ঘর

আলো ঘরে চাতি (বুক)

ধরো না ধরোনা ছাতি লকায় যাবে তোমার জাতি।

তুমি হলেন রাজার ছেলে লকায় আমি হলাম ডোমের মেয়ে।

জাতি গেলে জাতি পাব কামুনি(বউ) পাব কুটি (বউ)

আগা হলের গরু বেচা গিয়াতি খিলামু

জাতি তুলিয়া নিমু আহারে ডোমের মেয়ে জাতি তুলিয়া নিমু

আহারে রাজার ছেলে লকায় জাতি তুলিযা নিমু ।[৭৪]

---

৭৩ পূর্বোক্ত পৃ.২০২।

৭৪ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৩।

<u>বিয়ের গীত</u>

১. ডালা ডালা রং মালা গো

ডালা ডালা ফুল মালা গো

ডালা আইলো কইনা ছাইহাটা হাটে গো

ডালা দেখিয়ে আব্বা কাঁন্দে

ডালা দেখিয়া আম্মা কাঁন্দে

ডালা দেখিয়ে ঐ না সন্তার কন্যা হাসে গো

আব্বা তুমি কান্দো না গো

হামি যামু ঐ ডালার সাথে গো। [৭৫]

২. হলদি কোটে মিন্দি কোটা সাজাবো আরঙ্গোতে

কইর হোলদি দিয়্যা লাচরে গোল্যাপী

কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।

গোলাপীর সিতের সেন্দুর রোদে ঝলমল রোদে করেরো-ও-ও-ও-ও-ও-ও

কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।

গোলাপীর এক বাদশা খাইবে

মন ভুলাইবে কারো রো

কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে গোলাপী

কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।

শব্দের অর্থ

১. আরঙ্গেতে- আনন্দ হাসিতে

২. লাচরে-নাচতে বলা হয়েছে

৩. সিতে-সিঁথি.

৪.	সেন্দুর-সিঁদুর/সিন্দূর

৫.	ওদে-রোদে

৬.	কইর-দরজার কপাট বা পল্লা।

৭৫. তথ্যদাতা: মোঃ আশরাফ আলী (৬৭), চরপাড়া, সারিয়াকান্দি,বগুড়া।

হলুদ কোটার বর বা কনেকে গোসল করানো আগে হলুদ মাখিয়ে দিতে দিতে গীত গাইতে থাকে। বিয়ে বাড়ির ঠাট্টা সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একটা কুলা বা নতুন চালনি বা চালুনে (যা বাঁশের তৈরী) করে হলুদ, দূর্বা, সরিষার তেল, ধান, মাটির প্রদীপ (কুপি) অনেকে মোমবাতি ব্যবহার করছে। অনেক পরিবার এর সাথে মুশুর ডাল ও মাসকলাই ডাল ভিজিয়ে পাটায় পিষে নেয়। এরপর এগুলো সধবা, কুমারী ও শীর্ষস্থানীয়রা একেকজন বরের বা কনের কাছে এসে আয়োজন করে হলুদ দেয়। আবার গীতও গায়, পাশাপাশি চলে ঠাট্টা মশকরা বর বা কনে চিন্তিত ও ভীত থাকে এ সময়। তাদের এ অবস্থা দেখে অন্যরাও মজা পায়। তারা নানা প্রতীকী মাধ্যমে নবদম্পতির জীবনের নানাকথা বলে কথা বা গীতের মাধ্যমে।

এমন একটি গীত হলোঃ

৩.	কি দে তুলিচেন তোমার সোনা মুকের ছিরি

আরে ও বিবি আরে ও বিবি ই বিবি ওরি অর্দ্দেক ছিরি হামাক

বাটিয়া দ্যেও আরে ও-ও-ও বিবি ই বি-বি,

আরে এ ও বি-বি-ই বিবি।

অন্যজন প্রথম জনের কথার প্রেক্ষিতে সে কথার সুর দরে বলে-

হামার ভাবি তুলিচ্যে এ সোনা আ-আ-আ- মুউ-উ-উকের ছিরি।

আরে এ-বি-বি-ই-ই আরে ও-ও-ও-বি-বি-ই

হামার বুবু তুলিচ্যে সোনা মুকের ছিরি-ই-ই-ই

আরে এ-এ-ও-বিবি-বিবি-ই-ই

আরে এ-এ-ও-বিবি-বিবি-ই-ই

এ হিরি হামি বাটে দ্যওয়া পারসোনা

আরে এ-এ-ও-ও বিবি-বিবি-ই-ই

আরে এ-এ-ও-ও বি-ই[৭৬]

বিরহগীত

বিরহগীত-১

জিরা বইলাম মালানি গো

জিরা বইলাম পালানি গো

জিরা বইলাম হামি তোলা মাটির ওপর

---

৭৬. তথ্যদাতাঃ মোছাঃ হাছিনা বেগম(৪৫), নারহট্ট, কাহালু, বগুড়া।

ছ'মাস হইল্যা হামি যাইন্যা বাপের দ্যেশে,

কাউয়া যদি হল্যাম হিনি ই গো

সূর্য যদি হল্যাম হিনি ই গো

উড়্যা যায়া পড়তাম বাবার দালানের উপর

জিরা বইলাম মালানি গো

জিরা বইলাম পালানি গো

জিরা বইলাম হামি তোলা মাটির ওপর

ছ'মাস হইল্যা হামি যাইন্যা মায়ের দ্যেশে,

কাউয়া যদি হল্যাম হিনি ই গো

সূর্য যদি হল্যাম হিনি ই গো

উড়্যা যায়া পড়তাম মায়ের দালানের উপর

দ্যাখা আলাম হিনি সোনা মায়ের মুখ...উ।

অর্থঃ মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতেই রয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে যায়নি সে। মনটা তার খারাপ। ছয়মাস হয়ে গেছে। বাপের বাড়ি থেকে কেউ তাকে নিতে আসেনি। সে তখন গাইছে কাক বা সূর্য যদি হতো তবে ভাল হতো। নারী জীবনের আক্ষেপ তার। বলছে তবে সে উড়ে যেত। গিয়ে বাবা ও মার সোনার মুখ দেখে আসত।[৭৭]

শব্দার্থ ঃ

১. উড়্যা- উড়ে গিয়ে

২. হিনি- তাহলে

৩. জিরা- জিরিয়ে বসা।

বিরহগীত-২

আরে ধুতি ভর‍্যা ভর‍্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে

মন মনেরা।

আরে আজকে বারাছি বাবাজানের তালাশে মন মনেরা।

---

৭৭ শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

আরে বাবাজানের জমি যে লিনাম হয়্যা যাচ্চেরে মন মনেরা।

আরে হামি যে বারাছি বাবাজানের তালাশে মন মনেরা

আরে ভাইয়ে ভাইয়ের জমি যে লিনাম হয়্যা যাচ্ছেরে মন মনেরা

আরে ধুতি ভর‍্যা ভর‍্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে মন মনেরা।

আরে ঘুতি মধ্যে ভর‍্যা ভর‍্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে মন মনেরা।

অর্থ ঃ বিয়ের পর কন্যা স্বামীর বাড়িতে রয়েছে। সে হঠাৎ শুনতে পেল তার বাবার বাড়ি ঘর নিলামে উঠেছে। সে চিন্তিত। বাবার বাড়ি যাতে নিলামে না ওঠে সেজন্য টাকা যোগাড় করেছে। যেভাবেই হোক পিতৃগৃহ সে রক্ষা করবে। শ্বাশতকাল ধরে পিতার প্রতি কন্যার যে সহমর্মিতা স্বামী-শ্বশুরের সংসারে থেকেও আদরের কন্যা তা বুঝতে পারে। সে তাই মা-বাবার দুখে দুখি ও সুখে সুখী হয়ে যায়।[৭৮]

জারিগান

গান-১

শোনেন শোনেন দেশ বাসী শোনেন দিয়া মন
বগুড়া জেলার জারি হামরা করি যে বর্ণন
পোরথমে বন্দনা কারি আলা নবির নাম
যত পীর মুর্শিদের নামে জারি শুরু করিলাম
আরে ও ও ও...।
উত্তর বঙ্গের মধ্যে খান্তি বগুড়া জেলা ভাই
মিচ্চি এ্যানো বগুড়ার কথা জারিতে কয়্যা যাই
ভাইরে...।
বার পীর আওলিয়ার জেলা ইতিহাসত আছে
তিন প্রধান মুন্ত্রির বাড়ি এই জেলাতে।
ভাইরে...।
করত্যা লদী এই জেলার মধ্যে দিয়া গ্যাছে

সাজাগোজা শহর লদীর পাড়ত দ্যাড়া আছে

এ...এ...এ।

আরে ও...ও...ও

পত্যা, হলদি, কুষারের গুঁড়, চিটকা আলু হাগরাই

---

৭৮. তথ্যদাতাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন (৪২), কামারচট্ট, গাবতলী, বগুড়া।

এতো রকম ফসল রে ভাই কোন জেলাতে নাই

ভাইরে কোন জেলাতে নাই...॥

সগলি হামরা কষ্ট কর্যা অনেক ফসল ফলাই,

আলার দোয়ায় হামাকেরে হিংসা বিদ্বেষ নাই

না...আ...আ...ই

আরে ও...ও...ও

মহাস্থানে সুত্যা আছে বাবা শাহ সুলতান

জিয়ারত করে সবার জড়ায় ও পরান,

ভাইরে জুড়ায়ও পরান... ॥

বেহুলার বাসর ঘর আছে আরো এটি

দেখতে পাবি যাও যদি একটু খানি হাঁটি

ই...ই...ই...।

আরে ও...ও...ও

এরি মধ্যে একনা কতা ফুসুত কর্যা কই

আছে এটি দ্যাশের সেরা বারকি শরার দই

ভাইরে... ॥

আরো আছে শুকনা পত্যা চিটকা আলুর কাই

সালাম দিয়া সবাই হামরা বিদায় হয়্যা যাই

হায়রে বিদায় হয়্যা যাই... ॥[৭৯]

গান-২

পলি মাটির ছল হামরা

লাল মাটির ছল

বগড়াত হামাকেরে বাড়ি ই...

বগড়া হামাকেরে বাড়ি

বগড়া হামার মায়ের লাকান

বগড়া যে হামারি

বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।

---

৭৯ শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

বাংলা দ্যাশের আদি শহর
পুন্ড বর্ধন নাম আছিল... ॥
এখন হইছে মাস্থানের গড়
সগলি সালাম করি
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।

শুকনা পত্যা হামরা জলমায়

ক্যাংকা চোটের এই পত্যা ভাই

হামরা কলে শ্যাংকা চোটের কাক্কু ছয় না করি।

বগড়াতে হামাকেরে বাড়ি।

সারিগান

সারিগান ঃ (নৌকা বাইচের গান)

১. ওরে টেংরা কাতলা যায়

মাগুর মাছে কেক কাটায়

শিং মাছটা যাবু হানা পরান যায় জলিরে

কি মাছ ধইরাছো বর্শি দিয়া ও হারুজি

ভেদা মাছ কেদা খায় পুটি মাছের পরান যায়

বৃষ্টি হলে কই মাছটা চলে ডাঙ্গা দিয়ারে

গুরু বলে মিথ্যা নয় চেং ধরেছি

ঝোল খাইবো দুটি বেগন দিয়ারে।[৮০]

১০. নারি ও পুরুষের পালাগান

নারী ও পুরুষের পালা গান

বগুড়ায় এই গীতে তৎকালিন সমাজের জীবনযাত্রার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

নারী পুরুষের পালাগান-১

পুরুষ

সোনার গাংগে লোনা পানি

রসিক যারা নাও চালায় গো

৮০. তথ্যদাতাঃ মোঃ জাকির হোসেন (২৮), দেবডাঙ্গা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

প্রেমিক যারা নাও চালায়,

দেখতে শুকনো গো নদী

ওরে কান্দে ফুল জল আদি

জোয়ার ভাট নের বধি

সাধু যারা টের পায়।

নারী

কে যাবিরে আয়রে আয়

ভক্তি দিতে মায়ের পায়

রবেনা সামনের ভয়

তোর এ বব সংসারে (২ বার)

জগতে বলতে গেলে মায়ের কৃর্তি

লেগে যাবে সারা রাত্রি

ঘোষণা হইতো প্রাপ্তি মায়েরি ব্যাপারে।

ও ভাই কালি দেবী কমলা

তোর গলায় মন্ডু মালা

অতিথি প্রাপ্ত চরণের ব্যাপরে।[৮১]

যাত্রা

এককালে রূপবান যাত্রাসহ সবরকম যাত্রাই জনপ্রিয় ছিল, এবং এখনো এটি একটি জনপ্রিয় আনন্দ মাধ্যম। নিরক্ষর লোক সমাজে জরিনা সুন্দরী, আলাল, দুলাল প্রভৃতি যাত্রা বিশেষভাবে সমাদৃত।[৮২] এমনকি রূপবান কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মানের পরেও এ যাত্রার কদর কমেনি। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমার প্রভাব লোকসাহিত্যের সকল শাখার উপর কিছু না কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেছে। এ জেলায় যাত্রা ও লোকসংগীতের আসর কৃষকদের অবকাশ মুহর্তকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। বর্তমানে অত্যাধুনিক মোবাইল, বিভিন্ন টেলিভিশনের সহসল্পতার ফলে এবং প্রযুক্তি মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে হওয়ায় যাত্রা শিল্প হুমকীর সম্মুখীন।

৮১. শামসুজ্জামান খান (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

৮২. ব্রিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী, সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৪.৪ সংবাদপত্র ও সাময়িকী ঃ

সংবাদপত্র

যে কোন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক রাষ্ট্রীয় তথা সার্বিক অবস্থা প্রকাশ ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে পত্র-পত্রিকা বা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা সর্বকালেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন এসব পত্র-পত্রিকায় জীবনাচরণের বহুভঙ্গিম দিকগুলো নিয়ে বুদ্ধিজীবীগণের যুগোপযোগী আলোচনা, সমালোচনা এবং সংস্কার সুপারিশ গুলোর মাধ্যমেই গড়ে উঠে জীবন ও জনমত; পরিবর্তন আসে সমাজে। সঙ্গত কারনেই যেকোন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও চিন্তাধারার সার্বিক পরিচয় মেলে তাদের সমকালীন পত্র-পত্রিকায়। আর এভাবেই সংবাদ-সাময়িকপত্র দেশ ও জাতির ইতিহাস নির্মাণে পালন করে চলে স্থপতির ভূমিকা।

বাংলায় কোম্পানী-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যেই সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয়।[৮৩] আর বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রটি হলো 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'। ১৮৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর থেকে এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিল "১২৫৪ ভাদ্র.....জিলা রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়"।[৮৪] বাংলাদেশের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক, 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' ১৮৬০ সালে রংপুর থেকেই প্রকাশিত হয়।[৮৫]

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলকাতার বাইরে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের তেমন কোনো উদ্যেগ লক্ষ করা যায়নি। যেহেতু পেশাজীবী, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী ছিল সংবাদপত্রের প্রধান পাঠক আর তৎকালীন সময়ে কলকাতাতেই ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ফলে শিক্ষিতজন বলতে প্রায় সকলেই ছিল কলকাতার বাসিন্দা। বস্তুত এ অবস্থাটিই ছিল ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কলকাতার বাইরে তথা মফস্বল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।[৮৬]

৮৩. বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য:- সুব্রত শংকর ধর বাংলাদেশের সংবাদপত্র (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ: ১৫-৩৫, মুনতাসীর মামুন, ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্রঃ ১৮৪৭-১৯০৫ ১ম খন্ড পৃ: ৩৯-৪৬, এ, আর দেশই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি (কলকাতা, কে পি বাগী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭) পৃ: ১৯১-২০৬, মুনতাসীর মামুন।

ঊনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজঃ- ১৮৫৭-১৯০৫, পৃঃ ২৩৬-২৫৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খন্ড (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৭), পৃঃ ৬-৮, তাহমিনা আলম প্রাগুক্ত পৃঃ ১-৫, মুনতাসীর মামুন, 'বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্র, আদিপর্ব, পৃঃ ৯৯৯-১০০১, চৌধুরী শামসুর রহমান, 'আমাদের সাংবাদিক প্রচেষ্টা' মাহে নও (৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৩), পৃঃ ২-৮, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, "প্রথম বাংলা ট্যাবলয়েডের প্রকাশকালে", দৈনিক মানবজমিন (১ম বর্ষ, সংখ্যা ২০ (সূচনা সংখ্যা), ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮), পৃঃ ১৩, যতীন সরকার, "সংবাদপত্র সেকালের ঐতিহ্য ও একালের প্রত্যাশ্যা" দৈনিক মানবজমিন। পৃঃ ১৮

কিন্তু ঊনিশ শতকের ষাট এর দশকে 'ব্রাহ্ম আন্দোলন' এর অভিঘাত।[৮৭] ১৮৬১ সালে Indian Council Act'- এর মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ প্রথম আইন পরিষদ সংক্রান্ত কাজে সরকারের সঙ্গে যুক্ত হলে ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চতর পর্যায়ের লোকদের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ,[৮৮] সর্বোপরি ঊনিশ শতকের বাংলার 'নবজাগৃতি' বা 'রেনেসাঁর প্রভাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেও এক বিকাশমান অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৮৯] এবং এ সময় হতেই সংবাদপত্র শুধু কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন মফস্বল অঞ্চল এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম থেকেও প্রকাশ হতে শুরু করে। ঐ সময় প্রকাশিত সাময়িকপত্র গুলো ছিল বৈচিত্র্যময়, সেগুলোতে বিভিন্ন বিষয় থাকতো। বরিশাল থেকে আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক 'বালারঞ্জিকা' চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কিত মাসিক 'ঋষিতত্ত্ব', ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সংগীত বিষয়ক মাসিক 'কৌমুদ', রাজশাহী থেকে শিল্প ও কৃষি বিষয়ক পত্রিকা 'বৈষয়িকতত্ত্ব', যশোর থেকে কিশোরদের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল 'সুখীপাখী', বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ', ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক 'রামধনু' ও ছিল জনপ্রিয়। এ থেকে ধারনা করা যেতে পারে যে সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে পেশাজীবী, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী প্রভৃতির বিকাশ ও উদ্ভব হয়েছি।[৯০]

১৮৫৭-১৯০০ সালে ব্রজেন্দ্রনাথের হিসাব অনুযায়ী বাংলায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল মোট ৯০৫ টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০ টি। কিন্তু এছাড়াও আরো ৬১ টি সাময়িকপত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। ফলে ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাময়িক ও সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪১ টি। এ ২৪১ টি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে অনেকগুলোই ছিল সাপ্তাহিক এবং অনিয়মিত, যেমন 'ঢাকা প্রকাশ' বা 'বেঙ্গল টাইমস' এ দু'টি সংবাদপত্র বহুদিন ধরে প্রকাশ হয়েছিল। 'ঢাকা প্রকাশ' এর আয়ু ছিল প্রায় একশ বছর। কালী প্রসন্নঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য 'মাসিক বান্ধব' কে অনেকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে।[৯১]

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পত্রিকা কখন প্রকাশিত হয় সে খবর জানা গেলেও তা কখন লুপ্ত হয় তা জানা যায় না। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকজন ছিল দরিদ্র তাই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য প্রেস, দক্ষ সংবাদকর্মীর সুবিধা ছিল না।

৮৪. সুব্রত শংকর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র (ঢাকা বাংলা একাডেমী), ১৯৮৫ পৃঃ ১৫

৮৫. মুনতাসীর মামুন। "বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রঃ আদিপর্ব পৃঃ ১০০১।

৮৬. সুব্রত শংকর ধর। প্রাগুক্তঃ পৃ-14

৮৭. যদিও ব্রাহ্ম আন্দোলন ঊনিশ শতকের চল্লিশের দশকে শুরু হয়, তবে ষাট এর দশকে এটি পূর্ববঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও জোড়াল হয়। মুনতাসীর মামুন "বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্র আদিপর্ব পৃ: ১০০১

৮৮. এ, আর দেশাই, প্রাগুক্ত পৃ: ১৯৩

৮৯. সৈয়দ মকসুদ আলী রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ (ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২) পৃ: ৪৯।

৯০. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, ৯ম খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ: ৪৮১

৯১. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫) (ঢাকা নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬) পৃ: ২৩৯।

পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার অনেক সংবাদপত্রকে রক্ষা করেছেন ধনী ব্যবসায়ী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা সংবাদপত্র যারা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন আইনজীবী, সমাজসেবক, ব্রাহ্ম প্রচারক ও শিক্ষক একই ব্যক্তি ছিলেন সম্পাদক, লেখক এবং সাংবাদিক। তাই দেখা গেছে যতদিন প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি বা উদ্যেম টিকে ছিল ততদিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গই পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত।

প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের অভিঘাতের ফলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। সমাজ সংস্কারই ছিল যাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয় ব্রাহ্ম বিরোধীরাও চেয়েছিল নিজেদের কথা সাধারণের কাছে পৌছে দিতে। ব্রাহ্ম, রক্ষনশীল হিন্দু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সবার ক্ষোভ আকুলতা প্রকাশের যা বলা যেতে পারে সামাজিক কারনেই সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

ঢাকা বা মফস্বল থেকে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক রকম। ১৮৬৩ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী 'ঢাক নিউজ', 'ঢাক প্রকাশ', 'ঢকা দর্পন', এবং হিন্দু হিতৈষী'র প্রচার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২৫০, ৩৫০ এবং ৩০০ কপি। ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা যায় ঢাকা প্রকাশের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং হিন্দু হিতৈষীর ১০০ কপি। ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পরিচিত পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ৩২৭৭ কপি। এর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল 'রাজশাহী সমাচারের'- মাত্র ৩১ কপি। ১৮৯০ এর আরেক হিসাবে জানা যায় ছয়টি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে ঢাকা প্রকাশেরই প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০ কপি। পত্রিকা বিকাশের এটিও একটি অন্তরায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন রকম উপাত্ত ছাড়া এটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই ছিল নিরক্ষর। এ প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, তখন বাংলায় অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা তিনভাগ। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, কোন গ্রামে হয়তো মাত্র একটি খবরের কাগজ থাকত। তখন খবর জানতে হলে লোকজন গ্রামের পোস্ট অফিসে এসে হাজির হতো। একজন পড়ত এবং বাকী সবাই শুনত।[৯২]

বগুড়ায় সংবাদপত্রের ঐতিহাসিক ধারা:- বগুড়ার বিংশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাসমূহের ব্যাপক বিস্তার ছিল। এসময় সংবাদপত্র পত্রিকায় ফুটে উঠত ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক উপাত্তের নানা তথ্যচিত্র। কারো কারো মতে, ষাট দশকেই মূলত বগুড়ার সংবাদ-পত্রের বিকাশ ঘটে। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই সংবাদপত্র

বিকাশের সাথেই বগুড়াতেও এর প্রভাব প্রবল হয়ে উঠে। বগুড়ার বেনীপুর বুক হাউসে সেই সময়ে আসা সাম্প্রতিক প্রকাশনা ও তৎকালীন সময়ে অনেক তরুণের ঢাকায় আগমন ও সাহিত্য কাগজ তথা সংবাদপত্র প্রকাশ করাও এই সময়ের উদ্দীপনার কারণ হিসেবে বলা যায়।"[৯৩]

---

৯২. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ পৃ: ২৫০-২৫১।

৯৩. ঈমান সামী: 'বগুড়ার লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন। আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত) মল্লিকা, একটি সাহিত্য সাময়িক), ২৩ তম বর্ষ, ৩৯ তম সংখ্যা, ঈদুল ফিতর সংখ্যা, ২০০৯, পৃ: ২৬।

এখন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজধানী খ্যাত ঐতিহাসিক পুন্ড্রনগরী প্রাচীন জনপদ 'বগুড়া' থেকে ক'টি এবং কি ধরনের সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ব্রিটিশ-ভারত বা বাংলাদেশ সর্বত্র এখন সংবাদপত্র প্রচলন শুরু হয়নি এবং সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও জনগন সচেতন হয়ে ওঠেনি সে সময় হতেই বগুড়া জনপদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেন। সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের এই প্রবণতা শুধু শহর অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি জনপদের নিভৃত পল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ জেলার জনগণের চির অগ্রসরমান তারই প্রমাণ দেয়। বগুড়া জেলার সংবাদ-সাময়িকপত্রের তথ্যানুসন্ধানে নিম্নলিখিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের কথা জানা যায়।

ডেজিটিয়ার আর দি বগুড়া ডিষ্ট্রিক্টঃ (Gazzatiar of the Bogra District): ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজত্বকালের স্যার উইলিয়াম হান্টার অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে গেজেটিয়ার অব দি বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট প্রকাশ করেন। ১২৭ পৃষ্ঠার ইংরেজী ভাষায় লিখিত এ বইতে বগুড়ার প্রাকৃতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, প্রাচীন রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন, মহাস্থান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশ এ অঞ্চলের পুরাকীতি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে যদি আমরা প্রথম 'সংবাদপত্র' বা গবেষণা মূলক অভিধান বলে অভিহিত করা যায়। সংবাদপত্র বলতে আমরা আজকাল যে রূপটি দেখি। সে সময়ে ঠিক সেই রূপে ছিল না তাই অনেক বিজ্ঞজন মনে করেন এই বগুড়া গেজেটিয়ার বগুড়ার প্রথম সংবাদপত্রের সূচনা বলে ধারণা করেন। তবে এই গেজেটিয়ার টিকে "সংবাদপত্র" বলা যাবে কিনা এ ধরনের প্রশ্ন থাকলেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান তথ্যাদি থাকায় "সংবাদপত্র" চরিত্রের বলা হয়।[৯৪] বগুড়া গেজেটিয়ার "সংবাদপত্র" এর চরিত্র হুবহু মিল না থাকলেও, এই গেজেটিয়ার থেকে আমাদের বহু ঐতিহাসিক লেখক, গবেষক, সমাজচিন্তক, বুদ্ধিজীবী অনেক তথ্য সংগ্রহ এবং তার বাংলা অনুবাদ করে বগুড়ার ইতিহাস রচনা করে আমাদের বগুড়ার ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করার সুযোগ পেয়েছেন।

বগুড়া বার্তা : স্বদেশী যুগে "বগুড়া বার্তা" নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল আর এই "বগুড়া বার্তা" কোন মুদ্রনালয় থেকে প্রকাশিত হতো না। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের সাথে যুক্ত বগুড়ার বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের উদ্যোগে গুপ্তভাবে হাতের লেখায় পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের লক্ষ্যে 'বগুড়া বার্তা' প্রকাশিত হত। "বগুড়া বার্তার সম্পাদনা, প্রকাশনা, ও লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন ডা: প্যারী শঙ্কর দাশগুপ্ত কবি

মাধব চন্দ্র রায়, কিশোরী লাল রায়, রজনীকান্ত মজুমদার, বরদা মজুমদার, বেনী চাকী, সারদা নাথ চক্রবর্তী, বরদা নাথ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী:- বগুড়া অঞ্চলে কৃষক প্রজার দরদী বন্ধু হিসেবে খ্যাত প্রয়াত রাজিব উদ্দিন তরফদার প্রকাশনার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বগুড়া শহর থেকে বর্তমান কবি নজরুল ইসলাম সড়কে প্রজাবাহিনী প্রেস থেকে "সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী" পত্রিকা প্রকাশিত

৯৪. দুর্গাদাস মুখার্জী বগুড়া পৌরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব সুভীনর, পৃঃ ২৯।

হত। এই পত্রিকাটি বাংলা ১৩২৮ সালে প্রজা আন্দোলনের 'মুখপাত্র' হিসাবে পরিণত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ছিলেন প্রয়াত বাগ্মী গোকুলের বিখ্যাত ব্যক্তি প্রয়াত এছাহাক গোকুলী[৯৫] ও মাওলানা মুহাম্মদ আরেফুর রহমান সুধারামী। তিনি নোয়াখালী অধিবাসী ছিলেন। পত্রিকাটি সুদীর্ঘ ৩০ বছর পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। "সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী" পত্রিকায় যারা লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক ওসমান গনী, কবি-সুফী সাধক (শহীদ প্রফুল্ল চাকী) স্মৃতি সংসদ, বগুড়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি) রোস্তম আলী কর্নপুরী), কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ[৯৬] মৌলভী হামিদ আলী, বি.এল, আব্দুল বাসিদ, মৌলভী আব্দুস সাত্তার তরফদার, মনছের আলী, নাছের আলী "প্রজা আন্দোলনের" সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। পত্রিকাটি 'প্রজা আন্দোলনের' মুখপাত্র হিসেবে জেলা সহ তৎকালের বাংলার চাষী সমাজের চরম দুরবস্থা, গ্রামীণ সমাজের সমস্যা, আপামর জনতার দুঃখ-দুর্দশা, বিশেষ করে চাষী সমাজের আশা

৯৫. এছাহাক গোকুলী (১৮৯৫-১৯৬৬): বগুড়া সদর উপজেলার গোকুল গ্রামে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দিয়ামত উল্লাহ আকন্দ। ছাত্রজীবনেই তিনি সরল সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করতেন। 'দেশের কথা' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সম্পাদনায় 'বাংলা আল হেলাল' এ রচনা প্রতিযোগিতা 'ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের দান' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বগুড়ার গণআন্দোলনে তার অবদান অপরিসীম। তার রচিত কয়েকটি বই অপ্রকাশিত। তিনি ১১ মে ১৯৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আখতার উদ্দিন মানিক 'বগুড়ার চরিতকোষ' পৃঃ ৯০-৯১

৯৬. কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ (১৮৮১ সালে বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার নগর গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ ইব্রাহিম ও মাতা মাগরুবন নেছা। তিনি লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাননি। শেরপুর ডি জে হাইস্কুলে সামান্য লেখাপড়া করেছেন। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে লর্ড ডায়ার এর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ পরিদর্শন করেন। ১৯২০ সালে আসামের কুখ্যাত 'বাঙ্গালখেদা' আন্দোলনে বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। ১৯২১ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। ১৯২২ সালে খেলাফত ও কংগ্রেস কমিটির জেলা সদস্য ও সম্পাদক হন। ১৯২৩ সালে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বগুড়া জেলা যুবক সমিতি গঠন করেন। ১৯২৪ সালে প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে ভারতের ছোট নাগপুরে নিখিল ভারত খেলাফত ও কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহন করেন। ১৯২৬ সালে সিরাজগঞ্জ শহরে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সমর্থনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে যৌতুক বা পণ প্রথা উচ্ছেদের কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে আজিজুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেন এবং 'কলেজ স্টুডেন্ট লজিং' কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে বগুড়া জেলা কৃষক প্রজা সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং বগুড়া পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি যুব ছাত্র আন্দোলন, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা, জমিয়তে জলসা ও আহলে হাদীস আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। বগুড়ার দুর্বার প্রজা আন্দোলনের জন্য প্রজাবন্ধু রজিব উদ্দিন তরফদার ও শেখ আব্দুল আজিজ কবিরাজ জমিদারদের চক্ষুশুলে পরিণত হন। দ্র. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত ৩০৯-৩১

আকাঙ্খার সংবাদে পরিপূর্ণ থাকত এবং চাষী সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখত।[৯৭] পত্রিকাটি ৩০ বছর বন্ধ থাকার পর এই নামে পুনরায় ফজলুল কবীর[৯৮], সম্পাদনায় ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।[৯৯]

বগুড়ার কথা (সাপ্তাহিক):- 'বগুড়ার কথা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯২০ সালে[১০০] ইসলামিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হলেও শেষ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি বগুড়ার আঞ্চলিক সংবাদপত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়। ডাঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ এর সম্পাদক ছিলেন।[১০১] পত্রিকা প্রকাশে প্রয়াত খান বাহাদুর ইব্রাহীম[১০২] সাহেবের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পত্রিকাটি প্রথমে বড়গোলার তৎকালীন লেটার প্রেসে বগুড়া ব্যাংকিং এ্যান্ড ট্রেডিং মেশিন থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্মলগ্ন থেকে সম্পাদক ছিলেন, ডাঃ এছাহাক এল.এম.এফ যুগ্ন সম্পাদক ছিলেন, মৌলভী মীর বক্স এল.এল.বি. প্রকাশনা ও পরিচালনায় ছিলেন হেকিম মুহাম্মদ আকবর হোসেন ও আকবর উদ্দীন মন্ডল, সুদীর্ঘ ৪০ বছর কাল পর্যন্ত এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে" আর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে 'বগুড়ার কথা' সম্পাদনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তী পর্যায়ে বগুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ 'বগুড়ার কথা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তিনি সুদীর্ঘ কয়েক বছর পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে 'বগুড়ার কথা' পত্রিকার সঙ্গে বগুড়ার বিশেষ কয়েকজন এ্যাডভোকেট জড়িত ছিলেন। পত্রিকাটি প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নবির উদ্দিন তালুকদার বি.এল, আব্দুল বারী বি.এল, কাবেজ উদ্দীন আহম্মদ বি.এল, মোঃ এছহাক বি.এল, সৈয়দ আশরাফ হোসেন, বগুড়া প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ। উল্লেখ্য যে, ডাঃ মফিজ উদ্দিন আহম্মদ বেশ কিছুকাল পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায়

৯৭. বিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা) বগুড়া জেলা গেজেটিয়ার পৃ: ২৩৭

৯৮. ফজলুল বারী (১৯২১-১৯৭১): বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চাদনিয়া গ্রামে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন, ১৯৪৫ সালে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭ সাল হতে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে বগুড়া জেলা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩ সালে পাকিস্তান আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে পাক্ষিক 'পাকিস্তান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও পুনরায় ১৯৬৪ সালে জেলা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য এবং পার্লামেন্টরী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে ত্রৈমাসিক 'মহস্থান' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং ১৯৬৫ সালে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে ২৭ শে মার্চ বগুড়া শহরের নিজ বাসভবনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। দ্রঃ এ. জে. এম সামছুদ্দীন তরফদার। প্রাগুপ্ত পৃ: ২৭

৯৯. দুর্গাদাস মুখার্জী বগুড়ার সংবাদপত্রঃ অতীত ও বর্তমান আজিজার রহমান (সম্পাদক) মল্লিকা, ৩৬ তম সংখ্যা পৃঃ ১৪৯-১৫০

১০০. K.G.M Latiful Bari (ed) Bangladesh District Gazetteers Bogra (Dacca: Bangladesh Government Press, 1979), P- 233

১০১. আমানউল্লাহ খান, আজকের বগুড়া (বগুড়াঃ গ্রন্থমেলা প্রকাশনী, ১৯৬৮) পৃঃ ১৫৯

তিনি 'বগুড়ার কথা' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। 'বগুড়ার কথা' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে অন্যান্য যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারা হলেন শহীদ ডাঃ কছির উদ্দীন আহম্মদ, কে.এম মেছের আলী, আহম্মদ আলী, কাজী কলিম উদ্দিন, মুহম্মদ ইউসুফ ও মহিলা লেখকদের মধ্যে মিসেস রাহেলা খাতুন অন্যতম। এছাড়া কবি সুফী রোস্তম আলী কর্ণপুরী কিছুকাল 'বগুড়ার কথা' সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তিনি আরও জানান যে, সৈয়দ আশরাফ হোসেনের সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।[১০৩]

দেশের কথা (সাপ্তাহিক):- নুরুল হোসেন কাশেমপুরীর সম্পাদনায় বগুড়ার কংগ্রেস দলের মুখপাত্র হিসাবে খ্যাত ব্যাংকিং এন্ড ট্রেডিং মেশিন থেকে ২২ আগষ্ট ১৯২৪ সালে সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' প্রকাশিত হয়।[১০৪] পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বগুড়া লোন (Loan) অফিসের প্রধান কর্মকর্তা লোলিত মোহন সান্যাল বি.এল এবং যুগ্ন সম্পাদনায় ছিলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রয়াত সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত[১০৫] ও বগুড়ার এককালের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী[১০৬]। 'দেশের কথা' পত্রিকার সাংবাদিকতা ও লেখার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন সারদানাথ খাঁ বি,এল, বৈদ্যনাথ সান্যাল[১০৭] বি,এল, বগুড়ার ইতিহাস লেখক প্রভাসচন্দ্র সেন, সৈয়দ নবাব আলী বি,এল, কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী, ডাঃ ননী গোপাল দেবদাস[১০৮] প্রমুখ। মুদ্রাকার ছিলেন প্রয়াত জিতেন্দ্র নাথ চৌধুরী[১০৯]। প্রথম সংখ্যার মূল্য ছিল ২ পয়সা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৭৫০ টি।[১১০] দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থী দলীয় বিরোধের ফলশ্রুতিতে পত্রিকাটি মাত্র ৪ বছর প্রকাশনার পর বন্ধ হয়ে যায়।[১১১]

---

১০২. খান বাহাদুর ইব্রাহিম মোক্তার (১৮৬৪-১৯৪৮) : বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার যুগলিয়া গ্রামে ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে মোক্তারি পাশ করে বগুড়া বারে মোক্তারি পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। বৃটিশ আমলে এম এল এ ও এম এল সি ছিলেন। সোনাতলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৮ সালে সোনাতলা পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার হতে 'সার্টিফিকেট অব অনার' লাভ করেন। ১৯১২ সালে দিল্লী দরবার মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ সালে 'কাইজার-ই-হিন্দ' সিলভার মেডেল লাভ করেন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালে খান সাহেব এবং খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি পাবনা বগুড়া আসনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইসলামী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য ১৯২৩ সালে বগুড়া থেকে সাপ্তাহিক 'বগুড়ার কথা' প্রকাশ করেন। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, বগুড়া চরিতকোষ, পৃঃ ৮৯-৯০, এ.জে.এম সামছুদ্দিন তরফদার দুই শতাব্দীর বুকে বগুড়ার ইতিহাস ১ম ও ২য় খন্ড (বগুড়া প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭০) পৃঃ ১২৬

১০৩. দুর্গাদাস মুখার্জী 'বগুড়ার সংবাদপত্রঃ অতীত ও বর্তমান) আজিজার রহমান তাজ (সম্পা), মল্লিকা, একটি সাহিত্য সাময়িকী, ২১ তম বর্ষ, ৩৬ তম সংখ্যা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ২০০৭ পৃঃ ১৫০।

১০৪. আনিসুজ্জামান মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০) (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃঃ ৫৪১

১০৫. সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮১-১৯৬০) : বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ডাক্তার অনন্ত কুমার দাশগুপ্ত। তিনি ১৮৯৯ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে বি.এল ডিগ্রি লাভ করে ১৯০৮ সালে বগুড়া বারে যোগদান করেন। বগুড়া পৌরসভার (১৯২৪-১৯২৮) নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহবানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

পাবনা-বগুড়া হিতৈষী (সাপ্তাহিক):

৫ আগষ্ট ১৯২৭ সালে পাবনা-বগুড়া হিতৈষী একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মালিক, প্রকাশক, মুদ্রক ও প্রেস অধিকারী ছিলেন বসন্তবিনোদ কাব্যতীর্থ। এর সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লাকুমার মুখোপাধ্যায়। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী ইহা নরমপন্থী পত্রিকা ছিল। এর বার্ষিক মূল্য দুই টাকা আট আনা। এর প্রচার সংখ্যা ছিল- ১২০০[১১২]।

করতোয়া (সাপ্তাহিক) :

সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' প্রকাশনা বন্ধ হলে কংগ্রেস নেতা সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্তের সম্পাদনায় বগুড়া ব্যাকিং এণ্ড ট্রেনিং মেশিন প্রেস থেকে ১৯২৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ডা. বিরাজমোহন সিং এম. বি. ও গিরিজা মোহনের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বগুড়ার বিখ্যাত মোক্তার নারায়ণচন্দ্র দাস ভৌমিক পত্রিকাটির সর্বশেষ সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সত্যেনধর, ধীরেন ভৌমিক, রাজেন্দ্রলাল, হেমঘটক, নরেশ ঘোষ, কালিদাস সাহা রায়, কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী, ডা. ননীগোপাল দেবদাস, মহিলা লেখকদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম বাঙালী শহীদ বগুড়ার সূর্য সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র চাকী বংশের সান্তনা চাকী ও ইন্দিরা দেবী।[১১৩]

পল্লীমঙ্গল (সাপ্তাহিক) :

'পল্লীমঙ্গল' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালে তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (পরবর্তী বিভাগীয় কমিশনার ও পল্লীমঙ্গল ডিরেক্টর এবং গণফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা) নুরুন্নবী চৌধুরী আই. সি.এস. পল্লীমঙ্গল-এর ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে তদানীন্তন বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নবাব মোহাম্মদ আলীর (তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) পৃষ্টপোষকতায় ১৯৩৭ সালে কমলা মেশিন প্রেস থেকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনায় ছিলেন মৌলভী আব্দুল বারী বি.এল ও কলিম উদ্দীন[১১৪] বি.এল। পত্রিকার সাথে লেখক-সাংবাদিক হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন কে.এম. খন্দকার মোফাজ্জল হোসেন, ধীরেন ভৌমিক, কুমুদ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র রায়, মাওলানা হাছেন আলী, কাবেজ উদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ। কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।[১১৫] প্রায় ৫ বছর পত্রিকাটি প্রকাশ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

এবং কংগ্রেস দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯২০ সাল হতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বহুবার কারাবরণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে বগুড়ায় তাঁত ও চরকাশিল্প গড়ে উঠে এবং বিলাতি দ্রব্য বর্জন শুরু হয়। তিনি ১৯২৫ সালে বগুড়ায় সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি (১৯৪৬-১৯৫৪) বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী ভাষায় সুবক্তা ছিলেন। তিনি ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আমিনুল ফরিদ (সম্পা), উন্নয়ন স্মরনিকা, ২০১০ বগুড়া পৌরসভা, পৃঃ ৩১ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুপ্ত পৃঃ ৩৩৮-৩৪০।

১০৬. ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বগুড়া শহরে একজন স্বনামধন্য (M.L.S) চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বগুড়া পৌরসভার (১৯২৯-১৯৩১ এবং ১৯৪৩-১৯৪৬) নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বিভাগ পূর্ব বাংলার উচ্চ পরিষদ সভ্য ছিলেন। এছাড়া ও তিনি বহু সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। দ্র: এ.জে. এম. শামসুদ্দিন স্বপন (সম্পা.), বগুড়া জেলার এ্যাডভোকেট বার সমিতি ১০০ বৎসর পূর্তি উৎসব স্মরণিকা (১৮৯২-১৯৯২); এ. জে.এম সামছুদ্দিন তরফদার, দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়া : প্রজাবাহিনীর প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ২১০-২১১।

চন্দন (সাপ্তাহিক) :

বগুড়া শহরে বাইরে চন্দনবাইশা (সারিয়াকান্দী) থেকে 'চন্দন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১১৬] পরবর্তীতে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গ (সাপ্তাহিক) :

প্রয়াত মজির উদ্দীন আহম্মদ ও মোজাম পাইকারের যুগ্ম সম্পাদনায় 'উত্তরবঙ্গ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া সিটি প্রেস থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। আব্দুল হামিদ খান পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। এই পত্রিকায় যারা সাংবাদিকতা ও লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা হলেন ডা. আফাজ বেগম, বেগম রোমেনা আফাজ[১১৭], কবিরাজ আব্দুল আজিজ, কবি নাছের আলী, পল্লীকবি মোহাম্মদ আলী, তাজলিমুর রহমান[১১৮], বেগম আনোয়ারা রহমন এ্যানা[১১৯], কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী[১২০] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার পিছনে যে কারণ তা হল- পত্রিকার নাম ছিল 'উত্তরবঙ্গ'। পাকিস্তান শাসনামলে কেন 'উত্তরবঙ্গ' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সে বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠে। আঞ্চলিক, বিচ্ছিন্নতা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকসহ সম্পৃক্ত সকলকে উগ্রধর্মান্ধতা এবং

---

১০৭. বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বগুড়া বারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বগুড়া বারের প্রথম ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথম সভাপতি হিসেবে ১৯২৭ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং (১৯৩৭ সাল পর্যন্ত) দীর্ঘ দশ বছর বগুড়া বারের সভাপতি ছিলেন। দ্র: আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১০৮. ডাক্তার ননীগোপাল দেবদাস (১৯১২-২০০৪) : ফেব্রয়ারি ১৯১২ সালে বগুড়া শহরের কাটনারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৮ সালে বগুড়া করনেশন ইনস্টিউট থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও রাজশাহী কলেজ হতে ১৯৩০ সালে এইচ এস সি পাস করেন। কলকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হতে ১৯৩৬ সালে স্ত্রী শাস্ত্রে বিদ্যায় স্বর্ণপদক পেয়ে এম বি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪০ হতে বগুড়াতে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। নিখিল ভারত মেডিকেল সমিতির বগুড়া শাখার (১৯৪০-৪৭) সাধারণ সম্পাদক, দইবার পাকিস্তান মেডিকেল কমিটি বগুড়া জেলা শাখার (১৯৬২-৬৩) সভাপতি ছিলেন। তিনি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও পরবর্তীতে আওমীলীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। রাজনীতির কারনে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। বগুড়া শহরের শিববাটী সেবক সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বালুরঘাট মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে Motivator ও বাংলাদেশ সরকার নিযুক্ত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি বগুড়া জেলা শাখা সভাপতি (১৯৭২), বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী বগুড়া জেলা সহ-সভাপতি (১৯৭২), বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাকিস্তানের সমাজতন্ত্র কোন পথে (১৯৫৪); আগামী দিনের ধর্ম (১৯৬৪), তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি (১৯৭১), দূর নয় মঞ্জিল (১৯৮৫), তাইতো তুমি এলে (১৯৮৬), শেষ পারানির কড়ি (১৯৯০), বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী (১৯৮৮), A Handbook of Pediatrics Diseases of cholera (1947) মেডিকেল স্কুলের পাঠ্যসূচি চিকিৎসক হলে ও সাহিত্য চর্চা ও জনসেবা ছিল তার জীবনের মহান ব্রত। ১৯৭৫ সালের পর সপরিবারে ভারতে বসবাস করেন। ২৭ মে ২০০৪ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্র: এ.জে.এম সামছুদ্দিন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২; আমানউল্লাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত,পৃ.২১১।

১০৯. ব্রিগেডিয়ার এম.মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), বগুড়া জেলা গেজেটিয়ার (ঢকা : সরকারি মুদ্রাণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ২৩৭।

১১০. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১।

১১১. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৭।

মূলত এক শ্রেণির কট্টর মুসলিম লীগ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা না করেই পরিস্থিতির কবলে পড়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ 'উত্তরবঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।[১২১]

নিশান (সাপ্তাহিক) :

সাপ্তাহিক 'নিশান' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ সালে এবং তা ১৫ বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।[১২২] সাপ্তাহিক 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক প্রয়াত মজির উদ্দীন আহম্মদের প্রচেষ্টায় বগুড়া সিটি প্রেস থেকে 'নিশান' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন মজির উদ্দীন আহম্মদ।[১২৩]

চাবুক (সাপ্তাহিক):

১৯৫১ সালের ২০ জানুয়ারি বগুড়া থেকে 'চাবুক' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কবিরাজ কে. এম. মতিউর রহমান। 'চাবুক' নামকরণের ফলে বগুড়ায় তৎকালে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সম্পাদক কে.এম মতিয়ার রহমান কবিরাজ 'চাবুক' হাতে কষাঘাত করেছিলেন

---

১১২. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী (প্রধান সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১১৩.আমানউল্লাহ খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯; বিগ্রেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১১৪২.এ্যাডভোকেট কলিম উদ্দিন বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার বিষ্ণুপুর (মুরইল) গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতাডর নাম নজিব উদ্দিন আহমদ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। দুইবার বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান, বগুড়া পৌরসভার কমিশনার এবং তিনবার মুরইল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। দ্র. এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

১১৫. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৯।

১১৬. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১১৭. বেগম রোমেনা আফাজ (১৯২৬-২০০৩) : বগুড়া জেলার শেরপুরে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজেম উদ্দিন আহম্মদ মাতা আছিয়া খাতুন। স্বামীর নাম ডাক্তার আফাজ উল্লাহ। মাত্র ৯ বছর বয়স থেকে লেখিকা তার লেখা শুরু করেন। কলকাতার মোহাম্মদী পত্রিকায় 'বাংলার চাষী' ছড়া দিয়ে তার লেখা শুরু হয়। ছোটগল্প, কবিতা, কিশোর উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, গোয়েন্দা সিরিজ ও রহস্য সিরিজ-এ তার লেখা প্রকাশিত হয়। তার লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৫০। এরমধ্যে ৬ খানা উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সেগুলো হল– কাগজে নৌকা, মোমের আলো, মায়ার সংসার, মধুমিতা, মাটির মানুষ ও দুস্য বনহুর। তিনি সাহিত্য অবদানের জন্য প্রাপ্ত স্বীকৃতিস্বরূপ বগুড়া, রাজশাহী এবং ঢাকা থেকে (১৯৮৪-২০০৩) প্রায় ২০টি পদক অর্জন করেছেন। তিনি ৩৬টি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলায় নিজ বাসভবনে ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

১১৮. মোঃ তাজমিলুর রহমান (১৯২৫-২০১৩): ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে বগুড়া সদর উপজেলার কর্ণপুর গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ, মাতা হাসনা বানু। তার শিক্ষা জীবন কেটেছে বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম কর্মজীবন (১৯৪৪-১৯৪৬) কলকাতা সিভিল সাপ্লাই বিভাগ। ১৯৪৬ সালে সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু লোক নিহত হওয়ায় তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বগুড়ায় এসে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথমে গাবতলী হাইস্কুলে,

করোনশন ইনস্টিটিউট পরবর্তীতে সহকারি শিক্ষকতার পর বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯৭১-১৯৮২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী ছিলেন। বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী এ পর্যন্ত তার অর্ধ শতাধিক নাটকের ৩৫০টি প্রদর্শন করেছে। বগুড়া নাট্যগোষ্ঠীর একজন কর্ণধার। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, ব্যঙ্গ ও হাস্য রসাত্মক রচনায় তিনি পারদর্শী। এ ধরনের ২৫-৩০টি গ্রন্থের মধ্যে অমৎসর, কলির জ্বীন, লঘুগুরু, রূপচাঁদ, টোফ, সুবেহ উম্মিদ, কারিগর, অমৎসর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ফলে সে সময় 'চাবুক' সাপ্তাহিক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল বিশেষ করে পূর্ব বগুড়ার কৃষক সমাজের নিকট। 'চাবুক' পত্রিকা আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষ এর প্রকাশনা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।[১২৪]

তার জীবনীমূলক লেখা দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, রাজশাহীর দৈনিক বার্তা এবং বগুড়া থেকে দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত কলাম লিখছেন। বগুড়া প্রায় সব সেমিনার, ওয়ার্কসপ, আলোচনায়, এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকের স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্রঃ আমানউল্লাহ খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত. পৃ. ১০১ঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৮।

১১৯. আনোয়ারা রহমান এ্যানা (১৯৬৬-২০১০) : ১ অক্টোবর ১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ আব্দুল লতিফ মাতা হামিদুন্নেছা এবং স্বামী খ্যাতনামা কবি অধ্যাপক আতাউর রহমান। তিনি বগুড়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় হতে এস.এস.সি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ হতে এইচএসসি ও স্নাতক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৩ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নাটোর গার্লস হাই স্কুল, বগুড়া ইয়াকুবিয়া গার্লস হাইস্কুল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১৯৭৫-৮৬), যমুনা বহুমুখী সেতু গ্রন্থাগার (১৯৮৬-৯৫), বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি রাজশাহী জেলা শাখা প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করেছেন। ১৯৫৭ সালে বিয়ের পরে তার সাহিত্যরূপের পরিচয় ঘটে। আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ, অনন্যা, বেগম ও বগুড়ার কথা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে আমার বধুয়া (১৯৬৪), হে বন্ধু বিদায়, এই জীবন এই যৌবন, ঐক্যতান, পুস্পরাগ, জননী আমার অহংকার, মায়াবী ডাকে মতিহার, হৃদয়ে কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ২০১০ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৪।

১২০. কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী (১৯০২-১৯৮৯): ১ ফেব্রুয়ারি বগুড়া সদর থানার কর্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আকবর আলী খন্দকার এবং মাতা হাজেরা খাতুন ছিলেন ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন ও নেতা আলহাজ্ব মাহ্‌তাব উদ্দিন এর ৪র্থ কন্যা। তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করে বগুড়ার বিপ্লবী নেতা মাস্টার যতীন্দ্রনাথ সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'বিশ্বকথা' সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের তার দান অসামান্য। তার কাব্যগ্রন্থ ও গ্রন্থসমূহ হল- বিশ্বকথা, পণ্যভূমি, জন্মভূমি, প্রীতির মৌচাক, সমন্বয়ের বাঁশি, মণিকাঞ্চন, পারুল পরাগ, কাঞ্জন কাবেরী, এছাড়াও "বগুড়ার লোকসাহিত্য এবং বগুড়ার আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ অভিধান" নামক দুটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক, বগুড়া আলিমপন সংস্থা পুরস্কার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক কবি পদক, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা কর্তৃক কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯৮৯ সালের ১০ অক্টোবর নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ রাকিবুল হাসান জুয়েল (সম্পা.) কবি ও কবিতা ১৯৪০-১৯৭০ (বগুড়া : কণ্ঠসাধন আবৃত্তি সংসদ, পার্ক রোড, ২০০৭), পৃ. ৩১; বিগ্রেডিয়ার এম মসাহেদ চৌধুরী (অব.) (সম্পা.),

প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৬; প্রদীপ মিত্র, 'জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী, কবি এস.কে.এম রোস্তম আলী কর্ণপুরীর জীবন ও সাহিত্য সাধনা', ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২, দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা।

সন্ধানী (সাপ্তাহিক):

খন্দকার মোফাজ্জল বারীর সম্পাদনায় ১৯৫৪ সালে সাপ্তাহিক 'সন্ধানী' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠিত কৃষক প্রজা দলের মুখপত্র হিসেবে এ সংগঠনের সংবাদ অধিক প্রকাশ হতো। সম্পাদক ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হলে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১২৫]

উত্তর সুর (সাপ্তাহিক):

প্রয়াত তবিবর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৭০ সালের ১৩ আগস্ট পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। বগুড়া প্রেসক্লাবে এক আড়ম্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশকালে প্রধান অথিতি হিসেবে দৈনিক করতোয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক যাহেদুর রহমান যাদুসহ বহু নবীন-প্রবীণ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[১২৬]

উত্তরবঙ্গ বুলেটিন (অর্ধ-সাপ্তাহিক):

এম এ দেওয়ান এর সম্পাদনায় 'উত্তরবঙ্গ বুলেটিন' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার সঙ্গে প্রয়াত তবিবর রহমান সহকারী সম্পাদক ছিলেন। দেওয়ান প্রিন্টিং প্রেস বুলেটিন হাউস থেকে মুদ্রিত হতো। তৎকালে 'উত্তরবঙ্গ বুলেটিন' সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১২৭]

সমাচার (সাপ্তাহিক):

যাহেদুর রহামান যাদুর সম্পাদনায় এবং জাবেদুর রহমানের প্রকাশনায় বগুড়া সাধনা প্রেস থেকে ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে সাপ্তাহিক 'সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য পাক হানাদার বাহিনী বগুড়া প্রেসক্লাবের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত সাধনা প্রেসে অগ্নিসংযোগ করে প্রেসটি ধ্বংস করে দিলে মুক্তিযুদ্ধকালেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১২৮]

সংসার সুধা (সাপ্তাহিক):

সুফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক সংসার সুধা পত্রিকাটি ১৯৭৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ৯ বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।[১২৯]

গণঐক্য (সাপ্তাহিক):

যাহেদুর রহমান যাদুর সম্পাদনায় ১৯৭৩ সালের ২৯ জুলাই বগুড়া থেকে 'গণঐক্য' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তবিবর রহমান, বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক তালুকদার। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান পটল (সাবেক সংসদ সদস্য)। পত্রিকাটির জন্মকালে কার্যালয় ছিল বগুড়া প্রেসক্লাব। পত্রিকাটি ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারী হলে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৩০]

---

১২১. বিগ্রেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; আমানউল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১২২. বিগ্রেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; আমানউল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১২৩. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১২৪. আমান উল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১২৫. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১২৬. দুর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র: অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১২৭. পূর্বোক্ত।

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪।

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৩০. পূর্বোক্ত।

বর্তমান (সাপ্তাহিক):

খন্দকার আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালের ৭ আগস্ট 'বর্তমান' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশর ফলে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ৩০ জুলাই থেকে উত্তরা প্রকাশনী মুদ্রাণালয় থেকে প্রকাশিত হবার পর পুনরায় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৩১]

কাঁকন (সাপ্তাহিক):

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে মহিলাদের সাময়িকী হিসেবে 'কাঁকন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্নপ্রকাশ করে। মিসেস সুফিয়া খাতুন পত্রিকার সম্পাদিকা এবং পত্রিকার সঙ্গে বিজলী প্রভা মণ্ডল সম্পৃক্ত ছিলেন। জন্মগ্রহণ থেকে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ তাসাদ্দুক হোসেন এবং বার্তা সম্পাদক ছিলেন তারা রহমান। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখন বন্ধ আছে।[১৩২]

জীবন (সাপ্তাহিক):

১৯৭৮ সালে জীবন নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়ে এই পত্রিকাটি 'স্বনির্ভর' আন্দোলনে বিশ্বাসী জনগণের স্মরণিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ আকরাম হোসেন। যুগ্ম-সম্পাদিকা নূর আফরোজ বেগম (জ্যোতি), পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মো: আব্দুর রউফ। 'জীবন' পত্রিকার নাম বহাল রেখে 'সাপ্তাহিক জীবন' 'স্মরণিকা' পরিবর্তে মুখপত্র লেখা হল ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক এম.এ. রউফ। সম্পাদক মুহাম্মদ আকরাম হোসেন। বর্তমানে 'সাপ্তাহিক জীবন' এর প্রকাশনা বন্ধ হয়েছে।[১৩৩]

গণরায় (সাপ্তাহিক):

বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা থেকে সাপ্তাহিক 'গণরায়' প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন প্রকাশনার পর আর প্রকাশ হয়নি।[১৩৪]

গ্রামবার্তা (সাপ্তাহিক):

'গ্রামবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক আমানউল্লাহ খান বগুড়ার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নামে নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তবে এ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক কে ছিলেন তা সর্ম্পকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[১৩৫]

The North Bangal Express (Weekly):

বগুড়া থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'The North Bengal Express' এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলামের সম্পাদনায় ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস' ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হবার পর ১৯৯০ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।[১৩৬]

সরণী (সাপ্তাহিক):

'সরণী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হতো। 'সরণী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন মো: শাহ আলম এবং সম্পাদক মুহম্মদ মাহবুব-উল আলম।[১৩৭]

---

১৩১. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৩২. পূর্বোক্ত।

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৩৪. পূর্বোক্ত।

১৩৫. দূর্গাদাস মুখার্জী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৩৬. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৩৭. পূর্বোক্ত।

পাক্ষিক সংবাদপত্রঃ

আনছার (পাক্ষিক) :

আনছার একটি প্রাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে বগুড়া থেকে ১৯৫৭ সালে আবেদুর রহমানের (মোক্তার) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং এর কিছুকাল পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৩৮]

বগুড়া বুলেটিন (পাক্ষিক) :

শহীদ অধ্যক্ষ এম. এ দেওয়ান ও আমানউল্লাহ খান এর যৌথ সম্পাদনায় ১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর 'বগুড়া বুলেটিন' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু নামকরণ ইংরেজী থাকায় population census of pakistan 1961 District Census Report Bogra তে এই পত্রিকাটির ভাষা ইংরেজী ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটি 'আর্ট এ্যান্ড পাবলিসিটি' থেকে মোহসীন আলী দেওয়ান কর্তৃক প্রকাশিত ও সাধনা প্রেস হতে নুরুল আলম কর্তৃক মুদ্রিত হত।[১৩৯]

খবর (পাক্ষিক) :

বগুড়া শহর থেকে ১৯৬২ সালের ২৫ ডিসেম্বর মনোয়ার হোসেন রিজভীর সম্পাদনা ও প্রকাশনায় খবর পত্রিকাটি পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায়, তৎকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার বগুড়াস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা মোশারফ হোসেন তালুকদার 'খবর' নামকরণ করায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার পর সম্পদক বগুড়া শহর পরিত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যায়। দীর্ঘকাল পর ১৯৬৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর 'প্রতিরক্ষা দিবস' সংখ্যা হিসেবে পত্রিকাটি পুন:প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সিরাজুল ইসলাম সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে নাম দেখা যায় এবং সহ- সম্পাদক হিসেবে ছিল মোশারফ হোসেন তালুকদার।[১৪০]

সোমবার (পাক্ষিক) :

সোমবার একটি পাক্ষিক পত্রিকা। মুহম্মদ বাদল চৌধুরী এ পত্রিকাটি সম্পাদন করেন।[১৪১] বর্তমানে এর প্রকাশনা বন্ধ।

মাসিক সংবাদপত্র ঃ

বিশ্ববন্ধু (মাসিক) :

১৯৮১ সালে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) কিশোরীলাল রায় এর সম্পাদনায় বগুড়া শহর হতে বিশ্ববন্ধু নামজ একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। এই পত্রিকাই সমগ্র উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা।[১৪২]

১৩৮. মল্লিকা, পৃ. ১৫৩।

১৩৯. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

১৪০. আমানউল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

১৪১. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৪২. প্রভাসচন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস (বগুড়াঃ ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, ২০০০), পৃ. ৪০৪-৪০৫; ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী (প্রধান সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

তাকবীর (মাসিক) :

১৯৪৯ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (তৎকালীন আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ) 'তাকবীর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তৎকালে ইসলামী স্টাডিজ গ্রুপ বগুড়ার পক্ষে হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও তালুকদার প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো। বেশ কিছু সংখ্যা অনিয়মিতভাবে প্রকাশের পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪৩] বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ পাঠাগারে কয়েকটি পত্রিকা সংরক্ষিত আছে।[১৪৪]

আর্য্যদর্পণ (মাসিক) :

হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রিয়ভাবে বাংলা ও আসামের আর্য সারস্বত ধর্ম মঠ বা আশ্রম থেকে এ পত্রিকার প্রকাশনা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতো। বগুড়া করতোয়া নদীর তীরে শহরের চেলোপাড়া শাখা আশ্রম থেকে ১৯১৭ সালে (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশনায় ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ হংস। বগুড়া কমলা মেশিন প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো। বেশ কয়েক বছর নানা সমস্যা, ডিক্লারেশন, আইনগত জটিলতা ও আর্থিক সংকট হেতু পত্রিকাটি কয়েক বছর প্রকাশিত হতে পারেনি। পরবর্তীতে স্বামী অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক গৌর চৈতন্য ব্রহ্মচারী পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিলে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রচারণার উদ্দেশ্য থাকলেও হিন্দু-মুসলিম এ পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করতে দ্বিধা করত না।[১৪৫]

অতএব (মাসিক):

শহীদ মোহসীন আলী দেওয়ান বগুড়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার সম্পাদনায় ইংরেজী ১৯০৬ সালে 'অতএব' নামে একটি মাসিক ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।[১৪৬] পত্রিকাটি লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে মুদ্রিত এবং আর্ট এ্যান্ড পাবলিসিটি বগুড়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সাধনা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। 'অতএব' পত্রিকার সিনেমা সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার মাসিক সাহিত্য হিসেবে আর গন্য হতো না এবং পরবর্তীতে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪৭]

সোনার কাঠি (মাসিক):

'সোনার কাঠি' সচিত্র শিশু মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। সৈয়দ তাইফুল ইসলাম (তোফা) পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।[১৪৮] বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ।

নবনূর (মাসিক) :

মাওলানা নুরুল হোসেন কাশেমপুরীর[১৪৯] সম্পাদনায় মাসিক নবনূর পত্রিকাটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় ৬ (ছয়) বছর ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।[১৫০]

---

১৪৩. আমান উল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১৪৪. তথ্যদাতা: মোঃ শফিউজ্জামান, গ্রন্থাগরিক, বগুড়া ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ, বগুড়া।

১৪৫. ব্রিগেডিয়ার, এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৪৬. K G M Latiful Bari (ed.), op, cit, p. 233.

১৪৭. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

১৪৮. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র' অতীত ও বর্তমান, আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৪৯. নুরুল হোসেন কাশেমপুরী বগুড়া হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নবনূর 'সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রতাপবাজুর গাজী বংশের ইতিবৃত্ত, মোসলেম জাতিতত্ত্ব প্রভূতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারক ও বাগ্নী ছিলেন। দ্রঃ আমানউল্যাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১৫০. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

প্রাচী (মাসিক) :

১৯৭২ সালে শাহ্ আলমের সম্পাদনায় 'প্রাচী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১৫১] কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

আমার দেশ (মাসিক) :

১৯৭২ সালে আবেদুর রহমানের সম্পাদনায় 'আমার দেশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১৫২] কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

তর্জমানুল কোরআন (মাসিক) :

তর্জামানুল কোরআন একটি ধর্মীয় মাসিক পত্রিকা। মাওলানা ইব্রাহিম নগরীর[১৫৩] সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মুকুল প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৪]

নানান (মাসিক) :

আব্দুস সালামের সম্পাদনায় ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নানান' মাসিক পত্রিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ তাসাদ্দুক হোসেন। মাত্র ছয় মাস প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়[১৫৫]

স্বনির্ভর (মাসিক) :

স্বনির্ভর বগুড়া জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা।[১৫৬] বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

দ্বি মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সংবাদপত্রঃ

সবুজ (দ্বি-মাসিক) :

বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে চেলোপাড়া যুব ও ব্যায়াম সমিতির মুখপত্র হিসেবে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সবুজ' পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জয়গোবিন্দ ভৌমিক ও ইউনুস উদ্দীন আহম্মেদ। কিন্তু পত্রিকাটি মাত্র ১ বছর পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৭]

তরুণ (দ্বি-মাসিক):

কে.এম. মেছের আলীর সম্পাদনায় ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিমাসিক 'তরুণ' বগুড়া প্রজাবাহিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সংবাদ লেখক হিসেবে ছিলেন কবি কে. এম শমসের আলী, ডাঃ রমজান আলী, কবিরাজ এ.আজীজ, মোঃ মুসা ও আজহারুল ইসলাম। মূল্য ছিল ৪ আনা, পৃষ্ঠা ছিল৩৪। ২ বছরে মাত্র ৪ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৫৮]

---

১৫১. পূর্বোক্ত।

১৫২. পূর্বোক্ত।

১৫৩. ইব্রাহিম নগরী বগুড়া শহরের অধিবাসী ছিলেন। 'মুসলমানের অবনতি কেন' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বগুড়া শহরের সাহিত্য সাংস্কৃতিতে তার অনবদ্য পদচারণা ছিল। দ্রঃ আমানউল্যাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১৫৪. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সাংবাদপত্রঃ অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৫৬. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৫৭. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭। আমান উল্যাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১৫৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১০১-১৯৩০) (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৪৪৯; ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

যুবশক্তি (ত্রৈমাসিক) :

১৯৩৬ সালে বগুড়া মুসলিম মিশনের অধিকর্তা মওলানা মোজাহার আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় মো: হায়দার আলী ও মো: তছলিম উদ্দীন তালুকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় তালুকদার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার লেখক ও সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন প্রয়াত আকবর হোসেন আকন্দ, রইস উদ্দীন আকন্দ, মাওলানা আশারফ আলী, কবি রুস্তম আলী কর্নপুরী, কবিরাজ শেখ আব্দুল আজিজ, ডা. আফাজ উদ্দীন, সাদত আলী তালুকদার, কবি কে.এম. শমসের আলী ও খোদেজা খাতুন প্রমুখ।[১৫৯] মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

মহাস্থান (ত্রৈমাসিক):

বগুড়া জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে 'মহাস্থান' প্রথমে ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সদর মহকুমা প্রশাসক মু. নাঈমুদ্দীন আহমেদ। পরিচালক সম্পাদক মোঃ নজরুর ইসলাম ডি.পি এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন মোঃ ফজলুল বারী। 'মহাস্থান' পত্রিকা বগুড়া জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র হিসেবে ত্রৈমাসিক সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রধান সম্পাদক হন মুহম্মদ নওয়াব আলী, মহকুমা প্রশাসক সদর সম্পাদক মোঃ ফজলুল বারী, পরিচালক সম্পাদক মো: নজরুল ইসলা। ১৯৬৩ সালে তৃতীয় সংখ্যা থেকে সম্পাদক হন মো: ফজলুল বারী (তৎকালনি এম.পি)। ১৯৬৩ সালে পাক্ষিক আকারে প্রয়াত জহুরুল কাইয়ুম। ১৯৬৯-৭০ সালে 'মহাস্থান' মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে 'মহাস্থান' পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রৈমাসিক হিসেবে 'মহাস্থান' প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক ছিলেন মো: নুরুজ্জমান মিঞা সচিব, জেলা পরিষদ। ১৯৭১ সালে পত্রিকাটি পুনরায় মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন যাহেদুর রহমান (যাদু)। পত্রিকাটি বগুড়া জেলা পরিষদের নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পত্রাকাটির প্রকাশনা বন্ধ।[১৬০] পত্রিকাটি বগুড়া জেলা পরিষদ গ্রন্থাকারে ২৫-৩০ কপি সংরক্ষিত আছে।[১৬১]

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীঃ

সমবায় ও স্বায়ত্তশাসন :

বগুড়া থেকে ১৯৩৪ সালে তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এমদাদ আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় ও ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের মুখপাত্র হিসেবে 'সমবায় ও স্বায়ত্তশাসন' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সংবাদপত্রের চরিত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়। প্রায় ৩ বছর কাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়াত বসন্ত চক্রবর্তী বি.এল, কাবেজ উদ্দিন আহম্মদ বি.এল. পত্রিকা সম্পাদন করতেন। অন্যদিকে এ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল চলচ্চিত্র অভিনেতা অমিয় চ্যাটাজী, কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী ও শিবেন কুণ্ডু প্রমুখ।[১৬২] পত্রিকাটি প্রায় তিন বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

বোর্ড বুলেটিন :

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থাকাকালে বগুড়া থেকে 'জেলা বোর্ড বুলেটিন' নামে একপি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে জেলা বোর্ডের বিবিধ কার্যক্রম ও তৎপরতার সংবাদ বহুলাংশে প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি জেলা বোর্ডের মুখপাত্র ছিল।[১৬৩]

---

১৫৯. আমানউল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১৬০. আমান উল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; ব্রিগেডিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

১৬১. তথ্যদাতা: মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত), বগুড়া জেলা পরিষদ গ্রন্থাগার, বগুড়া।

১৬২. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র: অতীত ও বর্তমান' আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।

১৬৩. পূর্বোক্ত, ১৫১।

বগুড়া মেডিকেল জার্নাল:

পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকের ইংরেজী ভাষায় 'বগুড়া মেডিকেল জার্নাল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদনা করতেন ডা. মফিজ উদ্দীন ও ডা. ননীগোপাল দেবদাস। উল্লেখ্য, বগুড়ার মেডিকেল স্কুল এর সঙ্গে এই পত্রিকাটির সম্পৃক্ত থাকার কারণে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পত্রিকাটির প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়।[১৬৪]

সিনেমা:

বগুড়া থেকে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্রিকা 'সিনেমা' নামে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে মোতারফ আলী (এম.এ) খানের[১৬৫] অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। সিনেমা পত্রিকাটি পরবর্তীকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৬৬]

বুলেটিন:

১৯৭৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে বুলেটিন পত্রিকা শহীদ অধ্যক্ষ মহসীন আলী দেওয়ান এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালের ৬ জানুয়ারী তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, বগুড়া প্রদর্শনীর সাংস্কৃতিক মঞ্চে অশ্লীল নৃত্য এবং জুয়া চলছে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সংবাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে সে সময়ে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হলে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৬৭]

খামার:

১৯৬২ সালে 'খামার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শামসুল আলমের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।[১৬৮]

শতবর্ষী:

'শতবর্ষী' অনিয়মিত একটি সাহিত্যপত্র। আব্দুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় ১৯৮১ সালে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।[১৬৯] বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

বিপ্রতীক:

বগুড়া থেকে 'বিপ্রতীক' নামে অনিয়মিত একটি কবিতাপত্র ১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ফারুক সিদ্দিকী। ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।[১৭০] বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

---

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১।

১৬৫. মোতারফ আলী (এমএ) খান ১৮৯৯ সালে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আসেক মোহাম্মদ খান। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। তিনি পিতার সাথে বাংলা, আসাম ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ১৯৩৮ সালে বগুড়া এডওয়ার্ড ড্রামেটিক হলে মেরিনা টকিজ নামে একটি প্রেক্ষাগৃহ চালু করেন যা ১৯৬৩ সালে শহরের সাতমাথার অদূরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বগুড়া শহরে তার নামে এম.এ খান লেন রোড এবং এম এ খান মার্কেট আছে। দ্র: এ.জে.এম সামছুদ্দিন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১৬৬. এ.কে. এম. সামছুদ্দিন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৬৮. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।

১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

১৭০. পূর্বোক্ত।

দৈনিক পত্র-পত্রিকাঃ

গণপ্রতিনিধি:

১৯৩০ সালে বগুড়া জেলার চন্দনবাইশা থেকে আব্দুল মালেক জোয়ারদারের সম্পাদনায় গণপ্রতিনিধি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।[১৭১] সংবাদপত্র সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য এ সংবাদপত্রের উৎপত্তি ঘটে। ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের বলয় থেকে মুক্ত না হওয়ায় ফলে পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখকগণ জনকল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সার্বিকভাবে সক্ষম না হলেও কালক্রমে পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে বগুড়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে এ পত্রিকার সাংবাদিক বহু বাধা, বিপত্তি ও হুমকির মুখে অনেক সত্য সাহসী কথা লেখার চেষ্ঠা করেছিলেন।[১৭২]

জনমতঃ

জনমত সান্ধা দৈনিক পত্রিকা হিসেবে ১৯৬৭ সালের ১০জানুয়ারি অধ্যাপক মহসীন আলী দেওয়ানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[১৭৩] বগুড়া থেকে সর্বপ্রথম সান্ধ্য প্রথম দৈনিক 'জনমত' প্রকাশের ফলে বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গের সংবাদপত্রের ইতিহাসে দুঃসাহসিক এক প্রচেষ্ঠা যা ছিল বিশেষ প্রশংসনীয়। জানা যায় যে, ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম মুদ্রিত না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।[১৭৪]

দৈনিক বাংলাদেশ ঃ

আমানউল্লাহ খানের সম্পাদনায় দৈনিক বাংলাদেশ বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।[১৭৫] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রের জন্মের পর বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গের প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক বাংলাদেশ'। দৈনিক বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আমানউল্লাহ খান (সংসদ সদস্য), বগুড়া থেকে দৈনিক বাংলাদেশ নামে বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড কলেজ রোড থেকে মুদ্রিত হতো। 'দৈনিক বাংলাদেশ' পত্রিকায় টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু হয় ২০ জুলাই ১৯৭২ সালে। পত্রিকাটি ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তদানীন্তন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওমীলীগ (বাকশাল) সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি করলে বগুড়ার 'দৈনিক বাংলাদেশ'সহ সমগ্র বাংলাদেশের ৪টি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশনা থেকেই সম্পাদক ছিলেন আমানউল্লাহ খান। উপদেষ্টা মমতাজ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আহসান উল্লাহ খান, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আহমাদুল হক, পৃষ্ঠপোষক মাকছুদ আহমদ চৌধুরী, পত্রিকাটি জয়লা প্রিন্টিং প্রেস, শেরপুর রোড়, বগুড়া থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হত। 'দৈনিক বাংলাদেশ, উত্তরাঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসেবে গৌরব লাভ করে। উত্তরাঞ্চল থেকে প্রথম দৈনিক এ পত্রিকাটি প্রথমে দুই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার পর চার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকে।এই পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন রবি ভট্টাচার্য এবং এই পত্রিকার জন্মলগ্নে প্রধান পৃষ্ঠাপোষাক ছিলেন মতিয়ার রহমান ভাণ্ডারি[১৭৬]।

১৭১. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র: অতীত ও বর্তমান' আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১৭২. পূর্বোক্ত।

১৭৩. পূর্বোক্ত।

১৭৪. আমান উল্যাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

১৭৫. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৭৬. মতিয়ার রহমান ভাণ্ডারী ১৯৩৪ সালে বগুড়া শহরের বড়গোলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ময়েজউদ্দিন শেখ মাতা ময়েজান বেওয়া। তার বড় ভাই মুজিবুর রহমান ভাণ্ডারী গ্রুপের সকল ব্যবসা করে ব্যাপক উন্নতি করেন। তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ঠ অর্থ দান করেন। দ্র: আমানউল্লাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯০।

অন্যান্যদের মধ্যে এ.কে.মজিবুর রহমান (তৎকালীন সংসদ সদস্য), মোস্তাফিজুর রহমান পটল[১৪৫] (তৎকালীন সংসদ সদস্য), মমতাজ উদ্দীন, ওয়াজেদ আলী তালুকদার, শামসুর রহমান। সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন জাফরুল্লাহ খান, জুবায়ের মুকুল, ফেরদৌস জামান মুকুল, যাহেদুর রহমান যাদু, আবুল কাশেম আজাদ, ফারুক ফয়সাল, মুহম্মদ আব্দুল মতীন[১৭৭], জিল্লুর রহমান, মোজাম্মেল হক তালুকদার, মীর্জা আমজাদ হোসেন জওহর মল্লিক প্রমুখ।[১৭৮] পত্রিকাটি কয়েক সংখ্যা ট্যাবলয়েট আকারে প্রকাশের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক করতোয়া:

১৯৭৬ সালের ১২ আগষ্ট বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গে 'দৈনিক করতোয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৭৯] যে সময়কার 'দৈনিক করতোয়া' ও আজকের 'দৈনিক করতোয়ার' প্রকাশনার মধ্যে বহু উত্থান পতনের ইতিহাস রয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও বলা যায়, 'দৈনিক করতোয়া' বগুড়া উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। অথচ. 'দৈনিক করতোয়া' জন্মলগ্নের প্রাক্কালে ঢাকার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তাচ্ছিল্য সহকারে বলেছিলেন, 'ঢাকার বাইরে দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ করা ছেলের হাতের মোয়া নয়' কিন্তু তাদের এই উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত করে 'দৈনিক করতোয়া' প্রকাশিত হচ্ছে দম্ভভরে। 'দৈনিক করতোয়া' প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন মুহম্মদ আব্দুল মতীন, বার্তা সম্পাদক ছিলেন দুর্গাদাস মুখার্জী। পত্রিকাটি সার্ভিস প্রিন্টিং প্রেস ও হক প্রিন্টিং প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হয় এবং রাজা বাজার থেকে প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক করতোয়া' আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ১৯৭৬ সালের ১২ আগষ্ট স্থানীয় উত্তর প্রেক্ষাগৃহে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। রঙ্গিন ও আট পৃষ্ঠায় বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে মূল্য মাত্র ৩.০০/- পরবর্তীতে ৪.০০/- করা হয়।[১৮০]

---

১৭৭. মোস্তাফিজুর রহমান পটল (১৯৪৭-১৯৭৫) : বগুড়ার গাবথলী উপজেলার আটবাড়িয়া গ্রামে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল জলিল মন্ডল সোনারায় ইউনিয়নের ৪২ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬২ সালে 'হামদুল হক' শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনের জন্য দীর্ঘদিন হাজত বাস করেন । আজিজুল হক কলেজ ছাত্র সংসদের (১৯৬৪-৬৫) জি.এস (General Secretary) এবং পরবর্তীতে ভিপি (Vice president) হয়েছিলেন ১৯৬২ সালে বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে আওয়ামীলীগের মনোনয়নে বগুড়া- ৭ (গাবতলী) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 'গণঐক্য' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বগুড়া থেকে প্রকাশ করেন । ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর সেনা অভ্যুত্থানে জাতীয় ৪ নেতাকে হত্যা করার পর ঐদিন মধ্যরাতে শেরে বাংলানগরস্থ ৩নং ব্লকের এমপি হোস্টেলের শয়নকক্ষ হতে উঠিয়ে নেওয়ার পর ৭ নভেম্বর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার স্ত্রী কামরুন্নাহার পুতুল (বগুড়া-জয়পুরহাট) সংরক্ষিত মহিলা আসনে (১৯৯৬-২০০১) এমপি ছিলেন। দ্রঃ এ.জে.এম সামছুদ্দিন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪; আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-২৬১।

১৭৮. মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বগুড়ার (১৯২৪-২০০৮) : ধুনট উপজেলার বৈশাখী গ্রামে ২৯ অক্টোবর ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জশমত উল্লাহ সরকার ব্রিটিশ সরকারের সাব-ইন্সপেক্টর (পুলিশ) ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। পার্টি, সমাজ ও জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বশিক্ষিত হন। তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার কারণে উচ্চশিক্ষ গ্রহণ করতে পারেনি। রাজনীতি ছাড়াও কবিতা, প্রবন্ধ ও ইতিহাস গবেষক হিসেবে বহু লেখালেখি করেন। ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধের মধ্যে 'করতোয়ার গতিপথ' অন্যতম। তিনি আজীবন কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ১১ এপ্রিল ২০০৮ সালে বগুড়ার শেরপুর পৌরসভায় (শ্রীরামপুর) মৃত্যুবরণ করেন।

দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২-২৭৪।

১৭৯. দুর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্রঃ অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

১৮০. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, ৯ম খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনমুদ্রণ, ২০০৪), পৃ. ৪৮৪।

১৯৮০ সাল থেকে 'দৈনিক করতোয়া' মোজাম্মেল হক লালুর সম্পাদনা ও প্রকাশনায় প্রকাশিত হচ্ছে[১৮১] জন্মলগ্নে যে সকল সাংবাদিক এই সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যাহেদুর রহমান যাদু, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক তালুকদার, মীর্জা আমজাদ হোসেন, মাহবুব উল-আলম, জওহর মল্লিক, ওয়াসিকুর রহমান বেচান প্রমুখ। [১৮২]

পল্লী প্রদীপ : ব্রিটিশ যুগে যখন পত্র-পত্রিকার উপর চরম বিধি-নিষেধ সে সময়ে 'পল্লী প্রদীপ' নামে বগুড়া থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পতিকাটির সম্পাদক ছিলেন কবিরাজ আব্দুল আজিজ। সে সময়ে যে পরিস্থিতিতে পত্রিকাসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে নিশ্চিতভঅবে বলা যায় বগুড়ার ইতিহাসে এই পত্রিকা নবদিগন্তের সূচনা করেছিলে। এ সকল পত্র-পত্রিকা সে যুগে বগুড়ার সামাজিক ক্রমবিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।[১৮৩]

বগুড়া বার্তা : ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সাথে জড়িত বগুড়ার বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের উদ্যোগে গুপ্তভাবে হাতের লেখায় পরাধীনতার শৃঙ্খলা মোচনের লক্ষ্যে 'বগুড়া বার্তা' প্রকাশিত হয়েছিল। 'বগুড়া বার্তার' সম্পাদনা, প্রকাশনা ও লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন ডা. প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত[১৮৪], কবি মাধবচন্দ্র রায়, কিশোরীলাল রায়[১৮৫], রজনীকান্ত মজুমদার[১৮৬], বেনী চাকী[১৮৭], সারদানাথ চক্রবর্তী, বরদানাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।[১৮৮]

---

১৮১. দুর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র, অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৮৩. ব্রিগ্রেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব.) (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৮৪. ব্রিগ্রেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব.) (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৮৫. ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত (১৮৫৫-১৯২২): বরিশাল জেলার রণমতি গ্রামে (মাতুলালয়) ১৮৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বগুড়া শহরের দত্তবাড়িতে বসবাস করেন। তিনি সে সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের বড় ডিগ্রি LMF (Licentiate Medicine Faculty) 1880 সালে অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হলে বগুড়াতে তিনিই কংগ্রেস রাজনীতির সূত্রপাত করেন। ১৯০০ সালে বগুড়ার তিনি 'আর্যবিপণী' নামে স্বদেশী পণ্যের দোকান খুলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯২১ সালে তিনি বগুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। গরীবদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ বিরোধী 'বগুড়া বার্তা 'নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি চোর রত্নাঙ্কর, ফুলমুকুল গ্রন্থ এবং ঋষি অলর্কের ব্রহ্মলাভ উচ্চাঙ্গের কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। তার নামে বগুড়া শহরে 'প্যারীশঙ্কর সড়ক' আছে। তিনি ১৯২২ সালে বগুড়া শহরে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ এ.জে.এম. সামছুদ্দিন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২: আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯২।

১৮৬. কিশোরীলাল রায় (১৮৩৯-১৮৯৩) : বগুড়া শহরের শিববাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণলাল রায় মাতা রসসুন্দুরী দেবী। তিনি অন্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ৮ বছর বয়সে তিনি জিলা ভার্নাকুলার স্কুল (পৌর উচ্চ বিদ্যালয়) এ কিছুদিন পড়াশোনার পর বগুড়া জিলা স্কুল (এন্ট্রান্স স্কুল) ভর্তি হয়ে ৪/৫ বছর অধ্যয়ন করেছিলেন। পিতা মৃত্যুসহ পারিবারিক নানা অসুবিধার কারণে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঘরে বসে নানা বই-পুস্তক পড়ে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কিছুদিন ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কেরানি ও ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকতার চাকুরী করেছেন। ১৮৮১ সালে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) 'বিশ্ববন্ধু' নামে অতি উচ্চমানসম্পন্ন একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যা সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম পত্রিকা। ১৮৮১ সালের শেষ দিকে ইংরেজিতে Free Enquiry after truth নামক একটি দর্শন গ্রন্থ প্রকাশ করে সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে কাকিনার (রংপুর) বিশিষ্ট জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তার পুত্রের গ্রহশিক্ষক হিসেবে কিশোরীলাল রায়কে নিয়োগ করেন। এ সময় তিনি কাকিনা অবস্থানকালে রংপুর দিক প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনা করে। ১৮৮৩ সালে কাকিনায় অবস্থানকালে তিনি Eassay on happiness নামক একটি দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে পণ্ডিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। স্বপ্নদূত, শকুন্তলা নাটক, দেবতত্ত্ব, মনোহর সঙ্গীত ও তান্ত্রিক অভিধান রচনা করেন যার কোনটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৯৩ সালে বগুড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্র : ব্রিগেডিয়ার. এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব.) (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০; আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫-১১৬।

দৈনিক উত্তরাঞ্চল :

১৯৮১ সালের ২৭ নভেম্বর বগুড়া থেকে দুর্গাদাস মুখার্জীর সম্পাদনায় করতোয়া প্রিন্টিং প্রেস, ছালমা আর্ট প্রেস, চকসুত্রাপুর থেকে এ.কে .এম সামসুল আবেদীন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 'দৈনিক উত্তরাঞ্চল' বগুড়ার বুকে সর্বপ্রথম চকযাদু রোডস্থ মুকুল অফসেটে প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক উত্তরাঞ্চলা' এর সম্পাদক হৃদয়রোগে অসুস্থ হলে কিছুকাল অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় শুধুমাত্র ডিক্লারেশন রক্ষার লক্ষ্যে। উল্লেখ্য যে, 'দৈনিক উত্তরাঞ্চল' ২০০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।[১৮৯]

দৈনিক উত্তরবার্তা :

১৯৮১ সালে বগুড়া থেকে 'দৈনিক উত্তরবার্তা' আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে শাহ আলম প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'দৈনিক উত্তরবার্তা' সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি আব্দুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহম্মদ আব্দুল মতিন উত্তর মুদ্রণ চেলোপাড়া হতে মুদ্রিত এবং কবি নজরুল ইসলাম সড়ক বগুড়া থেকে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।[১৯০]

দৈনিক চাঁদনীবাজার :

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যে সকল বীর বাঙালি আত্মদান করেছেন সেই অমর দিনে ১৯৯১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বগুড়া থেকে 'দৈনিক চাঁদনীবাজার' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন যাহেদুর রহমান যাদু, প্রকাশক ছিলেন মাকছুদু রহমান খুকু, মুদ্রাকর মোশারফ হোসেন মুকুল। পরবর্তীতে যাহেদুর রহমান সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর প্রকাশক মাকছুদুর রহমান খুকু সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীপংকর চক্রবর্তী 'দুর্জয় বাংলা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। এসময় বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মহসীন আলী রাজু। পরবর্তীতে দীপংকর চক্রবর্তী 'দুজয় বাংলা' পত্রিকায় যোগদান করলে মহসিন আলী রাজু 'দৈনিক চাঁদনীবাজার' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই মহসীন আলী রাজু এই পত্রিকায় সঙ্গে সর্ম্পক ত্যাগ করেন। বর্তমানে, সহ-সম্পাদক মীর সাজ্জাদ আলী সন্তোষ, মুদ্রাকর ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক পদে রয়েছেন মোশারফ হোসেন মুকুল।[১৯১]

---

১৮৭. রজনীকান্ত মজুমাদার (১৮৬৮-১৯৯১) : ১ এপ্রিল ১৮৮৮ সালে বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৮ সাল হতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মোট ১২ বছর বগুড়া পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হাতে লেখা 'বার্তা' পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে 'রায়বাহদুর' খেতাবে ভূষিত করেন। তার পুত্র মাখনালাল মজুমদার ও অন্তিমচন্দ্র মজুমদার বগুড়া বারের প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তিনি ৩০ এপ্রিল ১৯৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আমিনুল ফরিদ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।

১৮৮. বেণীমাধব চাকী বগুড়া বারের বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালে বগুড়া বারে যোগদান করেন।এবং বগুড়া বারের তৃতীয় প্রধান আইনজীবী। রাজনীতিতে তিনি কংগ্রেস ধারার অনুসারী হিসেবে ১৯২১ সালে বগুড়া জেলা সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে হাতে লেখা 'বগুড়াবার্তা' পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন। বগুড়া শহরের কাটনারবাড়ায় 'বেনীচাকী লেন' নামে তার নামে একটি সড়ক আছে। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

১৮৯. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র : অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯।

১৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭।

১৯১. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮।

১৯২. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্রঃ অতীত ও বর্তমান', আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

দৈনিক আজ ও আগামীকাল:

১৯৯৩ সাল থেকে বগুড়া হতে 'দৈনিক আজ ও আগামীকাল' প্রকাশিত হয়। এই প্রত্রিকার সম্পাদক জাহিদ কামাল। উপদেষ্টা সম্পাদক ডা: শামিমা, রিচি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন এর পক্ষে হীরা প্লাজা (৩য় তলা) গালাপট্টি বগুড়া থেকে প্রকাশি হচ্ছে। 'আজ ও আগামীকাল' পত্রিকা বগুড়ার তরুণ ও যুবক সমাজের নিকট সমাদৃত হয়েছে।[১৯৩]

দৈনিক সাতমাথা:

'দৈনিক সাতমাথা' পত্রিকাটি বগুড়া থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন। পত্রিকাটি আল-মুশারাকা প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন লি: বগুড়া হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এর কার্যালয় জামান মার্কেট, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।[১৯৪]

দৈনিক দুর্জয় বাংলা :

১৯৯৬ সালের ১২মে 'দুর্জয় বাংলা' বগুড়া থেকে আত্নপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন মোস্তাফা নূরুল আমীন। প্রকাশক ছিলেন রফিকুল ইসলাম, পরবর্তীতে রফিকুল ইসলাম সম্পাদক হন। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি হন গৌরদাস রায় চৌধুরী। ফেরদৌস জামান মুকুল সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক গৌরদাস রায় চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মি. দীপংকর চক্রবর্তী, বার্তা সম্পাদক জয়নাল আবেদীন। পত্রিকাটি চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে প্রকাশিত এবং রাহুল প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স কাটনারপাড়া থেকে মুদ্রিত।[১৯৫]

দৈনিক মুক্তবার্তা:

ওয়াসিকুর রহমান বেচান-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনায় 'দৈনিক মুক্তবার্তা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি এক সময় 'দৈনিক করতোয়া ভবন' থেকে মোজাম্মেল হক লালুর সহায়তার প্রকাশিত হওয়ার পর বাদুরতলা থেকে নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হতে থাকার পর বর্তমানে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 'দৈনিক মুক্তবার্তা' প্রকাশের পর সংবাদপত্র অঙ্গনে এবং সাংবাদিক মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয় লেখা নিবন্ধ ও সম্পাদকীয়তে।[১৯৬] পত্রিকাটি অনিয়মিত প্রকাশিত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ:

১৯৯৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক জনকণ্ঠ' একযোগে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও বগুড়া থেকে মুদ্রিত হয়। বগুড়া থেকে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা প্রকাশনা অঙ্গনে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বগুড়া থেকে এই পত্রিকা প্রকাশের ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষ প্রত্যুষে পত্রিকা পাঠকদের পৌঁছে বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনিক জনকণ্ঠ বগুড়া থেকে সর্বপ্রথম প্যারীশঙ্কর রোড থেকে মুদ্রিত হতো। এই পত্রিকার বগুড়াস্থ স্টাফ রিপোর্টার জন্মলগ্ন থেকে আচেন সমুদ্র হক। নিজস্ব সংবাদদাতা মাহ্‌মুদুল আলম নয়ন। স্টাফ ফটোগ্রাফার হিসেবে শফিউল আলম কমল নিযুক্ত হয়েছেন। 'দৈনিক জনকণ্ঠ' ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে পত্রিকা পূণাঙ্গ আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে। বগুড়া থেকে দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বগুড়া উত্তরবঙ্গের বিশেষ সম্মানে ভূষিত হতে সক্ষম হয়েছে।[১৯৭]

---

১৯৩. পূর্বোক্ত।

১৯৪. পূর্বোক্ত।

১৯৫. পূর্বোক্ত।

১৯৬. দূর্গাদাস মুখার্জী, 'বগুড়ার সংবাদপত্র' অতীত ও বর্তমান, আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

১৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ, ১৫৯।

দৈনিক উত্তরকোণ:

২০০২ সালের ১৬ আগষ্ট ‘দৈনিক উত্তরকোণ’ প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অধ্যাপক মোজাম্মেল হক তালুকদার। প্রকাশক হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু।[১৯৮]

দৈনিক বগুড়া:

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘দৈনিক বগুড়া’ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রেজাউল করিম বাদশা।[১৯৯]

স্ফুলিঙ্গ :

বগুড়া থেকে ডিক্লারেশন ছাড়া, হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে স্ফুলিঙ্গ নামে। বগুড়া ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র হিসেবে একই দিনে বগুড়ার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক দুর্গাদাস মুখার্জী।[২০০]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের পর বগুড়া থেকে বিভিন্ন সময় সাপ্তাহিক অর্ধ-সাপ্তাহিক সহ বিভিন্ন ধরনের যেসব পত্রিকা মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়, তার নাম নিচে বর্ণিত হল-‘শরনী’, ‘সূর্যতোরণ’, ‘নতুন খবর’, ‘সাপ্তাহিক নওজোয়ান’, ‘ককটেল’, ‘সাপ্তাহিক দিনক্ষণ’, ‘হাতিয়ার’, ‘আজকের সকাল’, ‘মাসিক নতুন’, প্রভৃতি। [২০১]

বগুড়ার সাংবাদিকতা:

ইংরেজি জার্নালিজম শব্দ থেকে সাংবাদিকতা কথাটি এসেছে। এই Journalism শব্দটি হলো Journal ও Ism এই দু’টো শব্দের সমন্বিত রূপ। Journal (জার্নাল) মানে কোন কিছু প্রকাশ করা, অন্য অর্থে দিনপঞ্জি এবং Ism (ইজম) মানে অভ্যাস বা অনুশীলন বা চর্চা। পুরো অর্থে সাংবাদিকতা মানে দিনপঞ্জি অনুশীলন। সংবাদপত্রে তথ্য ও গণজ্ঞাপন পদ্ধতিই মুখ্য। তাই ডেভিট ওয়েন রাইট যথার্থ বলেছেন।

Journalism is information it is communication. It is the events of the day distilled into a few words, sounds of picture, process, by the mechanics of communication to satisfy the human curiosity of a word that is always eager to know what’s new.

শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিনোদন তথা মানব সভ্যতা বিকাশের মূল বাহন হচ্ছে সাংবাদিকতা। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ধ্যান-ধারণার বিবর্তন, সমাজ বিপ্লব কিংবা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারক ও বাহক হলো’ সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা কেবল ইতিহাস নির্মাণ করে না, ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে তার পথ নির্দেশিকা দেয়। সাংবাদিকতা মানুষের জীবন আচরণের এক নিত্য সঙ্গি।[২০২]

দেশ বিভাগের পূর্বে (১৯৪৭) বগুড়ায় সাংবাদিকতার উজ্জল বেগমান প্রবাহ ছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সংবাদপত্রই জাতির ‘সাচ লাইট,’-এই আলোকে জাতি অচেনা পথে দৃঢ় পদচারনা করতে পারে। কৃষি, শিল্প, বানিজ্যে অগ্রসর বগুড়া জেলায় সংস্কৃতির বিকাশের পথ সে সময়ে অবরুদ্ধ ছিল। নামেমাএ কিছু পত্র-পত্রিকা ছিল, তা আবার সুযোগ বঞ্চিত। গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে মেহনতি মানুষের হাসি, কান্নার বাস্তব চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির কোন আয়োজন সেই অতীত থেকে বর্তমানেও নেই। বগুড়ায় সাংবাদিকতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সম্ভাবনার প্রাচুর্য থাকলেও বাধা-বিপত্তির ফলে এপথে কেহই অগ্রসর হতে পারেনি। ব্রিটিশ আমল থেকে আজাদী লাভের পর ৫টি পত্রিকার জন্ম হলেও ২টি ছাড়া ৩টি পত্রিকা জেলা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন।[২০৩]

---

১৯৮. পূর্বোক্ত।

১৯৯. পূর্বোক্ত।

২০১. পূর্বোক্ত।

২০২. পূর্বোক্ত।

সাংবাদিকতার ইতিহাসে বগুড়ায় অনেক সাংবাদিকের জন্ম হলেও নানা বিধি-নিষেধ-বিপত্তি এবং অনগ্রসরতার কারণে তারা সাংবাদিকতা পেশা থেকে সরে দাঁড়ান। আবার অনেকে জীবনের ব্রত হিসেবে সাংবাদিকতাকে জীবন সঙ্গী করে নেয়। নিম্নে বগুড়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাংবাদিকদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক : ১৯০৪ সালে বগুড়া শহরের কাটনারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতে তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বগুড়ার বাণীবভন ও উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর সাথে বহুদিন যাবৎ জড়িত ছিলেন। বগুড়ার সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি করতোয়া নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২০৪]

এ.বি.এম. ফজলুর রহমান : এ বি.এম. ফজলুর রহমান বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার কৈধোপ গ্রামে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বগুড়া জেলা পরিষদের পত্রিকা 'মহাস্থান' এর তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাক্ষিক 'খবর' পত্রিকার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি ছোট গল্প এবং কবিতা লিখতেন। তিনি বগুড়া প্রেসক্লাবের অফিস সম্পাদক ছিলেন। তার যুগ্ম-সম্পাদনায় 'সোনালী কচিকাঁচা' কিশোর সংকলন প্রকাশিত হয়।[২০৫]

রিয়াজ উদ্দিন আহমদ : রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ১৯২৪ সালে বর্তমান নওগাঁ জেলার কালিগ্রাম দোড়াঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় কলেজ হতে ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৪৪ সালে তিনি বগুড়ায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২১ বছর যাবত তিনি প্রাচীন দৈনিক আজাদের বগুড়া প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বগুড়া জেলার মুসলিম ছাত্রলীগের সহকারী সম্পাদক এবং পরে সভাপতি ছিলেন। তিনি বগুড়া প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। বগুড়াতে ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম সাংবাদিক সমিতি গঠন করেন।[২০৬]

এম. এ. হান্নান : এম.এ হান্নান ১৯২৬ সালে পূর্ব বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী রইছউদ্দিন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ . ও ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.টি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রায় ১০ বৎসরকাল তিনি বিভিন্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি এ.পি.পি.এর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন। সেন্টোর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সদস্য এবং এম.পি.পি. এর প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৬১ সালে তিনি এক সাংবাদিক শুভেচ্ছা সফরে প্রায় এক বছরকাল ইরান সফর করেন।[২০৭] করাচী রেডিও পাকের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর হামিদ নাসিম, খুরশীদুল হাসান ও হান্নান এই দলের সদস্য ছিলেন। তিনি উত্তর বাংলা সাহিত্য সংসদের কিছুদিন অস্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৬৩ হতে ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি বগুড়া জেলা সমবায় সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি Mohammad Ali (Bogra) গ্রন্থের প্রণেতা ও বগুড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকালে বগুড়া জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৩ সালে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।[২০৮]

---

২০৩. সাঈদা সুলতানা, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা: দৈনিক আজাদ ও সংবাদ এর একটি তুলনামূলক আলোচনা (১৯৪৭-১৯৭১), অপ্রকাশিত এম.ফিল, থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ১২-১৩।

২০৪. আমানউল্লাহ খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

২০৫. এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৩।

২০৬. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭০। এ.জে. এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭১।

২০৭. আমানউল্লাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৩-১৬৪; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৪।

২০৮. আমানউল্লাহ খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৬; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭২।

আব্দুর রাজ্জাক : আব্দুর রাজ্জাক বগুড়া শহরের রাজাবারে ১ জানুয়ারি ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল জব্বার চৌধুরী, মাতা- মেহেরনেগার মমতাজ। ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে দৈনিক কৃষক পত্রিকার দৈনিক স্বাধীনতার স্টাফ রিপোর্টার (১৯৪৮) ও দৈনিক সত্যযুগের স্টাফ রিপোর্টর (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫১ সালে কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা আগমন। দৈনিক সংবাদের চীফ রিপোর্টার হিসেবে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দৈনিক ইত্তেফাক, ডেইলি নিউনেশন ও দৈনিক জেহাদ এ সাংবাদিকতা করেন। ১৯৬৪ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে এ দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহকারি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বপরিবারে মুজিবনগরে গমন করেন এবং সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে দৈনিক পূর্বদেশ এর যুগ্ম-সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৬ সালে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি বি.এফ.ইউ জের সিনিয়র সহ-সভাপতির নির্বাচিত হন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'কন্যকুমারী' (১৯৬০) তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তিনি ২৫ মার্চ ১৯৮১ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[২০৯]

মনোয়ার হোসেন রিজভী : মনোয়ার হোসেন রিজভী ১৯২৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে মনোয়ার হোসেন রিজভীর উদ্যোগে বগুড়া থেকে 'খবর' পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তিনি 'খবর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এডওয়ার্ড ড্রামেটিক এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। একজন মঞ্চ অভিনেতা হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিত। দৈনিক 'ইনসাফ' দৈনিক 'মিল্লাত' প্রভৃতি পত্রিকার তিনি বগুড়া প্রতিনিধি ছিলেন।[২১০]

মোশারফ হোসেন : ১৯২৮ সালের ১ অক্টোবর বগুড়া শহরতলীর শিকারপুর গ্রামের বিখ্যাত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় কলেজ হতে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি শিকারপুর চাঁদতারা ক্লাব ও পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইংরেজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এর বগুড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডেভলপমেন্ট'র অফিসার ছিলেন। স্থানীয় প্রেসক্লাবের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদি ও হাস্যরসিক ছিলেন।[২১১]

অধ্যক্ষ এম.এ.দেওয়ান: পশ্চিম বগুড়ার ভূটিয়াপাড়া গ্রামে ১৯২৯ সালে ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান রূপে দীর্ঘদিন কাজ করার পর শেরপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। সে সময়ে জয়পুরহাট কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৬১ সালে মহসীন আলী দেওয়ান (এম.এ. দেওয়ান) ও আমানউল্যাহ খানের উদ্যোগে পাক্ষিক বগুড়া বুলেটিন পত্রিকা প্রকাশ পায়। উক্ত পত্রিকাই তখন উত্তরবঙ্গ বুলেটিন নামে খ্যাত ছিল। তিনি এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অতএব নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বগুড়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম জনমত নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বের করেন। তিনি বগুড়া প্রেসক্লাবের অনেকদিন সভাপতি ছিলেন। এর দুই বৎসর পূর্বে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বগুড়া জেলা কাউন্সিললের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে এক সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন।[২১২]

---

২০৯. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ২৭; আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৪।

২১০. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

২১১. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৬৬।

২১২. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৬৩।

কাজী এরাদুতুল্লাহ:

১৯৩১ সালে বগুড়া শহরের সুত্রাপুরে কাজী পরিবারে কাজী এরাদতুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৈনিক 'পয়গামের' বগুড়া প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। এর মাঝে তিনি দৈনিক 'জেহাদ' ও দৈনিক 'পাকিস্তান' এর বগুড়া প্রতিনিধি ছিলেন। ইনি বগুড়া প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক ছিলেন। উত্তরবঙ্গ কাজী সমিতির তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৬৩ সালে প্রাদেশিক কাজী সমিতির তিনি যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।[২১৩]

মোহাম্মদ মহসীন আলী খান:

মোহাম্মদ মহসীন আলী খান ১৯৩৪ সালে পূর্ব বগুড়ার ধনুট উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে সাংবাদিকতাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ই.পি.আই এর ঢাকা অফিসের সাব-এডিটর হিসেবে এক বছর কাজ করেন। দৈনিক পাকিস্তান এর প্রথম দিন থেকে প্রায় তিন বছরকাল সাব-এডিটর ছিলেন। সে সময়ে তিনি দৈনিক পাকিস্তানের বগুড়া প্রতিনিধি। তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী ছিলেন।[২১৪]

দূর্গাদাস মুখার্জী : দুর্গাদাস মুখার্জী ১৯৩৫ সালের ২৫ এপ্রিল বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম- রমেশচন্দ্র মুখার্জী, মাতা- লাবণ্যবালা মুখার্জী। পিতা বরিশাল জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে বগুড়ায় আসেন এবং স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি করোনেশন স্কুল হতে এস.এস.সি পাশ করেন এবং বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বাম প্রগতিশীল রাজনীতির সাতে সম্পৃক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালের কম্যুনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ড সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে একাধারে দুই দফায় এই দায়িত্ব পালন করেন। তার অসাধারণ যোগ্যতা ও যোগ্যতা ও সাংগঠনিক তৎপরতার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হন। তার সম্পাদনায় বগুড়া শহরের প্রথম দেয়াল পত্রিকা 'স্ফুলিঙ্গ' নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। তার সময়েই বগুড়া ছাত্র ইউনিয়নে মেধাবী প্রতিভাবান কর্মীর সমাবেশ ঘটে যারা পরবর্তীতে বৃহত্তর রাজনীতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ন্যাপের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে দ্বন্দের কারণে ন্যাপ বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি বামপন্থীদল ভাসানী ন্যাপে থেকে যান। বগুড়ার সংবাদপত্রের ইতিহাসের দুর্গাদাস ছিলেন একটি বিপ্লব। স্থানীয় পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদকে প্রাধ্যন্য দিয়ে পাঠকের কাছে সেই সংবাদপত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি তিনি করেছিলেন সাহসের সাথে। দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি, দৈনিক করতোয়ার বার্তা সম্পাদক, দৈনিক উত্তরাঞ্চলের সম্পাদক,বগুড়া প্রেসক্লাব ও বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। রাজনীতিতে তিনি যেন যেন শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের চিন্তা করতেন, তেমনি তার সাংবাদিক জীবনে সর্বত্রই শোষণমুক্ত চিন্তা চেতনার ছাপ পড়েছে। তিনি সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কলমকে তরবারির মত ব্যবহার করে সমাজের দুর্নীতি, অনিয়মের রিুদদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ১৯৭৬ সালের ১২ আগস্ট দৈনিক করতোয়ার আবির্ভাব ঘটলে তিনি এর বার্তা সম্পাদক হলে মানসম্মত সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু নানা কারণে দৈনিক করতোয়া কাজ করেননি। ১৯৮১ সালের ২৭ নভেম্বর দৈনিক উত্তরাঞ্চল প্রকাশ করেন দুর্গাদাস মুখার্জী। কোনদিন ভয়-ভীতি, লোভ-লালসার পথ অবলম্বন করেননি। তিনি কোন দলের হয়ে কথা বলেননি, সংবাদ আড়াল করেননি, রং চড়াননি, কোন বিশেষ দিকে পাঠকের মন পরিচালিত করেননি।

---

২১৩. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

২১৪. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক বাংলা পত্রিকাতে তিনি বগুড়া তথা উত্তরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা ছাড়াও 'শহীদ প্রফুল্ল চাকী স্মৃতি সংসদ' ও বর্ষীয়ান 'কবি রোস্তম আলী কর্ণপুরী স্মৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বগুড়া ইতিহাস গবেষণা পরিষদের অন্যতম সদস্য। নাগরিক কমিটির উদ্যোগে কবি আতাউর রহমানের শোকসভা, ডা. আব্দুর রশিদ স্মরণে শোকসভা, সপ্তাহব্যাপী শহীদ খোকন পার্কে একুশে বই মেলার আয়োজনে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রাজনীতির কারণে তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ৭-৮ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি ২০০৩ সালের ২৮ আগস্ট বগুড়া শহরে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।[২১৫]

সাইফুল বারী:

তিনি ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বগুড়া বারের খ্যাতিমান এ্যাডভোকেট আবদুল বারীর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে অর্থনীতিতে এম.এস.এস ডিগ্রি নিয়ে বিশ বছর বয়সে শুরু করেন সাংবাদিক জীবন। ১৯৪৭ সালে তিনি যোগ দেন এ.পি.পি'র ঢাকা অফিসে এবং সেখানে তিনি চীফ রিপোর্টার ও পরে নিউজ এডিটর ছিলেন। ১৯৬৩ সালে কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি রেডিও পাকিস্তানের হেডকোয়াটার করাচীতে যোগ দেন। তিনি Central Information Service এর প্রথম ব্যাচের সবচেয়ে কম বয়সী সদস্য। তিনি ১৯৫৬ সালে শিক্ষা সফরে বিলেত যান এবং সেখানে তিনি B.B.C ছাড়া ও অন্যান্য সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও কাগজে কিভাবে কাজ হয় তা দেখেন। ছাত্রজীবনে তিনি ঢাকা মুসলিম হলের পত্রিকা থেকে শুরু করে সারা দেশের পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। তার ছোটগল্প ও কবিতায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।[২১৬]

জহুরুল ইসলাম:

এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম (বগুড়া পৌরসভার একাধিকবার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান) ১৯৩৭ সালের ১০ অক্টোবর বগুড়ার কাহালু উপজেলার মুরাইলের বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেনঅ তার পিতা মরহুম কলিম উদ্দিন আহমদ ও নানা মরহুম মজিবর রহমান তরফদারও খ্যাতিমান উকিল ছিলেন। তার নানা জেলা বোর্ডের সহ-সভাপতিও ছিলেন। জহুরুল ইসলাম ১৯৬২ সালে ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বগুড়া জেলা সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সাল হতে বগুড়ার উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী হিসেবে যোগ্যতার সাথে কাজ করেছেন। রেডক্রসের তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি লায়ন ইন্ট্যারন্যাশনাল চার্টারের মেম্বার ছিলেন।[২১৭]

আমানউল্লাহ খান :

১৯৪১ সালে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার জয়লা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে সর্বদলীয় মুসলিমলীগ বিরোধী কর্মী শিবিরের শেরপুরের) চান্দাইকোণা শাখার সভাপতি নির্বাচিত । ১৯৫৮ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের বগুড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং এই সময় বগুড়ায় অনুষ্ঠিত উত্তর বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বগুড়ার সাংবাদিকদের পক্ষ হতে বগুড়ার পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকতা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৬১ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান এবং প্রাদেশিক সংসদের সদস্য নির্বাচিত।

২১৫. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭।
২১৬. আমানউল্লাহ খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।
২১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

১৯৬১ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জননিরাপত্তা আইনে বগুড়ায় গ্রেফতার হন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে বগুড়া জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৩ সালে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালের শেষে ঢাকার প্রখ্যাত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ সোনার বাংলা’র সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গের আনাচে কানাচে ঘুরে সর্বশ্রেণীর মানুষের অসংখ্য সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করেন। তাঁর বহু সংবাদ সংবাদপত্রের হেডিং হয়েছে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি সীমান্ত এলাকা সফর করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সময় হতে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল রেডিও পাকিস্তান রাজশাহীতে পল্লী উন্নয়নমূলক সংবাদ ও কথিকা পাঠ করেন। তিনি তার নিজ নামে ১৯৬১ সালে ‘দক্ষিণ-পূর্ব বগুড়া সাধারণ পাঠাগার’ শেরপুর কলেজের উদ্যোক্তা এছাড়াও বহু সমাজসেবামূলক কাজে তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৭৩ সালে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি বগুড়া প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও গ্রন্থমেলা প্রকাশনীর ম্যানেজিং পার্টনার।[২১৮]

শামসুর রহমান :

শামসুর রহমান বগুড়া শহরের সেউজগাড়ীর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঢাকার সান্ধ্যা দৈনিক ‘আওয়াজ’ এর বগুড়া প্রতিনিধি ছিলেন। উত্তরবঙ্গ বুলেটিনের ছোটদের আসর পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। সোনালী কচি কাঁচার মেলার প্রাক্তন আহবায়ক ছিলেন।[২১৯]

সিরাজুল ইসলাম:

সিরাজুল ইসলাম বগুড়া শহরের নামাজগড়ের বাসিন্দা। তিনি অধুনালুপ্ত ‘নিশান’ পত্রিকার সম্পাদক মজির উদ্দিন আহমদ এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র। বগুড়া হতে প্রকাশিত পাক্ষিক ‘খবর’ পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি এডওয়ার্ড ড্রামেটিক সমিতির সভ্য এবং নামাজগড় স্পোটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইয়ং প্রেসের স্বত্বাধিকারী।[২২০]

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক তালুকদার :

মোজাম্মেল হক পূর্ব বগুড়ার গাবতলী উপজেলার কলাকোপা গ্রামের সিরাজুল হক তালুকদারের পুত্র। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিল। দৈনিক ‘সংবাদ’ ‘দৈনিক আজাদী’ ‘পূর্বদেশ’ প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বগুড়া কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন।[২২১]

শাহ্ আনিসুর রহমান :

শাহ্ আনিসুর রহমান সারিয়াকান্দি উপজেলার বোহাইল গ্রামের আদি অধিবাসী ছিলেন। তিনি অধুনালুপ্ত ‘জিহাদ’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি জয়পুরহাটে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।[২২২]

খোন্দকার মীজানুর রহমান :

তিনি বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গুয়াগাছি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ শেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তিনি গুয়াগাছি জয়লা হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।[২২৩]

২১৮. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
২১৯. এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।
২২০. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
২২১. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।
২২২. পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭০।
২২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।

রেজাউল মোস্তফা মোহাম্মদ আসাফ উদ্দৌলা:

আসাফ উদ্দৌলা বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ধনকুণ্ডী গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার আজগর সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র। কলিকাতায় লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি জীবিকা হিসেবে সাংবাদিকতা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সহকারী বার্তা সম্পাদক রূপে দীর্ঘদিন কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য সমস্যামূলক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সারা পূর্ব বাংলায় যে কয়জন প্রথিতযশা সাংবাদিক আছেন আসাফউদ্দৌলা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৫ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার পল্লী শ্রোতাদের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করেছিলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের অন্যতম দিশারী মহামনিষী কবি মরহুম ইসলাম হোসেন সিরাজী তার মাতামহ। তিনি সাংবাদিক শুভেচ্ছা সফরে বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দেশ সফর করেন।[২২৪]

২২৪. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১; সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

পঞ্চম অধ্যায়

বগুড়া জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষা মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। যে কোন জেলার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সে অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। আলোচ্য অধ্যায়ে বগুড়া জেলার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৫.১ বগুড়া জেলার শিক্ষার প্রেক্ষাপট

পূর্বে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তখন স্থানীয় ব্যবস্থাধীনে পাঠশালা চন্ডীমন্ডপ এবং গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হতো। পরবর্তীতে মুসলমান শাসনামলে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মুসলমানদের এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মসজিদ কেন্দ্রিক আরবী, বাংলা ভাষা, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো।[১]

পরবর্তীতে সুলতানী, পাঠান ও মোগল আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন না হলেও বহু স্থানে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার কথা জানা যায়। বগুড়াতে তখনও এ শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের উপরে স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। মসজিদ কেন্দ্রিক ধর্মীয় এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোরআন পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য সর্বত্র এ শিক্ষা দেওয়া হতো। বিত্তশালী লোকেরা নিষ্কর জমি, ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করতেন। সমগ্র দেশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার পর এ দেশীয় মুসলমানদের প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।[২]

১। ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব). (সম্পা) বগুড়া জেলা গেজেটীয়ার (ঢাকা মুদ্রণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ১৯৫

২। ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব). (সম্পা) প্রাগুক্ত- পৃ.১৯৫।

এদেশে ১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজী মাধ্যমে একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন্ নব প্রবর্তিত শিক্ষানীতি তদরাকের জন্য ১৮৪২ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে বাংলাদেশে মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের উদ্ভব হয়।[৩]

১৮৮১ সালে বগুড়া জেলায় পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৭.১ এবং ০.৫। ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, প্রতি হাজারে ৯৬ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা পড়তে ও লিখতে সক্ষম ছিল। স্বাক্ষরতার হার ছিল ১৯২১ সালে ৮.৫৫, ১৯৩১ সালে ৯.৩১, ১৯৪১ সালে ১৫.৭৩, ১৯৫১ সালে ২০, ১৯৬১ সালে ১৬.৬০, ১৯৭৪ সালে ২০.৬৪, ১৯৮১ সালে ২২.৯, [৪], ১৯৯১ সালে ২৮.৪১ এবং ২০০১ সালে ৪২.৯৩। [৫]

১৯৬১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী বগুড়া শহরের শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৪৮; তার মধ্যে পুরুষ হার ছিল ৫৬.৫ এবং মহিলার হার ছিল ৩৮ জন। শিক্ষিতদের মধ্যে ৪০.৯ ভাগ প্রাথমিক স্তর ও ৩৫.৬ ভাগ মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল। ১৩.4 ভাগ ম্যাট্রিক ও ২ ভাগ ডিগ্রি পাশ ছিল। ১৯৭৪ সালে বগুড়া শহরে শিক্ষা হার ৫৬.১৩, ১৯৮১ সালে ৫৪.১, ১৯৯১ সালে ৬৩.০ এবং ২০০১ সালে ৭২.১৫। [৬]

৫.২ বগুড়া জেলার শিক্ষা বিস্তার

১৮২১ সালে থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়ে বগুড়া জেলার শিক্ষার বিকাশকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১) প্রাথমিক ২) মাধ্যমিক ৩) উচ্চতর ৪) নারী শিক্ষা ৫) বিশেষ শিক্ষা এবং ৬) মাদ্রাসা শিক্ষা। এসব শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্যের উপর গড়ে উঠে ও শিক্ষা বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। [৭]

---

৩. ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব). (সম্পা) প্রাগুক্ত-পৃ.১৯৫

৪. K.G.M Latiful Bari (ed), Bangladesh District Gazetters Bogra (Dacca : Bangladesh Government Press, 1979), p . 190.

৫. Bogra District Population Cencus Report- 1991 % 2001.

৬. Op. Cite.

৭. Government of Bengal, Reports on the public instrucation of bengal 1904-1905 (Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905), PP- 4-5 (here after report on Education)

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষা (primary Education)

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে একে প্রাথমিক, মৌলিক, প্রস্তুতিমূলক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো। ১৮৮২ সালে 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশন' (Indian Education Commission) দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করে কিভাবে এ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা যায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।[৮] কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড ও শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় সংস্থার উপর অর্পণ করা হয়। তথাপি তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করা। জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সরকারি কর্মচারী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

primary education is the instruction of the masses, through the vernacular, in such subject as will best stimulate their intelligence and fit them for their position in life. The government of India fully accepts the proposition that the active extension of primary education is one of the most important duties of the state.[9]

ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন এবং সাথে সাথে আইনি পদক্ষেপও গ্রহন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Primary education act VI of 1919) অনুযায়ী ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৯ সালে শিক্ষা আইনে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। [১০]

এ আইনকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সরকার ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ই.ই.বিস (E.E Biss) কে বাংলার প্রেসিডেন্সির মিউনিসিপ্যাল ও গ্রাম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর

---

৮. Government of Bengal, Reports of the progress of Education in Bengal, 1882 (Kolkat : Bengal Secretariat Book Depo, 1884), p. 22

৯. Government of Bengal, progress of Education in Bengal (1897-1902) (Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905), PP. 262-263.

১০. B.R. Purkait, Administration of Primary Education in west Bengal (Kolkata : Firma K.L.M. 1984), P. 45.

অনুসন্ধান চালিয়ে সুপারিশসহ রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। [১১] বিস এ সম্পর্কে দুটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তার প্রথম রিপোর্টটি ১৯২১ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এ দুই রিপোর্টে তিনি তৎকালীন সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রাথমিক শিক্ষা অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ সংস্কার ও পরিবর্তন করার সুপারিশ করেন। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ সমন্ধে তিনি একটি পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনা তিনি এভাবে স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন, যাতে প্রত্যেকটি পরিবারে শিক্ষার প্রসার ঘটে। তিনি আরও বলেন, প্রস্তাবিত স্কুলসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড) প্রত্যেক নিয়ন্ত্রধীনে রাখা উচিত এবং শিক্ষকদের নির্দিষ্ট উন্নয়নের জন্য বিস সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় সরকার ও অপর ৫০ ভাগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা লাভ করবে।[১২]

বিসের সুপারিশের আলোকে ১৯১৯ সালে বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা আইনকে সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়। এ আইন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়। এ আইন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফল শুভ হয়নি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্কুলের ব্যয়ভার বহন করার ব্যাপারে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জন্য অধিকতর কার্যকরী একটি আইনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আইনের সবচেয়ে লক্ষনীয় দিক হলো ঃ

(১)প্রত্যেক জেলায় একটি করে ‘ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড (District School Board) নামক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এ বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

(২)এ আইনে শিক্ষা কর নির্ধারণ করার ব্যবস্থা ছিল।

বগুড়া শহরে ২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি রেজিষ্ট্রার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। [১৪] ১৯৩০ সালে বগুড়া শহরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

---

১১. Ibid, P. 120.

১২. For details about the scheme see purkait, primary education, pp 119-146.

১৩. Purkait, Primary Education, pp. 187

৫.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

উচ্চতর ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে। ব্রিটিশ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। যথা উচ্চ ইংরেজী (High English), মধ্য ইংরেজী (Middle English) এবং মধ্য মাতৃভাষা (Middle Vernacular School) । উচ্চ ইংরেজী স্কুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সমমানের বিষয়াদি ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো। মধ্য ইংরেজী স্কুল উচ্চতর চার শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষা দনের ব্যবস্থা ছিল।[১৪] যেসব স্কুলে আদৌ ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হতো না সেগুলো মধ্য মাতৃভাষা স্কুল নামে অভিহিতো করা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উচ্চ মাধ্যমিক (Upper School) এবং নিম্ন মাধ্যমিক (Lower School) এ দুই স্তরে বিভক্ত ছিল।[১৫] এসব স্কুলের মধ্যে কিছু কিছু সরকারি সাহায্যে ও কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো এবং কতগুলো জেলা বোর্ড ও স্থানীয় উদ্যোগীদের অর্থ সাহায্যে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতো। নিচের সারণিতে স্কুলসমূহের শ্রেণী বিভাগ দেখানো হলো ঃ

High English School for boys and girls	Middle English school for girls	Middle English school for boys	Middle Vernacular School	Primary School
Class	Class	Class	Class	Class
X	-	-	-	-
IX	-	-	-	-
VII	-	-	-	-
VII	VII`	-	VII (M.V)	-

১৪. Report on Public Instruction, 1902-1903, P. 16.

১৫. Education in Bengal, 19025-1903, P. 33.

High English School for boys and girls	Middle English school for girls	Middle English school for boys	Middle Vernacular School	Primary School
VI	VI	VI	VI (M.V)	-
V	V	V	V (U.P)	V
IV	IV	IV	IV (L.P)	III
III	III	III	III (L.P)	III
II	II	II	II (L.P)	II
I	I	I	L (L.P)	I

M.V. Middle Vernacular, U.P = Upper Primary, L.P = Lower Primary.

Source : Government of Bengal Education Department syllabuses of studies for secondary schools for boys and girls in Bengal (Kolkata : Bengal secretariat book Depot, 1928), p. 76.

উচ্চ ইংরেজী স্কুল ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং মধ্য মাতৃভাষা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আধুনিক শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ কমে যাওয়ার মধ্য মাতৃভাষা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে জনসাধারণ ইংরেজী স্কুলের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক ১৮৯৮ সালে লেখেন যে-

Purely Vernacular education is thus as a discount, especially as all avenues to public service or professional education have been closed against the middle vernacular certificate holders. They are no longer admitted to the medical schools. The surevery schools too, requious some knowledge of English, the mukhtarship examination requires nothing short of an entrance certificate. It is only the vernacular mastership that is now open to the expupil of a middle vernacular school and even here preference is given in filling up appointments

to those who have a little knowledge of English. Naturally, therefore, the member of English and school and of pupils learning English schools are being supplanted by high English schools and middle vernacular schools by middle english schools.[১৬]

মধ্য মাতৃভাষা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে সরকার ১৯০১ সালের জানুয়ারি ১ নং প্রস্তাবে (Regulation) একটি নতুন মাতৃভাষা পরিকল্পনা (New Vernacular scheme) অনুমোদন করেন। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ শক্তি বাড়ানোর পরিবর্তে তাদের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা।[১৭]

আজকের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে আমরা যেটা বুঝি, বস্তুত তার ভিত্তি মূল রচিত হয় ১৯১১ সালের 'শিক্ষা কমিশন' (স্যাডলার কমিশন) এর রিপোর্টে। এ রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। আজ আমাদের দেশে যে পৃথক পৃথক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে তা স্যাডলার কমিশন রিপোর্টের পরস্পরায় অনুসারে সৃষ্টি ব্রিটিশ মিশনারিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতার চতুর্দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা যখন জনসাধারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তখন মফস্বলে ও এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।[১৮] তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয় ও বগুড়া জিলা স্কুল।

বগুড়া জেলার পুরাতন মাধ্যমিক স্কুলসমূহের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৪৪)

তৎকালীন স্থানীয় বিদোৎসাহী ব্যক্তিগণ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জর্জ উইলসনের (১৮৩৯-১৮৪৫) উদ্যোগে কেবলমাত্র বিদ্যালয়টির গৃহ নিমার্ণ হয়। পরে জেলা মুন্সেফ ও সদর আমিন পন্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ (১৮৪৫-১৯৪৯) এর চেষ্টায় ১৮৪৪ সালে বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব প্রথম বিদ্যলয়টি মডেল বাংলা বিদ্যলয় হিসেবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত নবাব বাড়ির রোডে স্থাপিত হয়। এরপর জর্জ উইলসন এর নামকরণ করেন গর্ভমেন্ট বাংলা বিদ্যালয়। কালক্রমে ইহা মাইনর স্কুল হিসেবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয় এবং মধ্য ইংরেজী স্কুল হিসেবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয়। রুপান্তরের ধারায় ১৮৬০ সালের পরে কোন এক সময় ইহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হিসেবে প্রথম থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত খোলা হয় এবং বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চলছে। নবাব বাড়ী রোড থেকে স্কুলটির ভবন সাতমাথার যেখানে বর্তমান

---

১৬ Report on Public instrucation 1998-99, P. 61.

১৭ See letter no. 563/25 Communicated to the D.P.I, E.B. and Assam dated 1.8.07 Kumudini Kanta Banerji, Prinicipal Rajshahi (Manuscript).

১৮ দূর্গাপদ রায়, খুলনা শহর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (১৮৪১-১৯৮৪) অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, (রাজশাহী : ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪), পৃ. ১৮২।

সপ্তপদী মার্কেট যেখানে স্থাপিত হয় এবং পরে বর্তমান পৌর পার্ক সংলগ্ন রাস্তার দক্ষিনে পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বগুড়া শহরের মধ্যে এ বিদ্যালয়ইটিই প্রথম উচ্চ বিদ্যালয়।[১৯]
উল্লেখ্য যে, ১৮৪৭-১৮৮৭ সালে পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের নাম না পাওয়ার কারণে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বিদ্যালয়টি গরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ভস্মিভূত।

বগুড়া জিলা স্কুল (১৮৫৩)

ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে ইংরেজ সরকার ভারতীয় (প্রাচ্য) শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির দিকে মনোনিবেশ করতে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী না ভারতীয় ভাষা হবে এ নিয়ে সামাজিক তর্ক ও দ্বন্ধ চলতে থাকলে নব্য ভারতর অবিসংবাবিদত নেতা রাজা রাম মোহন রায় পাশ্চত্য শিক্ষার পক্ষে মত দেন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি লর্ড আমহার্স্টকে মত জানিয়ে এক ঐতিহাসকি চিঠি লিখেন এবং দীর্ঘ অচলবস্থার পর ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ লর্ড বেন্টিংক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করার পক্ষে রায় দেন। এ ঘোষণার ফলে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী ৫ বছরে বাংলাদেশে স্কুল কলেজের সংখ্যা ৩ গুন বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ আরো ঘোষণা করেন যে সরকারি চাকুরী পাওয়ার জন্য ইংরেজী শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ১৮৫৩ সালের পূর্বে বগুড়ার জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিভাবে, কোন সময় বাবু হরগোপাল দাসকুন্ড[২০] ও বাবু জয়নাথ মজুমদার এ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কম ছিল এবং কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে ও যত্নে বিদ্যালয়ের কাজ কোন রকমে চলত। এমনকি এক পরিস্থিতিতে

---

১৯. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, বগুড়া শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৮২১-২০০৬), অপ্রকাশিত পি.এই.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-২০১৩।

২০. হরগোপাল দাসকুন্ডু (১৮৬০-১৯৩৫) : বগুড়ার শেরপুর শহরে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম শ্রী কালীচরণ দাসকুন্ডু। তিনি রংপুরে মাতুরায়ের সময় বসবাসের কারণে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় তার লেখা প্রাকাশিত হতো। এই পরিষদ তার লেখা শেরপুরের ইতিহাস (১৯১২) গ্রন্থটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। পৌন্ডবর্ধন ও করতোয়া (১৯১৮) নামে গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে পরলোকগমন করেন। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, বগুড়া চরিকোষ (ঢাকা : বাংলার মুখ, ২০১১), পৃ. ৩৪১-৩৪২।

১৯৫৩ সালে বিদোৎসাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মি. রাসেল এর প্রচেষ্টায় ও তদানীন্তন ডেপুটি কালেক্টর বাবু সূর্য কুমার মূখোপাধ্যায় এর অশেষ পরিশ্রমে এ বিদ্যালয়টি গর্ভমেন্টের তত্বাবধানে গৃহিত হয় এবং `Bogra Government High English School' নামে প্রকাশিত হয়।
সরকারি হওয়ার সাথে বিদ্যালয়টির উন্নতি হতে থাকে। এ সময় বঙ্গের অন্যতম সুসন্তান ও সুপন্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পিতা বাবু ভগবতী চরণ ঘোষ এর প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এসময় বগুড়ার বাবু কিশোরীলাল রায় এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি তাঁর Free Enquiry after truth' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ভগবতী বাবু সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন।

In 1853 a Government English school was established here and I obtained my entrance into it. My progress in this institute has been remarked by its first and best if its headmasters that ever were, to have been remarkably rapid. Be it said with deep respect and gratitude that under the judicious tuition of babu bhagabati charan Ghosh I obtained a useful knowledge of the english language within about four years and a half. I have always
Thought Bhagabati to be one of my greatest benefactors on earth and will think so for ever also. [২১]

ভগবতী বাবুর সময় এই ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬৫ সালে Bogra Government High English School এর নাম পরিবর্তন করে Bogra Zilla School রাখা হয়। এ সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন পার্বতিচরণ রায় বি.এ। ১৮৭৩ সালে স্কুলে ৬ জন শিক্ষক, ১ জন মৌলভী, ১ জন হিন্দু পন্ডিত ছিলেন। স্কুল গৃহটি সূত্রাপুরের ব্রক্ষসমাজ মন্দিরের নিকটে ছিল। এটি ১৮৮১-৮৫ সালে বর্তমান স্থানে স্তান্তারিত হয়। তৎকালীন হেড মাস্টার বাবু শ্রী গিরিশ চন্দ্র মিত্র এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্কুল গৃহটি ইটের তৈরী পাকা বিল্ডিংয়ে নির্মিত হয়। ১৮৮২ সালে শেরপুরের জমিদার তৎকালীন লেফটেন্যন্ট গর্ভনর স্যার রিভার থমসন (Thompson) এর নামে বিদ্যালয়ের মূল ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে (সাতমাথার কোলে ঘেঁষে) একটি থিয়েটার হলো নির্মাণ করেন। এ থিয়েটার হল কালক্রমে বিদ্যালয় পাঠাগারে রুপান্তরিত হয়। ১৯০৭-০৮ সালে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৬৩ জন এবং তার মধ্যে ২১৮ জন হিন্দু ও ১৪৫ জন মুসলিম। শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৪ জন। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯১৯ সালে বিদ্যালয়ের একটি দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্মিত হয়।[২৪]

২১ মহি উদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), উন্মোষ, বার্ষিকী ২০১০, বগুড়া জিলা স্কুল, পৃ. ৯৪-৯৫।

২২ মহি উদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.) প্রাগুক্ত-পৃ.৯৫।

১৯৪৭ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪১৮ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৭ জন। ১৯৭১-৭২ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫০ জন এবং ৬০৭ জন। ১৯৭৭ সালে বগুড়া জিলা স্কুলে 'ডাবল শিফ্‌ট' চালু হয়। প্রভাতী শাখায় শিক্ষক ছিলেন ১৪ জন তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেনীর মোট ৯টি শাখা নিয়ে প্রভাতী শাখা খোলা হয়। আর সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেনীর ১২টি শাখা দিয়ে দিবা শাখা খোলা হয়। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০০০ জন।

বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন (১৯১২)

বগুড়া শহরে দু'টি সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯১০ সাল থেকে করোনেশন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগ গ্রহনের ফলে বগুড়ার জমিদার নবাব আলতাফ আলী চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় শহরের কাটনারপাড়া মৌজায় শহীদ তারেক রোড সংলগ্ন প্রায় ৪ একর জমির উপর ০১.০২.১৯১২ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চম জর্জের নামানুসারে এ স্কুলের প্রথম নাম ছিল জর্জ স্কুল।১৯১২ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোয়িার অভিষেক এর সময়ে স্কুলটির স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরদাকান্ত তালুকদার, মরহুম আব্দুস সোবহান চৌধুরী, খান বাহাদুর হাফিজুর চৌধুরী[২৩], মরহুম খান সাহেব রিয়াজ উদ্দিন কাজী[২৪], মরহুম কুদরতউল্লাহ তালুকদার ও খান বাহাদুর কোরবান উল্লাহ এবং রমজান পাইকার। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নওগাঁ শহরের বাবু পিয়ারী মোহন সান্ন্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রায় সমস্ত অর্থ তিনিই দিয়েছিলেন। প্রমাণস্বরুপ স্কুলের প্রধান দেয়ালে শ্বেত পাথরে খোদাই করা তাঁর নাম এরুপ খেলা আছে।

---

২৩. খান বাহাদুর রহমান চৌধুরী (মৃ; ১৯৩৮) : বগুড়ার সাতানি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মুন্সী আব্দুল হাফিজ মানিকগঞ্জ জেলার মাচান গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং বিবাহ সূত্রে বগুড়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। মাতা সালেমা সায়দাতননেছা সাতানি জমিদার পরিবারের কন্যা। তার মাতা উক্ত জমিদারির মালিকানা প্রাপ্ত হন। তিনি সর্বসাধারণের নিকট সাতানি মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গভর্নমেন্ট মনোনীত সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালে বগুড়ায় ইয়ং ম্যানস্ মুসলিম এসোসিয়েশন নামে একটি জকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় (ঊনপঞ্চাশের আকাল) প্রায় ১১০০ রেওয়ারিশ ও দু:স্থ মানুষের মৃতদেহের দাফনের ব্যবস্থা করেন। তার তিনপুত্র ছিল। প্রথম পুত্র আহমাদুর রহমান চৌধুরী (বুলু মিয়া) পাকিস্তান আমলে আয়ুব খান সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পাল করেন। তৃতীয় পুত্র মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (পুটু মিয়া) বগুড়া থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। তিনি ১৭ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেন। দ্রঃ এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার, দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (বগুড়া : প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭০), পৃ. ৪।

২৪. সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন কাজী (১৮৫৯-১৯২৫) : ১৮৫৯ সালে তৎকালীন বগুড়া জেলার (জয়পুর হাট) ক্ষেত্রলাল উপজোর কাজীপাড়া গ্রামে সম্রান্ত মুসলিম পরিবার জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বগুড়া জেলার মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রাজুয়েট এবং বারের দ্বিতীয়

Pyri Mohan Sanyal

To commerorate the name of Babu Mohan Sanyal of Par Naogoan. District Rajshahi Who contributed for the costrucation of the school building.

শহরের কয়েকজন শিক্ষিত ও বিত্তশালীদের দ্বারা একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয় এবং নিমার্ণ কাজ করা হয়। স্কুলটি নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন রমজান উদ্দিন পাইকার। তার নাম স্কুল ভবনের গায়ে খোদাই করে লেখা হয়েছে এভাবেঃ Contractor, Ramjan Uddin Paiker-1915.

১৯১৭ সালের মধ্যেই করোনেশন স্কুলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক আবাসিক ও ডাইনিং এর ব্যবস্থা ছিল। এখানে ১০০০০ গ্রন্থ সংরক্ষিত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। দেশ বরেণ্য অনেক শিক্ষার্থী এ স্কুলকে অলংকৃত করেছেন। তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালের ব্যাচের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পুত্র মুর্তজা বশিরের (বকুল) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৫] স্কুলটি ১.০৬.১৯৮৫ সালে সরকার কর্তৃক এমপিওভূক্ত হয়। ২০০৫ সালে থেকে পে- শ্রেণী হতে পঞ্চম এবং একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়।

মুসলমান উকিল হিসেবে ১৮৯১ সালে বগুড়া বারে যোগদান করেন। ১৮৯৭ সালে বগুড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯২১ সাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১২ সালে করোনেশন ইনস্টিটিউশন স্কুল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিজ গ্রামে কাঝী পাড়াসহ অত্রাঞ্চরে মসজিদ, পুকুর খনন সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজের জন্য তদান্ত্রীন সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' খেতাবে ভূষিত হন। ১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি নি:সন্তান ছিলেন। বগুড়া শহরের সূত্রাপুর তার বাসস্থান সংলগ্ন সড়কটি রিয়াজ কাজী লেন নামকরন করে (বগুড়া পৌরসভা) তার স্মৃতিতে স্মরণীয় করে রেখে। দ্রষ্টব্য : এ.জে.এম শামসুদীন স্বপন (সম্পা.), বগুড়া জেলা এডভোকেট বার সমিতি ১০০ বর্ষ পুর্তি উৎসব (১৮৯২-১৯৯২) স্যুভেনীর।

২৫. বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন এর শতবর্ষের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, মো: বদরুল হুদা, মাহবুব আহমেদ ববি (সম্পা.) বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন এন্ড কলেজ এর শতবর্ষ উদযাপন, উৎসব, মার্চ- ২০১১, পৃ. ২৫-৩১।

বগুড়া সেন্ট্রাল হাই স্কুল (১৯৫৫)

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে এ গুপ্ত এর সভাপতিত্বে বগুড়া থিয়েটার হলে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্য সভা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করেন যা বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা থেকে দক্ষিণে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন সূত্রাপুরে অবস্থিত। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় বগুড়া সেন্টাল মাদ্রাসা ।[২৬]

প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হল। তহবিল গঠন ও মাদ্রাসাটি পরিচালনার জন্য মাসিক চাঁদা হিসেবে যারা প্রাদন করতেন তারা হলো ঃ

১.	নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী	৩০ রুপি
২.	মেমোরিয়াল স্টেট মোতওয়াল্লি	১০ রুপি
৩.	আঞ্জুমান ইসলামিয়া	১০ রুপি
৪.	সৈয়দ মেয়াজ্জেন হোসেন চৌধূরী, শিবগঞ্জ	০২ রুপি
৫.	মৌঃ তোজাম্মেল আলী চৌধুরী, তালোড়া	০১ রুপি
৬.	মৌঃ রিয়াজ উদ্দিন কাজী	০১ রুপি
৭.	মৌ খোরশেদ আলী চৌধুরী	০১ রুপি
৮.	বাবু ক্রীশনান্দ্রনাথ সরকার	০২ রুপি
৯.	মৌঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী	০১ রুপি
১০.	শাহ নিজাম উদ্দিন আবুল হোসেন জমিদার	০২ রুপি
১১.	সৈয়দা মাহমুদা খাতুন সাহেবা	০১ রুপি
১২.	মৌঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী	০১ রুপি
১৩.	উকিল বার লাইব্রেরী	০৩ রুপি
১৪.	মৌ . হানিফ উদ্দিন শেরেস্তাদার	০১ রুপি

২৬. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, বগুড়া শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮২১-২০০৬, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এরপর ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসাটি ভালভাবে চলছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব কমে যাওয়ায় ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল বারী মহোদয়ের সূদুরপ্রসাবী চিন্তাভাবনা এবং এলাকার চাহিদা মোতাবেক মাদ্রাসাটির নাম পরিবর্তন করে বগুড়া সেন্টাল হাই স্কুল রুপান্তর করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠনটি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত খোলা ছিল। ১৯৯০ সালের পর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত চলে আসছে।

বগুড়া মূক-বধির বিদ্যালয় (১৯৩৯)

কুমিল্লা জেলার অধিবাসী শ্রী নকলেশ্বর চক্রবর্তী ভারতের এলাহাবাদ থেকে শ্রবন প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ নিয়ে বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা নামক স্থানের আব্দুল জব্বার সড়ক সংলগ্ন একটি মাটির বাড়ী নিয়ে ১৯৩৯ সালে বগুড়া মূক-বধির বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো যে সকল ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন তারা হলেন বগুড়া আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কে এস মোবারক আলি (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বগুড়া জিলা স্কুল) বগুড়া সমবায় সমিতির সহকারি রেজিষ্ট্রার মৌলবী আবদুল জব্বার ও মৌলবী কলিম আহম্মদ প্রমূখ। সেই সময় আজিজুল হক কলেজের প্রফেসর অতুল চন্দ্র এ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী পদটি বগুড়ার বিশিষ্ট সমাজ সেবক ডা. ইয়াছিনের নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলটিতে রুম সংকট দেখা দেয়। এ সময়ে সেক্রেটারী ডা. ইয়াছিন এবং গন্যমান্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শহরের দক্ষিণে লতিফপুর মৌজায় জায়গা ক্রয় করা হয়। উক্ত স্থানে মিউনিসিপ্যালিটির ভাগাড় (ময়লাখানা) এবং এর আশেপাশে পুকুরপাড়সহ অনেক জায়গা ক্রয় করা হয়। এ ফলে স্কুলটির জয়াগার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ একর। পরবর্তীতে জলেশ্বরীতলা থেকে স্কুলটি বর্তমান শেরপুর রোড, কলোনী তাজমা সিরামিক সংলগ্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। সে সময় উক্ত স্কুলটি সমগ্র পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) ইহা দ্বিতীয় বিদ্যালয়রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র উত্তরবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে শিশু শ্রেনী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস খোলা ছিল। ১৯৮২ সালে অষ্টম শ্রেণী খোলা হয়। স্কুলটির বয়স অর্থ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আজও সরকারিকরণ করা হয়নি। শেরপুর রোড সংলগ্ন ৪০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলের ভিতরে (অস্থায়ী) কাঁচা বাজার স্কুলের আয়ের উৎস। খেলা-ধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্কাউট সহ সবগুলো অনুষ্ঠানই যথাযথভাবে পালিত হয়।

ফয়েজুল্লা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৮)

বগুড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তে লতিফপুর নামক মহল্লায় জনবসতি এলাকার এক নিভৃত স্থানে ১৯৬৮ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আধুনিক বগুড়ার রুপকার, বগুড়ার কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম ডা. মো: ইয়াছিন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জমি দান করেছেন। জমির পরিমাণ প্রায় ৪ একর। বর্তমান শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ২৩ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৬১ জন।[২৭]

দারুল ইসলাম নৈশ উচ্চ বিদ্যলয় (১৯৬৮)

বগুড়া শহরের শহীদ খোকন সড়ক সংলগ্ন মালতীনগর মৌজার ১৯৬৮ সালে দারুল ইসলাম নৈশ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের গরীব, কর্মজীবী ছেলেমেয়েরা এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। প্রতিষ্ঠানের ৫ শতক জায়গা (শহরের নামাজগড়ে) কেনা থাকলেও কোন নিজস্ব ভবন নেই। মালতীনগরের টাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ০১.০৬.১৯৮৫ সালে এমপিওভূক্ত হয়। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তারা হলেন- ইব্রাহীম নগরী, এ্যাডভোকেট এনামুল হক এবং আবদুল হামিদ খান। প্রথম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মো: ইসমাইল হোসেন।

মালতীনগর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৯)

বগুড়া শহরের মালতীনগর মৌজায় শান্তিবাগ এলাকায় ১৯৬৯ সালে মালতীনগর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্কুলটির জমির পরিমাণ ০.৯৮ শতাংশ। স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রগন্য ছিলেন তারা হলেন মরহুম আজিজুল হক মোল্লা, (সাবেক সংসদ সদস্য বগুড়া- ৪), মরহুম মকবুল হোসেন ঠিকাদার, মরহুম কাজেম আলী ঠিকাদার, মরহুম শফি উজ্জামান মন্ডুল ঝিনা, , ফজলে রাব্বি লোহানী

---

২৭. শফিকুল আলম সৈয়দী ও অধ্যাপিকা রাফিনা আহমেদ, জেলা পরিচিতি, প্রথম খন্ড, (বগুড়া : সাদ প্রিন্টির্স এন্ড সায়িদ প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৭;

এবং জহিরউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন আব্দুল মোত্তালেব। স্কুলটি ০১.০৬.১৯৮৫ সালে এমপিওভূক্ত হয়।

সুবিল উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০)

বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী মৌজায় সুবিল খালের উত্তর পার্শ্বে ১৯৭০ সালে সুবিল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জায়গার পরিমান ৬৭ শতাংশ। আলহাজ্ব শামসুদ্দিন হায়দার ও নিজাম উদ্দিন হায়দার স্কুলটির উদ্যোক্তা এবং জমি দান করেছেন। ১৯৮৫ সালে স্কুলটি এমপিওভূক্ত হয়। শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১৫ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩০৫ জন। প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মুহা. ইদ্রিস আলী।

প্রি ক্যাডেট হাই স্কুল (১৯৭৬)

বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা শহীদ আব্দুল জব্বার সড়ক সংলগ্ন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সুত্রাপর মৌজার ০২.০১.১৯৭৬ সালে প্রি ক্যাডেট হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির জমির পরিমাণ ৩১.৫০ শতক। তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল আলম ও আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ খানে আলম খান, ডা. ইয়াছিন, এ্যাডভোকেট রাজ্জাক-উল-হাইদার[২৮], এ্যাডভোকেট এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান[২৯]

---

২৮. এ্যাডভোকেট এম.এ.রাজ্জাক-উল-হাইদার (জন্ম ১৯৩৫) : ১৯৩৫ সালে বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার সোনামুখী গ্রামে জন্মগ্রহন কনে। তার পিতার নাম ময়েজউদ্দিন তালুকদার মাতা আলীফা খাতুন। তিনি ১৯৫৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। ২১ জানুয়ারী ১৯৬১ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে ১ মার্চ ১৯৬১ সালে বগুড়া বার সমিতিতে যোগদান করেন। বগুড়া বারের দেওয়ানী আদালতের একজন খ্যতিমান আইনজীবী। তিনি বগুড়া বার সমিতির একাধিকবার নির্বাচিত সভাপতি এবং বগুড়া আইন কলেজের শিক্ষক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন ও নানাভাবে সহযোগীতা করেন। সামাজিক কর্মকান্ডে তার অনেক অবদান রয়েছে। দ্রঃ বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি, সাধারণ শাখার Enrolment Vol-I থেকে সংগৃহীত; এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪২।

২৯. এ্যাডভোকেট এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কানুপুর গ্রামে ৩১ জুলাই ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ আলী। তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এল.এল.বি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে বগুড়া বার সমিতিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে তালিকা ভূক্তি হন। তিনি সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) বগুড়া সাবেক সাধারণ সম্পাদক-বগুড়া বার সমিতি, পরিচালক-বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লিগ্যাল এ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ব্যাংক, সভাপতি-বগুড়া আর্ট কলেজ ও নুনগোলা কলেজ, সহ-সভাপতি বগুড়

স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপরে অগ্রগণ্য ছিলেন। প্রথমে ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেবী শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত ক্লাস চালু করা হয়, ১৯৯০ সালে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত খোলা হয়। ১৯৯১ সালে নমব ও দশম শ্রেনী একসাথে খোলা হয় এবং ১৯৯২ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বেবী প্রথম দ্বিতীয় শ্রেনী বিলুপ্ত করা হয় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত ক্লাস চালূ আছে। স্কুলটি ০১.০১.১৯৯৪ সালে এমপিওভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন হাফেজ মোঃ আব্দুল গাফ্ফার।

আলোর মেলা কে.জি এন্ড হাই স্কুল (১৯৭৯)

বগুড়া শহরের কালিতলায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন মৃত এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান (সাবেক এমপি) ও মৃত আব্দুল জব্বার পাইকার এবং তৎকালীন জেলা প্রশাসক শহিদুল আলম এর সহযোগীতায় ১ মার্চ ১৯৭৯ সালে আলোর মেলা কে.জি এন্ড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। জমির পরিমান ১ একর। স্কুলটিতে প্রথমে নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত খোলা হয়, পরবর্তীতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেনী পর্যন্ত খোলা হয়। ১৯৯২ সালে প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে স্কুলটি এমপিওভুক্ত হয়। নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা স্কুলের নিজস্ব আয় থেকে দেওয়া হয়।

বগুড়া ওয়াই.এম.সি.এ পাবলিক স্কুল (১৯৯০)

বগুড়া শহরের শেরপুর রোডের পার্শ্বে ভাইপাগলা মাজার সংলগ্ন মালতিনগর ঠনঠনিয়া যৌথ মৌজায় ৭৪ শতাংশ জায়গার উপর ১৯৯০ সালে বগুড়া (Young Men’s christian Association)

জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বগুড়া, সাবেক ডাইরেক্টর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ বগুড়া সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৪ সালে বগুড়া পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়। তিনি ১৯৯৫ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা বি.এন.পির (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) সভাপতি ছিলেন। সুত্রঃ এ্যাডভোকেট মোঃ মজিবর রহমান, পৌরসভার তথ্য ও চেয়ারম্যান পরিচিতি (ঢাকা : বাণিজ্যিক বার্তা(প্রাঃ) লিঃ, ২০০৫), পৃ.৮০; আমিনুল ফরিদ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

ওয়াই.এম.সি.এ পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট রবিন মারাজী। কে.জি পে-শ্রেনী হতে দশম শ্রেনী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে। দুই শিফটে ক্লাস চলে প্রভাতী এবং দিবা শাখা। শিক্ষক সংখ্যা ৮৬ জন, কর্মকর্তা ১০ জন এবং কর্মচারী সংখ্যা ১৫০ জন কর্মরত আছে। স্কুলটি সরকারী বিধি মোতাবেক এমপিওভুক্ত নয়। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ভাতা বগুড়া ওয়াই.এ.সি.এ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

উত্তরণ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৯০)

বগুড়া শহরের গাবতলী রোড সংলগ্ন নারুলী মৌজায় ১.৩০ একর জায়গার উপর ০১.০১.১৯৯০ সালে উত্তরণ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির দাতা ছিলেন মোঃ ফজলুর রহমান এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন মোঃ নূরুল ইসলাম ওমর, অধ্যক্ষ কে বি এম মুসা, মৃত মতিউর রহমান, ডাক্তার মকবুল হোসেন এবং ভাষা সৈনিক মৃত সাদেক আলী। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন মোঃ আলতাফ হোসেন প্রধান। ১৯৯৪ সালে স্কুল এমপিওভুক্ত হয়। শিক্ষক সংখ্যা ১৬ জন এবং কর্মচারী সংখ্যা ৩ জন।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, জাহাঙ্গীরাবাদ (১৯৮৪)

বগুড়া শহরের সাতমাথা হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের গা ঘেঁষে জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্টমেন্টের উত্তর পশ্চিম কোনে পতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিদ্যালয়টি। এ উচ্চ বিদ্যালয়টি পূর্বে গোহাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ১৯৮৪ সালে স্থাপিত হয়েছি আজকের ক্যান্টমমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল জাহাঙ্গিরাবাদ। তখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছিলেন। তৎকালীন এরিয়া কমান্ডর মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম পিএসসি। ১৯৮৮ সালে বিদ্যালয়টি উন্নীত হয় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৮৯ সালে এখানে শুরু হয় উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করে।

বিদ্যালয়টির বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৫ জন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীর সংখ্যা ৮ জন।

৫.৫ উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education)

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় এ দুই শ্রেনীর কলেজ ছিল। প্রথম শ্রেনীর কলেজে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদান এবং কখনও কখনও এম এ ও এম এস সি ডিগ্রী প্রদান করা হতো। দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেয়া হতো। মাধ্যমিক স্কুল

থেকে দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজ এবং সেখান থেকে প্রথম শ্রেনীর কলেজে উন্নীত হওয়া এভাবেই অধিকাংশ কলেজ বিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ব্যক্তিগত তহবিল অথবা সরকারি সাহায্যে কলেজগুলো পরিচালিত হতো।[৩০]

বাংলায় স্থাপিত কলেজসমূহের অধিকাংশই ছিল দ্বিতীয় শ্রেনীভুক্ত। প্রথম শ্রেনীর কলেজের সংখ্যা ছিল খুব অল্প। সাধারণত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অসম্পুর্ণ ছিল এবং এগুলোতে ঘর ও শিক্ষকের অভাব ছিল। সরকারি কলেজেরই ছিল এ অবস্থা। বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা ছিল আরও করুণ এবং নিয়মিত পরিচালনা করাও ছিল অসুবিধাজনক। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর স্যার ল্যান্সিলোট হেয়ার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন প্রকৃত সন্তোষজনক নয়। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি কলেজসমূহের অবস্থা চিল বেশী শোচনীয়[৩১]।

বগুড়া জেলার উল্লেখযোগ্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সরকারি আজিজুল হক কলেজ (১৯৩৯)

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন হলেও বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত বগুড়ায় উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বগুড়া জেলার শিক্ষার্থীদের রাজশাহী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং নিকটস্থ অন্যান্য কলেজে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। এ সুযোগ কেবল সে সময়ের জমিদার, ভূ-স্বামী এবং অন্যান্য ধনী সম্প্রদায়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে মধ্যবিত্তসহ অপরাপর নিম্নসম্প্রদায়ের জন্য বগুড়া শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে।[৩২] উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ৪ এপ্রিল বগুড়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি

৩০. Report on Public Instruction, 1904-05, PP. 4-5

৩১. M.K.U. Molla, The Province of Eastern Bengal and Assam, Unpublished Ph.D. Thesis, (Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi university, (1981), pp. 161-162.

৩২. আতাউর রহমান মিঠন, প্রসঙ্গ : আজিজুল হক কলেজ (বগুড়া : হেলাল প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ১৩ : এ.জে.এম সামছুদ্দীন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩।

এবং মৌলভী আব্দুস সাত্তার তরফদারকে[৩৩] সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ডা. মফিজ উদ্দীন, ময়েন উদ্দীন পাইকার, ময়েন উদ্দীন প্রামাণিক, রফাতুল্লাহ, ডা. হাবিবুর রহমান, বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়[৩৪], নবীর উদ্দিন তালুকদার[৩৫] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তবে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য শহরের ফুলবাড়ি মৌজার ৩৫০১, ৩৫০২ ৩৫০৪, ৩৫০৬ দাগ নম্বরের জমি ২৪.০৬.১৯৩৮ তারিখে এবং ৩৫৫০ দাগ নম্বরের জমি ২৭.০৬.১৩৯৮ তারিখে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলীসহ উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে দানপত্র (অর্পণনামা) লিখে দেওয়া হয়। ২৪.০৬.১৯৩৮ সালে যাদের দানকৃত জমির উপর ফুলবাড়ি মৌজায় কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তারা হলেন[৩৬] ঃ

ক্র।	দাতা	মৌজা	জমির পরিমান (একর)	জমির মূল্য
১।	ময়েন উদ্দিন পাইকার	ফুলবাড়ি	০.০৬	২০/-
২।	মিছু প্রামাণিক	ফুলবাড়ি	০.০৫	৩০/-
৩।	মনির উদ্দিন সোনার	ফুলবাড়ি	০.২৪	১০/-
৪।	হাবিবুর রহমান ও হাফিজ উদ্দীন	ফুলবাড়ি	০.৫১	৩৬/-
৫।	মানিক উদ্দিন ও হাফিজ উদ্দিন	ফুলবাড়ি	০.১০	০৬/-
৬।	রহিম উদ্দিন ও কলিম উদ্দিন	ফুলবাড়ি	০.১১	০৬/-
		মোট =	১.০৭ একর	১০৮/- টাকায়

৩৩. আব্দুস সাত্তার তরফদার (১৯০১-১৯৭৭) : ১ জানুয়ারী ১৯০১ সালে বগুড়া জেলার সায়িাকান্দী উপজেলার নারচী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুর রহমান তরফদার, তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯২২ সালে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২৬ সালে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বগুড়া আজিজুল হক কলেজের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৭ সাল মৃত্যুবরণ করেন। দ্র ঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।

৩৪. পূর্ণ চন্দ্র রায় (১৮৭১-১৯৪৩) : ২৫ জুলাই ১৮৭১ সালে বগুড়া শহরের শিববাটীতে জন্মগ্রহন করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য ১৯২৮ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কারাবরণ করেন। ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে ১৫ আগস্ট ১৯৪২ সালে ‘তাম্রপত্র’ সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি প্রথমে বগুড়া পৌরসভার প্রেসিডেন্ট ও পরে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান অবস্থায় তিনি ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আমিনুল ফরিদ (সম্পা.), উন্নয়ন স্মরণিকা ২০১০, বগুড়া পৌরসভা পৃ. ৩১।

৩৫. নবীর উদ্দিন তালুকদার (১৮৯৫-১৯৬৭) : বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার মহিষমুণ্ডা গ্রামে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ সালে বগুড়া বারে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে বগুড়ায় মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসেবে কিছু সময় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ৬ এপ্রিল ১৯৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তথ্যসূত্র : এ.জে.এম শামসুদ্দীন স্বপন (সম্পা.), প্রাগুক্ত, আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, ১৭৩।

৩৬. ঐতিহ্যবাহী সরকারী আজিজুল হক কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রকৌশলী মোঃ আবু তৈয়ব রোকন (সম্পা.), ডিজিপিডিয়া, প্রকাশনায়, আইসিটি সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া, পৃ. ১৬।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত জমি পাওয়া গেলেও দাতারা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ শর্তে জমি দান করেছিলেন যে, দানকৃত জমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলেজ অন্যত্র স্থানান্তর হলে জমির মালিকেরা বা এর বংশধরেরা জমি ফেরৎ পাবে বা কলেজ কর্তৃপক্ষ জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। এজন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে দ্রুত শক্তিশালী করার জন্য ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭.০০ টায় প্রজাবন্ধু রজিব উদ্দিন তরফদারের সাতমাথাস্থ 'প্রজা সমিতি' কার্যালয়ে স্থানীয় সুধীবর্গের এক বৈঠক অনষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বগুড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন-

সভাপতি	:	খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী এমএলএ
সহ-সভাপতি	:	রজিব উদ্দিন তরফদার
সহ-সভাপতি	:	বাবু নলিনী চন্দ্র চক্রবর্তী এম.এ.বি.এল[৩৭]
সহ-সভাপতি	:	জমিদার পূর্ণ চন্দ্র রায়
সহ-সভাপতি	:	খান বাহাদুর কোরবান আলী
সাধারণ সম্পাদক	:	মৌলভী মোঃ ওসমান গনী এম.এ[৩৮]
সদস্য	:	মৌলভী দবির উদ্দিন আহমেদ
সদস্য	:	নবীর উদ্দন তালুকদার এ্যাডভোকেট
সদস্য	:	বাবু রনেশ চন্দ্র বি এল
সদস্য	:	ডা. কছির উদ্দিন তালুকদার এম.বি

৩৭. এ্যাডভোকেট নলিনী চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৮৩-১৯৬৩) : বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপাজেলার কুসুম্বী গ্রামে ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯০৯ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে বগুড়া বারে যোগদান করেন। বগুড়া পৌরসভার ১৯৩২ সালে পেসিডেন্ট এবং ১৯৩৯ হতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বগুড়া বারের ৩ বার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৪০ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৫২ হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পর পর ৪ বার সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে বগুড়া শেহরে পরলোকগমন করেন। দ্রঃ আমিনুল ফরিদ (সম্পা,), প্রগুক্ত, পৃ.৩১

৩৮. মোঃ ওসমান গনী: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দী উপজেলার কাশাহার গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতার নাম শরবেস মুন্সি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজিতে সম্মান এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েও গ্রহণ করেননি। ১৯৩৫ সালে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে বগুড়ায় ফিরে আসেন। বগুড়ায় উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন কলেজ না থাকায় সর্বপ্রথম তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে আজিজুল হক কলেজ (ইন্টার মিডিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি শহর ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে ছাত্র ভর্তি ও তাদের জায়গিরের ব্যবস্থা করেন। কলেজের অর্থ সংগ্রহের জন্যও তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহন করেন। তিনি ১৯৩৮-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কলেজ পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে জটিলতা ও কোন্দলের কারণে তিনি সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অধ্যক্ষ হিসেবে তাকে অনুরোধ করলে তিনি কলেজের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ও অফিস সুপারিনটেনডেন্ট পদে আমৃত্যু পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১১ আগষ্ট ১৯৫৪ সালে বগুড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৫।

সদস্য	:	ডা. মোজাফফর রহমান এম.বি[৩৯]
সদস্য	:	সৈয়দ দেলওয়ার আলী চৌধুরী বি.এল
সদস্য	:	আব্দুস সাত্তার তরফদার বি.এল
সদস্য	:	আব্দুল বারী বি.এল
সদস্য	:	বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এম এ বি এল
সদস্য	:	হিমাংশু রায় এম এ বি এল
সদস্য	:	মোবারক আলী
সদস্য	:	হযরত আলী
সদস্য	:	মুজিবুর রহমান
সদস্য	:	বাবু শিব চাঁদ আগরওয়ালা
সদস্য	:	মৌলভী ছহির উদ্দিন আহমেদ
সদস্য	:	আব্দুল জব্বার খলিফা

উক্ত ২২জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে নবাব বাড়িতে সন্ধ্যা ৭.০০ টায় মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দফা বৈঠক সিদ্ধান্ত হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শকের অনুমতি পাওয়া গেলে অস্থায়ীভাবে সুবিল প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্লাস শুরু হবে। অনুমতি না পাওয়া গেলে নিশিন্দারা টেনারী ভবনে কলেজের ক্লাস শুরু হবে। এ সিদ্ধান্তের অনুলিপি তৎকালিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আযিযুল হক সাহেবের কাছে পাঠানো হলে সৌভাগ্যক্রমে সুবিল স্কুলে অস্থায়ী ভিত্তিতে কলেজের ক্লাস শুরুর অনুমতি পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালের ২ জুলাই রবিবার কলেজের উদ্বোধনী সংক্রান্ত দাওয়াত কার্ডের যে নমুন তৈরী করা হয় তা হলো ঃ

৩৯. ডাক্তার মোজাফফর রহমান (১৯০৮-১৯৯৮) : বগুড়া জেলার সায়িকান্দী উপজেলার নারচী গ্রামে ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তমিজউদি আহমেদ, মাতা জোবেদা খাতুন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হতে এম বি ডিগ্রি অর্জন করেন। ভাল চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে বগুড়ায় তার সুনাম আছে। ডাক্তার হয়েও তিনি সমাজসেবা এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ সালে বিহারের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় মেডিকেল টিম নিয়ে সেবা করেন। তিনি বগুড়া জেলা বোর্ডের সদস্য ও বগুড়া ফৌজদারি আদালতের আনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৫৪ সালে বগুড়া অন্ধ ত্রাণ সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বগুড়া সিটি গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৯৮ সালে ১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ আখতার উদ্দিন মানিক, প্রগুক্ত, পৃ. ২৫৬-২৫৭

“The President and members of Bogra College Committee request the pleasure of Mr....’s Presence of the opening Ceremony of the college to be performed by the Hon’ble Khan Bahadur M. Azizul Haque C.I.E Vice Chancellor Calcutta University on Sunday the 2nd July 1939 at 4:30 A.M at the College premises at Subil”

২৮ জুন ১৯৩৯ সালে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক দীর্ঘ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কলেজের নাম “বগুড়া আজিজুল হক কলেজ’ রাখা হল।

কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতেই দানকৃত ১.০৭ একর জমি পাওয়া গেলেও আর্থিক সংকটের কারণে সঙ্গে সঙ্গেই অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে যাত্রা শুরুর দুই বছর পর্যন্ত সুবিল স্কুলেই কলেজের ক্লাসচলেছে। এ সময় ফুলবাড়ির ‘পল্লী মঙ্গল সমিতি’ ছিল ছাত্রদের কমন রুম। পরবর্তীতে কলেজে আরও যে সকল লোক জমি দান করে তারা হলেন-

তারিখ	দাতা	জমির পরিমাণ (একর)
১২.১২.১৯৩৯	আয়েন উদ্দিন	০.০৬
১২.১২.১৯৩৯	মোজাম উদ্দিন পাইকার	০.০৩
০৪.০৭.১৯৪১	রমজান উদ্দিন পাইকার ও আব্দুর রহমান পাইকার	০.২০
২১.১২.১৯৪৪	আয়েন উদ্দিন ও তছলিম উদ্দিন	০.৪০
	মোট =	০.৬৯

উপরোক্ত (১.০৭+০.৬৯)=১.৭৬ একর দানকৃত জমি ছাড়াও ১৯৪২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ৪ একর জমি ক্রয় করা হয়। যাদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করা হয়েছে তাদের অনেকেই ফুলবাড়ি এলাকার গরীব তাঁতি এবং জেলে। সে সময় ২০টি জমির দলিল (১৯৪২-১৯৫৭) ১৪৩২/- টাকা মোট ৩.৫৬ একর জমি ক্রয় করা হয়। জমি ক্রয়, অবকাঠামো নির্মাণ

কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতাদির ব্যয়ের কোন আর্থিক ব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের সাহায্যের উপরই কলেজ চলত। পরবর্তীতে কলেজের অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৯৩৯ সালে 'হোয়াইট হয়ে' নামক সার্কাস পার্টিকে অনুরোধ করে কলেজ ক্যাম্পাসে চ্যারিটি শোর আয়োজন করে ৩১৫৬ রুপি ৬ আনা আয় হয়। অর্থের পুরোটাই বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র এর নেতৃত্বে কলেজ হিসাব তহবিলে (সেন্ট্রাল ব্যাংক, হিসাব-৮৬, বগুড়া শাখা) জমা দেয়া হয়। কলেজের ফান্ড বৃদ্ধির জন্য পি ডব্লিউ বি কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করে বগুড়া জেলার প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একশত রুপি এবং সদস্যের কাছ থেকে পাঁচ রুপি করে চাঁদা নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় সিনেমা হল কর্তৃপক্ষও কিন্তু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কলেজের লাইব্রেরীর জন্য সাতানী জমিদার এক হাজার রুপি দান করেছিলেন। সেন্ট্রাল ব্যাংক বার্ষিক (৩.৫০%) সাড়ে তিন পারসেন্ট হারে দুই হাজার রুপি সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৬০ সালে কলেজটি সরকারের নেক নজরে আসে। এ সময় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বগুড়া সাতানী পরিবারের হাবিবুর রহমান চৌদুরী বুলু মিয়া কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করেন। এর মধ্যে ১,৫২,৪২৬/- (এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার চারশত ছাব্বিশ) টাকা বগুড়া রেলস্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে কামারগাড়ি, নিশিন্দারা ও মালগ্রাম মৌজার প্রায় ৫৫ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়।[৪০]

১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল আযম খান প্রায় ৯ লক্ষ টাকার দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। নতুন ভবনের এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত জনতার মাঝে যাদের জমি কলেজে নেয়া হয়েছিল তারাও উপস্থিত ছিল। এ জমি এ্যাকুয়ারের ফলে সেদিন যারা ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল তাদের চোখ দিয়ে তখন পানি গড়িয়ে পড়ছিল। গভর্নর এ দৃশ্য দেখে বুলু মিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-

"Why they are weeping?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন- They are very glad that

৪০. প্রকৌশলী মোঃ আবু তৈয়ব রোকন (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৯।

You have come here,

So they are Weeping

উত্তর শুনে আনন্দিত হয়ে গভর্নর তখন বলেছিলেন

Oh called them near...”

কিন্তু জনতা তার কাছে আসতে পারেনি; জানাতে পারেনি তাদের দুঃখ ব্যথা। এভাবেই নতুন ভবন অনেকের সুখের কবর রচনা করে সুঠাম দাঁড়িয়ে যায়। শিক্ষা মন্ত্রী হাবিবুর রহমান চৌধুরী বুলু মিয়ার নামের অদ্যাক্ষের `H’ দিয়ে ভবন `H’ অক্ষরের মত করে নির্মিত হয় যা হাবিবুর রহমানকে অমরত্ব দান করেছে।

এছাড়াও হাবিবুর রহমান কলেজের উন্নয়নের জন্য আরও ৩০০০০০/- টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। এ সময় কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে অভ্যন্তরীণ সড়ক, একটি দ্বিতল ভবন, একটি একতলা ছাত্রাবাস (তিতুমীর হল) একটি একতলা ছাত্রীনিবাস (রোকেয়া হল) কলেজে বিদ্যুৎ ও পানির পাইপ সংযোগ (নতুন পুরাতন ভবন), নতুন ও পুরাতন উভয় ভবনে সায়েন্স ল্যাবরেটরী জন্য এক লক্ষ করে দুই লক্ষ টাকা এবং কলেজ লাইব্রেরীর বই-পুস্তক ক্রয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান জন শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ শামসুল হক নতুন ভবন পরিদর্শন করে এ ভবন সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

The new campus of the college with fine building already constructed is very impressive and is a tribute to the immegination and efforts to those who have been associated with the planning and implementation of this project.

১৯৬৮ সালে ১৫ এপ্রিল কলেজটি সরকারিকরণ হয়। এর পূর্বে শিক্ষকদের বেতন স্কেল ২২৫-৪২৫ টাকা, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫০-৫০০ টাকা এবং ১৯৬৪ সালে ৩৫০-৭০০ টাকা (সর্বসাকুল্যে) নির্ধারিত হয়।

একটি সূত্র মতে মাহবুবুর রহমান চৌধুরী পুটু মিয়া[৪১] এর পরে সাধারণ সম্পদকের দায়িত্ব পালন করেন। কমিটিতে প্রথম কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন- বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। কলেজ যাত্রার

৪১ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী পুটু মিয়া(১৯১০-১৯৯১) : ১৯১০ সালে বগুড়া শহরে (সাতানী বাড়ি) জসন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্ট দলীয় প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। বগুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী ছিলেন। তার ছেলে মামদুদুর রহমান চৌধুরী ১৯৮৬ সালে বগুড়া-৪ আসন (কাহালু-নন্দীগ্রাম) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় এবং উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। দ্র: সাতানীবাড়ীর পারিবারিক নথিপত্র থেকে সংগৃহীত; আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

শুরুতে কেবলমাত্র আই এ ক্লাসের অনুমতি পায়। ঠিক কতজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিলো তা জানা না গেলও ১৯৪১ সালে কলেজের প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ১৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৭ জন পরীক্ষায় পাস করে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ ৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩৫ জন। পাসের হার ছিল ৬৯.২%। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর হার ছিল ৬৩.৪%।

প্রতিষ্ঠালগ্নে আই এ শ্রেনীতে যে সব বিষয় পড়ানো হতো সেগুলো হলো- বাংলা(সাধারণ), বাংলা (২য় ভাষা), ইংরেজি (আবশ্যিক), ইংরেজি (অতিরিক্ত), ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, যুক্তিবিদ্যা, পৌরনীতি, সাধারণ গণিত, আরবী/ফার্সী। সে সময়ে যারা কলেজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন ইংরেজী- শ্রী কে.সি চক্রবর্তী, সংস্কৃত ও বাংলা- শ্রী প্রভাতচন্দ্র সেন এম এ বিটি, আরবী ও ফার্সী- মোঃ আব্দুল গফুর, গণিত-শ্রী মনিন্দ্রচন্দ্র চাকী এম এ, ইতিহাস- শ্রী এসপি সেন বি এ সম্মান লন্ডন, যুক্তিবিদ্যা- মোঃ ফজলুর রহমান এম এ, পৌরনীতি- মোঃ আকবর কবির এম এ। এদের মধ্যে শ্রী এসপি সেন একই সাথে উপধক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনিই কলেজের প্রথম উপাধ্যক্ষ। তখন ছাত্রী ছিল না। ছাত্রের মাসিক বেতন ছিল ৬ রুপি। ১৯৪৩ সালে কলেজে ৮-১২ জন ছাত্রী ভর্তি হয় এবং এদের ভি এম গার্লস স্কুলে সকালের শিফটে ক্লাস করতে হতো।

কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ২ বছর পর ১৯৪১ সালে কলেজে অর্থনীতি এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দু'বছর মেয়াদী সম্মান শ্রেনী ও বি এ পাস কোর্স চালুর অনুমতি পায়। ড. এ কে এম ইয়াকুব আলীর মতে, তদানিন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এটিই প্রথম কলেজ যেখানে সে সময় সম্মান শ্রেনীর চালুর অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৪৫-৪৬ সেশন কলেজটি বাংলা এবং আরবী বিভাগে সম্মান ও আই কম ক্লাসের অনুমতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হবার ফলে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হয়ে পড়ে। তখন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কলেজ হতে সম্মান শ্রেনী বিলুপ্ত হয় এবং আই এস সি ক্লাসের অনুমিত পায়। এর কিছুকাল পরে ১৯৫৪-৫৫ সেশনে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হয় এবং আরবী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে তিন বছর মেয়াদী সম্মান শ্রেনী চালু করা হয়।

সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, বগুড়া (১৯৬৫)

ব্রিটিশ আমলে (আনু. ১৯২০ খ্রি.) এডওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। এখানে পর্যায়ক্রমে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Technical Training Institute-TTC) চালু করা হয়। এরপর বগুড়া পলিটেকনিক এখান থেকে স্থানান্তর করে শেরপুর রোড কলোনী নামক স্থানে স্থাপন করা হয় এবং কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র (TTC) শহরের নিশিন্দারা মৌজায় স্থানান্তর করা হয়। কালের পরিক্রমাায় কারিগরি বোর্ডের অধীনে বগুড়া শহরের সুত্রাপুর মৌজায় সাতমাথা সংলগ্ন শেরপুর রোডস্থ ১৯৬৫ সালে সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জায়গার পরিমান ৮৯.৮৪ শতাংশ। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কারিগরি বোর্ডের অধীনে ছিল। এরপর স্বতন্ত্রভাবে ১৯৮৪ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর অধীনে চলছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন ওমর খাত্তাব।

সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ (১৯৬৮)

১৮৯৯ সালে বগুড়া শহরের দক্ষিণে করতোয়া নদী সংলগ্ন লতিফপুর দক্ষিণ পাড়ায় একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মসজিদের জমির পরিমাণ ছিল দশ বিঘা। বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান আজিজুল হক পরিবর্তীতে এ মসজিদের দশ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে বগুড়া মডেল প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর কালের পরিক্রমায় ১৯৬৮ সালে বগুড়া শহরের অন্তর্গত আজিজুল হক কলেজ যখন জাতীয়করণ করা হয় তখন স্বভাবতই বগুড়া শহেরর ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর চাপের সৃষ্টি হয়। এ চাপ মোকাবেলা করার জন্য বগুড়া শহরে আরো একটি বেসরকারি কলেজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এতদঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং জনগণের তরফ থেকে বগুড়ায় উন্নতমানের একটি ডিগ্রি কলেজে স্থাপনের যে প্রশ্ন উঠে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তদানীন্তন বগুড়ার জেলা প্রশাসক (ডি.সি) মোঃ মনিরুজ্জামান ও বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন ভাইস- চেয়ারম্যান আজিজুল হক, সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন চেয়ারম্যান আবুল আহম্মেদ, বগুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাঃ ইয়াছিন এমবিবিএস, বগুড়া সাতানী বাড়ীর জমিদার মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ও আরো অনেকের প্রচেষ্টায় এ কলেজটির যাত্রা শুরু হয় এবং উল্লেখ্য যে, এ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় তদানীন্তন আজিজুল হক কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ বয়েন উদ্দিন মিয়া এম.এ(ক্যাল) সাহেবকে এ কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি এলাকার উন্নতিকল্পে সরকারি কলেজের বিভাগীয় প্রধান হতে পদত্যাগ করে বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। আর ইনিই

হলেন এ কলেজের প্রথম এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর কলেজটি জাতীয়করণ হয়। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ হতে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু করা হয়। অনার্স পঠিত বিষয়গুলো হল- বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা।

বগুড়া আইন কলেজ (১৯৭২)

বগুড়া শহরের নবাববাড়ি রোড সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে সুত্রাপুর মৌজায় ৩০ শতাংশ জায়গার উপর ১২.০৮.১৯৭২ সালে বগুড়া আইন কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের চেষ্টা এবং শ্রমে কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তারা হলেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক আজিজুল হক, তৎকালীন বগুড়া জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন[৪২], এ্যাডভোকেট আব্দুল বারী[৪৩], এ্যাডভোকেট এ কে

---

৪২. মোঃ মমতাজ উদ্দিন (জন্মঃ ১৯৪৮) : বগুড়া শহরের কাটনাপাড়ায় ১৫ জুন ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোবারক আলী, মাতা গফুরুন্নেছা বেগম। তিনি বি.কম পাস। তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি থাকা অবস্থায় বগুড়ায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৭২ সালে বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক, পর্যায়ক্রমে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক প্রাতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আজীবন সদস্য বগুড়া স্টেশন ক্লাব, বগুড়া রাইফেল ক্লাব ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। দ্রঃ সোহেল রানা (সম্পা), বগুড়া তথ্যকোষ, (ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ২০১২), পৃ. ২১৫।

[৪৩] এ্যাডভোকেট আব্দুল বারী (১৯০০-১৯৮০) : বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার জয়ভোগা গ্রামে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কছিম উদ্দিন আকন্দ। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন শাস্ত্রে বি এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বগুড়া বারে যোগদান করেন। তিনি বগুড়া বার সমিতির পরপর চারবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৬৬-১৯৭২)। তিনি ১৯২৫ সালে গাবতলী উপজেলা থেকে জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পূর্ব বগুড়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০ সালে বগুড়া জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে বগুড়া পৌরসভার কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একটানা ২০ বছর বগুড়া পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বগুড়া পৌরসভার ফ্রি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন, রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণ, অফিস গৃহ নির্মাণ, এডওয়ার্ড পার্ক সংস্কার, ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ সংস্কার করেন। তিনি দুর্গাহাটা হাই স্কুলের সভাপতি ও বগুড়া সেন্ট্রাল হাই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। বগুড়া আজিজুল হক কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ও বগুড়ার নাইট স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন।

মোঃ শামসুল আবেদীন[৪৪], এ্যাডভোকেট গোলাম মুর্তজা চৌধুরী[৪৫], এ্যাডভোকেট খোরশেদ আলী[৪৬] প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন বগুড়া বারের এ্যাডভোকেট আব্দুল বারী।

পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ (১৯৮৩)

১৯৮৩ সালে বগুড়া জেলা পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ১ জানুয়ারি লতিফপুর মৌজায় বগুড়া পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপিত হয়। এ সময় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস দিয়ে জুনিয়র হাই স্কুল রূপে এর যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন বগুড়া পুলিশ সুপার কাসেদুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি ছিলেন সে সময়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি। গোড়া পত্তন থেকে আজ পর্যন্ত জেলা পুলিশ সুপারগণ সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৮৬ সালে নমব শ্রেণী এবং ১৯৮৭ সালে দশম শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয় এবং ১৯৮৮ সালে প্রথম এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৮৮ সালেই প্রাইমারী স্কুল শাখা খোলা হয়। ২০০২-২০০৩ সেশন হতে এইচ.এস.সি পাঠদান অনুমতিসহ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৬৩ সালে বগুড়া আইন কলেজ স্থাপতি হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছি। আব্দুল বারী ‘পল্লী মঙ্গল’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তিনি ১৯৮০ সালের ২৫ নভেম্বর বগুড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্র : আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮।

৪৪. এ্যাডভোকেট একেএম শামসুল আবেদীন সোনা (মৃ. ২০০৯) : নওগা জেলার রাণীনগর উপজেলার শিয়ালা গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা নাম সাদত আলী। বি.এ অনার্স এম.এ ডিগ্রির পর এল এল বি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে ১৪ মার্চ ১৯৬৮ সালে বগুড়া বার সমিতিতে যোগদান করেন। তিনি বগুড়া আইন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১ জুলাই ২০০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি, সাধারণ শাখার Enrloment Vol-ও থেকে সংগৃহীতঃ তথ্যদাতা : এ্যাডভোকেট্ আল মাহমুদ, সরকারি কৌশলী-২০০৯ থেকে, জজকোর্ট বগুড়া।

৪৫. এ্যাডভোকেট গোলাম মুর্তজা চৌধুরী (মৃ. ২০০৩) : বগুড়া (বর্তমান জয়পুরহাট) জেলার খঞ্জনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোলাম আফতাব চৌধুরী। তিনি ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে ১০ জুলাই ১৯৬৩ সালে বগুড়া বার সমিতিতে যোগদান করেন। দক্ষ আইনজীবী হিসেবে দেওয়ানী মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। তিন বছর সরকারি কৌশলী নিযুক্ত হন। তিনি ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে মৃত্যুবরন করেন। দ্রঃ বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি Enrloment Vol-1 থেকে তথ্যটি সংগৃহীত এ্যাডভোকেট আল মাহমুদ।

৪৬. এ্যাডভোকেট মোঃ খোরশেদ আলী (মৃ.২০১১) : বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার বেলকুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইব্রাহিম হোসেন। তিনি ১৩ নভেম্বর ১৯৫৮ সালে বার কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে ২০ নভেম্বর ১৯৬২ সালে বগুড়া বার সমিতিতে যোগদান করেন। দেওয়ারনী মামলার একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। তিনি বগুড়া আইন কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন এবং সরকারি কৌশল ছিলেন। দ্রঃ বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি; এ্যাডভোকেট আল মাহমুদ।

সম্পুর্ণ রাজনীতি ও কোলাহলমুক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি। পুলিশ লাইন ক্যাম্পাসে অবস্থিত বলে সুশৃংখল পরিবেশ রয়েছে। সুশৃংখল পুলিশ বাহিনীর একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত।

আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ (১৯৮৩)

বগুড়া শহরের চকসুত্রাপুর (বাদুরতলা) চকযাদু রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে সুত্রাপুর মৌজায় প্রায় ১ একর জমির উপর ২৩.১১.১৯৮৩ সালে আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে জানুয়ারি মাসে বেবী শ্রেনী হতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত চালু হয়, ১৯৮৭ সালে (কিন্ডার গার্টেন) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালে অষ্টম শ্রেণী এবং ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়। এরপরেই এইচ.এস.সি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপরে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির (সাবেক এম পি), গোলাম রাব্বানী, আলহাজ্ব মফিজার রহমান, নাজির আহম্মেদ, লোকমান হাকিম, খন্দকার আনিসুর রহমান। কলেজটি ১৯৯৪ সালে এমপিওভুক্ত হয়।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ (১৯৮৬)

বগুড়া শহরের বগুড়া-দিনাজপুর রোড সংলগ্ন নিশিন্দারা মৌজায় ২৫ জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে ২.১০ একর জমির উপর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়কদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্লে গ্রুপ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য) পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন তাজমিলুর রহমান।

নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন স্কুল ও কলেজ (১৯৮৬)

বগুড়া শহরের নিশিন্দারা মৌজায় বিশিস্ট শিক্ষানুরাগী ও প্রাক্তন নিশিন্দারা ইউপি ও বগুড়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হায়দার আলীর প্রচেষ্টায় ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে ১.৬০ একর জমির উপর নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নে যারা উদ্যোগী এবং জমি দান করেছেন তারা হলেন- আব্দুস শুকুর মোল্লা, আব্দুল গণি সরকার, প্রয়াত হাজী শাজাহান আলী শেখ, আবুল প্রাং, হাজী আব্দুল কাদের, ফাতেমা খাতুন, আব্দুস সামাদ খলিফা, তহমিনা হায়দার, অরূপ ইশতিয়াক ও মেহেরুন বিবি। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিসেস তহমিনা হায়দার। পরবর্তীতে কলেজে রূপান্তরিত হলে এর অধ্যক্ষ

হলেন মোঃ আনোয়ার কামাল। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি মঞ্জুরী লাভ করে এবং ০১.০৬.১৯৯৩ সালে এমপিওভুক্ত হয়। ২০০১ সাল থেকে এইচ.এস.সি বিয়াম কোর্স চালু আছে। প্লে শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

বগুড়া আর্ট কলেজ (১৯৯৫)

বগুড়া জিলা স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক তাজমিলুর রহমান এর সভাপতিত্বে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ১৯৯৫ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি বগুড়া নট্রামস এ বগুড়া আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাম্ভিক সভার আয়োজন করা হয়। কলেজের নাম দেওয়া হয় 'চারুকলা মহাবিদ্যালয়'। এর পর বগুড়া শহরের মালাতিনগরের স্কুল বিদ্যানিকেতনকে কলেজের কর্মকান্ডের জন্য অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে শুরু হয়। স্কুল ছুটির পর দুপুর ১২টা থেকে কলেজের কার্যক্রম পরিচালানার জন্য ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। এ সময় ঢাকা চারুকলা ইন্সটিটিউটের সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস শুরু হয়। এভাবেই কলেজটি প্রতিষ্ঠার পরেই ১৯৯৭ সালে কলেজের পরিচালনা পরিষদ পরিবর্তন করে শহরের বহুল পরিচিত ডাঃ মশিহুর রহমানকে কলেজের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৮ সালে ২৫ জানুয়ারি ৭টি বিভাগের অনুমতি পায় বগুড়া আর্ট কলেজ। উল্লেখ্য যে, এ বগুড়া আর্ট কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির শর্তানুযায়ী তখন নিজস্ব ভূমির প্রয়োজন হয় এবং এই প্রেক্ষিতে বগুড়া শহরের চকলোকমান এলাকার জায়গা কেনা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনযায়ী গভর্নিং বডি গঠনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ২৮ জুলাই ১৯৯৯ এ ভাই-চ্যান্সেলর কর্তৃক তৎকালীন বগুড়া জেলা প্রশাসক শামসুল হক মহোদয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এ আর্ট কলেজে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম চালু আছে। পাঁচ বছরের কোর্সকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন- প্রথম দুই বছরের কোর্সকে বি এস এ (প্রি ডিগ্রী) এবং পরের তিন বছরের কোর্সকে বি এফ এ (পাস) বলা হয়। এখানে এস.এস.সি পাস করে ভর্তি হতে হয়। সরকারিভাবে এখানে ৭টি বিভাগ চালু আছে সেগুলো হলো- (১) ড্রইং এন্ড পেইন্টিং (২) প্রাচ্যকলা (৩) গ্রাফিক্স ডিজাইন (৪) ভাস্কর্য (৫) গ্রাফিক্স (ছাপচিত্র) (৬) কারুশিল্প এবং (৭) মৃৎ শিল্প।

এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ (১৯৯৬)

বগুড়া শহরের বারপুর মৌজায় ২ একর জায়গার উপর ১৯৯৩ সালে এস ও এস আন্তর্জাতিক শিশু পল্লী প্রতিষ্ঠিত হয়। এস ও এস শিশু পল্লটি একটি অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক শিশু কল্যাণমূলক সংস্থা যা জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠি নির্বিশেষে পিতৃ-মাতৃহীন ও অসহায় শিশুদের

জীবনযাপনের জন্য প্রস্তূত করে। এ অসহায় শিশুরা যখন বড় হয় তখন তাদের লেখাপড়ার জন্য ১৯৯৬ সালে ৯ মার্চ প্লে শ্রেনী হতে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অসহায় শিশুসহ বাহিরের ছাত্ররাও এখানে লেখাপড়া করতে পারে। অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন এ টি এম নজরুল ইসলাম। কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৫০ জন এবং শিক্ষক কর্মচারির সংখ্যা ৩৮ জন। পল্লীতে ২৪০ জন অসহায়-এতিম শিশু বাস করে।[৪৭]

৫.৬ নারী শিক্ষা (Female Education)

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন বৈদিক যুগ এবং বৌদ্ধ যুগেও এদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শামনামলেও নারীর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। তবে এ শিক্ষা উচ্চবিত্ত পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচই সর্বপ্রথম নারী শিক্ষার জন্য সরকারি প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে।[৪৮]

বগুড়ার মুসলিম নারী শিক্ষার আগ্রহ না থাকলেও স্থানীয় হিন্দুরা বহু পূর্ব হতেই আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বগুড়া জেলা প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজি রাজভাষা হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজেও শিক্ষার প্রভাব বেড়ে যায়। নওদাবগার মুনশী ছমির উদ্দিন এবং কাঁটাবাড়িয়ার মুনশী সাবান আলীর[৪৯] পরিবার যথাক্রমে নারী ও পুরুষের উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিতে মনোনিবেশ করেন। তাদের পদানুসারণ করে পরবর্তীতে বগুড়ায় প্রায় ৩০ জন মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মুসাম্মৎ খোদেজা খাতুন এম.এ, মোসাম্মৎ জেবুন্নেসা জামাল,

৪৭. এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ বার্ষিকী ২০১০-২০১১, পৃ. ৩৩; বিকিরণ, কলেজ প্রতিষ্ঠার যুগ পূর্তির স্মারক, এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, বগুড়া।

৪৮. মোছা : মেহের উননেসা বেগম, খুলনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৮৮২-১৯৪৭ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (রাজশাহী : অপ্রকাশিত পিএইচডি. থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০১০) পৃ. ১৭১।

৪৯. মুনশী সাবান আলী (১৮৬৬-১৯৩২) : বগুড়া শহরের দক্ষিনে ৭ মাইল দূরে কাঁটাবাড়িয়া গ্রামে ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনশী সুজন আলী। তার পিতা তাকে বগুড়া শহরের মাদ্রাসায় পড়ালেখার ব্যবস্থা করেন। কোরান-হাদিস বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে নিজ গ্রামে এসে জুম্মা মসজিদের ইমামতি করেন। এরপরে তিনি গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপন করে গ্রাপমের ছেলে-মেয়েদের পড়াতে থাকেন। অতঃপর তার ৪ মেয়েকে বগুড়া শহরের ভিএম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলে গ্রামের মোল্লা ও মাতব্বরাগণ তাকে সমাজচ্যুত করেন, তার ইমামতি পদ বাতিল করেন এবং তাকে নাসারা-বেদীন বলে ধিক্কার দেন। এতে তিনি পথ ভ্রষ্ট না হয়ে তাদের নিন্দা ও গঞ্জনা সহ্য করে গ্রাম হতে বগুড়া শহরে বসবাস করে ৪ কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করান। পরবর্তীতে তার কোন এক কন্যা উক্ত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। দ্র : কাজী মোহাম্মদ মিছের, প্রগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৭১।

ডা. মেহেরুন্নেছা এম.বি, মোসাম্মৎ আফিয়া খাতুন এম.এ.বিটি, শ্রীযুক্তা অনিমা রানী সাহা এম.বি.বি.এস.ডি.জি.ও, ডা. সরবালা দাসী এম.বি, ও শ্রীযুক্তা সান্তনা চাকী এম.এ, মোসাম্মৎ সালেহা খাতুন বি.এ.বি.টি ও মাদলার জমিদার বাবু হীরেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রী যুক্তা উমারানী মজুমদার বি.এ, মোসাম্মৎ জিয়াউন নাহার ও মোসাম্মৎ জহুরা খানম প্রমুখ নারীগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা দেশের নারী কল্যাণ সমিতি ও অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। বগুড়া শহরের নারী শিক্ষার হার ১৯৬১ সালে ৩৭.৭৩, ১৯৭৪ সালে ৪৮.৩৮, ১৯৮১ সালে ৫০.৯, ১৯৯১ সালে ৫৬.৪ এবং ২০০১ সালে ৬৬.৯৭ ছিল।[৫০] নিচে বগুড়া জেলার নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৯)

১৮৬৯ সালে বগুড়া শহরের সুত্রাপুর মৌজায় .৮২২৫ শতাংশ জায়গার উপর কোর্ট হাউজ স্ট্রিট সংলগ্ন রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে সর্বপ্রথম নারী শিক্ষার জন্য (Middle English) এম ই স্কুল নাম ধারণ করে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬৯ সালের এক শুভ দিনে ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার জন্য এর নাম হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল। স্কুলটি ১৯৬২ সালে জাতীয়করনের পূর্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যঅলয় নাম ছিল। ১৯৬২ সালে সরকারি হবার পরে স্কুলটির নাম হয় বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বগুড়ার স্থানীয় লোকেরা স্কুলটিকে ভিএম স্কুল বলেই অভিহিত করে থাকে। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাঙালি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লীলা মন্ডল।

কাটনার সেন্ট্রাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯২)

বগুড়া শহরের শহীদ তারেক রোড সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে কাটনারপাড়া মৌজায় ২১ শতক জায়গার উপর ০১.০১.১৮৯২ সালে প্রায়ত অমৃত লাল কুণ্ডু এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় কাটনার সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে উভয়ে লেখাপড়া করতে পারে কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুধু মাত্র মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫০ জন, শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন এবং কর্মচারি ৬ জন স্কুলটি এমপিওভুক্ত হয় ০১.০৬.১৯৮৫ সালে।

৫০. Bogra District Census Report-1961, 1974, 1981, 1991, 2001.

ইয়াকুবিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯২৯)

১৯২৯ সালে শহরের সাতমাথার অদূরে শেরপুর রোড সংলগ্ন সুত্রাপুর মৌজায় ইয়াকুবিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি জুনিয়র বালিকা মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ও দাতা ছিলেন প্রয়াত কাজি জলিল উদ্দীন মুহ: ইউসুফ। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ০.৪৫ একর জমি দান করেন। তার পিতার নাম মুহ: ইয়াকুব আলী সাহেবের নামানুসারে মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয়েছিল ইয়াকুবিয়া জুনিয়ার বালিকা মাদ্রাসা। ১৯৩৯ সালে মাদ্রাসাটি হাই মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সালে ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ব্যাপারে অন্যান্য যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন ডা. ইয়াছিন আলী ও প্রয়াত এ্যাডভোকেট আঃ করিমের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫১] তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে।

বগুড়া জুবিলী ইনস্টিটিউশন (১৯৩৫)

বগুড়া শহরের চকবৃন্দাবন মৌজায় বগুড়া রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর পার্শ্বে ১ জানুয়ারি ১৯৩৫ সালে ৫৩ শতক জায়গার উপর বগুড়া জুবিলী ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি শুরুতে বালক উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। স্বাধীনতার পর শিক্ষার্থী ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাওয়ার ফলে পরবর্তীতে বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হয়। স্কুলটির সম্পূর্ণ জায়গা সরকারি খাস জমি এবং একটি পরিত্যক্ত জায়গা ছিল। মরহুম এ্যাডভোকেট সৈয়দুল্লাহ, মরহুম মজিরউদ্দিন (সাবেক এম পি) এবং নবাব মোহাম্মদ আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সরকারের নিকট থেকে (লীজ) ইজারা নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে। ছাত্রী সংখ্যা ৩১২ জন। শিক্ষক কর্মচারির সংখ্যা ১৩ জন।

ভাারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬২)

বগুড়া শহরের ফুলবাড়ী মৌজায় ২.১৪ একর জমির উপর শিল্পপতি মরহুম মুজিবুর রহমান ভাণ্ডারীর উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে ভাণ্ডারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হয়। প্রতিষ্ঠানটি এমপিও হলেও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত নয়। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী বি.এ (সম্মান) এম.এ.বি.এড, শিক্ষক কর্মচারির সংখ্যা ২৭ জন এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৭৫ জন।

---

৫১. শফিকুল আলম সৈয়দী ও অধ্যাপিকা রাফিনা আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

বগুড়া ইসলামিক মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়(১৯৬৪)

বগুড়া শহরের চেলোপাড়া (নাটাই) মৌজায় চন্দনবাইসা রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে ৮৯ শতাংশ জায়গার উপর ০১.০১.১৯৬৪ সালে বগুড়া ইসলামিক মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি শুরু থেকে ইসলামিক মিশন নাইট উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। নাইট স্কুলের পাশাপাশি ১৯৭৪-৭৫ সালে এখানে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়। নাইট স্কুলের ছাত্র ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাওয়ায় ১৯৮২ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বগুড়া ইসলামিক মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে আজ পর্যন্ত চালু আছে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন আবূল হোসেন তালুকদার, কালুরাম বিহানি, সাবেক লে.কর্ণেল ইউনোছ আলী। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবুল হোসেন তালুকদার। স্কুলটি ০১.০৬.১৯৮৫ সালে এমপিওভুক্ত হয়।

দি বগুড়া সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৫)

বগুড়া শহরের শেরপুর রোড সংলগ্ন বাংলাদেশ ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে ঠনঠনিয়া মৌজায় ১.৩৫ একর জায়গার উপর ১ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে দি বগুড়া সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১ জুন ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন হোসনে আরা বেগম।

বাদুরতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৯)

বগুড়া শহরের হকার্স মার্কেট সংলগ্ন রেল লাইনের উত্তর পার্শ্বে চকবৃন্দাবন মৌজায় ১ একর জমির উপর ০১.০১.১৯৬৯ সাল বাদুরতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন-রেজাউল হাসান রানু, এ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন (মুকুল), তাহের উদ্দিন চৌধুরী, আলহাজ্ব ফজলুর রহমান পাইকার এবং শোকরানা।

হাসনা জাহান (ভাণ্ডারী) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭১)

বগুড়া শহরের শিববাটী মৌজায় ১.৮৩ একর জমির উপর ১ জানুয়ারি ১৯৭১ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের ভাণ্ডারী পরিবারের মরহুম মতিয়ার রহমান ভাণ্ডারীর স্ত্রী হাসনা জাহান ভাণ্ডারীর প্রচেস্টায় ও অর্থায়নে হাসনা জাহান (ভাণ্ডারী) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফজিলাতুন্নেছা। ১৯৭২ সাল থেকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশক

শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। ১৯৮৫ সালে স্কুলটি এমপিওভুক্ত হয়। শিক্ষক, কর্মচারির সংখ্যা ১৫ জন।

তাপসী রাবেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৮০)

বগুড়া শহরের মালগ্রাম মৌজায় সবুজবাগ এলাকায় ১ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে তাপসী রাবেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টির জমির পরিমাণ ৩.৪১ একর। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা উদ্যোগী ছিলেন তারা হলেন আবু নাসেহ্ আরিফ, আব্দুর রউফ এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শেখ মোঃ ইজ্জুতুল্যা। বিদ্যালয়টি ০১.০৬.১৯৮৫ইং সালে এমপিওভুক্ত হয়। তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে।

সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ (১৯৬৩)

১৯৬৩ সালের ৩১ জুলাই বগুড়া শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম মুজিবুর রহমান ভাণ্ডারী, মরহুম হাবিবুর রহমান ভাণ্ডারী, মরহুম মোজাফফর রহমান ভাণ্ডারী, মরহুম গোলাম কিবরিয়া ভাণ্ডারীদের একান্ত প্রচেস্টায় এবং শহরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের চেষ্টায় ফুলবাড়ী মৌজায় সুবিল খালের উপর ৩.৭৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। কলেজটি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ সালে জাতীয়করণ হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। এরপরে দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৯ সাল হতে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন ,রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু এবং আছে (৫টি বিষয়ে) বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিসয়ে মাস্টার্স চালু আছে। কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০ জন। ১ জন্য অধ্যক্ষ এবং ১ জন উপাধ্যক্ষসহ মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫৬ জন। কর্মকর্তা কর্মচারির সংখ্যা ২৪ জন। ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধার জন্য দুটি হল আছে। ময়জন নেচা ভাণ্ডারী হল এবং বেগম জাহানারা রহমান হল। হল দুটিতে ৫০০/৬০০ ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা আছে।[৫২]

বগুড়া মহিলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৪)

বগুড়া শহরের মালতীনগর মৌজায় এস পি ব্রিজ সংলগ্ন ৩১.০৫.১৯৯৪ সালে বগুড়া মহিলা মাহবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটির জায়গার পরিমাণ ৬৬ শতাংশ। কলেজটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন- আলহাজ্ব লে. কর্ণেল (অব.) জিল্লুর রহমান, কামরুল আলম রিপু, কামরুন্নাহার পুতুল (সাবেক সংরক্ষিত মহিলা এমপি), অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী, মাহবুব আলম লেমন (সাংবাদিক), মোঃ মতিউল ইসলাম সাদি (সাংবাদিক) ও ডা. মুশিহুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন আলিয়া চৌধুরী। ০১.০১.১৯৯৭ সালে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। শিক্ষক সংখ্যা ৩০ জন এবং কর্মচারী ১১ জন।

---

৫২. প্রসপেক্টাস ও পাঠ পরিকল্পনা, সরকারি মুজিবুর রহমান কলেজ, বগুড়া, জুন ২০১০, পৃ. ৬

৫.৭ বিশেষ শিক্ষা (Special Education)

পিটিআই (Primary Trainging Institute) বগুড়া (1953)

বগুড়া শহরের শেরপুর রোডস্থ ১.৫৬৫ একর জায়গার উপর বগুড়া পিটিআই ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বগুড়া জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখানে ১ বছর ট্রেনিং করার পর তাদের সি.ইন.এড () ডিগ্রি দেওয়া হয়। একজন সুপারেনটেনডেন্ট এবং একজন সহকারি সুপারিনটেনডেন্টসহ ২৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারি কর্মরত আছেন। এখানে ৫০ জন পুরুষ এবং মহিলা ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য পৃথক দুটি হোস্টেল আছে।

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (১৯৬২)

১৯৫৫ সালে ঢাকা পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) যে ছয়টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে বগুড়া অন্যতম। বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় তদানীন্তন এডওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের প্রাচীন ভবনে এ ইনস্টিটিউটের কাজ প্রথমে শুরু হয়। তখন দুটি বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রকৌশল ও শক্তিকৌশল। পরবর্তীতে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য ১৯৬৭ সালে সাতমাথা হতে আড়াই কিলোমিটার দক্ষিণে শহরের শেরপুর রোড সংলগ্ন পুলিশ লাইনের বিপরীতে কলোনী নামক স্থানে ২৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তিন বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম চালু ছিল। কিন্তু ২০০০-২০০১ সেশন হতে চার বছর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা (Diploma in Engineering) চালু আছে। বর্তমানে যে সাতটি প্রযুক্তি বিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলো হল ১) প্রকৌশল- ৮০জন, ২) তারিৎ কৌশল- ৪০ জন, ৩) ইলেকট্রনিক্স- ৪০ জন। ৪) যন্ত্র কৌশল- ৪০ জন ৫) পাওয়ার- ৪০ জন ৬)কম্পিউটার- ৪০ জন ৭) মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে- ৪০জন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। ৪ বছর মেয়াদী ৮ সেমিস্টারের মাধ্যমে পরীক্ষা শেষ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তক চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সনদপত্র দেওয়া হয়। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২০০৪-২০০৫ সেশন হতে দুই শিফটে ক্লাস হচ্ছে।[৫৩]

---

৫৩. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, বগুড়া শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৮২১-২০০৬, অপ্রকাশিত পি.এইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪২-১৪৩।

কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র (Technical Training Centre-TTC) (১৯৭৬)

বগুড়া শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পূর্বে নিশিন্দারা মৌজায় কারবালা নামক স্থানে ১২.১৩ একর জমির উপর ১৯৭৬ সালের অনুমোদিত আই.ডি.এ এবং আই এল ও প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৭ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে ১ জানুয়ারি ১৯৮৬ সাল থেকে ৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তা চালু ছিল। ১৯৯৫ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১টি ট্রেডে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) নবম ও দশম শ্রেণী এবং ছয় মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। এস.এস.সি কোর্স পাস ছাত্র ছাত্রীরা ছয় মাস মেয়াদী কম্পিউটার ও গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেডের প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট অর্জন করে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। এ দুই কোর্সে ৪০ জন করে ৮০ জন শিক্ষার্থী প্রতি ব্যাচে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ১১ টি ট্রেডে এস.এস.সি (ভোকেশনাল কোর্স চালু আছে সেগুলো হলো : ১) অটোমোটিভ, ২) ইলেকট্রিক্যাল, ৩) কার্পেন্ট্রি, ৪) সিভিল কনস্ট্রাকশন, ৫) প-াম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, ৬) জেনারেল মেকানিক্স রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ৮) রেডিও এন্ড টিভি ৯) ইলেকট্রিক্যাল মেশিন মেইনটেন্যন্স ১০) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন এবং ১১) আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটোক্যাড। প্রতি শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেনী বোর্ড কর্তৃক ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করতে হয় এবং দশম শ্রেণী ও ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করতে হয়।[৫৪]

ভোকেশনাল টিচার্স টেনিং ইনস্টিটিউট (Vocational Teachers Training Instiute gyÐvTTI) (১৯৭৯)

বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা হতে দক্ষিণে শেরপুর রোডস্থ কলোনী নামক স্থানে VTTI ১৯৭৯ সালে স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৫.৬৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়/কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ক্যাটাগরি প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান। এখানে ৯টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এ ৯টি ডিপার্টমেন্টকে বিভিন্নভাবে ট্রেনিং করানো হয়। ২ সপ্তাহে বা ১৫ দিন মেয়াদী, ১ মাস মেয়াদী, ৩ মাস মেয়াদী, ৬ মাস মেয়াদী, ১ বছর মেয়াদীসহ বিভিন্ন সর্ট কোর্সের টেনিং করানো হয়। যে সকল বিষয়ের উপর সর্ট কোর্স করানো হয় তা হলো : ১) ফার্ম মেশিনারী/এগ্রিটেক ২) ইলেকট্রিক্যাল ৩) মেশিনিস্ট/মেকানিক্যাল ৪) অটো মোবাইল ৫) ওয়েল্ডিং

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪

৬) রেডিও এবং টেলিভিশন/ইলেকট্রনিক্স ৭) রেফ্রিজারেটর এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন ৮) উড ওয়ার্কিং এ্যান্ড সিভিল ড্রাফটিং এবং ৯) কম্পিউটার। এছাড়া আরো ৯টি ফ্যাকাল্টি চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেগুলো চালু হলে বগুড়া শহরে কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) (Institute of Health Technlogy IHT) (১৯৭৬)

ডা. সুধীরচন্দ্র চ্যাটার্জি[৫৫] ও ডা. সুরেন্দ্রচন্দ্র বকশী কর্তৃক বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় বগুড়া মেডিকেল স্কুল ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ৭/৮ জন ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। পরে কো-অপারেটিভ মেডিকেল সোসাইটির প্রচেস্টায় লাইসেন্স প্রাপ্ত হলে বর্তমানে শেরপুর রোড, ঠনঠনিয়া নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে সময় এবং কালের পরিক্রমায় ১৯৭৬ সালে এখানে একটি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট টেনিং স্কুল (Medical Assistant Training School-MATS) স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভূমি হুকুম দখল করে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরে মেডিকেল কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৯২ সালে মেডিকেল কলেজটির কার্যক্রম শুরু হয় এবং উক্ত মেডিকেল কলেজটির নাম হয় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ। ২০০৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কলেজটির কার্যক্রম এখানেই চলছিল। পরবর্তীতে বগুড়া শহরের পশ্চিম পার্শ্বে বিশ্বরোড সংলগ্ন সিলিমপুর নামক স্থানে মেডিকেল কলেজটি নিজস্ব স্থাপনায় স্থানান্তরিত হয়। উক্ত মেডিকেল এসিসটেন্ট টেনিং স্কুল (Medical Assistant Training School-MATS) টি রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ প্রনীত কারিকুলাম অনুযায়ী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (Institute of Health Technlogy IHT) তে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এখানে ডিপে-ামা কোর্সটি ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। এখানে ৭টি অনুষদ আছে, সেগুলো হলো ১) Sanatory Inspector Training (SIT) ২) ল্যাবরেটরী ২) ডেন্টাল ৪) ফার্মেসী ৫) রেডিওগ্রাফী ৬) ফিজিওথেরাপী এবং ৭) রেডিওথেরাপী।

৫৫. সুধীরচন্দ্র চ্যাটার্জী (১৮৭০-১৯৪৮) : তিনি বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলায় জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়া শহরের একজন খ্যতিমান এম এল এস ডাক্তার ছিলেন। বগুড়া জেলায় সমবায় আন্দোলনের রূপকার হিসেবে তিনি পদ্মাপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক, বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, বগুড়া কো-অপারেটিভ মেডিকেল সোসাইটি লিমিটেড প্রভৃতি সংস্থার সংগঠক ও সভাপতি ছিলেন।

প্রত্যেক অনুষদের আসন সংখ্যা ৫০ জন। শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থার জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস আছে। ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৩৫০ জন, শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন, কর্মচারীর সংখ্যা ৫৭ জন, অধ্যক্ষ ১ জন।

নার্সিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া (১৯৭০)

বগুড়া নার্সিং ইনস্টিটিউট ঠনঠনিয়া মৌজায় ২.৯৫ একর জমির উপর ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়। এস.এস.সি পাসের পর ভর্তি হয়ে চার বছর শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ডিগ্রি অর্জন করেন। ইনস্টিটিউটের প্রধানকে ইনস্ট্রাক্টর ইনচার্জ বলা হয়। প্রত্যেক বছরের আসন সংখ্যা ২৫ জন। নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর ইনচার্জ ১ জন, নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর ২ জন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী ৪ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ৮ জন কর্মরত আছেন। ।

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (১৯৭৯)

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া মৌজায় শেরপুর রোডস্থ মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল সংলগ্ন ১৯৭৯-৮০ সালে ভূমি হুকুম দখল করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি নিহত হলে কলেজের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।[৫৬] ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর তৎকালীন 'মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল' কে দেশের নতুন পাঁচটি মেডিকেল কলেজের একটি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হিসেবে উদ্বোধন করেন এবং সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের বিদ্যমান আসন ২৫০ এ বৃদ্ধি করে তা কলেজের টিচিং হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপ উন্নত যোগাযোগের কারণে একটি নতুন বৃহত্তর হাসপাতাল এবং স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পাসের সংলগ্ন ছিলিমপুর মৌজায় ৪০ একর জমির উপর ২০০২ সালের ১৬ জানুয়ারি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ কলেজে প্রতি বছর ১০০ জন স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং ৫ বছর শিক্ষা শেষে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করে। এখানে ছাত্রাবাস ১টি, ছাত্রীনিবাস ১টি, ইন্টার্নী চিকিৎসক হোস্টেল ২টি, নার্স, কর্মচারি, কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের আবাসিক ভবন রয়েছে। ডাক্তার, নার্সসহ এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা ৯৫৯ জন। হাসপাতালে সার্বক্ষণিক চালু থাকে জরুরী বিভাগ। এছাড়া অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে সব ধরনের চিকিৎসা হয়ে থাকে।[৫৭]

৫৬. শফিকুল ইসলাম সৈয়দী ও অধ্যাপিকা রাফিনা আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৫৭. শহীদ জিয়াউর রহমান ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শুভ উদ্বোধন ১৬ ভাদ্র ১৪১৩/৩১ আগস্ট ২০০৬, প্রকাশনায়: প্রকল্প পরিচালক শ. জি. মে. কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প, বগুড়া, পৃ. ২১।

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া, ৩১টি বিভাগে পড়াশোনা হয়ে থাকে, বিভাগগুলো হলো এনাটমি, ফিজিওলজী, বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজী, প্যাথলজী, মাইক্রোবায়োলজী, ডার্মাটোলজী, মেডিসিন, নিউরোলজী, শিশু, শিশু সার্জারি সাইকিয়াট্রি, কার্ডিওলজী সার্বারী, নিউরো সার্জারী, বার্ণ ও প-াস্টিক সার্জারী, চক্ষু, ই.এন.টি, অর্থো সার্জারী মিডওয়াইফারী, রক্স পরিসঞ্চালন, রেডিওলজী, রেডিওথেরাপী, এ্যানেসথেসিওলজী, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী, রেসপিরেটরী মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজী, ইউরোলজী এবং দন্ত প্রভৃতি।

বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (১৯৮১)

১৯৮১ সালে বগুড়া বিদ্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় শহরের কাটনার সেন্ট্রল জুনিয়র হাইস্কুলে নৈশকালীন বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। পরে বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ে নৈশকালীন হোমিওপ্যতিক মেডিকেল কলেজ চালু করেন। দুইটি কলেজ একসাথে চালু হলে দুটোর শিক্ষার মান দুর্বল হওয়ার উপক্রম হলে গণমান্য বিদ্যানরাগী ডা. মোঃ হাবিবুর হরমান, ডা. মোঃ আব্দুস সামাদ ডা. মোঃ মোঃ আয়ুব হোসেন, ডা. এ.কে.এম আব্দুর রহমান এ চারজনের চেষ্টায় কলেজ দু'টি একত্রিত হয়ে পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস চলতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে শহরের দক্ষিনে ফুলদীঘি মৌজায় ৩৩.৫০ শতক জায়গা ক্রয় করে কলেজটির একটি টিনশেড ভবন নির্মাণ করা হয়। শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেতনের টাকা দিয়েই উক্ত জমি ক্রয় করা হয়। ঢাকা হোমিওপ্যথিক মেডিকেল বোর্ড থেকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। চার বছর মেয়াদী শিক্ষা শেষে ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করলে শিক্ষার্থীরা Diploma Homoeopathic Medicine and Surgery (DHMS) ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্তীর সংখ্যা ৩৫০ জন। শিক্ষক ২৭ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৬ জন। দুই শিফটে অর্থাৎ দিবা রাত্রি ক্লাস চলে। কলেজটি সম্পুর্ণ বেসরকারি সেবামূলক। এখানে ৫ আসন বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। অভ্যন্তরীণ রোগীর ভর্তি ফি ৫ টাকা এবং বহিরাগতদের ডাক্তারী ফি ১০০ টাকা এবং বেড ভাড়া ৫০ টাকা। প্রতিষ্ঠনটির ৯ সদস্য বিশিস্ট একটি কলেজ পরিচালনা পরিষদ আছে। উক্ত পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক, বগুড়া।[৫৮]

৫৮. ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম আখন্দ, বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অতীত ও বর্তমান, ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এর ২৪৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কলেজের বিশেষ প্রকাশনা- হ্যানিম্যান স্মরণিকা-২০০৩ইং বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ফুলদিঘী, বগুড়া, ২২ জুলাই, ২০০৩, পৃ. ৩৭-৩৯।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া (১৯৮২)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বগুড়া শহরের রেলগেটের উত্তর পার্শ্বে পুরান বগুড়া মৌজায় ২০০৬ সালে ৬.৭৬ একর জায়গায় এর প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের জন্য অফিসসহ এর ভবন নির্মাণ করা হয়। বগুড়া জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয় ৮ এপ্রিল ১৯৮২ সালে। প্রথমে এর নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। তখন শহরের বিভিন্ন ভাড়া বাসায় এর কার্যক্রম চল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া-উপ-পরিচালকের কার্যালয় থেকে এ দপ্তরাধীন দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এর সমস্ত কার্যক্রম করে থাকে। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো : ক) বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং খ) যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্র, বগুড়া।

(ক) বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। যুব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর উম্মেষ সাধনের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হয়েছে বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের পথ পরিক্রমা। উত্তরাঞ্চলের বেকার যুবকদের উপযোগী সকল কার্যক্রম এ কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন বেকার যুব সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয় উঠতে পারে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ মাস থেকে ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। ছেলে এবং মেয়েদের জন্য দু'টি পৃথক আবাসিক রয়েছে, যা তাদের প্রশিক্ষণের জন্য অনুকূল। এখানে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়-সেগুলো হল পোশাক তৈরী, মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড হাউজ ওয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, কম্পিউটার প্যাপি- কেশন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি। এর কর্মকর্তা, কর্মচারির সংখ্যা ২২ জন।

খ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বগুড়া

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন বগুড়া ১৯৯২ সালে যুব প্রশিক্ষণ নামে আরেকটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র একই জায়গায় উত্তর পার্শ্বে টিন শেড রুমে অফিস এবং কার্যক্রম চলছে। প্রথমে শহরের মালতীনগরে ভাড়া বাসায় এ কার্যক্রম চলত। ১৯৯৫ সালে প্রশিক্ষন কেন্দ্রটি বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের পার্শ্বে তার কর্মশালা শুরু হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এখানেই আছে। এখানে ২ মাস ১৫ দিন মেয়াদ হিসেবে বছরে ৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া

হয়। এখানে যারা প্রশিক্ষন নেয় তারা সবাই অনাবাসিক। গবাদী পশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৫৯]

নেকটার (NACTAR) (১৯৮২)

১৯৮২ সালে আব্দুল মান্নান ব্যক্তিগত উদ্যোগে বগুড়া শহরের একটি পরিত্যাক্ত বাড়িতে (বর্তমানে ডায়াবেটিস হাসপাতল) কোর্ট হাউজ স্ট্রীটে খুব ছোট পরিসরে জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (National Training and Research Academy for Multilingual shorthand-NTRAMS) হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে সরকার ১৯৮৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন। তখন প্রাথমিকভাবে কোর্ট হাউজ স্ট্রীট রোড থেকে শহরের পার্ক রোডে ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড পার্কে পৌরসভার টিটু মিলনায়তনে এর সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে এর কার্যক্রম এখানেই পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠানটি বগুড়া শহরের সাতমাথা হতে ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণে এশিয়া মহাসড়ক ও ফুলতলা জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাসের উত্তর পার্শ্ব তিন একর জমির উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালে বহুভাষী সাঁটলিপি গবেষণা ও প্রশিক্ষনের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। নট্রামস সরকারি স্বায়ত্তশাসিত, আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারিদের কম্পিউটার ট্রেনিংসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। একাডেমীর প্রধান কোর্সের মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ এবং সার্টিফিকেট, কম্পিউটার সায়েন্স ও সাচিবিক বিদ্যা। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোঃ আবদুল মান্নান সরকার কর্তৃক ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষার জন্য বহুভাষী সাটলিপিকা প্রবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি এখন ব্যাপকভাবে সরকারি এবং বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই একাডেমীটি একজন পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হয় যিনি সরকারের যুগ্ন সচিবের সমান পদ মর্যাদাসম্পন্ন একজন নির্বাহী। এ একাডেমী ৩০০ কম্পিউটারের একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৮৯ সালের জুলাই থেকে একাডেমী প্রায় ১৬০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষন দেয়া হয়।

৫৯. তথ্যদাতা: মোঃ মিজানুর রহমান, প্রশিক্ষক মৎস, যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্র, পুরান বগুড়া, রেলগেট তিনমাথা, বগুড়া।

পরবর্তীতে যুগের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রতিষ্ঠানটি বহুভাষী সাঁটলিপি থেকে তার কর্মপরিধি কম্পিউটার বিজ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। যার শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সাল থেকে, তার এ ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম (NTRAMS) নট্রামস পরিবর্তন করে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষন ও গবেষণা একাডেমী (National Academy for Computer Training and Research-NACTAR) রাখা হয়। বর্তমানে এখানে একজন পরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা ১৩৮জন।[৬০]

৫.৮ মাদ্রাসা শিক্ষা

সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৯২৫)

বগুড়া শহরের সাতানী পরিবারের খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী ১৯২৫ সালের ১ জুলাই (১৩৩২ বঙ্গাব্দ ১৪ আষাঢ়) সুত্রাপুর মহল্লার সাতানী মসজিদে মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার গোড়াপত্তন করেন। অবিভক্ত বাংলা ও আসামের আলেমের আলিম-ই-হক্কানী ও ওলী-ই-কামেল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার ফুরফুরা শরীফের হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) খান্দানী সিলসিলা উর্ধতন এক কামিল পুরুষ হযরত মাওলানা মুস্তাফা আল মাদানীর নাম অনুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় মুস্তাফাবিয়া। মাদ্রাসার রেকর্ড পত্র সূত্রে বলা হয় যে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার যখন কথা উঠে তখন ১৮ জন ব্যক্তির ১৯ টাকা সাহায্য নিয়ে সাতানী মসজিদে মাদ্রাসার যাত্রা শুরু করেন। সাতানী মসজিদের সে সময়ের ইমাম মাওলানা নিজামুদ্দীন গজনবী এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হবার গৌরব অর্জন করেন। ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মসজিদে ছাত্র সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিন পার্শ্বে ১৫০×২০ ফুট আয়তনের উপর একটি বেড়ার ঘর এবং চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি আধা পাকা ইমারত নির্মিত হয়। এখানে প্রায় ষোল বছর ধরে মাদ্রাসার শিক্ষা চলতে তাকে এবং এখানে আলিম ও ফাজিল ক্লাস খোলা হয়। ১৯৩৮ সালে অত্র মাদ্রাসা হতে প্রথম আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে এবং ফলাফল সন্তোষজনক হয়। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাদ্রাসাটি অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য সবাই একাগ্রচিত্তে কাজ করতে থাকে। এরই ফলে শহরের উত্তর পশ্চিম কোনে নিশিন্দারা মৌজায় পুরাতন দিনাজপুর রোড সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৪.২৩ একর জমির উপর ১৯৪১ সালে মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির মোট জমির পরিমান ২৩.৭৯ একর। ১৯৪৯ সালে কামিল হাদিস বিভাগ খোলা হয়।

---

৬০. একাডেমী পরিচিতি ও নিয়ামাবলী, জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, ফুলতলা, জাহাঙ্গীরাবাদ, বগুড়া।

১৯৬৫ সাল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেমের মধ্যে সর্বপ্রথম এখানে কামিল তফসীর বিভাগ খোলা হয়। সে জন্য এ মাদ্রাসাকে ডবল টাইটেল মাদ্রাসা বলা হয়। প্রথম শ্রেনী থেকে কামিল পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে। মাদ্রাসাটি জাতীয়করণ হয় ১২.০৩.১৯৮৬ইং সালে। বগুড়া সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্নে যে ১৮ ব্যক্তি ১৯ টাকা সাহায্য করেছিলেন তারা হলেনঃ[৬১]

ক্র. নং	ব্যক্তিগণের নাম	দানকৃত অর্থের পরিমাণ
০১	মুন্সী নায়েবুল্লাহ	২.০০ টাকা
০২	মুন্সী আহমাদ উদ্দীন পানজাবী	১.০০ টাকা
০৩	মুন্সী হামিদ উদ্দীন খন্দকার	১.০০ টাকা
০৪	মুন্সী খাদেম আলী	১.০০ টাকা
০৫	মুন্সী হাবিবুর রহমান মিয়া	১.০০ টাকা
০৬	হাফিজ আবদুর রহমান	২.০০ টাকা
০৭	হাজী মুনির উদ্দীন প্রামাণিক	১.০০ টাকা
০৮	মৌলবী মুহাম্মদ মাহমুদ উল্লাহ	১.০০ টাকা
০৯	মুন্সী জিয়াউল হক	১.০০ টাকা
১০	সৈয়দ মুন্সী আহমদ আলী	১.০০ টাকা
১১	মুন্সী আব্দুস শকুর	১.০০ টাকা
১২	মুন্সী সৈয়দ উল্লাহ মিয়া	০.৫০ টাকা
১৩	জনাব মুন্সী রহীম বক্স মণ্ডল	১.০০ টাকা
১৪	মুন্সী মহীর উদ্দিন খলিফা	১.০০ টাকা
১৫	মুন্সী মুমিন উদ্দীন	১.০০ টাকা
১৬	মুন্সী ফজলুর রহমান	০.৫০ টাকা
১৭	মুন্সী নরম উদ্দীন	১.০০ টাকা
১৮	জনাব মুন্সী দীন মুহাম্মদ	১.০০ টাকা
	সর্বমোট	১৯.০০ টাকা

৬১ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বি, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বগুড়া সরকারী মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসার ভূমিকা (অপ্রকাশিত এম.এ. থিসিস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫), পৃ. ৪৪-৪৫।

ঠনঠনিয়া নূরুল-আলা-নূর ফাযিল মাদ্রাসা (১৯৪২)

শাহ সূফী হযরত মাওঃ মোঃ জয়নাল আবেদীন (র.) বগুড়া শহরের শেরপুর রোড, ঠনঠনিয়া নামক স্থানে ১৯৪২ সালে অত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর অতিক্রম করার পরে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৮ সালে বোর্ড কর্তৃক দাখিল ক্লাশের সরকারি অনুমোদন পায় এবং ১৯৬০ সালে আলিম ক্লাসের এবং ১৯৭০ সালে ফাজিল ক্লাসের অনুমোদন পায়। প্রতিষ্ঠানটিতে দাখিল পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের ভিতরের আয়তন ৩ একর। ভবন ২টি। মাদ্রাসাটিতে ২০০ ছাত্রের জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে, শিক্ষক সংখ্যা ২৪ জন, কর্মচারির সংখ্যা ৬ জন ।

ফয়জুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা (১৯৫৩)

বগুড়া শহরের কলোনী এলাকায় চকলোকমান মৌজায় ১৯৫৩ সালে ৫২ শতাংশ জমির উপরে ফয়জুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বিহারি এবং বাঙালি উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলেও এখানকার অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী (৯৫%) বিহারি এবং বাঙালি ছাত্র ছাত্রী (৫%) খুবই কম। নিম্ন আয়ের বিহারিদের সন্তানরা এখানে পড়ালেখা করে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক এবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান অনুমতি আছে। অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও মাদ্রাসাটি এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি।

উত্তর চেলোপাড়া দাখিল মাদ্রাসা (১৯৮৫)

বগুড়া শহরের চেলোপাড়া মৌজায় উত্তর চেলোপাড়া বটতলা নামক স্থানে ৫২.৫০ শতক জায়গার উপর ১৯৮৫ সালে উত্তর চেলোপাড়া দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী, আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আলী, মৃত জয়নাল আবেদীন ব্যাপারী জমি দান করেছেন। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন মৃত আলহাজ্ব তোরাব আলী, আলহাজ্ব সুজাবত আলী আকন্দ ও আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে আছেন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয়। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। শিক্ষক সংখ্যা ১৫ জন এবং কর্মচারি ৩ জন আছেন। মাদ্রাসাটিতে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করে।

বগুড়া মহিলা আলিম মাদ্রাসা (১৯৯৬)

বগুড়া শহরের নিশিন্দারা মৌজায় বগুড়া-দিনাজপুর রোড সংলগ্ন রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে ১.৫০ একর জমির উপর ২.০৮.১৯৯৬ সালে বগুড়া মহিলা আলিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যারা উদ্যোগী ছিলেন তারা হলেন আলহাজ্ব সিদ্দিকুর রহমান, আলহাজ্ব আব্দুল গণি

সরদার এবং আলহাজ্ব অধ্যাপক আবুল হোসেন। মাদ্রাসাটি ২০০৪ সালে এমপিওভুক্ত হয়। বেবী শ্রেণী থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু আছে।

বগুড়া কওমী মাদ্রাসা

বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসার মূল প্রেরণা আসে দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তা থেকে। কওমী মাদ্রাসা বলতে সমাজ বা কওম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসাকে বুঝায়। এ সকল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বেসরকারি। এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ণয় করেন শিক্ষকমন্ডলী। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং বার্মাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় দেশসমূহে এ ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবী (১৮৩২-১৮৮০)র নেতৃত্বে উত্তর ভারতের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২] চট্টগ্রামের দারুল উলুম হাঠহাজারী ও ঢাকার লালবাগ বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে অন্যতম।[৬৩]

কোরান ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার লক্ষ্যে বগুড়া শহরে আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও বেশকিছু হাফেজিয়া ও কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে কওমী মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য বগুড়া শহরে তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া আল কাওমিয়া (উত্তরবঙ্গ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শেরপুর রোডস্থ কলোনীতে জামিল মাদ্রাসায় ১৯৯৬ সালে বোর্ড স্থাপিত হয়েছে।[৬৪] এর পাশাপাশি বগুড়া শহরে মহিলা কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত উত্তরবঙ্গের মহিলা কওমী মাদ্রাসার জন্য বগুড়া শহরে মহিলা কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত উত্তরবঙ্গের মহিলা কওমী মাদ্রাসার জন্য বগুড়া শহরে ২০০২ সালে ইত্তেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া মাদারিসিল লিল বানাত নামক বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। এর অফিস ভবন চকলোকমান আল জামিয়াতুল আরাবিয়া লিল বানাত নাম মহিলা কওমী মাদ্রাসায়।[৬৫] এরই ধারাবাহিকতায় বগুড়া শহরে প্রায় ৫০টি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬৬]

---

৬২ মোঃ আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে ইহার প্রভাব, পৃ. ৩৭১

৬৩ পূর্বোক্ত

৬৪ তথ্যদাতা : তানযীমূল মাদারিসিদ আল কাওমিয়া বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোডং, জামিল মাদ্রাসা, নথিপত্র তালিকা থেকে সংগৃহীত।

৬৫ তথ্যদাতা : মুহতামীম (অধ্যক্ষ) মাওলানা আছাফুদ্দৌলা, অফিস নথিপত্র ও তালিকা থেকে সংগৃহীত।

৬৬ তথ্যদাতা : মোঃ আহসান হাবীব, অফিস সহকারি, তানযিমুল মাদারিসিদ আল কাওমিয়া মাদ্রাসা বোর্ড বাংলাদেশ, জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্ট জনদের অবদান

সমাজ ও সংস্কৃতির গড়ার মূল কারিগর হলো মানুষ। সভ্যতায় যা কিছু অবদান তা মনুষ্য সৃষ্টি। পৃথীবিতে বহু মানুষের আবাস হলেও সভ্যতা নির্মাণে উল্লেখযোগ্য মানুষের সংখ্যা কম। উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জনপদ বগুড়া। এ জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মানে যে সকল সমাজসেবক ও সংস্কৃতিসেবকের অবদান অসামান্য। তন্মোধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

অমৃতলাল কুন্ডু চৌধুরী (আনুমানিক ১৮৬৪-১৯৬২) সমাজ সেবক। বগুড়াসহ গোটা বাংলাদেশ যখন শিক্ষা-দিক্ষায় অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন বিশিষ্ট সমাজ সেবক অমৃতলাল কুন্ডু ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলটির নাম “অমৃত পাঠশালা”। যা পরবর্তীকালে কাটনার ‘সেন্ট্রাল জুনিয়র হাইস্কুল’ এ রূপান্তরিত হয়। (এখন কাটনার ‘সেন্ট্রাল উচ্চবালিকা বিদ্যালয়”)। ১৮৯২ সালে অমৃতলাল কুন্ডু এই পাঠশালা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তার পুত্র স্কুলটির সমুদয় সম্পত্তি স্কুল কমিটির নিকট হস্তান্তর করেন। তখন উক্ত কমিটি স্কুলের নাম পরিবর্তন করে। ১৯৫৮ সালে স্কুলটি সরকারি আওতাভূক্ত হয়। এটি অমৃতলাল কুন্ডুর সময়ে ও তার পরেও বগুড়ার একমাত্র উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হতো।[১] বগুড়ার বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি এই স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

আকবার আলী খাঁন চৌধুরী (১৯১৯-১৯৮৪) রাজনীতিবিদ ও সংসদসদস্য। তিনি বগুড়ার নন্দিগ্রাম উপজেলা আমড়াগোহাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ ১৩২৬ সন। পিতা হযরত উল্লাহ খান চৌধুরী এবং মাতা ময়জান বেগম। আকবর আলী খাঁন চৌধুরী নন্দীগ্রামের বিশিষ্ট জোতদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার সহধর্মিণীর নাম আনোয়ারা বেগম। তিনি রাজশাহী মাদ্রাসা থেকে স্নাতক সমমান ডিগ্রি লাভ করেন। বগুড়ার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ধারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম দিকে মুসলিম লীগের সঙ্গে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। পরবর্তীকালে আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে যোগদান করেন। তিনি মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন।

১. আখতার উদ্দিন মানিক, বগুড়া চরিতকোষ, বাংলার মুখ, ঢাকা, এপ্রিল- ২০১১, পৃ. ২১

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনীতি প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বা এমএলও পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য বা এমএনএ পদে নির্বাচিত হন। তিনি বগুড়া পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন। বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ নিরহংকারী ও জনদরদী। পৌরসভার কমিশনার থাকাকালীন সময়ে পৌর কর্মচারীদের বেতন প্রদানের সঙ্কট দেখা দিলে অনেক সময় নিজ পকেট থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করেছেন। বহু গরিব ও মেধাবী ছাত্রকে নিজ খরচে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি বগুড়া গোহাইল রোডে চৌধুরী লেন প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজও আকবর চৌধুরী লেন নামে তার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি ভাট্‌রা খান চৌধুরী বিদ্যালয় এবং নন্দীগ্রামে তিনতলা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। নন্দীগ্রামের বিভিন্ন স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নন্দীগ্রামের রাস্তা মেরামত ও উন্নয়নে তার অবদান রয়েছে। তিনি বহুসংখ্যক জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আকবর আলী খাঁন চৌধুরী ১৯৮৪ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি বগুড়া শহরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর ১০ মাস।

<u>আকবর হোসেন আকন্দ (১৯০৯-১৯৬৯)</u> আইনবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি বগুড়া সদর উপজেলায় রাজাপুর ইউনিয়নে কুটুরবাড়ি গ্রামে ১৯০৯ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ আকালু আকন্দ। তিনি বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকেই মেট্রিক পাশ করেন। তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। কলকাতা থেকেই আইন শাস্ত্রে বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১১ই নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে বগুড়া বারে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। মুসলিম লীগের একজন কর্মী হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি ন্যাপের রাজনৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত হন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বগুড়া জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ১৮-১৯শে মে বগুড়ায় উত্তরবঙ্গ কৃষক

কর্মীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন আকবর হোসেন আকন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। আকবর হোসেন আকন্দ বগুড়া বারের নেতৃত্বস্থানীয় ও স্বনামখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তিনি বগুড়া বারের সেক্রেটারি হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। নানা সামাজিক ও জনহিতৈষী কার্যকলাপের সাথে আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন। তার অন্যতম পুত্র টিপু, বগুড়ার বিখ্যাত পপ গায়ক ও 'ইয়থকয়্যার' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ তারিখে বগুড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[২]

<u>আব্দুর রউফ মহম্মদ (১৯২৯-)</u> স্বভাবকবি। বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা শহরের পোদ্দারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- আব্দুল কাদের পোদ্দার, মাতা- রাবেয়া খাতুন। সহধর্মিনী বেগম সুফিয়া রউফ। তিনি শেরপুর ডিজে হাইস্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে মেট্রিক পাশ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা আর হয়নি। ১৯৫৩ সালে জনস্বাস্থ্য দপ্তরে, শেরপুর অফিসে সুপারভাইজার পদে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে উক্ত চাকুরি থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬৮ থেকৈ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সুপারভাইজার পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি স্বভাবকবি হিসাবে এলাকায় সমধিক পরিচিত। ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় তার কবিতা প্রথম প্রকাশ পায়। 'দৈনিক সংবাদ' এর খেলাঘর এ ছড়া প্রতিযোগিতায় পঞ্চাশের দশকে তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় তার প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে ছদ্মনামেও কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি গৌরবজনক অবদান রেখেছেন। যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে কবিতা ও ছড়া লিখে এবং আবৃত্তি করে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

১৯৮৯ সালে গণউন্নয়ন ট্রাস্ট পুরস্কার, ১৯৯২ সালে শেরপুর সাহিত্যচক্র পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে এসএম রাহী পুরস্কার পান। এছাড়াও পেয়েছেন বহুসংখ্যক সাহিত্য পুরস্কার, পদক, সনদ ও সংবর্ধনা। 'ইন্টারন্যাশনাল বায়োটেকনিক্যাল সেন্টার' ক্যামব্রিজ, ইংল্যান্ড থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দুস্থ কবি হিসাবে মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা পেয়ে আসছেন। জীবন যন্ত্রণা ও অনটন তাকে কাবু করতে পারেনি। বয়সে প্রবীণ হলেও মনের দিক থেকে চির নবীন। তিনি শেরপুর সাহিত্যচক্রের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য। তার প্রচুর লেখা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিবর্ণ জ্যোৎস্না (কবিতা) ২০০৩ সনে প্রকাশিত, 'অনাদি প্রবাহ' (ছড়া সমগ্র)

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ (১৯৪৩-১৯৯৭) কথাসাহিত্যিক। পেশাগত জীবনে সরকারি কলেজের অধ্যাপক। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে মাতুলালয়, গোটিয়া, গাইবান্ধায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বগুড়া। পিতা বি.এম. ইলিয়াস বগুড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং ব্রিটিশ যুগে ও পরবর্তীকালেও মুসলিম লীগ দলীয় পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য ছিলেন (১৯৪৭-১৯৫৩)। মাতা মরিয়ম বেগম ছিলেন গৃহিণী। শিক্ষাজীবনে তিনি বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পাশ করেন। অত:পর ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন ১৯৬০ সালে। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক পাশ করে একই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৪ সালে। উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত সফল এবং অসাধারণ জনপ্রিয়। জগন্নাথ কলেজে নৈশ বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সাধারণত ছাত্র উপস্থিতি থাকতো নগণ্য সংখ্যক। কিন্তু যেদিন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা ক্লাশ নিতেন, সেদিন শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলান হতো না। তার 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়ানোর স্মৃতি প্রাক্তন ছাত্রদের মনে বহুদিন পর্যন্ত জাগরুক ছিল। তিনি ১৯৬৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে এবং ১৯৮৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ঢাকার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় অধ্যাপনা করেন। ১৯৯০ সালে পুনরায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা কলেজে বদলি হন এবং বাকি জীবন এ কলেজেই অধ্যাপনা করেন।

তিনি ছিলেন এ যুগের শক্তিমান কথা সাহিত্যিক। সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতনতা তার লেখায় বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত। অনাহার , অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করে, তাদের ছবি তিনি এঁকেছেন তার গল্প, উপন্যাসে নিখুঁতভাবে।

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোয়ার (১৯৮২), দুধ ভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯)। উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬)। প্রবন্ধ : সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু।৩

কারো কারো মতে তার শ্রেষ্ট রচনা মহাকাব্যেচিত উপন্যাস ' খোয়াবনামা' য় গ্রামবাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকীর- সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ এর আকাল, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান নিপুণভাবে উপস্থাপিত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিলেন উভয় বাংলায় বিশেষ ভাবে সমাদৃত। শিব নারায়ন রায় বলেছেন,'এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় সম্প্রতি যাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাদের ভিতরে সবচাইতে শক্তিশালী গল্প-লেখকদের একজন হচ্ছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াছ।

৩. www.bogra.gov.bd

'কি মহাশ্বেতা দেবীর মন্তব্য : 'কি পশ্চিম বাংলা কি বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক '। ' অন্যত্র ইলিয়াস-এর নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম।' ইলিয়াসকে একটি বই উপহার দিতে গিয়ে তাতে তিনি লিখেছেন : ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় বইয়ের লেখককে মহাশ্বেতা দি।' হাসান আজিজুল হক মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৃত্ত বাঙার ক্ষেত্রে ইলিয়াসের তুলনা করেছেন জগদীস গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), মানিক বন্দ্যোপধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮২) সঙ্গে । তারপর লিখেছেনঃ এদের সঙ্গে ইলিয়াসের তুলনা চলবে না, 'আমি মনে করি সমস্ত বাংলা সাহিত্যে কার ও তুলনা চলবে না। ' লিরিক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যার (চট্রগ্রাম, ১৯৯২) সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইলিয়াসকে বঙ্কিক, রবীন্দ্রনাথ, মানিক এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পর সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিমান, মেধাসম্পন্ন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক লেখক এবং আপোসহীন সিরিয়াস সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে 'সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক" হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দুই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তার জীবনকালেই সংঘটিত হয়েছে। একটি ১৯৪৭- এর দেশবিভাগ, আরেকটি ১৯৭১-এর মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ । স্বাধীনতাযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্বেই ঘটেছে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, যে আন্দোলনে জাতিগত শোষণ ও শ্রেণীশোষনের বিরুদ্ধে ব্যক্ত হয়েছে অভূতপূর্ব গণরোষ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যার সফল পরিণতি। তার দুটি উপন্যাসের একটি (খোয়াবনামা : ১৯৯৬) ১৯৪৭ এর আরেকটি (টিলকোঠার সেপাইঃ ১৯৮৬) ১৯৬৯-এর রাজনৈতিক আখ্যানের বিচিত্রমুখি জটিলতা অবলম্বনে রচিত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনার একান্ত ইচ্ছাটি তার অপূর্ন রয়ে গেছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকালপ্রয়াণের কারণে। তবে 'অপঘাত' ,'রেইনকোট' এবং জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতা ও পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের চিত্র। মুক্তিযুদ্ধোত্তর নানাবিধ সংকটের স্বরুপ বিশ্লেষিত হয়েছে ' প্রতিশোধ' , 'ফেয়ারী,' 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', খোয়াঁরি',মিলির হাতে স্টেনগান', 'দখল', প্রভৃতি গল্পে। বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুরানো ঢাকার জীবনবৈচিত্র্যের নানাবিধ অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত হয়েছে ' উৎসব', ফেয়ারী', অসুখ- বিসুখ', তারাবিবির মরদ পোলা,' 'দোজখের ওম', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল', প্রভৃতি গল্প। এছাড়া চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের ও বিস্তৃত অংশ জুড়ে পুরানো ঢাকার জীবনধারার ইতি-নেতি ও তার শোষণবৈচিত্র্য উদঘাটিত হয়েছে। ইলিয়াসের বাস্তবতাবোধ সর্ম্পকে হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য ও স্মরণযোগ্য : 'কোথা ও একটু দয়া নেই। জল দাঁড়ায় না- বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনি আঁকা ক্যামেরাও এর চেয়ে নিখুঁত ছবি তুলতে পারে না। শ্মশানের মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসের ও তাই।' কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্টা ৭৪) । বাস্তবতার রুপচিত্রণে ইলিয়াসের দৃষ্টি ভঙ্গি অত্যন্ত নির্মোহ, নিরাসত্ত ও

পক্ষপাতহীন। এই বাস্তবতা বোধের অর্থ হলো,তিনি একটি চরিত্রকে তার সরলতা-দুর্বলতা, নীতিনিষ্ঠা নীতিদৃষ্টতা এবং সততা- অসততাসহ তুলে ধরার এক দুরূহ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। লেখক হিসাবে ইলিয়াসের মনোবিশ্লেষণ-প্রবণতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার গল্প-উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস কৌশলের এ তাৎপর্যময় দিক। মনোগত বিশ্লেষণের নের স্বাভাবিক পথ ধরেই কাহিনীবিন্যাসে অনুসৃত হয়েছে চৈতন্যপ্রবাহ রীতি। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও ইলিয়াছ পরিহার করেছেন প্রথাগত রীতি। কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক-চরিত্র সৃষ্টির কোনো প্রয়াসই তার উপন্যাসে নেই। তিনি তার কথাসাহিত্য এমনসব চরিত্রে ওপর আলো ফেলেছেন, যারা প্রচলিত ধারার নায়ক- চরিত্রের মহিমা অর্জন করতে অক্ষম। ওইসব চরিত্রে নেই কোনো উচ্চ শ্রেণীগত গৌরব কিংবা বীরত্বব্যঞ্জক জৌলুস। শারীরিক শক্তি কিংবা রূপময়তা কিংবা ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য কোনো মাপকাঠিতেই তারা সাহিত্যের পরস্পরাগত নায়কত্বের গুণমন্ডিত নয়। বরং একবারেই সাদামাটা, অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত এবং কুশ্রী দৈহিক অবয়ববিশিষ্ঠ এসব চরিত্র, বিশেষত চিলকোটার সেপাই- এর হড্ডি খিজির ও খোয়াবনামার- তমিজের বাপ-লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণ নিম্নবর্গীয় জীবনের প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ ও একাত্মবোধ। তিনি এই দলিত-পিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জীবনভাষ্যকে তাদেরই মাধ্যমে পাঠকের গোচরে আনতে চান এবং ভেঙে দিতে চান মধ্যবিত্তের সহানুভূতিশীল মনোভঙ্গির মাধ্যমে পীড়িতজনদের অবহেলিত জীবনধারা উপস্থাপনের সুখপ্রদ রীতি। এভাবে তিনি মধ্যবিত্তের বৃত্ত থেকেও বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। ভাষা ও পরিচর্যারীতির ক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সৃষ্টিশীলতা আর ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। বিভিন্ন নাট্যিক কৌশল যেমন তার রচনাকে প্রাণদীপ্ত করেছে,তেমনি টান টান গাম্ভীর্যের মধ্যে উইট ও হিউমারের ব্যবহারে তার সাহিত্য হয়ে উঠেছে রসমন্ডিত। আগেই বলেছি মনোবিশ্লেষণধর্মিতা তার রচনার প্রধান গুন। ঢাকার উপভাষা এবং বগুড়ার গ্রামাঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহারে সৃজনশীল নৈপুণ্যের দিকটি ব্যাপকভাবে আলোচিত । তাছাড়া তিনি অন্ত্যজ মানুষের কথাভঙ্গিতে ব্যবহৃত অশিষ্ট-অশালীন ভাষার যে সমাদার করেছেন তা এ দেশের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির অহংকে আঘাত করে এবং আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত নর্মসক (যা মধ্যবিত্ত স্তরেরই সৃষ্ট) ভেঙে ফেলে।

এই আঘাত ও বৃত্ত ভাঙার বিষয়টি ইলিয়াসের শিল্পাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শক্তির পরিচায়ক। উপনিবেশবাদী শাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের সংস্কৃতি ও শালীনতা–অশালীনতাবোধ এই উভয়কেই লেখক উত্তর-উপনিবেশী মনস্তত্ত্ব দ্বারা আঘাত করতে চান এবং পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চান আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শেকড়সন্ধানী ভিন্নতর রূপের দিকে। ইলিয়াসের ভাষা ব্যবহারের আর ও একটি শক্তিময়তার দিক হলো: তার ভাষা পলিফোনিক । একটি উপন্যাসের সার্থক হয়ে ওঠার প্রধান শর্তই হচ্ছে বহুস্বরের সংযোজন। ইলিয়াছ তার উপন্যাসে বিভিন্ন

শ্রেণীস্তর ও পেশার মানুষের বিচিত্র কণ্ঠস্বরকে ভাষারুপ দিয়েছেন। ভাষায় বহুস্বারিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ইলিয়াসের অসাধারণ সার্থকতা কথাসাহিত্যিক হিসাবে তার সাফল্যকে অনন্য করে তুলেছে।

সাহিত্যে তার অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। রাজনীতিতে তিনি প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিশেষভাবে সমর্থন করতেন। 'বাংলাদেশ লেখক শিবির' নামক বাম প্রগতিশীল সংগঠনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্গাত্মক রস সৃষ্টিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত । তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে ঢাকায় অকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪]

আজিজা বেগম (১৯৩৬-)ঃ কথাসাহিত্যিক । এক সময়ের সাড়া জাগানো লেখিকা আজিজা বেগম ১৯৩৬ সালে বগুড়া শহরের নামাজগড়ে জম্লগ্রহন করেন।পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করেন বগুড়ার 'উত্তরবঙ্গ' ও ঢাকার 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে। লিখেছেন ১৯৫২ থেকে। সংসারের নানা ব্যস্ততায় লেখার সুযোগ তিনি পাননি। ফলে দীর্ঘ বিরতি পরে তার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে। ১৯৮০ সাল থেকে আবার লেখা শুরু করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা একসময় নিয়মিত প্রকাশ পেতো। আজিজা বেগম নারী নির্যাতনের সত্য ঘটনা সংগ্রহ এবং তার সমালোচনা প্রকাশিত গ্রন্থ :সে সুমনা ও আলী উপন্যাস ১৯৮৫ নীল যন্ত্রনা ও প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ লিখিছেন।

আতাউর রহমান (১৯২৫-১৯৯৯) ঃ কবি, শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি কবিতা ছাড়া সাহিত্য বিষয়ক বহু গবেষণা প্রবন্ধ লিখিছেন। ৮ই মে ১৯২৫ সালে তৎকালীন বগুড়া জেলার (বর্তমান জয়পুরহাট) আক্কেলপুরে জন্মহগ্রহণ করেন। আক্কেলপুর গ্রামটি তৎকালীন বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার (অর্ন্তগত) ছিল। পৈত্রিক নিবাস আক্কেলপুরের নিকটবর্তী ঝাঁড়ঘরিয়া গ্রাম। ঝাঁড়গরিয়া গ্রামটি ছিল তৎকালীন রাজশাহী জেলার বদলগাছি উপজেলার কোলা ইউনিয়নের অধীনে। বর্তমানে বদলগাছি উপজেলা নওগাঁ জেলার অন্তগত । কবি আতাউর রহমানের পিতার নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সরদার এবং মাতার নাম গোলেজান নেছা। কবির মাতামহের নাম ঘিনা হাজি এবং পিতামহের হবীবুল্লাহ সরদার। আতাউর রহমানের প্রথম সহধর্মিণী বেগম মমতাজ রহমান। দ্বিতীয় সহধর্মিণী আনোয়ারা রহমান এ্যানা দেশের খ্যাতনামা লেখিকা।

কবি আতাউর রহমান শৈশবে গ্রামের মক্তবে ছাত্রজীবনের সূত্রপাত করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি আক্কেলপুর এম.ই . স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

---

৪. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮

ভালো ছাত্র হিসাবে তাকে দু-মাস পরেই চতুর্থ শ্রেনীতে উন্নীত করা হয়। ১৯৪০ সালে তিনি আক্কেলপুর এমই. স্কুলের পাঠ শেষ করে আক্কেলপুর বাজার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সোনামুখী হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে তিনি সোনামুখী হাইস্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। প্রবেশিকা পাশ করে তিনি বগুড়ার আযিযুল হক কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেনীতে ভর্তি হন। সে সময়ে আযিযুল হক কলেজ কিংবা রংপুর কারমাইকেল কলেজের মতো অতোটা উন্নত ছিল না। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ছিলেন আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, এটাই ছিল ছাত্রদের গর্বের বিষয়।

১৯৪৬ সালে তিনি আযিযুল কহ কলেজ থোকে আই.এ পাশ করেন এবং বি.এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ১৯৪৮ সালে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী হয়। পার্টির নির্দেশে তিনি আত্নগোপন করেন। ফলে বিএ. পরীক্ষা দেয়া হয়নি। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন নিয়ে কলকাতায় গমন করেন এবং কবি বিষ্ণু দে’র মাধ্যমে মাওলানা আজাদ কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কারণ উক্ত কলেজটি ছিল সরকারি কলেজ। অবশেষে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুর্খাজির মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বিএ.পাশ করেন। কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ. শ্রেণীতে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পরামর্শে) বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে যাদের পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান এবং ছাত্র হিসাবে তার সতীর্থ ছিলেন কাজী আব্দুল মান্নান, মাযহারুল ইসলাম, আবদার রশীদ, আব্দুল হাফিজ, আলীমুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ, ।১৯৫১ সালে তিনি প্রস্তুতির অভাবে এমএ. পরীক্ষা দেননি। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ.ডিগ্রি লাভ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাকে উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করতে বলেছিলেন।

আতাউর রহমান তার কৈশোর জীবনে মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মী হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যহত ছিল। ১৯৪৫ সালের আযিযুল হক কলেজে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। তিনি পর্যাক্রমে কম্যুনিস্ট রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে পড়াশুনার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং বামপন্থী বন্ধুদের সাথে ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থক হয়ে ওঠেন। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৬-৪৮ সময়কালে বগুড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন কারন। তিনি ১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বৎসর বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি

রংপুর অধিবেশনে তেভাগা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। রাজনীতি করতে যেয়ে বহু খ্যাতনামা ও যশস্বী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন, এদের মধ্যে ছিলেন কলকাতায় কমরেড মুজাফফর আহমদ, মনসুর হাবীব, গোলাম কুদ্দুস, গৌতম চট্রোপধ্যায়, গীতা মুখার্জি, প্রমুখ। তিনি কৃষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কৃষক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তৎকালীন বগুড়ার। পাঁচবিবি থানা। এখানে ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী ও নাছির মন্ডল ছিলেন অবিসংবাদিত কৃষকনেতা। ১৯৪৮ সালে ২৩-২৪ মার্চ কম্যুনিস্ট পার্টির বগুড়া জেলা কমিটির গোপন বৈঠক হয় পাঁচবিবিতে এবং একই বৎসর ১১ই সেপ্টেম্বর লালমণিরহাটে পূর্বপাকিস্তান কৃষক সভার গোপন বৈঠক হয়। উভয় বৈঠকে আতাউর রহমান অংশগ্রহন করেন। এই সময় কম্যুনিস্টরা স্লোগান তুলেছিল 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্টের পূর্বরাতে পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করতে যেয়ে তিনি ও কমরেড মোস্তফিজুর রহমান মন্টু (পরবর্তীকালের চলচ্চিত্র পরিচালক ইবনে মিজান) পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। আতাউর রহমান পালাতে সক্ষম হন এবং তিনি আত্মগোপন করে ভারতে চলে যান। ১৯৫০-৫২ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন বগুড়ায় যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ১৯৫২ সালের অন্যতম ভাষাসৈনিক। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে এম.এ পাশ করার পরে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তবে তিনি ছিলেন আজীবন বাম প্রগতিশীল রাজনীতি ও চেতনার দৃঢ় সমর্থক। ১৯৭১ সালে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আতাউর রহমান জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র পেশা হিসাবে শিক্ষকতা করে গেছেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বি.এ পরীক্ষা দিয়ে নিজ গ্রাম আক্কেলপুরে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা মজিবর রহমানের অনুরোধে আক্কেলপুর হাইস্কুলে ছয় মাস শিক্ষকতা করেন। পড়াতেন ইংরেজী ও বাংলা। বি.এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ ফেলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পূর্বভাগ পরীক্ষা দিয়ে পাঁচবিবি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। এখানে তিনি ১৯৫১ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। এম.এ পাশ করে তিনি কলেজের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও কলেজে প্রভাষক পদে চাকুরি করেন। এই কলেজের চাকুরীর জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুপারিশ করেছিলেন। এরপর ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বগুড়া আযিযুল হক কলেজে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মওলানা আব্দুর হামিদ খান ভাসানীর নির্দেশে কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজে যোগদান করেন। এখানে তিনি ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অত:পর ১৯৫৮ সালের জুন

মাসে জামালপুরের আশেক মাহ্মুদ কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালের জুলাই পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৬২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বগুড়া আযিযুল হক কলেজে পুনরায় যোগদান করেন এবং ২৪শে আগষ্ট ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯৭৩ সালের ২৫ শে আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতিশিক্ষক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। ১৯৯০ সালের ২০শে এপ্রিল অবসর গ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয় থেকে অবসর নিয়ে ১৯৯০ সালে নজরুল ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে কবি নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের একটি বড় সময় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্টানে চাকুরি করেছেন, আর বারবার কর্মস্থল পরিবর্তন করেছেন। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বৎসর অধ্যাপনা করেন। অবসরের পূর্বে সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

আতাউর রহমানের মূল পরিচয় কবি হিসাবে। একেবারে ছেলে বেলা থেকে তার সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। আক্কেলপুরে ১৯৪০-৪১ সালে মাড়োয়ারি বন্ধুদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘রাষ্ট্রীয় হিন্দি পুস্তকালয়’। এখানে বাংলা বইও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাতে এই পুস্তকালয়টির ভুমিকা ছিল অপরিসীম। ১৯৪২ সালের ১৬ জানুয়ারি তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘দৈনিক আজাদ’ পত্রিকার ‘মুকুলের মহফিল’ এ । তিনি স্কুলজীবনেই বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটদের পাতায় কবিতা লিখতেন। ব্রিটিশ যুগের শেষদিকে মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, পলাশী (সাপ্তাহিক) প্রভৃতি পত্রিকায় কিশোর বয়সে রচনা প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সালের পরে পাকিস্তান আমলে আজাদ, সংবাদ , মোহাম্মদী, সওগাত, ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক, মাহেনও প্রাভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। স্কুলে পড়ার সময় তিনি ‘ধূমকেতু’ নামে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৩ সালের ৮ ও ৯ মে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অনুষ্টিত হয়। বগুড়ায় আযিযুল হক কলেজের ছাত্র অবস্থায় তিনি ১৯৪৬ সালে ‘নজরুল সাহায্য তহবিল’ গঠনের জন্য বগুড়ার এডওয়ার্ড ঘূর্ণায়মান মঞ্চে ‘টিপু সুলতান’ নাটক মঞ্চস্থ করেন। আযিযুল হক কলেজে শিক্ষকতা করার সময় তিনি বগুড়ার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তিনি আযিযুল হক কলেজ বার্ষিকীয় উপদেষ্টা , বগুড়ার প্রথম দৈনিক বাংলাদেশ’এর সাহিত্য পাতার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তিনি বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কবিতা সারথি, শব্দায়ণ, আড্ডা, রাজশাহী শহরের রবিবাসরীয় সাহিত্য সংসদ, কিশোর কুঁড়ির মেলা, উত্তরা সাহিত্য মজলিস প্রভৃতি সংগঠনে তার যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ

ছিল। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাদেশ লেখক শিবির'এর প্রথম সভাপতি। তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণা সংসদের সাহিত্য সংকলন (বাংলা কবিতা সংকলন ৫ম সংস্করণ ১৩৯৭, বাংলা প্রবন্ধ সংস্করণ ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯৪) এর সম্পাদকীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনার, সিস্পোজিয়াম ও আলোচনাক্রমের উৎসাহী সংগঠক ছিলেন। তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি রাজশাহীর 'বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। জীবনের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে নানা কর্মকান্ডে পদচারণা করেন। কবি আতাউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম কবি। জীবনবোধ তার কাব্যে উৎসারিত। বগুড়া আযিযুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে 'কবি নজরুল ' রচনার পর বগুড়ার সুধীসমাবেশে তাকে স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়া হয়।[৫] তার লেখা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাতেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পুরোপুরি অধ্যাপনা ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুই ঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। তার কাব্যগ্রন্থ 'একদিন প্রতিদিন' 'নিষাদনগরে আছি' সুধী সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সারাটা জীবন ধরে' ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুই ঋতু'তে তিনি অন্ধকার বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের আলোকিত জীবনের প্রত্যাশা করেছেন।

কবি হিসাবে ১৯৭০ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। এছাড়া ও নজরুল স্মৃতি পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, হিলালী স্মৃতি পুরস্কার, শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কার , বগুড়া লেখকচক্র পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন ।আতাউর রহমানের কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে সংগ্রামী মানুষের আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-বেদনা। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবতাবাদ ও মানুষের সমঅধিকারে।
প্রকাশিত গ্রন্থ : গবেষণা-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬৩), কবি নজরুল –(১৯৬৮), নজরুল কাব্য সমীক্ষা (১৯৭২), নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি (১৯৯৩), নজরুল জীবনে প্রেম ও বিবাহ (১৯৯৭), । জীবনী : বেনজীর আহম্মেদ (১৯৯৪)। কবিতা : দুই ঋতু (১৯৫৬), একদিন প্রতিদিন (১৯৬৫), নিষাদনগরে আছি (১৯৭৭), ভালোবাসা চিরশত্রু (১৯৮১), ইদানীং রঙ্গমঞ্চ (১৯৯২), ভালোবাসা এবং তারপর (১৯৯৩), সারাটা জীবন ধরে (১৯৯৪)।

৫. আমানুল্লাহ খান, আজকের বগুড়া, (অতীত ও বর্তমান) গ্রন্থমেলা প্রকাশণী বগুড়া, আগষ্ট ১৯৬৮, পৃ. ৬৮।

মৃত্যুর পূর্বে আতাউর রহমান নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। ২০ শে জুন তিনি গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে ঢাকায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ শে জুন ১৯৯৯ তারিখে শনিবার রাত ১০.২০ টায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[৬]

<u>আঞ্জুমান আরা বেগম (১৯৪২) :</u> কণ্ঠশিল্পী। অন্যতম সেরা বাঙালি কণ্ঠশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম ছিলেন বগুড়ার স্বনাখ্যাত কৃতি সন্তান। যিতি তার কণ্ঠ দিয়ে জয় করেছিলেন অজস্র মানুষের মন। বাংলার হাটে-মাঠে- ঘাটে যার গান গুঞ্জরিত হতো সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। সেই সুপ্রিয় শিল্পী বগুড়ার গর্ব আঞ্জুমান আরা বেগম। তিনি ১১ জানুয়ারি ১৯৪২ তারিখে বগুড়া শহরের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা ডা. কছির উদ্দীন তালুকদার ছিলেন বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা চিকিৎসক, তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহীনির হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। আঞ্জুমান আরার মাতার নাম- জিয়া উন নাহার তালুকদার,তিনি তার যুগে বগুড়ার নারী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। আঞ্জুমান আরা বেগমের স্বামী মাসুদ আলম সিদ্দিক বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। বগুড়া শহরের বাদুড়তলা মোড়ে পৈতৃক নিবাস 'হোয়াইট হাউজ'এর তার শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময় কেটেছে। তিনি ১৯৫৬ সালে স্কুল জীবনে সমাজেসেবী হিসাবে বর্ধমান হাউসে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) সোসাল কনফারেন্সে যোগদান করেন। তিনি বগুড়ার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এই স্কূল থেকে ১৯৫৭ সালে মেট্রিক আযিযুল হক কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৬২ সালে সমাজবিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। [৭]

শৈশব থেকে সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য ছিল তার সাবলীল পদচারণা। পারিবারিক উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে শৈশব ও কৈশোরের আনন্দঘন দিনগুলো কেটেছে বগুড়ায়। তার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন বগুড়ার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শৈলেন পোদ্দার, শিবেন কুণ্ডু ও সুনীল কুমার রায় । বাবা ডাক্তার হলে ও রাজনীতি করতেন।সেই সুবাদে তাদের বাড়িতে অনেক গণ্যমান্য রাজনীতিবিদদের যাতায়াত ছিল। যেমনঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, সরদার আব্দুর রব, নূরুল আমিন, সরদার কাইয়ুম খান, তাজউদ্দিন প্রমুখ উপমহাদেশখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ।

৬. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৭. আমানুল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

আঞ্জুমান আরার সঙ্গীত ওস্তাদ শিবেন বাবু একজন ভালো সেতার বাদক ছিলেন, সেই সাথে তিনি তবলা বাজাতেন, গান,লিখতেন, সুর দিতেন। ছাত্রীজীবনে আঞ্জুমান আরা বেগম নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেন; 'ফুল ও মালী', 'আঁধারে আলো', 'ফুল ও মালী'তে মালীর ভূমিকায় তিনি সার্থক হয়ে উঠেছিলেন।'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্যনাট্যে তিনি কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয়ে দর্শক ও সুধী মহলের চিত্ত জয় করেছিলেন।

১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ঢাকা বেতারকেন্দ্রে ও দেশে টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানে নিয়মিতভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বৎসর রেডি ও টেলিভিশনে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনন্য কণ্ঠমাধুর্যের জন্য তিনি অনায়াসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করেন। তিন শ'রও বেশি ছায়াছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য ছায়াছবির মধ্যে রয়েছে 'হারানো দিন, জোয়ার এলো, নতুন সুর, সুতরাং, চান্দা, অবির্ভাব, আয়না ও অবশিষ্ট ইত্যাদি। তার বিখ্যাত গানের মধ্যে রয়েছে অভিমান করো না, বলতো পাখিরা কেন যে গান গায়, কে স্মরণের প্রান্তরে বারে বারে ছোঁয়া দিয়ে যায়, তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে, চাঁদনি ডিগি ডিগি হাওয়া, সাতটি রঙের সাঝে আমি নীল খুঁজে না পাই, আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল ইত্যাদি।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি সরূপ তিনি ' একুশে পদক' ২০০৩ লাভ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পদক, জিসাম পদক, কলধ্বনি স্বাধীনতা স্বর্ণপদক, রংধনু ললিতকলা একাডেমী পদক ,রেইনবো পদক প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালে লাভ করেন ' তারকালোক পদক'।

তিনি ১৯ মে ২০০৪ তারিখে নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ধানমণ্ডিস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তার মরদেহ বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশের সুধীজন শোক প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন ' আঞ্জুমান আরার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হবে।'

আব্দুস সুবহান চৌধুরী (১৮৪৫-১৯১৪) নবাব, জমিদার ও সমাজসেবক । জন্ম টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারে জমিদার পরিবারে। পিতা মীর মসনদ আলী ছিলেন টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট জমিদার । সুবহান চৌধুরী পিতা মাতার কনিষ্ঠ পুত্র। তার পিতামহ সৈয়দ মহব্বৎ আলী চৌধুরী টাঙ্গাইলের আটিয়াতে এসে বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারির মালিকানাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ঢাকায় পীর বা আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে এদেশে আগমন করেছিলেন।

বগুড়ার নওয়াব সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী ছিলেন আদর্শ জমিদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, দানবীর, সমাজ-হিতৈষী বিদ্যোৎসায়ী ও মুসলিম বাংলার শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দিশারি। সভা-সমিতির ও পত্র-পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে তিনি সমাজের হিদসাধন করেন। বাংলার মুসলিম রেনেসাঁয় তার অবদান রয়েছে। নওয়াব সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী ও তার বড় ভাই সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরী বগুড়ার বিখ্যাত নবাবপরিবারে বিয়ে করেন। বৈবাহিক সূত্রে তারা উভয়ে বিপুল বিত্ত-বৈভরের অধিকারী হন। উভয় ভ্রাতা পৈতৃক নিবাস দেলদুয়ার ত্যাগ করে বগুড়ার বসতি স্থাপন করেন। আব্দুস সুবহান চৌধুরী বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মীর সরওয়ার আলীর ভগ্নি তহুরুন নেছাকে বিয়ে করেন। মীর সরওয়ার আলী ছিলেন বগুড়ার শেলবর্ষ পরগনার জমিদার। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার সমুদয় সম্পত্তির উত্তারাধিকারী হন ভগ্নি তহরুন নেছা। উভয় সূত্রে সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী শেলবর্ষ পরগনার বিশাল জমিদারির মালিক হন। এছাড়াও তিনি কলকাতাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে প্রভূত অর্থ অর্জন করেছিলেন। তিনি শেলবর্ষ জমিদারিকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। সৌভাগ্যবান সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ‘বিট্রিশ এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল জমিদার’ সভার সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালের অস্ত্রআইনের ১ম প্যারাগ্রাফ ৯ (এফ) ধারা মতে অস্ত্রসহ ১০ জন দেহরক্ষী রাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন।

সৈয়দ আব্দুস সুবহান চৌধুরী বগুড়ায় স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকান্ডে পর্যায়ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েন। সভা-সমিতি গঠন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। ১৮৮২ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত শিক্ষা বিভাগীয় এক সরকারি পত্রে মাসিক আট টাকা হারে কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি (দু’বছরের জন্য), তিনটি পুরস্কার ও দু’টি মূল্যবান পদক বাবদ তিন হাজার টাকা প্রদানের জন্য তাকে অভিনন্দিত করা হয়। জনকল্যাণকর কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সুদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ‘নওয়াব’ উপাধিতে ভূষিত হন। তার এই উপাধি প্রদানকালে তৎকালীন বাংলার ছোট লাট লেপটেন্যান্ট গভর্নর চার্লস এলিয়ট যে ভাষণ দান করেছিলেন, তা নিম্নরূপ:

“সৈয়দ আব্দুস সুবহান চৌধুরী সাহেব” ভারত গভর্নমেন্ট আপনাকে ‘নওয়াব’ উপাধি প্রদানপূর্বক এই সনদ প্রদান করিয়াছেন। ভূমধ্যধিকারী ও সাধারণ প্রশংসা জননায়ক সরূপ আপনার বিবেচনাপূর্ণ সদ্ব্যবহার গভর্নমেন্টের প্রসংশা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গভর্নমেন্ট অবগত আছেন যে, আপনি আপনার প্রজাবর্গের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্কুল, মাদ্রারাসা ও ছাত্রবৃত্তি স্থাপনপূর্বক এবং তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মুক্তহস্ততার পরিচয় প্রদান করিয়া আপনি স্বীয় জেলায় শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আপনি স্ত্রীজাতির নিমিত্ত দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন কল্পে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা দান করতঃ জেলায় স্বাস্থ্যেন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছেন। এই সমুদয় কারণে আমি ভারত গভর্নমেন্ট সমীপে আপনার সৎকার্যসমূহের পুরস্কার সরূপ ‘নবাব’ উপাধি

প্রদানের নিমিত্ব প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, ভারত গভর্নমেন্ট আপনার গুণাবলীর স্বীকারোক্তি সরূপ আপনাকে এই নবাবী সনদ প্রদান করিয়াছেন'। (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল)।

তিনি ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত অনারাবি মেজিস্ট্রেট, বগুড়া জেলাবোর্ডের সদস্য, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের কমিশনার এবং বগুড়া পৌরসভারও সদস্য ছিলেন। তিনি স্ত্রী তহুরুননেছার নামে একটি মহিলা হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। প্রভাসচন্দ্র সেন তার 'বগুড়ার ইতিহাস' এ লিখেছেন:

'বগুড়া শহরে 'তহুরুন্নেছা হাসপাতাল' নামক স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বগুড়ার স্বনামখ্যাত বদান্যনবাব সৈয়দ আব্দুস ছোবহান চৌধুরী সাহেবের পরলোকগত বণিতার নামে উক্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়টির নামকরণ হইয়াছে। উক্ত নবাব সাহেব এই চিতিৎসালয়টির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই বার্ষিক ১২০০০/= টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। একজন মহিলা ডাক্তার এখানে নিযুক্ত আছেন।

এই মহিলা হাসপাতালটি বর্তমানে তহুরুননেছা মহিলা সংসদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা স্থানীয় ভাষায় 'মহিলা ক্লাব' হিসাবে বর্তমানে আছে। তিনি একমাত্র কন্যা আলতাফুন্নেছার নামে বগুড়ার একমাত্র খেলার মাঠটির জন্য জায়গা দান করেছেন। যা আজও 'আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ' নামে তার সুকৃতির পরিচয় বহন করছে। তিনি বগুড়ার প্রচীনতম গ্রন্থাগার ' উডবার্ন লাইব্রেরি'র জন্য একটি পাকা গৃহনির্মাণ করে দিয়েছেন, যা আজও বর্তমান। তিনি বগুড়াতে নবাববাজার প্রতিষ্টা করেছিলেন।[৮] তার আরও অবদানের মধ্যে রয়েছে বগুড়ার সাব-জজ আদালত, বগুড়া জামে মসজিদের মক্তব এবং ভিক্টোরিয়া মাদ্রাসা হাই স্কুল' এ পরিণত হয়েছে। নবাব আব্দুস সুবহান চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ১৯০০-১৯০১ সালে সান্তাহার হতে বগুড়া শহরের মধ্যে দিয়ে ফুলছড়ি ঘাট পর্যন্ত রেল লাইন বসানো হয়। এই রেল লাইন স্থাপনের জন্য তিনি রেল কোম্পানিকে নিজস্ব বহু একর জমি দান করেছিলেন।তিনি বগুড়াতে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্নভাবে অবদান রাখেন। তিনি 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' বগুড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই এটা তিনি বিশ্বাস করতেন । নবাব সলিমুল্লাহর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দান করেন। তিনি সবসময় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের জন্য আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতেন।

৮. অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেন বিএল. অনেক পরিশ্রম করে 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রস্তত করেন,তখন আর্থিক সহায়তা দান করেন। প্রভাসচন্দ্র সেনের লেখা থেকে জানা যায় 'এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় সম্বন্ধে বগুড়ার সর্ব্বজনপ্রিয় নবাব শ্রীযুক্ত সৈয়দ আব্দুস ছোবহান চৌধুরী সাহেব ১৫০/= টাকা

অনুদান হিসাবে প্রদান করেছিলেন ।' সে যুগের এই টাকা বর্তমানে মূ্ল্যে মোটেই নগণ্য নয়। ঐতিহাসিক সেন আর ও লিখেছেন; বগুড়া জেলা এক্ষণে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধশালী ও মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। রেলপথ বিস্তারের সহিত এই শহরের আয়তন ও লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নগরে সাধারণের ব্যবহার্থ পার্ক বা প্রমোদোদ্যান প্রতিষ্টিত হওয়ায় নগরবাসীগনের পক্ষে প্রত্যহ পরিস্কার সেবনের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং সহরের সৌন্দর্যও বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল 'নবাব বাজার' নামক একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শহরের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। সম্প্রতি বগুড়ায় একজন এসিস্টেন্ট সেসন জজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাবজজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের মূলানুসন্ধান করিতে গেলে তথায় একমাত্র এই মহানুভব নবাব সাহেবের কল্যাণময় ও দানশীল হস্ত এবং তাঁহার অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ' বগুড়া শহরের শিববাটি নিবাসী রায় গৌর গোপাল রায়বাহাদুর নবাব সুবহান চৌধরীর মন্ত্রী ও ম্যানেজার ছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ ই এপ্রিল ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র যে অধিবেশন হয়, তাতে নবাব আব্দুস সুবহান যোগদান করেন। ঐ অধিবেশনে ঢাকায় 'মোহামেডান হল' নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি চাঁদা-সংগ্রহ কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আবদুস সুবহান ছিলেন ঐ সদস্যদের একজন । ১৯১০ সালের ২৬ ও ২৭শে মার্চ বগুড়ায় 'পূর্ববঙ্গ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতি'র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুস সুবহান ঐ অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি মেহমানদের স্বাগত জানিয়ে উর্দুতে একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্ততা করেন।অতঃপর তার নির্দেমক্রমে বাংলায় লিখিত তার বিস্তারিত ভাষণটি পাঠ করেন তারই দৌহিত্র সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী । ঐ ভাষণে আব্দুস সুবহান চৌধুরী বলেন, শিক্ষার অভাবেই মুসলমান সমাজে দুর্গতি নেমে এসেছে। কেবল সাহিত্য শিক্ষায় মুসলমানদের উন্নতি হবে না। এর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ও প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ অধিবেশনে উপলক্ষে আব্দুস সুবহান চৌধুরীর ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন; আমাদের বগুড়ার নওয়াব সাহেব এই বৃদ্ধকালে এত কষ্ট স্বীকার করে কঠিন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে বর্তমান অধিবেশনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার যে চেষ্টা করেছেন, সেজন্য সমিতি তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি সমিতির পক্ষ হতে কৃজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। 'উক্ত অধিবেশনে নবাব সৈয়দ আব্দুস সুবহান চৌধরী মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে মুসলমানদের উপর বিশেষ কর ধার্য করার একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি ছিল এই : 'মুসলমান শিক্ষোন্নতির জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে এই সমিতি গভর্নমেন্টের নিকট এ মর্মে আবেদন করছেন যে, মুসলমানদের উপর একটি শিক্ষা-কর ধার্য করা হোক এবং একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে সভাপতি নির্বাচিত করে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি

কমিটি গঠন করা হোক এবং ঐ কমিটির উপর উক্ত শিক্ষা - 'কর সমন্ধে সবকিছু বিবেচনা করা ও স্কীম প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক।'

নবাব আবদুস সুবহান এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন,- 'মুসলমানদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা তাদের অশিক্ষারই ফলশ্রুতি। তাদেরকে উন্নত করতে হলে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষীর একান্ত কর্তব্য। মুসলমান সমাজ এত উন্নত নয় যে, অন্যান্য সমাজের ন্যায় তারা নিজের চেষ্টায় ঐ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে যে সকল ফান্ড সৃষ্টি করা হয়েছে সবই নিষ্ফল হয়েছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করলেই বক্তার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে। মুসলমান সমাজে এরূপ ধনী লোক তেমন বেশি নেই, যাদের স্বেচ্ছাকৃত দানে এরূপ একটি তহবিল সৃষ্টি হতে পারে। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের দয়াবান গভর্নমেন্ট বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট এর চাইতে বেশি কিছু করতে পারেন না। কারণ গভর্নমেন্টকে অন্যান্য সমাজের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। গভর্নমেন্টের সাধু চেষ্টায় আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। প্রস্তাবিত বিষয়টি সদুদ্দেশ্যপ্রসূত। প্রস্তাবিত কর হতে যে আয় হবে, তা গভর্নমেন্টের নিকট গচ্ছিত থাকবে। সুতরাং এতে অপব্যয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে কোনো প্রকার কারণ হোক না কেন, তা দেওয়া যে কষ্টকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রত্যেক সাধু কার্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক। যে কার্য্যোদ্দেশ্যে এই করের প্রস্তাব করা হচ্ছে, তা অতি মহৎ। সমাজহিতৈষী প্রত্যেক মহাত্মার নিকট এই উদ্দেশ্য অতি আদরের বস্তু-এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং সমবেত সভ্যমন্ডলী যে এই প্রস্তাব একবাক্যে ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করবেন, তাতে বক্তার অণুমাত্র সন্দেহ নেই।'

আবদুস সুবহান চৌধুরীর প্রস্তাব ঐ অধিবেশনে গৃহীত হলেও গভর্নমেন্ট কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলিম শিক্ষার উন্নতিসাধনে নবাব আবদুস সুবহান চৌধুরীর কতখানি আগ্রহ ছিল, ঐ প্রস্তাব এবং শিক্ষাখাতে তার-দান দক্ষিণা থেকে তা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

সুবহান চৌধুরী সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন তার কালের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী। তার সাহসিকতা ছিল সে যুগে প্রবাদতুল্য। তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে ও গভীর বন-জঙ্গলে পশু শিকারে যেয়ে হিংস্র বাঘ-ভালুক শিকার করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভুটান দুয়ারে গণ্ডার শিকার করে তিনি ঐ অঞ্চলের জনমানুষের উপকারসাধণ করেছিলেন। তার হাতিশালে ৫০টির অধিক হাতি প্রতিপালন করা হতো। এছাড়া তার নিজস্ব চিড়িয়াখানায় বহুসংখ্যক হরিণ, বাঘ, ভালুক ও কুমির ছিল। তিনি ছিলেন সে যুগের পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান সমাজের নিকট দিশারি সরূপ।[৭]

আলতাফুন্নেছা চৌধুরী (আনুমানিক ১৮৬২-আনুমানিক ১৮৯৯) ঃ আলতাফুন্নেছা বগুড়ার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- নবাব সৈয়দ আব্দুস সুবহান চৌধুরী । মাতা- জমিদারকন্যা ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী সৈয়দা তহুরুননেছা চৌধুরী। স্বামী- টাঙ্গাইল ধনবাড়ির নবাব বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী । আলতাফুন্নেছা চৌধুরী বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ও বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন। বগুড়ার নবাববংশের একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী আলতাফুন্নেছা চৌধুরী,বলা যায় সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পিতা নবাব সুবহান চৌধুরী ও মাতা তহুরুন্নেছার আদরের দুলালী ছিলেন। একাদারে চার জমিদারের বিপুল সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছিলেন । পিতা-জমিদার সুবহান চৌধুরী, মাতা- জমিদার মীর ছাওয়ার আলী চৌধুরী। আলতাফুন্নেছার স্বামী ধনবাড়ির নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন ব্রিটিশ যুগের অন্যতম ধনাঢ্য মুসলিম জমিদার ও সে যুগের মুসলিম সমাজের জাতীয় জাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক।

খুব অল্প বয়সে (নাবালিকা) আলতাফুন্নেছার বিয়ে হয়েছিল ধনবাড়ির জমিদার উদীয়মান তরুণ নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গে। কলকাতায় স্বামীসহ পিতার বাসগৃহে বসবাস করতেন। তাদের ঘর আলো করে একমাত্র পুত্র জন্ম নিল । স্বামী নওয়াব আলী চৌধুরী আলতাফুন্নেছার নামের সঙ্গে মিলিয়ে পুত্রের নাম রাখলেন আলতাফ আলী চৌধুরী। তাদের ঘরে আর একজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে তার নাম উম্মে যাহ্‌রা লতিফুন্নেছা চৌধুরী, পুত্র-কন্যার শৈশব অবস্থাতেই অকালে মৃত্যুবরণ করলেন আলতাফুন্নেছা চৌধুরী আদরের কন্যার অকাল মৃত্যুতে দুঃখভারাক্রান্ত হলেন।

তিনি কন্যার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বগুড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে জ্বলেশ্বরীতলায় খেলাধুলার জন্য জমি দান করলেন এবং আলতাফুন্নেছার নামে উৎসর্গ করলেন। নাম রাখলেন 'আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ'। আজ পর্যন্ত বগুড়া শহরের একমাত্র খেলার মাঠটি নবাব সুবহান চৌধুরীর কন্যার স্মৃতিকে জাগরুক রেখেছে।

আলতাফুন্নেছার মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লেন স্বামী নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি বহুদিন আলতাফুন্নেছার স্মৃতিকে ভুলতে পারেননি। নওয়াব আলী চৌধুরী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় একখানি ধর্মীয় বই লিখলেন ' ঈদুল আযহা'। এই গ্রন্থখানিতে তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামের তাৎপর্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেন' ।ঈদুল আযহা শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯০১ সালে গ্রন্থকার কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

---

৯. আখতার উদ্দিন মানকি, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৮-৫০

এই গ্রন্থে একটি ভূমিকা , একটি উপক্রমণিকা, ৯টি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট আছে। তিনি উক্ত গ্রন্থটি আলতাফুন্নেছা চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রবণ মানুষ। তিনি ১৯০৫ সালে 'মিছির ও সুধাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার

গ্রহণ করেন এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলকাতাতে একটি প্রেস ক্রয় করেন। পরলোকগতা স্ত্রী আলতাফুন্নেছা চৌধুরীর নামে প্রেসটিকে 'আলতাফি প্রেস' নামে অভিহিত করেন।

অকালে পরলোকগতা আলতাফুন্নেছা বিদুষী নারী ছিলেন। তার পুত্র নবাবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন বগুড়ার বিশিষ্ট জমিদার ও রাজনীতিবিদ। এবং পৌত্র মুহাম্মদ আলী চৌধুরী যিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

<u>আলতাফ আলী চৌধুরী নবাবজাদা (১৮৭৮-১৯৪৪)</u> জমিদার ও রাজনীতিবিদ। পুরো নাম সৈয়দ ফয়জুল বারী মুহম্মদ আলতাফুল আলী চৌধুরী। তিনি ১৮৮৭ সালে বগুড়া শহরের মাটিরডালি পুরাতন নবাববাড়ি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল । পিতা- ধনবাড়ির বিখ্যাত নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। আলতাফ আলীর পিতা সে যুগের প্রখ্যাত সমাজকর্মী,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ধনবাড়ি নবাব ইনস্টিটিউশনসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ব্রিটিশ সরকার মনোনিত প্রথম মুসলমান মন্ত্রী। ঐ সরকার কর্তৃক ' নবাববাহাদুর' খেতাবে ভূষিত। আলতাফ আলী চৌধুরীর মাতা ছিলেন বগুড়ার প্রখ্যাত জমিদার নবাব আব্দুস সোবহান চৌধুরীর কন্যা আলতাফুন্নেছা চৌধুরী। আলতাফুন্নেছা চৌধুরীর কোনো । ভাই বোন জীবিত না থাকায় তিনি পিতা-মাতার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। একইভাবে আলতাফ আলী চৌধুরী তার মাতামহের প্রতিষ্ঠিত ওয়াকফ এস্টেটের মালিকানাপ্রাপ্ত হন। আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি কলকাত মাদ্রাসা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে প্রায় তিন বৎসর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক গর্ভনর কর্তৃক নোয়াখালী জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্টেট নিযুক্ত হন। পরে তিনি বরিশাল জেলাতে ও ডেপুটি ম্যাজিস্টেট পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছদিন পর সরকারি চাকুরি পরিত্যাগ করে বগুড়ায় ফিরে আসেন। ১৯১৪-২৩ সাল পর্যন্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বগুড়ার জেলাবোর্ডের দুই মেয়াদে চেয়ারম্যান ছিলেন (১৯২৬-৩২ ও ১৯৪২-৪৩) সাল।

তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে গঠিত ' স্বরাজ্য দল' এ যোগদান করেন। এই দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ময়মনসিংহ পূর্ব (মুসলিম কোটা) থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪-১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ' স্বরাজ্য দল' নির্বাচনে ভাল ফল করেছিলেন। এমনকি মুসলমান নির্বাচনী এলাকায় ও প্রচুর 'স্বরাজ্য' প্রার্থী ছিল। তখন বাঙালি মুসলিম জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত দলের (স্বরাজ্য) পক্ষেই তাদের রায় জানাতে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তত ছিল। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ৪৭ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে সংসদে প্রবেশ করেন। এবং যাদের মধ্যে ২১ জন ছিলেন মুসলমান।

১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের পর তিনি কাউন্সিল অব স্টেট-এর সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই পদে কয়েক বৎসরকাল বহাল ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কৃষকপ্রজা পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪১ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। ছিলেন দক্ষ শিকারী,বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং বগুড়ার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত । তিনি বগুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দক্ষতা ও যোগ্যতায় পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনারারি ম্যাজিস্টেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সৌখিন প্রকৃতরি মানুষ, সিগারেট কোম্পানি থেকে অর্ডার দিয়ে বগুড়া স্পেশাল নামে বানানো সিগারেট পান করতেন। তিনি ভোগবিলাসিতা পছন্দ করতেন। সেজন্য পিতা নওয়াব আলী চৌধুরী তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। পিতা নওয়াব আলী চৌধুরী ধনবাড়ি এস্টেটের অধিকাংশ সম্পত্তি ‘ সেটেলমেন্ট’ করলে আলতাফ আলী মামলা দায়ের করেন। ফলে পিতা সেটেলমেন্ট বাতিল করেন। আলতাফ আলী চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং একসময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী । আলতাফ আলী চৌধুরীর দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী জহুরা খাতুন। পরে তিনি একজন ইতালীয় মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তার নাম রাখা হয় আমিনা খাতুন। আলতাফ আলী চৌধুরীর মোট ৬ পুত্র ও ১ কন্যা ছিল। প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের নাম মুহাম্মদ আলী, আহম্মদ আলী, হামেদ আলী ও মাহমুদ আলী এবং কন্যার নাম মাহমুদা বেগম। তার ইতালীয় স্ত্রীর গর্ভে আমীর আলী ও ওমর আলী নামে দুই পুত্র। আলতাফ আলী চৌধুরীর বহু সামাজিক কর্মকান্ডের কথা জানা যায়। তার নামে প্রতিষ্ঠিত আলতাফনগর এবং আলতাফনগর রেলস্টেশন বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় অবস্থিত । তিনি বগুড়া শহরের ‘এডওয়ার্ড পার্ক’স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও অর্থদাতা। বগুড়া ‘ উডবান লাইব্রেরি’র উন্নয়নে ও তিনি অর্থ সহায়তা প্রদান করেছিলেন। এই প্রচীন লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫০০০ বই রয়েছে, যার মধ্যে বহুসংখ্যক প্রচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও সংরক্ষিত রয়েছে। বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র জলেশ্বরী তলায় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠটি আজও তার মাতৃস্মৃতি বহন করছে। ইদানীংকালে প্রতিষ্ঠিত আলতাফ আলী সুপার মার্কেট বগুড়া শহরের একটি বিশেষ পরিচিত বিপণিবিতান। আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। তিনি দীর্ঘকাল ‘বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভা’র সদস্য থেকে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন দানশীল, অসাম্প্রদায়িক ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। খেলাধূলার প্রতি উৎসাহী এবং নিজেও ভাল খেলোয়াড়। তার কালে তিনি বগুড়ার সমাজজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার-পরিবারের সন্তান হওয়া সত্বেও গরিব দুঃখি মানুষ এবং কৃষক শ্রেনীর প্রতি তার মমত্ববোধ ছিল।

নবাবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী ৭ আগস্ট ১৯৪৪ তারিখে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মরদেহ বগুড়ায় এনে একটি জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়।[১০]

আলাউদ্দিন সরকার ওস্তাদ (১৯০১-১৯৯১) সুরকার ও অভিনেতা।পিতার নাম আব্দুর রহমান সরকার। তিনি বগুড়া রেজিস্ট্রি অফিসের মোহরার ছিলেন ব্রিটিশ যুগের একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা। একই সাথে সুরকার ও কৌতুকাভিনেতাও। ১৯০১ সালে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়া শহরের বৃন্দাবন পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। একজন সঙ্গীতশিল্পী,সুরকার ও সঙ্গীতের শিক্ষক হিসাবে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করেন। বগুড়া থেকে প্রকাশিত ১৪-১১-২০০৩ তারিখের দৈনিক করতোয়া তার উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। উক্ত নিবন্ধে তার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিভিন্ন দিক পাওয়া যায়: 'বগুড়া শহরের প্রায় সবাই দেখেছে এই ব্যক্তিকে। পরণে সাদা চোস্ত পায়জামার উপর ঢিলা চুরিদার আচকান, মাথায় কিস্তি টুপি, পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা। গোঁপ কামানো, দাড়ি মেহেদী-রঙ্গিন। কিছুদিন দেখা গেছে, সাইকেল চড়তে, আবার শেষের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে। ওস্তাদজিকে আগে পার্কের মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করতে দেখা যেত। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বলতেন একদিনের জন্যেও নাকি উনি নামাজ বাদ দেননি।

তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্মঠ। এই ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগে ও আমি দেখেছি অসুস্থ অবস্থায় মাথায় কাছে বাল্ব জ্বালিয়ে রেখে বই পড়তে। প্রায় ৮০ বছর বয়সের প্রতি দিনই গানের টিউশনি করে শহর থেকে দুই মাইল দূরে বৃন্দাবনপাড়া নিজ বাড়িতে ফিরতেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন বগুড়া আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, তখন উনি ওস্তাদজিকে বলেছিলেন খোদার কাছে চাইতে হলে ছোট কিছু চাইবি ক্যান। অর্থ সম্পদের মতো ছোট খাটো জিনিস চাইতে নেই। ওস্তাদজি কি চাইবেন বললে উনি বলেছিলেন' চাইবি জ্ঞান' বিশুদ্ধ জ্ঞান। বাল্যকালে উনি তার পিতামহীর কাছে শুনতে পান তার জন্মের পর নাকি বগুড়ায় রেইললাইন স্থাপিত হয়। সপ্তম শ্রেনীতে থাকাকালীন কলকাতা থেকে একটি সার্কাসের দল এসে খেলা দেখিয়েছিল একজন মানুষের বুকের উপর দিয়ে বোঝাই গাড়ি পার করার খেলা।

১০. অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ওস্তাদজি ব্যায়াম করতেন এবং পরে এই খেলা রপ্ত করে অনেক জায়গাতে দেখিয়েছিলেন। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী একদা তার গান শুনে বলেছিলেন- আমি বহু গান শুনেছি তবে অখ্যাত মফঃস্বলে এ রকম সুন্দর গান শুনতে পাব ভাবতে পারিনি। নজরুলের বহু গান তিনি গেয়েছেন। ওস্তাদ

এনায়েত খানের সাথে একবার তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন। বাজনার শেষে এনায়েত খান ওনার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন 'বহুত আচ্ছা বাজাইয়া বেটা। কিয়া নাম হায় তুমহারা?' ওস্তাদজি নাম বলায় উনি দোয়া করেছিলেন। পশ্চিমা মেয়েদের ঝগড়া তিনি হুবহু নকল করে হাসাতে পারতেন। এইটি মেগাফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেছিলেন। বৈদ্যনাথ বাবুর 'শাহজাহান' নাটকের মেহেদীর অভিনয়, 'আলীবাবা'তে মর্জিনার অভিনয় করে দর্শকদের চমৎকৃত করেছিলেন। মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার এন ঘোষ ওস্তাদজির গান শুনে ও ক্যারিক্যাচার দেখে এককালীন চার শত টাকা দিয়েছিলেন। ওস্তাদজি গায়ক আব্বাস উদ্দিনের সাথে কলকাতায় একই ঘরে থাকতেন।তার মাধ্যমেই কবি নজরুল ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটে। কবি ওস্তাদজির গান শুনে খুশি হন। ১৯৩৮/৩৯ সালে কবিগুরু রবিঠাকুরের সাথে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ ঘটে। তার গান শুনে, ক্যারিক্যাচার দেখে কবি গুরু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। দেবকী বোসের পরিচালনায়'সাপুড়ে' ছবিতে একটি নুলো লোকের অভিনয় করেছিলেন। অমর মল্লিকের 'অভিনেত্রী' ও প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রজতজয়ন্তী' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। দেশ ভাগের পর ঢাকায় বিভিন্ন ছবিতে ও কাজ করেছেন। ওস্তাদজির লিখিত দুটো ভজন গান দেবকী বাবু আকাশবাণী থেকে গেয়েছিলেন। ওস্তাদজি বলেন, সম্ভবত ১৯১০/১৯১২ সাল হবে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বগুড়ায় এলে দূরদুরান্ত থেকে যেমন মানুষের ঢল নেমেছিল। তেমনি দেখেছিলেন ১৯৭১ এর ৭মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উপলক্ষে। ১৯৬৮ সালে ঢাকা রেডিওর সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি মহাস্থানের জারী গেয়েছিলেন। লিখেছিলেন মরহুম কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী ও লুৎফর রহমান। সঙ্গীতে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি সরূপ ১৯৭৪ সালে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন সরকার ১৪ নম্বেবর ১৯৯১ তারিখে বগুড়ায় শেষ:নিশ্বাষ ত্যাগ করেন।[১১]

<u>আব্দুল বারী বিএল (আনুমানিক ১৯০০-১৯৮০)</u> আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি জয় ভোগা গ্রাম, গাবতলী উপজেলা, বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়া পৌরসভার দীর্ঘকালীন চেয়ারম্যান ও বগুড়া স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্ব ও জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। বগুড়ার প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার পিতার নাম- কছিম উদ্দিন আকন্দ। তার পূর্বপুরুষগণ বগুড়ায় ওহাবি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে গণ্য। আব্দুল বারী ঢাকা কলেজ থেকে বিএ. পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে বিএল. ডিগ্রি লাভ করেন।

১১. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৬

১৯২৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বগুড়া বারে যোগদান করেন। আব্দুল বারী বগুড়ার আইনজীবীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও স্বনামখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি বগুড়া বার সমিতির সভাপতি পদে পরপর চারবার

নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৬৬-১৯৭২)। ১৯২৫ সালে তিনি গাবতলী উপজেলা থেকে জেলাবোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে পর্যন্ত পূর্ববগুড়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৩০ সালে বগুড়া জেলাবোর্ডের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হন। আব্দুল বারী ১৯৩৪ হতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০বৎসর বগুড়া পৌরসভার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে বগুড়া পৌরসভার কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুনামের সাথে সম্পন্ন করেন। ১৯৪৫ সালে বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বগুড়া পৌরপিতা হিসাবে একটানা ২০ বৎসর (১৯৬৪ সাল পর্যন্ত) দায়িত্ব পালন করেন।[১২] এত দীর্ঘকাল বগুড়া পৌরসভার গুরুদায়িত্ব পালন পরবর্তীকালে আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই সময় তিনি বগুড়া পৌরসভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ফ্রি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন, রাস্তা, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, অফিসগৃহ নির্মাণ,এডওয়ার্ড পার্ক সংস্কার, ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ সংস্কার ইত্যাদি। বগুড়ার সমবায় আন্দোলনে আব্দুল বারীর অবদান অপরিসীম। তিনি সমবায় বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পদ্মাপাড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সেক্রেটারি ছিলেন। পরে একই ব্যাংকের ডিরেক্টর ছিলেন। নিজ উপজেলা গাবতলী হাইস্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। দুর্গাহাটা হাইস্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং স্কুলটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তিনি বগুড়া সেন্ট্রাল হাইস্কুল মাদ্রাসা ও সেন্ট্রাল হাইস্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাইসচেয়ারম্যান পদেও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজের গভনিং বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভিএম, গার্লস হাইস্কুলের এবং বগুড়া নাইট স্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে বগুড়ায় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩ সালে বগুড়া আইন কলেজ স্থাপিত হলে। তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। বগুড়া আইন কলেজের প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপন তার হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আব্দুল বারী ‘পল্লীমঙ্গল’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মোহাম্মদ আলী চৌধরী (পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)। এডভোকেট এম আব্দুল বারী ২৫ শে নভেম্বর ১৯৮০ তারিখে বগুড়ায় পরলোকগমণ করেন।

১২. www.bogra.gov.bd

আসাফউদদৌলা রেজা (১৯২৬-১৯৮৩) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পুরো নাম রেজাউল মোস্তফা মুহাম্মদ আসাফউদ্‌দৌলা। তিনি ধানকুণ্ডী, শেরপুর, বগুড়ায় ১৯২৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মোহাম্মদ আসগর হোসেন সরকার, মাতা: ফেরদৌসমহল সিরাজী। শৈশবে মাতামহ 'অনল প্রবাহ'র কবি ও জাতীয় জাগরণের প্রবক্তা বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কাছে প্রতিপালিত হন।১৯৪৩ সালে চান্দাইকোনা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। [কিছুকাল পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে থেকে ইন্টারমিডিয়েট] এবং ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে বিএ.পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এমএ.অধ্যায়নকালে পিতার সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণের জন্যে পড়াশুনা ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে কিছুদিনের জন্য চান্দাইকোনা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।একই বছর দৈনিক আজাদ পত্রিকা সহ সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।[১৩] সে সময় ঢাকার প্রাচীন পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ'এর সঙ্গে যুক্ত হন। 'মুখদুমী অ্যান্ড আহ্সানউল্লাহ পাবলিকেশন্স ' ও 'মর্ডান পাবলিকেশন্স'এর সাথে জড়িত ছিলেন। সরকারি তোষণনীতি মেনে নিতে না পারায় 'দৈনিক আজাদ' ত্যাগ করে 'দৈনিক সংবাদ'এ সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সহকারী বার্তা সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক হিসাবে পদোন্নতি এবং ১৯৭২ সালে উক্ত পত্রিকার বার্তা ও কার্য নির্বাহী সম্পাদক পদে আসীন হন। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার 'দৈনিক ইত্তেফাকে রাষ্ট্রয়ত্ব মালিকানায় নিয়ে আসলে দৈনিক ইত্তেফাক-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহন করেন। তিনি সরকারি মালিকানাধীন কোনো পত্রিকায় কাজ করতে রাজি হননি। এই জন্য ১৯৭৫ সালে তাকে পুলিশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন।

ব্যস্ত সাংবাদিকজীবনের পাশাপাশি জনকল্যাণকর কাজে সবসময় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে 'আমার দেশ' (১৯৫১), পরে ' বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর' (১৯৬০), পরিচালনা করে সুনাম ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। দক্ষ, নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মার্কিননীতির একজন দৃঢ় সমর্থক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্টানের সাথে নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিযোগ (উপন্যাস), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত মতবাদ, রাজনীতি ও সরকার, নিরস্ত্র সংগ্রাম (অনুবাদকর্ম) প্রভৃতি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৩. আমানুল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

আব্দুস সাত্তার তরফদার (১৯০১-১৯৭৭) আইনজীবী ও সমাজকর্মী। বগুড়া বারের বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুস সাত্তার তরফদার সারিয়াকান্দির বিখ্যাত তরফদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুর রহমান তরফদার। তিনি নৌখিল পিএন. হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন, ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিএল, ডিগ্রি লাভ করেন।[১৪] ১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে বগুড়া বারে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বগুড়া বারের আইনজীবী হিসাবে দীর্ঘকাল পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন এবং আইনজীবী হিসাবে বিশেষ অবদান রাখেন। বগুড়ায় শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার অবদান রয়েছে। বগুড়া আযিযুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আযিযুল হক কলেজের সেক্রেটারির দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বগুড়ার নামাজগড় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আব্দুল হামিদ খান (আনুমানিক ১৯২২-১৯৮৬) সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ। জনাব আব্দুল হামিদ খান বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় আগুনিয়ার তাইর গ্রামে প্রসিদ্ধ খান পরিবারে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ডাক্তার গোলাম হোসেন খান। তিনি ১৯৩৬ সালে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে এবং ১৯৩৭ সালে নিখিলভারত মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বগুড়া জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলেন।[১৫] ঐ সময়কালে এবং পরবর্তীকালেও তিনি নানাভাবে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪৩ সালের (বাংলা উনপঞ্চাশের আকালে) দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বগুড়া জেলা ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে দুঃস্থ ছাত্রদের সেবা দান করেন। ১৯৪৬ সালে বিহার দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড নিয়ে পাটনার গমন করেন। ১৯৪৭ সালে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় সিলেট গমন করেন। ১৯৫৫ সালে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে ঢাকায় বিপুল ভোটাধিক্যে পূর্বপাকিস্তান সমাজসেবা সম্মেলনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে উত্তরবঙ্গ হতে পাকিস্তান সমাজসেবা সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে বগুড়ায় অল পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে বগুড়া পৌরসভার সদস্য, ১৯৬৩ সালে সোনাতলা মডেল হাইস্কুলের সেক্রেটারি, ১৯৬৪ সালে বগুড়া জেলা স্পোর্টিং এসোসিয়সের সেক্রেটারি, ১৯৬৫ সালে সতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এমপিএ.) নির্বাচিত হন। পরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (কনভেনশন) এ যোগদান করেন।

---

১৪. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

১৫. সোহেল রানা (সম্পা.), বগুড়া তথ্যকোষ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ ৪৬

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের কনভেনর নির্বাচিত হন। তিনি আজীবন সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত থেকে একটি মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বগুড়ায় পরলোকগমন করেন।

আফাজ উল্লাহ্ সরকার (১৯১২-১৯৯৪) চিকিৎসক ও সমাজকর্মী। চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহন না করে সামাজিক কল্যাণই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি তৎকালীন বগুড়া সদর উপজেলার (বর্তমান মাঝিড়া উপজেলা) ফুলকোট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতাঃ দরবেশ উল্লাহ সরকার, সহধর্মিণী : রোমেনা আফাজ। রোমেনা আফাজ ছিলেন দেশখ্যাত রহস্য সিরিজ রচয়িতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর ও বিশিষ্ট লেখক লুৎফর রহমান সরকার ডাক্তার আফাজের ভ্রাতুস্পুত্র।

ডাক্তার আফাজ বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুলজীবনে অষ্টম শ্রেণীতে থাকতেই সমজসেবামূলক কাজে অংশ নেন বলে জানা যায়। মানুষকে অসুস্থতা থেকে মুক্ত করতে হলে, তার নিকট শিক্ষার আলো পৌছে দিতে হবে, এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। ডেমাজানী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তার বিশেষ পরিচিতি ও সম্মান রয়েছে। বগুড়া জেলায় শিক্ষা সম্প্রসারণে তার অবদান সামাজিকভাবে স্বীকৃত। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগর সিনিয়র মাদ্রাসা, নাগরহাট মাসবাড়ী হাই স্কুল, গাবতলী সেন্ট্রাল হাই স্কুল, বগুড়া বি.এম হাইস্কুল, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বগুড়া মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ প্রভৃতি। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমনঃ দি ইয়ংম্যান মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন বগুড়া, বগুড়া জেলা মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন, জেলা বোর্ড এডুকেশন কমিটি, দি নাগর ইউনাইটেড যুবক সমিতি, ইউনাইটেড উন্নয়ন সমিতি, দক্ষিণ বগুড়া জন জাগরণ সমিতি, ডেমাজানি হাই স্কুল, ট্রফিকেল মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি। তিনি সেবামূলক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোথাও সদস্য, কোথাও সহ-সভাপতি, সভাপতি বা সম্পাদক পদে কার্য পরিচালনায় মেধা ও দূরদর্শীতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমনঃ- দক্ষিণ বগুড়া আঞ্চলিক আলো সমিতি, ফুলকোট মদিনা মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসাবেও সহায়তা দান করেছেন। তিনি "যুব শক্তি" নামের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। বগুড়া পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমিশনার পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৬] মুসলিম লীগের সমর্থক ও কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। চন্দনবাইসা আঞ্চলিক মুসলিম কমিটির অন্যতম সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সহধর্মীনি রোমেনা আফাজকে সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ যুগিয়ে দেশ জুড়ে বিখ্যাত হতে সহায়তা করেছেন।

১৬. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮

নিজেই সাহিত্য সেবী লেখক হিসাবে কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: লাল শাড়ী (উপন্যাস), বিশ্বনবী সমন্ধে অমুসলিম মনিষীদের বাণী (যৌথ), দক্ষিণ বগুড়া জনসাধারণের পটভূমিকা। মৃত্যু ০১লা আগষ্ট ১৯৯৪ ইং।

আমজাদ হোসেন (১৯২২-১৯৯৮) : নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী। প্রখ্যাত নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্যপরিচালক আমজাদ হোসেন বগুড়ার বাদুড়তলায় ১৯২২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ আবেদ ইলাহ। মাতার নাম ছহিরুন নেছা। তিনি বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকে ১৯৪০ সালের দিকে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর শিক্ষার দিকে বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

নাট্যপরিচালক হিসেবে তার নাম অমর হয়ে আছে। কলকাতার যে সমস্ত নাট্যদৃশ্য দর্শকদের সামনে জীবন্ত হিসাবে তুলে ধরা হতো, বগুড়া রঙ্গমঞ্চে এক সময়ে ঠিক তাই দেখানো হতো।[১৭] কলকাতা রঙ্গমঞ্চের পরেই বগুড়ার ঘূর্নায়মান রঙ্গমঞ্চ স্থান ছিল। আমজাদ হোসেনের পরিচালনায় বগুড়ার নাট্য আন্দোলন যথেষ্ট পরিমানে বেগবান হয়ে উঠেছিল। তার নির্দেশনায় এ্যাডওয়ার্ড রঙ্গমঞ্চে শাহ্জাহান, টিপু সুলতান, রক্ত করবী, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়েছিল। বগুড়া নাট্য জগতে এক সময় আমজাদ হোসেন ছিলেন কিংবদন্তিতূল্য পরিচালক ও অভিনেতা। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই একটানা প্রায় ২০ বৎসর অপ্রতিহত গতিতে নাট্য পরিচালনা ও নাট্য চর্চা করে গেছেন। তিনি এ্যাডওয়ার্ড ড্রামাটিক এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী হিসাবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়ার তৎকালীন বিখ্যাত এ্যাডওয়ার্ড ঘূর্নায়মান রঙ্গমঞ্চটি তারই তত্বাবধানে পরিচালিত হতো। আমজাদ হোসেনের নিকট তালিমপ্রাপ্ত বগুড়ার অনেক নাট্যশিল্পীই পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করেন।' স্বামী- স্ত্রী ' নামে একখানি নাট্যগ্রন্থ লিখে পরিচিত লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন নাট্যগ্রন্থ বিশ্লেষন ও সমালোচনা করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বগুড়া নাট্যকার প্রসাদ বিশ্বাস লিখিত নাটকসমুহের সংশোধন ও মানোন্ননের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। নাট্যচর্চা ছাড়া ও তিনি বগুড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বগুড়া পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার হিসাবে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য বারবার উক্ত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। বগুড়া পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে ও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করে।

১৭. আমানুল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৫

যৌবনের প্রারম্ভে মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে ব্রিটিশবিরোধী পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পরে সিলেট গণভোটের সময় মুসলিম লীগের প্রেরিত প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে সিলেটে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত হন। তবে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতেন না। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফরপন্থী) সমর্থক ছিলেন।

তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়ায় অন্যতম সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎসময়ে বগুড়ার বাদুরতলায় 'উদয়ন সংঘ' স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি তখন ঐ সংঘের সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাড়িঘর পাকিস্তানপন্থীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে লুন্ঠিত হয়। তার পরিবারের কোনো অস্থাবর সম্পদই অক্ষত ছিল না।

তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব হিসাবে একসময় জনপ্রিয় ও খ্যাত ছিলেন। সাহিত্যিক শামসুল হকের সাথে 'সাহিত্য কুটির' নামে বগুড়ার একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার ম্যানেজিং পার্টনার ছিলেন। উক্ত 'সাহিত্য কুটির' বহুসংখ্যাক নাট্যগ্রন্থ প্রকাশ করে সারা দেশের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি আজীবন প্রেস ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সে সময়ে বগুড়ার বিখ্যাত ভান্ডারি পরিবারের 'বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স লিঃ; এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বামী-স্ত্রী (নাটক)।

২৯ মে ১৯৯৮ তারিখে বগুড়ায় পরলোকগমন করেন।[১৮]

---

১৮. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

ইবনে মফিজ পৌন্ড্র (১৯২০-২০০৫) : ইতিহাসবিদ। ইবনে মফিজের পুরো নাম আবুল হুসেন খান বিন মফিজ। তিনি বাংলা ১৪ পৌষ ১৩৩৬ তারিখে (৩০ ডিসেম্বর ১৯২৯) বগুড়া শহরে পিতার সরকারি বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে মফিজের আট বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' এ কর্মকর্তা পদে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে উক্ত ব্যাংকের পরবর্তিত নাম হয় 'সোনালী ব্যাংক'। বহু বছর সুনামের সাথে ব্যাংকিং জীবন থেকে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন (১৯৯০)। কর্মজীবন থেকেই সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় রত ছিলেন।

তার গ্রন্থসমূহ: ১৯৬৪ সালে ছোটগল্প গ্রন্থ 'যবন বাকু', ১৯৭৪ সালে ভিন্নধর্মী গ্রন্থ 'বিজ্ঞান ও কোরআন এবং আমরা', মহাস্থানের ইতিহাস ১-৫ খন্ড, মহাস্থানের ইতিহাস ১ম খন্ড, হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (১৯৯৩), মহাস্থানের ইতিহাস ২য় খন্ড, সুলতান-পরশুরাম লড়াই, জীয়ত কুন্ডু (১৯৯৪), মহাস্থানের ইতিহাস ৩য় খন্ড, বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর (১৯৯৪), মহাস্থানের ইতিহাস ৪র্থ খন্ড, শাহ্ সুলতানের কারামতি (১৯৯৫), মহাস্থানের ইতিহাস ৫ম খন্ড, গোকুল ম্যাডে উর্বশী কমলার শেষ নাটক (১৯৯৩)।

তিনি অবসর জীবনে নিজ বাড়ী 'আবুল হুসেন ভবন, নিশিন্দারা (দিনাজপুর রোড), বগুড়ায় বসবাস করতেন। তিনি 'ইবনে মফিজ পৌন্ড্র' নামে লেখালেখি করতেন। দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতে ভুগে বগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

ইব্রাহিম মোক্তার খানবাহাদুর (১৮৬৪-১৯৪৭) : সমাজসেবক। বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় (তৎকালীন সারিয়াকান্দি) বালুয়া ইউনিয়নের যুগলিয়া গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯২ সালে মোক্তারি পাশ করে বগুড়া বারে মোক্তারি পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। ব্রিটিশ যুগে এমএলএ ও এমএসসি ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বগুড়ায় স্বনামখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। সোনাতলা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বগুড়ায় সমবায় আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং 'বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ' এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৮ সালে সোনাতলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খান বাহাদুর ইব্রাহিম মোক্তার মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই স্কুলকে বগুড়া জেলার তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য করা হয়। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে ঢাকা ও জলপাইগুড়ির নবাব সাহেব সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। তার প্রচেষ্টায় ১৯০৮ সাল থেকে এই স্কুলটি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়। ১৯১০ সালে তিনি বগুড়া জেলাবোর্ডের সরকার মনোনীত সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার হতে 'সার্টিফিকেট অব

অনার’ লাভ করেন। ১৯১২ সালে দিল্লী দরবার মেডেলপ্রাপ্ত হন। ১৯১৬ সালে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ সিলভার মেডেল লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালে ‘খানসাহেব’ এবং একই সরকার কর্তৃক ১৯১৮ সালে ‘খানবাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত হবার গৌরব অর্জন করেন।[১৯]

তিনি পাবনা, বগুড়া আসনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার উচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাপ্তাহিক ‘বগুড়ার কথা’ পত্রিকা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ১৩৩০ সালে ইসলামি আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বগুড়া থেকে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে সংবাদপত্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পত্রিকাটি ‘বগুড়া ব্যাংকিং এন্ড ট্রেডিং মেশিন প্রেস’ বড়গোলা থেকে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ ৪০ বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে পত্রিকাটির মতাদর্শগত বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারিতে (১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ) ইহলোক ত্যাগ করেন। একেএম আব্দুল আজীজ ‘একটি স্বার্থক জীবন’ নামে তার জীবনভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইয়াকুব আলী কাজী (অজ্ঞাত) : বগুড়ার বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইয়াকুবিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় যার অবদান সর্বাধিক তিনি মাওলানা কাজী ইয়াকুব আলী। সে সময়ে বগুড়ায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হিসাবে কাজ করতেন। নিজ বাড়িতে গার্লস জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত এটি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম বালিকা মাদ্রাসা। পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালে কাজী ইয়াকুব আলীর পুত্র কাজী জালাল উদ্দিন আহম্মদ উক্ত জুনিয়র মাদ্রাসাটি গালর্স সিনিয়র মাদ্রাসা হিসাবে উন্নীত করেন। মাওলানা ওসমান গণি এই মাদ্রাসার প্রথম সুপারেন্টেন্ডেন্ট ছিলেন এবং মৌলভী আব্দুল আজিজ খান এই স্কুলের প্রথম হেড মাস্টার ছিলেন। উচ্চবিদ্যালয়টি বর্তমানে বগুড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইসাহাক গোকুলী (১৮৯৫-১৯৬৬) : সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলা ১৩০২ সালে বগুড়া জেলার গোকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দিয়ামত উল্লাহ আকন্দ। নিতান্ত শিশুকালেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন।

ছাত্রজীবনেই সুন্দর সরল ভাসায় বক্তৃতাদান করে সুধী সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন ১৯২১ সারে খেলাফত আন্দোলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। শৈশবকাল থেকেই কবিতা রচনা করতেন। তার রচিত কবিতা, প্রবন্ধ বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে পঠিত হতো। এই সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা কারারুদ্ধ হন।

---

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৯০

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর 'দেশের কথা' নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদারের সহযোগিতা নিয়ে 'প্রজাবাহিণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'তরুন ও 'প্রজাবাহিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রথম জীবনে তরুন বয়সে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ-র সম্পাদনায় 'বাংলা আল হেলাল' এ বিজ্ঞাপিত রচনা প্রতিযোগীতায় 'ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের দান' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। দীর্ঘকাল বগুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিচালক পদে থেকে সমবায় আন্দোলন করে প্রজামঙ্গলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বগুড়ার গণ-আন্দোলনে তার অবদান অপরিসীম।[২০]

তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়, কিন্তু তা অপ্রকাশিত।

মৃত্যু : ১১ মে ১৯৬৬।

এনামুল হক ডক্টর (১৯৩৬) : কবি ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। জন্ম ১৫ আগষ্ট ১৯৩৬, বগুড়া। জেলা কালেক্টরেট অফিসের জরিপ কর্মকর্তা এনায়েত আলী এবং পবিত্র কোরআন শিক্ষিকা রৌশন আক্তারের দ্বিতীয় পুত্র। বিনাবেতনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং বগুড়া জিলা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া হতে আইএসসি পাশ করেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ায় দুইবার ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালে কারারুদ্ধ হন।

প্রফেসর ড.এনামুল হক বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, স্মৃতিস্তম্ভ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং পূর্বভারতীয় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের ব্যাপারে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। গত পাঁচ দশক ধরে দেশের আনাচে কানাচে ব্যাপক ভ্রমণ তাকে সংস্কৃতির সুবিস্তৃত অঙ্গনে পরিচিতি দিয়েছে।

তার বিশেষ কৃতিত্ব নিচে আলোচনা করা হল: বাংলাদেশের আধুনিক জাদুঘর আন্দোলনের পথিকৃৎ। ঢাকা জাদুঘরকে (প্রতিষ্ঠা ১৯১৩, মোট মেঝের ক্ষেত্রফল তিন হাজার বর্গফুট, ১৯৬২) বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর (৫০ জন পেশাজীবি সহ ৩৭০ কর্মচারী এবং তিন লক্ষ বর্গফুট মেঝের একটি নতুন আধুনিক বিল্ডিং) এ রূপান্তরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা জাদুঘরে যোগদান করেন এবং সফল পরিক্রমায় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা-মহাপরিচালক পদ অলংকৃত করে ১৯৯১ সালে অবসর নেন।[২১]

২০. পূর্বোক্ত, পৃ ৯০
২১. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

১৯ শতকের ঢাকা নওয়াবাদের 'আহসান প্রাসাদটি' অধিগ্রহণ এবং জাদুঘরে রূপান্তরের দায়িত্বে ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও স্মৃতিস্থাপত্য 'দেখা হয়নাই

চক্ষু মেলিয়া' সিরিজের উপস্থাপনা করেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যশ আর ত্যাগের মিলনে সংস্থা ও প্রশাসন পরিচালনায় অসাধারণ যোগ্যতার জন্য স্বনামধন্য। বহুসংখ্যাক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেন।[২২] প্রত্নবিদ্যায় পরামর্শদাতার দায়িত্ব নেয়াসহ প্রত্নবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে জরিপ ও গবেষণার দায়িত্ব পালন করেন।

৬০-এর দশক থেকে ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদদ্যার খন্ডকালীন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট এন্ড ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বে সাংস্কৃতিক সম্পদের পাচার হওয়া উক্ত ধরনের সম্পদ ফিরিয়ে আনা ও যথাস্থানে স্থাপন আন্দোলনের পথিকৃৎ।

ঢাকায় 'বাঙ্গালি শিল্পকলার আর্ন্তজাতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেন এবং সেখানে দান করেন ব্যক্তিগত পাঠাগারের প্রায় বিশ হাজার বই, সংবাদপত্র ও পঞ্চাশ হাজার ছবি, স্লাইড, নেগেটিভ ইত্যাদি। একক হাতে গড়ে তোলেন বাঙ্গালী শিল্পকলার আর্ন্তজাতিক সংঘ।

১৯৯০ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি নজরুলের জন্মদিনে জাতীয় উৎসবের প্রচলন করেন। তিনি একজন কবি, নাট্যকার এবং পরিচালক। তিনি সকল মহাদেশ ভ্রমণ করেন এবং প্রায় একশত সেমিনার ও কনফারেন্স অংশগ্রহণ করেন।

তার বিশ্বপ্রেম সুবিদিত, পিতৃগ্রাম বগুড়ার ভেলুরপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৬৭), একটি কলেজ (১৯৯৫) এবং তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ।

শিক্ষাজীবন: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি (১৯৭৩), লন্ডন থেকে দক্ষিণ এশিয়ান প্রত্নবিদ্যায় কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এমএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ (অনার্স- ১৯৯৫) এবং লাইব্রেরি সাইন্সে ডিপ্লোমা।[২৩]

কর্মজীবন: ১৯৯৫-১৯৯৮: প্রফেসর, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনির্ভাসিটি, বাংলাদেশ। ১৯৯০ (ডিসেম্বর-জানুয়ারী): সচিব, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

---

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
২৩. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৯৮৩-১৯৯১: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা-মহাপরিচালক। ১৯৬৯-১৯৮৩: ঢাকা মিউজিয়ামের পরিচালক। ১৯৬৫-১৯৬৯: ঢাকা মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক। ১৯৬২-১৯৬৫: ঢাকা মিউজিয়মের সহকারী তত্তাবধায়ক। ১৯৬৩-১৯৬৪: গবেষক পন্ডিত, ব্রিটিশ পরিষদ (যুক্তরাজ্যে এক বছর দুই মাস)। ১৯৬৪-১৯৬৫ : গবেষক পন্ডিত, এশিয়া ফাউন্ডেশন (যুক্তরাজ্যে/ইউরোপে ১০ মাস)। ১৯৭০-১৯৭৩: ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলো (যুক্তরাজ্যে ৩ বছর এক মাস)। ১৯৯২: এশিয়ান সাংস্কৃতিক পরিষদ, (রকফেলার ফাউন্ডেশন, ইউএসএ-তে সাত মাসের জন্য)। ১৯৯২-১৯৯৪ : যুক্তরাজ্যে, যুক্তরাষ্ট্র, মায়ানমার ও ভারতে ১৮ মাসের জন্য 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলো'।

প্রকাশিত গ্রন্থ: Treasures Museum (1963), Nowab Bahadur Abdul Latif: His Writings nd related documents (1968), Servey of Museum and Archeological Education and Training in Est pakistan (1978), Islami Art in Bangladesh (1978), Catalogue of Speical Exibition of Islamic Arts & Craftes in Bangladesh (1983), Glimpeses of mosques of Bangladesh (1985), Bengal Secuptures: Hindu Icconography upto C. 1250 A.D. (1992).

কবিতা: উত্তরণের দেশে (১৯৬০), হাজার তারের বীণা (১৯৬১), রাজপদ জনপদ (১৯৬৯), অস্ত্র হাতে তুলে নাও (১৯৭১), সুবর্ণ ইত্যাদি উত্তেজনা (১৯৭৮), সূর্যমুখী নদী (১৯৮১), রমণীয় বৈশাখের বাঁশী (১৯৮৫), অসম্ভব দৃষ্টতায় মগ্ন (১৯৮৯), আত্নবিশ্বাসের চিতাবাঘ (১৯৯০), ভীষণ সুখের নির্যাতনে (১৯৮৭), সুবিশাল অস্থিরতা (১৯৯০), গীতিনাট্য চতুষ্টয় (১৯৯০)। শিশুতোষ : টুকুন মণি (১৯৮৫)।[২৪]

<u>একেএম নুরুল ইসলাম (১৯২২)</u> শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক একেএম নুরুল ইসলাম ১৯২২ সালে বগুড়া সদর উপজেরার জোড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আজগর আলী মন্ডল, মাতার নাম ছায়রুন্নেছা বেগম। সহধর্মিণীর নাম শেফালী ইসলাম। তিনি ধর্মভীরু ও সজ্জন ছিলেন।

নিজগ্রামের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাজমুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসায় শৈশবে ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪৫ সালে ফাজিল পাশ করেন। এরপর ১৯৪৬ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালে মেধাতালিকায় তৃতীয়স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উর্দুভাষায় অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

---

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'উর্দু' বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমএ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। রাজশাহী বিভাগে প্রথম ছাত্র, যিনি উর্দু ভাষায় এমএ, পরবর্তীকালে হেকিমি চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ইউনানি মেডিসিনে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার পর তিনি বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার হাটশেরপুর উচ্চবিদ্যালয়, মাঝিড়া মাদ্‌লা, চাঁচাইতারা উচ্চ বিদ্যালয় ও জোড়া মাদ্‌রাসাতে পর্যায়ক্রমে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এস.এ পরীক্ষা দিয়েই তিনি কুষ্টিয়া কলেজে উর্দু ভাষার প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। এই কলেজে এক বৎসরকাল শিক্ষকতা শেষে বগুড়ায় আযিযুল হক কলেজে উর্দুর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। একটানা ৩৩ বৎসরকাল এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। মাঝে কিছুসময়ের জন্য দর্শনা সরকারি কলেজে বদলি হয়েছিলেন। তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজের সহঅধ্যক্ষ পদে এবং কিছুদিন অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৮৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বিশাল আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাকে সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধার সাথে বিদায় জানানো হয়।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন স্বনামখ্যাত সমাজকর্মী। অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'বগুড়া কলেজ' নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করে নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে গতিশীল করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যরূপে এবং বগুড়া কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়া ইউনানি (হামদর্দ) মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি, বায়তুল হাফিজ মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি এবং নিজগ্রামের বায়তুল রহমান মসজিদ কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

একেএম নূরুল ইসলাম বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়া ইসলামী স্ট্যাডিজ গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পেছনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি বগুড়ার 'আল আমিন কেজি.ও জুনিয়র হাইস্কুল' এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া 'নাজমুল উলুম সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সহসভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ ছাড়া ও উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বগুড়া শাখার উপদেষ্টা সদস্য হিসাবে যথাযথ দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। তিনি বগুড়া প্রথম নৈশ স্কুলের ও অন্যতম উদ্যোক্তা। বাংলা, ইংরেজি ,আরবি ও উর্দূসহ ছয়টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ও উর্দু ভাষায় ৬ খানার ও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যক্তিগতজীবনে ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির মানুষ অধ্যাপক একেএম নূরুল ইসলাম দলমত নির্বিশেষে বগুড়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

এম আর আখতার মুকুল (১৯২৯-২০০৪) মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও গবেষক। ১৯২৯ সালের ০৯ আগষ্ট তারিখে বগুড়া জেলার মহাস্থান-এর অর্ন্তগত চিংগাসপুর গ্রামে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেণ। পিতা: সা'দত আলী আখন্দ। মাতা: রাবেয়া খাতুন।

এম আর আখতার মুকুলের জীবন বিবিধ বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে তার কর্মজীবনের মহুমুখিতার যেন শেষ নেই। তিনি ছিলেন এজি অফিসের সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগের চাকুরে, বীমা কোম্পানির কর্মকর্তা ,অভিনেতা, গৃহশিক্ষক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক , বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির (লন্ডন, ইংল্যান্ডে) কাটার, ছাপাখানার ব্যবসায়ী, প্রকাশক (সাগর পাবলিসার্স), চাল-আটা-কেরোসিন-সিগারেট ইত্যাদির ব্যবসায়ী, পুরানো গাড়ি বা বাস-ট্রাকের ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি রাজনীতি করেছেন। সমানে। এতোসব পেশা পরিবর্তনে মনে হতে পারে যে, তিনি কোথাও যেন সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি ছিল উল্টো। কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি শাখায় তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন।ছাত্র রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সে কারণে ১৯৪৮-৪৯ সালে কারাবরণ করেন এবং কারাবাসে স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে উত্তীর্ণ হন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে অংশগ্রহন করেন ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে । একদা তাকে বিদেশে সাড়ে তিন বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগ। এ সময় কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় ও বার্তা সংস্থার বিভিন্ন পদ। ফলে খ্যাতি অর্জন করেন কর্মঠ এবং সাহসী রিপোর্টার হিসাবে। সাংবাদিকতার সুবাদে সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহাম্মদ, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখের মতো রাষ্ট্র/সরকার প্রধান ও নেতাদের। গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব হিসাবে ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অসংখ্য দেশ। চাক্ষুষ করেছেন বহু চাঞ্চল্যকর ও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সান্নিধ্য ও স্নেহ-ভালোবাসা তার জীবনের অবস্মরণীয় স্মৃতি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং 'স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র'র অন্যতম স্থপতি ও মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ঐ বেতার থেকে নিয়মিত পাঠ করেন সাড়া জাগানো কথিকা 'চরমপত্র'।[২৫] রণাঙ্গণ ভ্রমণ করে তিনি নিয়মিত এই কথিকা রচনা করতেন। যা তার জীবনের অন্যতম বীরত্বের সাক্ষী। ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি সদ্যমুক্ত যশোর ভ্রমন করেন। উক্ত ডিসেম্বর ১৯ তারিখে মুজিবনগর থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। ৮ তার দুই কন্যা: দুই কন্যা : কবিতা ও সাগর। তার সহধর্মীনি ডক্টর মাহমুদা খানম রেবা (মৃত্যু : ১৯.৩.১৯৯২)

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্মজীবনীমূক : রুপালী বাতাস (১৯৭৩), রুপালী বাতাস সোনালী আকাশ (১৯৭৫) , লন্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮১)। প্রবন্ধঃ মুজিবের রক্ত লাল (১৯৭৬), ভাসানী- মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), আমি বিজয় দেখেছি (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি (১৯৮৭), নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন (১৯৮৭), ওরা চারজন (১৯৮৭), লেছড়াগঞ্জের লড়াই (১৯৮৮),একাত্তরের বর্ণমালা (১৯৮৯), একুশে দলিল লড়াই (১৯৯২), আমাকে কথা বলতে দিন (১৯৯৩), বাংলা নাটকের গোড়ার কথা (১৯৯৪), হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীর চোখে নজরুল (১৯৯৪), কে ভারতের দালাল (১৯৯৫), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), বঙ্গবন্ধু (১৯৯৭), চরমপত্র,পঞ্চাশের দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন (বাং ১৩৯১), বায়ান্নোর জবানবন্দী (বাং ১৩৯২)।

সম্পাদনা : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র (একখণ্ডে সমাপ্ত, ১৯৮৮), স্বাধীনতাযুদ্ধের আলোকচিত্র (১৯৮৮), আমিই খালেদ মোশারফ (১৯৯০), বিজয় একাত্তর (১৯৯১), নকশালের শেষ সূর্য (১৯৮৯), বায়োন্নোর ভাষা আন্দোলন (বাং ১৩৯১)

রম্যরচনা : বিচিত্র দেশে সুরমার লোক (১৯৮৪)।

তিনি ২৬ জুন ২০০৪ তারিখে ঢাকায় পরলোকগমণ করেন। তাকে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

<u>এমদাদুল হক তরফদার (১৯১০-১৯৮০)</u> চিকিৎসক ও সমাজসেবক। পিতা-মসির উদ্দিন তরফদার। মাতা-মসিমন্নেসা। বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার বয়রা গ্রামে ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় শিক্ষায়তন হতে এন্ট্রানর্স পাশ করে মায়ের ইচ্ছা পূরণে ৩০০ টাকা নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল পাশ করে পরবর্তীতে সোজা চলে আসেন মাতৃভূমি বগুড়া জেলার বয়রা গ্রামে। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা সেবাদান করেন। তারপর বগুড়া সাতমাথায় তৎকালীন প্রেস ক্লাবের নিচে চেম্বার খুলে রোগী দেখতেন। তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ আর্মির চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। এখানে থাকাকালে কিছুদিনের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতে এফআরসিএস করার সুযোগ পান। কিন্তু দেশভক্ত মাতৃভক্ত জনাব এমদাদুল হক তরফদার চাকুরী ছেড়ে চলে আসেন মাতৃভূমি বগুড়াতে। কিছুদিন পর তার ঠাটারী বাজারে চিকিৎসা সেবাদান করে আবার সিলেট হাসপাতালে সরকারী চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পত্রিকায় তৎকালে তিনি চিকিৎসার শাস্ত্রের উপরে টুকিটাকি লেখালেখিও করেন। আবার ইংরেজী ভাষায় আর্ন্তজাতিকতার উপরে গুরুত্ব জেনে নিজে ভালভাবে ইংরেজী ভাষায় রপ্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নিজের সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে ইংরেজীতে চিঠি লিখে ইংরেজীতে তার উত্তর চাইতেন। যাতে তারাও ইংরেজীতে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

ডা. মোঃ এমদাদুল হক তরফদারের পাঁচ কন্যা। কলকাতায় ডাক্তারি পড়াকালীন সময়ে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে মেয়েদের পড়তে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ৩য় মেয়েকে তৎকালীন ঢাকা চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। তার সেই মেয়েই আজকের বাংলাদেশের ৩য় এবং বগুড়ার একমাত্র মহিলা ভাস্কর আইভি জামান। একসময়ে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তারপর আবারও বগুড়ায় এসে সারিয়াকান্দির একটি বিদেশী সংস্থা 'বাম' হাসপাতালের কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি বগুড়া জেলা পরিষদের চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

তিনি বাইরে ছিলেন প্রচন্ড রাশভারি, অথচ অন্তরে প্রাণখোলা মানুষ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কখনও মনোমালিন্য হলে সেই চাকুরিই তিনি ছেড়ে দিতেন । অথচ একজন এমবিবিএস চিকিৎসক হওয়া সত্বেও তিনি নিজের হাতে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে রোগীর মলমূত্র পরীক্ষা করে রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায় দরিদ্রদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা করতেন। সকল স্তরের মানুষ তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা, আবার ভয়ও করতো। ভ্রমণপিপাসু এই ব্যক্তি সমগ্র ভারতসহ অন্যান্য দেশেব্যাপক ভ্রমণ করেন। কিন্তু বগুড়া জেলাই তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাছে টেনে রেখেছে। জ্ঞান-পিপাসু এমদাদুল হক তরফদার চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইরেও প্রচুর পড়াশোনা করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ডা. এমদাদুল হক তরফদার বগুড়ায় বাস করতেন। পাক হানাদার বাহিনী একবার ইনজেকশনের বাহানায় তাকে কোথাও নিয়ে যেতে জোড়াজুড়ি করতে থাকে। তিনি কৌশলে তাদের হাত থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু ফলস্বরূপ তার চিকিৎসাকেন্দ্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। সে সময় বগুড়ার বুদ্ধিজীবীদের নামের তালিকায় তার নাম লিখে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু তাকে পাকসেনারা আর খুঁজে পায়নি। ১৯৮০ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

<u>কছির উদ্দীন তালুকদার (১৮৯৯-১৯৭১)</u> : চিকিৎসাদি ও সমাজৰ্মী। বগুড়ার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজকর্মী ডা. কছির উদ্দীন তালুকদার ১৮৯৯ সালে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় মহিষমুণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার সহধর্মিনী সৈয়দ জিয়াউর নাহার বেগম বগুড়ার একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ছিলেন। বিখ্যাত গীতিকবি ও কন্ঠশিল্পী জেবুননেছা জামাল এবং এক সময় বাংলার শ্রেষ্ঠ কন্ঠশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম তার কৃতি কন্যাদ্বয়।[২৬] কছির উদ্দীন তালুকদার কলকাতায় স্কটিস চার্চ্চ কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আই.এসসি.পাশ করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হতে ১৯২৮ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে এমবি,ডিগ্রি লাভ করেন। চিকিৎসার পেশার পাশাপাশি সামাজিক ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বগুড়ায় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত লোকাল বোর্ডের সদস্য এবং ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত উক্ত লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

২৬. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৯৪৭ সালে বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপকসভার সদস্য ছিলেন। তিনি বগুড়ায় আযিযুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। উক্ত কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্রিটিশ যুগে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এবং জেলা কমিটির জেলা কমিটি সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।[২৭] জীবনে ৪৩ বৎসরকাল চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। তার প্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড মেডিকেল স্টোর বগুড়ার একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত ছিল।

১৯৭১ সালে ২৯শে মে ডা. কাছির উদ্দিন তালুকদার পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। খানসেনারা মঝিড়া গ্রামে একটি পুরাতন কবরের মধ্যে ফেলে তাঁকে হত্যা করে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭২ বৎসর।

কাজী মোহাম্মদ মিছের (১৯২২) : ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। জন্ম: নারায়নশহর গ্রাম, উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া, পিতা- কাজী আহসান উল্যাহ্ ছিলেন মধ্যবিত্ত কৃষক। মাতা- রহিমা বিবি ছিলেন গৃহিনী। কাজী মোহাম্মদ মিছেরের উচ্চশিক্ষা বা তেমন কোনো উচ্চমানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ছিল না। তবে তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রাহের জন্য তিনি সারা জীবন ব্যস্ত ছিলেন। আয় উর্পাজনের জন্য পেশাগত জীবন বলে তার কিছু ছিল না। দরিদ্রতা আর বেকারত্ব নিয়েই প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধান করে গেছেন। নিজেকে ‘অনুসন্ধানবিশারদ’ বলে পরিচয় দিয়েছেন। তার লেখা থেকে জানা যায়, তিনি বগুড়াতে একটি ‘অনুসন্ধান অফিস’ স্থাপন করেছিলেন। এই অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে বিয়ে বা সংসার করা হয়ে ওঠেনি। প্রায় মধ্য বয়সে তিনি সংসার পাতার চেষ্টা করেছিলেন, স্ত্রীর নাম সৈয়দা হোসনে আরা বেগম ওরফে হাসি। যিনি ক্যান্সার রোগে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। কাজী মোহাম্মদ মিছের সম্পর্কে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. এনামুল হক লিখেছেন, ‘মিছিরে সাহেবের ‘রাজশাহীর ইতিহাস’ এই জেলার একটি হিস্টরিক্যাল গ্যাজেটিয়ার বা ঐতিহাসিক বিবরণী। এই শ্রেণির গ্রন্থের আবশ্যকতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র দেশের বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য এই জাতীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বস্তুত এই শ্রেণির গ্রন্থ এখনও রচিত না হইলে আর কিছু দিন পর জাতির প্রকৃত ইতিহাসই অবলুপ্ত হইবে। --মিছের সাহেব ‘রাজশাহীর ইতিহাস’ রচনা করিয়া একটি বিশেষ জাতীয় কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।--- এতকাল রাজশাহীর সমস্ত প্রাচীন কীর্তি ও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে কেহই অবগত ছিল না, তাহা এই পুস্তকের মধ্যস্থতায় মানুষের জ্ঞানগোচর হইল।’ কাজী মিছের ইতিহাস অনুসন্ধানকারী হিসাবে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

২৭. পূর্বোক্ত।

তার সম্পর্কে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বিচারপতি আব্দুল মওদুদ মন্তব্য করেছেন: '১৯৫৪ সালে আমি যখন বগুড়ায় চাকুরিব্যবদেশে আসি, তখন আবার তার দেখা মেলে। সেই সময় তিনি বহু নথিপত্র নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলেন ও বগুড়া জিলার বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়নের অভিপ্রায় জানালেন। বিস্মিত হলুম এ রকম দুরূহ কাজে দুঃসাহসিকের মতো তাকে হাত দিতে দেখে। কিন্তু আশান্বিত হলুম তার চিন্তা ও ধারণাশক্তি প্রসারতা ও পরিকল্পিত কাজের সম্যক উপলব্ধিশক্তি দেখে। তারপর প্রায় দুই বৎসর ধরে নানাভাবে আলোচনায় ইঙ্গিতে তাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়ে এই ইতিহাসটির রূপদানে প্রয়াস পেয়েছি, এবং আজ আনন্দের ও গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন, যা যে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের হিংসার বিষয় হবে।[২৮] 'বগুড়ার ইতিকাহিনী'-তে অতি প্রাচীন কাল থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিপুনভাবে গ্রন্থিত হয়েছে। তথ্য-সংগ্রহে ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণে লেখক শ্রমস্বীকার করেছেন এবং সম্ভাব্য সবরকম সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি সাধ্যমত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সেগুলি গ্রহণ করেছেন। সত্য তথ্য আহরণে তিনি অবহেলা বা গাফিলতি করেন নাই; কিংবা সত্যতত্ত্বকে ধামাচাপা দিতে বা বিকৃত বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন নাই।' এই অনুসন্ধান কাজে জন্য তিনি কোনো রকমের দুঃখ কষ্ট স্বীকার করতে পিছপা ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একটি ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে জীবনের অধিকারী। তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন :-

'গায়ে কাদা, মাথায় দুপুরের রোদ, গামছা পরে নদী সাঁতার, বাঁশবনের ছায়ায় বসে হেঁটো পেতে লেখা, কত হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের গ্রাস থেকে প্রাণে বেঁচে, টিকটিকিদের খপ্পর এড়িয়ে, গুপ্তচর সন্দেহে পুলিশি হাজতে বাস করে, নানা জনের ঠাট্টা বিদ্রুপ গালমন্দ নীরবে সহ্য করে, দেশের মাটি থেকে খাঁটি সোনা উদ্ধার করা যায়। যাদের কাছে আমি এ শিক্ষা লাভ করেছি, তারা হলেন অনেকেই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী।' কেএম. মিছের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সহ-সভাপতি, বাংলা একাডেমীর সদস্য, সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। তার নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে বগুড়া শহরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেএম. মিছের সারা জীবন যে অনুসন্ধানের নেশায় মেতে ছিলেন, তারাই কিছুটা প্রতিফলন তার লেখালেখিতে ফুটে উঠেছে। তবে তার জানা ও দেখার চেয়ে লেখার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনাসমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলো : প্রকাশিত গ্রন্থ : দাওয়াতে ইসলাম (১৯৫৫), বগুড়ার ইতিকাহিনী (১৯৫৭), রাজশাহীর ইতিহাস (দুই খন্ড, ১৯৬৫), পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাস উপাদান (১৯৬৬), ১৪ই আগষ্ট (১৯৫৯)।

২৮. কে. এম. মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, গতীধারা প্রকাশনী, ২০০৭, "পূর্বাভাষ" এ

অপ্রকাশিত রচনাঃ উপমহাদেশে ইসলাম ও সূফীবাদ, মুজাহিদ আন্দোলনের গোড়ার কথা, মহাস্থান বিজয়, বাংলার ইতিহাস (১ম খন্ড), বাংলার পুরার্কীতি ও দর্শনীয় স্থান, যেখানে যেমন দেখেছি, বাংলার পূর্তি দৃশ্য, বাংলার নদী বাঙ্গালির বন্ধু, একাত্তরের যুদ্ধ, বাংলাদেশ (চাক্ষুষ বিবরণ), মহাস্থানগড়ে শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সওয়ার, জী হা, আমি পুন্ড্রবর্ধন বলছি, রংপুরের ইতিহাস ইত্যাদি। কাজী মোহাম্মদ মিছের শেষ জীবনে নিতান্ত দু:খ, কষ্ট ও বিনা চিকিৎসায় দিন কাটিয়েছেন।[২৯] একজন দুস্থ সাহিত্যক হিসাবে তিনি মাত্র ছয়শত টাকা সরকারি ভাতা বরাদ্ধ পেয়েছিলেন। তাও সরকারি নিয়মের জটিলতায় যথাযথভাবে কোনো দিনিই পাননি। এ নিয়ে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে তিনি ভোগেন। অর্থাভাবে যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ায় তার অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে। এমন অবস্থায় বগুড়া শহরের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শ্যামল ভট্টাচার্য্য তাকে তার গ্রামের বাড়ী থেকে নিয়ে এসে 'বগুড়া নার্সিং হোম' এ চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করেন। ২০০৩ সালের ৬ আগষ্ট সকাল ৭.৩০ টায় উক্ত নার্সিং হোমে তিনি শেষনি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

খন্দকার আমিনুল করিম দুলাল (১৯৫৬-১৯৯৪): কারুশিল্পী। বগুড়ার প্রখ্যাত কারুশিল্পী খন্দকার আমিমুল করিম দুলাল ১৯৫৬ সালে মার্চ মাসে বগুড়া শহরের বাদুরতলায় জন্মগ্রণ করেন। পিতার নাম-খন্দকার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। মাতার নাম-শামসুন নাহার বেগম। ছেলেবেলায় পিতা দুলালকে বগুড়ার শিববাটী শান্তিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি করেন। কিন্তু স্কুলের চার দেয়ালের গণ্ডি কোনদিনই তার ভালো লাগেনি।তিনি বড় ভাইয়ের ছবি আঁকা দেখে শৈশবেই ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকে পড়েন। স্কুল পালিয়ে লেখার খাতায় শুধু ছবি আঁকতেন। তাছাড়া মাছধরা, সাঁতার কাটা, বন্ধুদের নিয়ে গল্পকরা এসব নিয়েই কেটেছে শৈশব আর কৈশোর। একবার ফেরিওয়ালার কাছে ক্লাশের বইপত্র বিক্রিই করে দিলেন! ব্যাটারি কিনে চশমার পাওয়ার্ড গ্লাসে টর্চ দিয়ে আলোকে সম্পাত করে সিনেমা সিনেমা খেলতে গিয়ে ধরা পড়েন পিতার হাতে। সে যাত্রায় এক লাফে দৌঁড়ে পালিয়ে বাঁচেন। কয়দিন আর খোঁজে পাওয়া গেল না। পারিবারিক সিদ্ধান্তে পাঁচবিবিতে (বর্তমান জয়পুরহাট জেলায়) বোনের বাড়ীতে রেখে দলাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় তাকে। একসময়ে এখানে থেকেও পালালেন। এখানে থাকতে ও রংতুলির খেলা, চিত্রকলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা অনুশীলন চলতো। তার পাঞ্জাবির পকেটে সবসময় থাকতো একটা মাউথ অর্গান। দুলাল বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে মাউথঅর্গান বাজিয়ে পথ চলতেন।

চিত্রশিল্পে মনোযোগে থাকায় লেখাপড়ায় অনাগ্রহের কারণে মনক্ষণ্ন পিতা- মাতার দিক থেকে দুলাল অনাদরে থেকেছেন। কিন্তু এতে তিনি শিল্পের প্রতি আরো আত্মনিবিষ্ট হয়ে ওঠেন।

২৯. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

হাত খরচ যা পেতেন রং তুলি কিনতেই ব্যয় করতেন। কেউ যদি একটি সাদা কাগজ উপহার দিতেন, তিনি বিনয়ের সাথে ছবি একেঁ তা ফেরৎ দিতেন। ছবি আঁকতে যে সময় তিনি ব্যয় করতেন, তা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। শাস্তি দেবার জন্য লাগাতার কয়েকদিন ঘরে আটকে রাখলে ও যে কোনো উপায়ে তিনি বের হয়ে আসতেন এবং আবার ছঁবি আঁকা শুরু করতেন। স্বাধীনতার পরে শীববাটী সেবক সমিতি প্রাঙ্গনে (বগুড়া) মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে অঙ্কিত কিছু ড্রইং ও পেইনটিং নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি বিদগ্ধ দর্শককূলের দৃষ্টি আর্কষণে সক্ষম হলে তিনি বিষয়টিকে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার বড় ভিত্তি হিসাবে মনে করেন। এর পরপর ৭২ সালে এসএসসি. শেষ করে তৎকালীন জেলা প্রশাসক আতিকুল হকসহ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তির উদ্দেশ্য ঢাকা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কিন্তু তার আবেদন প্রত্যাখাত হয়। আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটায় এই সময়টি ছিল তার জীবনের পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আর্ট কলেজ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শিল্পী দুলাল ক্ষোভে লজ্জায় ঢাকার পথে প্রান্তরে ঘুরেছেন,পেটে ক্ষুধা,শূন্য পকেট আর রক্তে জন্ডিস নিয়ে। ঠিক এই সময় একজন প্রকৃত সমাজসেবী তৎকালীন ঢাকা সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রকাশনা ও গবেষণা কর্মকর্তা বেগম আমাতুল মোর্শেদ মাতৃস্নেহে শিল্পীকে সহযোগিতা করেন। ১৯৭২ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত তারই স্নেহের পরশে অঙ্কনশিল্পের যাবতীয় প্রচার কাজ, শিশুসনদ যুব কার্যক্রম, কিশোর অপরাধ সংশোধন, বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রকল্পের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন এবং জাতীয় দৈনিকগুলোর সবুজ আসর, সমবায়, সমাজ কল্যাণ, মেয়েদের পাতা ইত্যাদিতে নকশার কাজ করতে গিয়ে ভূবপূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান আর্টকলেজের অধ্যাপক মোমিনুল আজিম-এর সাক্ষাৎ পান। পরবর্তীতে তাকেই শিল্পী ওস্তাদ অভিভাবক হিসাবে মেনেছেন।[৩০]

এখানে উল্লেখ্য ১৯৭২- এর পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন মুক্তিলাভ করে দেশে ফেরেন তখন তার সংবর্ধনার জন্য সাজ-সজ্জার দায়িত্বে নিয়োজিত মোমিনুল আজিম এর নির্দেশনায় আলোচ্য দুলাল ৩৩×৪০ সাইজ ক্যানভাসে বঙ্গবন্ধুর ছবি এঁকেছিলেন যা দেখে আজিম স্যার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন ‘দুলাল তুই চাইলে, তোকে আমি আমার সবকিছু দিয়ে দেবো।

অসহানুভূতি, শিক্ষকের বিমাতাসুলভ আচরণ, বঞ্চনা আর পরিকল্পিত শিক্ষার পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বেদনা তার শিল্পীমনের বিকাশসাধনে যথেষ্ট ছাপ ফেলে এবং এসময় দেশের প্রখ্যাত শিল্পী ‘পাশা ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে আরও কিছু বৈচিত্র্যময় কাজে দক্ষতা অর্জন করেন এবং এরপর থেকেই শিল্পী দুলালের চিত্রশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচণ্ড উন্নতি ঘটে। তুলি কলমের কাজ করে জীবনধারনের মুখোমুখি হয়ে সত্তর দশকে ঢাকায় বিজ্ঞাপণজগতে তিনি প্রবেশ করেন।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ ১১৮

এটা ছিল তার জন্য খুবই দুঃখজনক এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতা বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো তার উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে তারা শিল্পীকে দিয়েছে খুবই কম। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা ঢাকা নগরের চিত্রশিল্পের অন্ধকার জগতের ভয়াবহতায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবেন সেটা তিনি তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন এবং এরপর থেকেই পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করেন। এব্যাপারে তার দক্ষতা অনেকের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করে। শিল্পী দুলালের আঁকা সে সব পোর্ট্রেট দেশের অসংখ্য ঘরের দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। পঁচাত্তরের শেষের দিকে ওস্তাদ মোমিনুল আজিমের ইন্তেকালে শিল্পী দিশেহারা ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তারপর বেশ কিছুদিন মৌন থেকে ওস্তাদ আজিমের আঁকা কিছু তৈলচিত্রের সাথে নিজের আঁকা আরো কিছু ছবি-সমন্বয়ে ঢাকা ক্লাবে সপ্তাহব্যাপী একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে প্রশংসিত ও পরিচিত হন। ঠিক এই মুহূর্তে বগুড়ার নওয়াবজাদা ওমর আলী চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও কৃপালাভে দুলাল সমর্থ হন এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন ব্যতিক্রম শিল্প সৃষ্টিতে নিজেকে উজার করে প্রকাশ করতে থাকেন।

শিল্পী খন্দকার আমিনুল করিম দুলাল তেলরং, জলরং কালি-কলম পেন্সিল প্রতিটি মাধ্যমেই নিজস্ব স্টাইলে কাজ করতেন। প্রতিটি মাধ্যমেই শিল্পী চেষ্টা করেছেন, কিছু সৃষ্টি করার। তার চোখ যেটি স্থান পেয়েছে, সেটিকেই তিনি দৃষ্টিনন্দন করে ক্যানভাসে একেঁছেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রম শিল্পচিত্র তার প্রতিভার স্বীকৃতি দেয়।

সিমেন্ট, কাদা, প্লাস্টার অব প্যারিস, যাবতীয় মেটাল, খড়, শোলা, বক্রবোর্ড, কাঠ, চামড়া, কাঁচ, বাঁশ, বেত দিয়ে ও বহু কাজ তিনি করেছেন এবং সে তার নতুন প্রতিভা প্রকাশের চেষ্টা চলছে বারবার। শিল্পী দুলাল কাজের সময় একপাল বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে সদা হাসি-খুশি আর রিলাক্সড মুডে থাকতেন। আর এটিই তার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে সহায়তা করতো।

চিত্রশিল্পের কাজের পাশাপাশি তিনি সংস্কৃতি জগতেও বিচরণ করতেন। শিল্প নাটকের ক্ষেত্রেও ছিলেন একজন সফল নাট্যকার ও অভিনেতা। তার রচিত ' অতৃপ্ত অন্ধকার, অথচ চলছে, স্বয়ং ভূত' ইত্যাদি নাটক নাট্যঙ্গনে যথেষ্ঠ সমাদৃত ও আলোচিত হয়। সময়ের বির্বতনে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ীভাবে 'যান্ত্রিক, দুলাল আর্ট ক্র্যাফট, কনরাক, আর্ট এ্যাড-আর্টস প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি নানা নামে তিনি কাজ করতেন। চুরাশি সালের মার্চে নিজের চিত্রকর্মকে পরিচিত করার লক্ষ্যে নওয়াবজাদা ওমর আলী চৌধুরী, সাংবাদিক রোটারিয়ান রেজাউল হাসান রানু, বুলবুল ললিতকলা একাডেমির শিক্ষক গিটারিস্ট সাঈদ ভাই প্রমুখ শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুর সহযোগিতায় ৭৩ নং নিউ এলিফ্যান্টরোড, ঢাকাতে 'দি গ্যালারি' নামে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্টা করেন। এই গ্যালারিটি তাকে মেট্রোপলিটান শহরে তার বন্ধু চিত্রশিল্পী টেকনিশিয়ান এবং বিভিন্ন সহযোগীদের নিয়ে কর্মক্ষেত্রের বিকাশসাধনে যথেষ্ঠ সহায়তা করে। দুলাল তার নিকটতম

বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পঁচাশি সালের ডিসেম্বর নওয়াব আলতাব আলী সুপার মার্কেট, বগুড়া নির্মানের কাজে হাত দেন। ছিয়াশিতে নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর বন্ধুদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী বিল্ডিং-এর এক অংশে ১ নভেম্বর ১৯৮৭ বরিবার অনাড়ম্বর এক আনন্দঘন প্রভাতে বগুড়া শিল্পাঙ্গনে কারুপল্লীর জন্ম হয়। তার পর ইয়াকুবিয়ার মোড়ে ১৪এপ্রিল ১৯৮৮ তে শিল্পী সৃষ্টি করেন বাংলাদেশে অদ্বিতীয় শততম ছবি নিয়ে স্টুডিও কারুপল্লী। দুটোই উদ্বোধন করেন পৌর চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম। সৈয়দ ওমর আলী চৌধুরী দেশে ফিরলেন। একদিন তিনিও এলেন কারুপল্লীতে। এসে দেখলেন, বুঝলেন এবং সেইসাথে আবেগে সন্তুষ্ট চিত্তে কারুপল্লীর আজব চিড়িয়াখানার জন্য নওয়াব বাড়ির সামনে ১২৪০৮ বর্গফুট জায়গা শিল্পী দুলালকে ২৫ বছরের জন্য লিজ প্রদান করেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি দেশের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক-বুদ্ধিজীবী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ২২ নভেম্বর ১৯৮১ তারিখে এই কারুপল্লী উদ্ধোধন করেন। কারুপল্লী প্রচারের মাধ্যমে ফটো স্টুডিও, আদিম মানুষের আজব গুহা সহ বর্তমানে আজব চিড়িয়াখানায় বাস করছে দুলালের সৃষ্ট প্রায় ৬০ বন্য প্রাণী। শিল্পী দুলাল বগুড়া তথা দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় কিছু না কিছু শিল্পের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তন্মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সেনাকুঞ্জের দেয়ালে সিমেন্ট এর তৈরি ২০×৩০ ফুট সাইজের দু'টি ম্যুরাল। যার বিষয় বস্তূর একটি 'মুক্তিযুদ্ধ, অন্যটি দেশ গড়ার স্বপ্ন'। ভাটিয়ারিতে (চট্টগ্রাম) অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীর পাসিং আউট গ্রান্ডের ৪০×৬০ ফুট সাইজের ইসলামী ফলক ও স্যালুটিং ডায়াস। সিরাজগঞ্জের চন্ডীদাসগাতী নামক স্থানে স্বাস্থ্য প্রকল্প প্রাঙ্গণে নিয়ামিত প্রায় ৩০ ফুট 'দূর্জয় বাংলা' ভাস্কর্য এবং বগুড়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সমুদ্রে ভাসতে গিয়ে তিনি জুয়েল আইচ, রবীন্দ্র নাথ রায়, মেজর জেনারেল মাহ্মুদুল হাসান, বিগ্রেডিয়ার ডাক্তার আমীর আলী, শংকর সাজোয়াল, সামছুল হক কোরেশী, সত্যজিৎ রায়, বিভিন্ন দেশের রাষ্টদূত প্রমুখের নৈকট্য লাভ করেন।

শিল্পী দুলাল পোষ্টার সৃষ্টিতেও ছিলেন অনন্য। তার সৃষ্ট পোস্টারগুলোর মধ্যে 'সাবধান আগামী ২০ বছরে মানুষ মানুষের মাংস খাবে, যদি এখন থেকে আপনার পরিবার ছোট না রাখেন,' 'ঘাম শুকাবার আগেই শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করুন', 'দাও ফিরিয়ে অরণ্য', 'বন কেটে আমাদের আবাস নষ্ট করবেন না' এবং 'এখন বর্ষাকালে আরো গাছ লাগান' উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী খন্দকার আমিনুল করিম দুলাল তার কর্মময় জীবনে একাধিক জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি আজব চিড়িয়াখানা ডিজনিল্যান্ড এবং দুই শতাব্দী নিয়ে নিজেকে গবেষণায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। আশা ছিল চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। তিনি তার চিন্তা চেতনাগুলোকে সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি করে

পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করবেন। কিন্তু শিল্পীর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ১৪ জানুয়ালী ১৯৯৪ তারিখ শুক্রবার রাতে সহকর্মীদের সকলকে বিদায় জানিয়ে বাড়িতে তিনি ছেনি হাতুড়ির সাহায্যে পাথর কেটে স্ট্যাচু তৈরির সময় বুকে ব্যাথা অনুভব করেন এবং রাত প্রায় ২ টায় তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলে তিনি নিজেই অতিকষ্টে একটা মাইক্রোতে চড়ে নির্বিড় নার্সিং হোমে যান, তারপর ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৪ শনিবার রাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু সংবাদে পুরো শহর অচল হয়ে যায়। আপামর বগুড়াবাসীর বুকে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। তাকে নামাজগড় গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৩১]

<u>খোদেজা খাতুন (১৯১৭-১৯৯০)</u> : কবি ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৬ আগস্ট ১৯১৭ তারিখে বগুড়ার সদর উপজেলার মন্ডলধরণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খোদেজা খাতুনের মাতা নুর জাহান বেগম। পিতা ডাঃ রমজান আলী খানও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। তিনি বগুড়া ভিএম গার্লস স্কুলের (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল) ছাত্রী ছিলেন। এই স্কুল থেকে ১৯৩৩ সালে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। পরে ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৫ সালে ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৫ সালে ইডেন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৩৯ সালে কৃতিত্বের সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবনের শুরুতে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত বরিশালের সৈয়দুন নেছা গার্লস স্কুরে প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে যোগদান করে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। তারপর কলকাতা লেডি ব্রেবোন কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা পদে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ঢাকা ইডেন কলেজে অধ্যাপিকা পদে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে বাংলা বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র প্রফেসরের পদ লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যক্ষা পদে নিযুক্তি পান। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা ইডেন কলেজে অধ্যক্ষা পদে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে উক্ত পদ থেকে অবসর নিয়ে বাঙলা একাডেমী সংশ্লিষ্ট 'ইতিহাস পরিষদ' এ ছয় মাসকাল এডমিনিস্ট্রেটর পদে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে বারোপাড়া গ্রামে 'বেগম রোকেয়া কলেজ' এ তিন বৎসরকাল অধ্যক্ষা পদে কর্মরত ছিলেন। উক্ত পদ থেকে অবসর নিয়ে 'ঢাকা ইসলামিয়া মহাবিদ্যালয়'এ আরও দুই বৎসর অধ্যক্ষা পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কর্মজীবন থেকে পরিপূর্নভাবে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের 'প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক' লাভ করেন।[৩২] সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী পদক লাভ করেন।

---

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ১১৯-১২০

৩২. আমানুল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫

প্রবন্ধ সাহিত্য অবদানের জন্য ১৯৮৪সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ কর্তৃক আব্দুর রাজ্জাক সাহিত্য স্মৃতিপদকে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। ১৯৭৭ সাল হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত উক্ত লেখিকা সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার সহসভাপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। বগুড়ার ভিএম. গার্লস স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। ৪০এর দশকে মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত পত্রিকায় প্রচুর লেখা প্রকাশ করেন। মূলত সমাজ ও বিজ্ঞানই তার সাহিত্যের মূল উপজীব্য ও ইতস্তত ছড়ানো সম্পাদনের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দেন। 'বেদনার এই বালুচরে' তার কাব্যগ্রন্থ।[৩৩] তার কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির খন্ডসৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'অত্যুচ্চ পর্বতমালার অপার গাম্ভীর্য, সুগভীর সিন্ধুর অতলস্পর্শী বিরাটত্ব ও সূর্যাস্তের ক্ষণস্থায়ী মোহনমায়া, এর কোনটাই ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, নয় অবজ্ঞেয়। মহাকবি সাহিত্যিকদের রচনা-দক্ষতা চিরস্থায়ী; সত্য ধরা দেয় তাদের শিল্পে। তারই পাশে ইন্দ্রধনুর ক্ষণস্তায়ী রুপমাধুরী, ছোট শিশিরকণায় প্রতিফলিত আলোর ঝিলিমিলি ও বিলীয়মাণ সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকুকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা ও উপেক্ষণীয় নয়। অনুরূপ টুকরো সৌন্দর্যে ছুঁয়ে যাওয়া মুগ্ধ মানসানুভূতিকে ধরার চেষ্টা রয়েছে এ কাব্যে। তিনি কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখিকা হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

'বগুড়ার লোকসাহিত্য' এবং 'বেদনার বালুচর' তার উল্লেখযোগ্য রচনা। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখনিবিড় অনুভব তার কবিতায় স্থান পেয়েছেন। কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের অথিকারী খোদেজা খাতুন ছিলেন বগুড়া জেলার প্রথম মুসলমান মহিলা এমএ ডিগ্রিধারী এবং সমগ্র বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ১. সাগরিকা (গল্প) ১৯৫৯, ২. বেদনার এই বালুচরে (কাব্য) ১৯৬৩, ৩.রূপকথার রাজ্যে (শিশুতোষ ১৯৬৩, ৪. শেষ প্রহরের আলো (ছাট গল্প) ১৯৬৯, ৫. বগুড়ার লোকসাহিত্য (গবেষণা) ১৯৭০, ৬. আরণ্য মঞ্জুরী (রম্যরচনা ছোট গল্প) ১৯৭১, ৭. সাহিত্য ভাবনা (প্রবন্ধ)১৯৭৭, ৮. আমার দীর্ঘতম ভ্রমণ (ভ্রমনকাহিনী) ১৯৮২, ৯. একটি সুর একটি গন্ধ (ছোট গল্প) ১৯৮২, ১০. ভিনদেশী সেরা গল্প (বিদেশী গল্পের অনুবাদ) ১৯৮৩, ১১. সম্পাদনা-শতপুষ্পা (১ম খণ্ড, কবিতা সংকলন) ১৯৮৪, ১২. আমার দীর্ঘতম ভ্রমন (ভ্রমন কাহিনী, ২য় খণ্ড) ১৯৮৫, ১৩. শত-পুষ্পা (২ খ, সম্পাদিত গল্প সংকলন) ১৯৯০, ১৪. শতপুষ্পা (৩য় খণ্ড, সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন) ১৯৯০।[৩৪]

৩৩. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

৩৪. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪

জহুরা ইয়াছিন (১৯৩৮-): সমাজসেবক ও নারী উন্নয়ন কর্মী। বগুড়া নারী সমাজ ও নারী নেতৃত্বের প্রতীক জহুরা ইয়াছিন দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ সমাজ সেবা, নারী জাগরণও নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। তিনি ২০ শে অক্টোবর ১৯৩৮ সালে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী বগুড়ার প্রখ্যাত সমাজকর্মী ডা. মোহাম্মদ ইয়াছিন।

তিনি বগুড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর আর উচ্চ শিক্ষার পথে পা না বাড়িয়ে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তিল তিল করে নিজেকে স্বশিক্ষিত হিসাবে গড়ে তুলছেন। তিনি বগুড়া শহরের নুতনকুঁড়ি নার্সারি স্কুলের পরিচালক হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন (১৯৮৩-৯৭)। বগুড়ার বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী হিসাবে জড়িত ছিলেন যেমনঃ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা (১৯৯৮), ফয়জুল্লাহ প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৬৮), কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি (১৯৯৭-৯৮), বাংলাদেশ নারী আন্দোলন সংসদ, বগুড়া জেলা শাখা (১৯৭০-৯১), বগুড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (১৯৭৯-৯৮), মহিলা ক্রীড়া সমিতি (১৯৭৯-৯৪), কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, বগুড়া জেলা শাখা (১৯৯৫-৯৮)।

তিনি যে সকল প্রতিষ্টানের সহসভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা বগুড়া, জেলা (১৯৭৬-৮৪), বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, বগুড়া জেলা (১৯৭৩-৮৭), বগুড়া নারী কল্যাণ সমিতি (১৯৭৪-৯৯) তিনি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে (১৯৭৪-৭৯) বগুড়া জেলার দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি, বগুড়া শাখার জাতীয় প্রতিনিধি হিসাবে (১৯৮০-৯১) দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বগুড়ার বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বগুড়া ছাত্র সংসদের ও (১৯৬৩-৬৬) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 'তহুরুনেছা মহিলা সংসদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'র প্রতিষ্ঠাতা- সাধারণ সম্পাদক হিসাবে (১৯৬৮-১৯৮৪) দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া আরও যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ শিশু সংগঠন-বগুড়া জেলা শাখা (১৯৭৯-৮২), বগুড়া দুঃস্থকল্যাণ সংস্থা- মহিলা বিভাগ (১৯৭৫-৮৯), নিখিলপাকিস্তান মহিলা সমিতি (আপওয়া) (১৯৬৭-৭০) , বগুড়া-জেলা শাখা।

তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ও কর্তব্য পালন করেন। এর মধ্যে মহিলা ক্রীড়া সমিতি, বগুড়া শাখা (১৯৭৭-৯৭), জাতিয় মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড বগুড়া জেলা (১৯৭৩-৭৭), বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি, বগুড়া শাখা (১৯৭২-৭৪), উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য করা যেতে পারে ' বাংলাদেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী সমিতি,বগুড়া- শাখা (১৯৭২-৭৪), বগুড়া চক্ষু হাসপাতাল (১৯৭১-৯১), বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা (১৯৭৭-৯৭), যুবকল্যাণ বোর্ড, বগুড়া (১৯৭৪-৮২), প্রিক্যাডেট নার্সারি স্কুল, বগুড়া, (১৯৭৪-৮২), জেলা পরিবার পরিকল্পনা, বগুড়া (১৯৭৬-৮৩), জেলা শাখা (১৯৭৮-৯১), রেডক্রেস সদর ইউনিট, বগুড়া (১৯৭৮-৮৩), জেলা গনশিক্ষা কমিটি, বগুড়া (১৯৮০-৯৭)। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টারূপে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ করার মতো প্রতিষ্ঠান গুলো হলোঃ পরিবার কল্যাণ সমিতি, বগুড়া (১৯৭৮-৯৭), সাপ্তাহিক কাঞ্চন পত্রিকা, বগুড়া, উচ্চারণ একাডেমী, বগুড়া।

তিনি বগুড়া বিভিন্ন জাতীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ছিলেন, যেমনঃ রেডক্রস সদর ইউনিট, বগুড়া (১৯৬৫), চক্ষু হাসপাতাল, বগুড়া (১৯৮৭ থেকে), তহুরুনেছা মহিলা সংসদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া (১৯৭৭ থেকে), বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা (১৯৮০ থেকে), বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, বগুড়া (১৯৮৯ থেকে), বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ড ফাউনডেশন।

তার জীবনকালে সংঘটিত বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৭০ সালের তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় নিবাচন, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৮০-৮১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯০ সালের জাতীয় নির্বাচন।

তিনি ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিনিধি হিসাবে কারাগার পরিদর্শন করেছেন। ১৯৯৪ সালে বগুড়া পৌরসভা নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন এবং পৌর কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। তিনি তার সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এর মধ্যে যেগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে তা হলো, সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ, সমবায় প্রশিক্ষণ, দর্জীবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ, উল ও এমব্রডারি প্রশিক্ষণ, আপওয়া কৃর্তক আয়োজিত পাকিস্তানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও খাল খননে আগ্রহী ভূমিকা ইত্যাদি।

তিনি বিভিন্ন দেশে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। যেমনঃ পাকিস্তান,নেপাল, ভারত। তার এই বিশাল কর্ম অজ্ঞিতার মাধ্যমে তিনি দেশ জাতি বিশেষ করে বগুড়াবাসীর জন্য কল্যাণ ও সেবাদান করেছেন নিবেদিত চিত্তে।[৩৫]

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪২-১৪৩

জহুরুল ইসলাম (১৯৩৭), এডভোকেট, পৌরপিতা ও সমাজসেবক। তিনি ১০ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে বগুড়ার কাহালু উপজেলার মুরইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ কলিম উদ্দিন আহমেদ বগুড়ার বিশিষ্ট উকিল ও মুরইল ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনবার। পিতামহ- মজিবর রহমান তরফদারও বগুড়া বারের নামকরা উকিল এবং বুগুড়া জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়াম্যান ছিলেন।

তিনি বগুড়া আযিযুল হক কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন্ ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি, পাশ করেন এবং একই বৎসর বগুড়া বারে যোগদান করেন। এডভোকেট মোঃ জহুরুল ইসলাম পেশায় আইনজীবী হলেও সমাজসেবা ও জনকল্যাণে নিয়োজিত থেকে বগুড়াবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি পরপর চারবার বগুড়া পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে বগুড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৩৬] ১৯৭৭ সালে প্রথম চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮২ সালে এবং ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করেন এবং বিএনপি দলের মনোনয়নে পার্লামেন্ট সদস্য পদে নির্বাচিত হন। একসময় দক্ষ সাংবাদিক হিসাবে ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৬২ সালে ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' এর বগুড়া প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বগুড়া জেলা সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত একটানা ১২ বৎসর বগুড়া উডর্বান পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বগুড়া বারের তিনবার জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বগুড়া রেডক্রিসেন্ট সমিতির আজীবন সদস্য এবং লায়ন্স ইন্ট্যারনাল'এর চার্টার মেম্বর ছিলেন।

বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। বিনয়ী ও সমাজসেবী হিসাবে তার বহুল পরিচিত রয়েছে। এডভোকেট জহুরুল ইসলাম সিঙ্গাপুর , থাইল্যান্ড, তুরস্ক, জার্মানি, সৌদিআরব, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত ভ্রমণ করেন। তার সমাজসেবার স্বীকৃতি সরূপ বগুড়ায় ' জহুরুল নগর' নামে একটি উপশহর স্থাপিত হয়েছে।[৩৭]

জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) মুক্তিযোদ্ধা, বীর উত্তম, রাষ্ট্রপতি ও রাজনীতিক। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, ছিলেন বগুড়ার কৃতিসন্তান। তিনি বাগবাড়ী, গাবতলী, বগুড়ায় ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মনসুর রহমান ছিলেন একজন কেমিস্ট। মা জাহানারা খাতুন ছিলেন করাচি বেতারকেন্দ্রের নজরুল সঙ্গীতশিল্পী। জিয়াউর রহমানের ডাক নাম কমল। পিতামহ মৌলভী কামাল উদ্দিন ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি।

৩৬. সোহেলা রানা (সম্পা) প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
৩৭. পুর্বোক্ত ।

তার সহধর্মীনি বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের একাধিক মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি শৈশবের অনেকগুলো দিন বগুড়ার গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে পিতার কর্মস্থল কলকাতায় 'হেয়ার স্কুলে' ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের বোমা হামলাকালে তার পিতা পরিবারকে নিয়ে গ্রামে আসেন। তিনি তখন গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে পিতার পরবর্তী কর্মস্থল করাচির একাডেমি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে একাডেমি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে করাচি ডিজে. কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩- তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫৫- সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন লাভ করেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট দুই বছর চাকরি করার পর ১৯৫৭- তে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি হন। বিশেষ গোয়েন্দা কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ তে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিকে নের্তৃত্ব দেন। ১৯৬৬- তে কাকুলস্থ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৯-এ জয়দেব পুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসাবে নিযুক্ত লাভ করেন। ১৯৭০-এর অক্টোবর মাসে চট্রগ্রামে নবগঠিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে একই পদে বদলি হন। এই পদে কর্মরত অবস্থাতেই পূর্ববাংলায় নিরস্ত্র জনতার উপর পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ তারিখে চট্রগ্রামস্থ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন।[৩৮] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। আগস্ট মাসে রাউমারীতে ১ম, ২য়, ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড গঠিত হয়। এই ব্রিগেড 'জেড ফোর্স ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ব্রিগেডের কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২-এর জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ-অব- স্টাফ নিযুক্ত হন। ১৯৭৩-এর মাঝামাঝিতে বিগ্রেডিয়ার এবং ১০ই অক্টোবর (১৯৭৩) মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্টপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শহিদ হলে দেশে সামরিক আইন জারি হয় এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদের রাষ্ট্রপতির পদে গ্রহণের ঘটনা ঘটে। একই বছর ২৫ আগস্ট জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনীর চিফ-অব–স্টাফ পদে নিযুক্তি লাভ হয়। ৪ নভেম্বর (১৯৭৫) ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে ঢাকা সেনানিবাসে সংঘর্ষ বাধলে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এই সংর্ঘষের ফলে রাষ্ট্রপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হন।

---

৩৮. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮-৫০

৭ নভেম্বর (১৯৭৫) সিপাহি-জনতার অভূথানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান চিফ-অব-স্টাফ পদে প্রর্ত্যবর্তন করেন এবং-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ এর ৯ আগস্ট কলম্বোতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে যোগদান করেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ এর ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান পদ লাভ ঘটে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৬-এর ১ নভেম্বর উলশী- যদুনাথপুরের বেতনা নদীতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে 'খাল খনন' কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ১৯৭৬-এর ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৬-এর গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন। ১৯৭৭-এর ফ্রেব্রুয়ারিতে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিসরূপ 'একুশে পদক' প্রবর্তন করেন। ১৯৭৭ এর ২১ এপ্রিল বাংলাদেশের,প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা সম্বলিত ১৯দফা কর্মসূচি ঘোষনা করেন। তার ও তার এই কর্মসূচির প্রতি জনসাধরণের আস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭-এর ৩০ মে দেশে গণভোট গ্রহণ করেন। ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৫৬ জন ভোটারের মধ্যে গণভোট অংশ নেয় ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯ হাজার ৮৫৬ জন। জিয়াউর রহমান ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫২ টি 'হাঁ' সূচক ভোট লাভ করেন। ১৯৭৭-এর ৮ জুন লন্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের পর সংবিধান ' ধর্মনিরপেক্ষতা'র 'সামাজিক' পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', 'সমাজতন্ত্র'এর পরিবর্তে 'সামাজিক ন্যায়বিচার' এবং 'বাঙালি জাতীয়বাদ'এর পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সংযোজন করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত। রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান করেন। ১৯৭৭-এর ১১ ডিসেম্বর মহিলা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রনালয় গঠন করেন। ১৯৭৮-এর ১ মে জাগদল, ভাসানী ন্যাপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), মুসলিম লীগ, তপশিলী ফেডারেশনের সমন্বয়ে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠন করেন ও ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ জাতীয়বাদী'দল (বিএনপি) গঠন করেন ও দলের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। তার শাসনামলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য (১৯৭৮-১৯৮০) নির্বাচিত হয়। তিনি যুবসমাজকে দেশের উন্নয়নমুলক কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে 'যুব কমপ্লেক্র' গঠন করেন। ১৯৭৮-এর ১ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। সংসদে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী গৃহীত (৫ম এপ্রিল ১৯৭৯) হলে তৎকর্তৃক দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় (৭ এপ্রিল ১৯৭৯)। ১৯৭৯-র ৩১ জুলাই লুসাকায় কমনওয়েলথ শীর্ষসম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮০-র জানুয়ারিতে মক্কায় তায়েফে অনুষ্টিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তার প্রচেষ্ঠায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিন আফ্রিকার অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত (১৯৮০) হয়। ১৯৮০-র ১৯ ফেব্রুয়ারি সাভারে জিরাবো গ্রামে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার উদ্বোধন করেন। ১৯৮০-র ২৬ আগস্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একাদশতম অধিবেশনে ভাষণদান করেন। ১৯৮০-র ১২

ডিসেম্বর 'যোতুক প্রথা বিরোধী আইন' পাস করেন। ইসলামি সম্মেলনে সংস্থার তিন সদস্য বিশিষ্ট আলকুদস কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৮১-র ২৭ মার্চ ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানে ইসলামি মধ্যস্থতা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে জেদ্দা গমন করেন। ১৯৮১-র ২১ এপ্রিল দক্ষিণ এশিয়া ফোরাম (SAARC) প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। ১৯৮১-র ২২ এপ্রিল মরোক্কোয় জেরুজালেম সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮১ এর ১২ মে ইসলামী মিশনের পক্ষ থেকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ও তেহেরান গমন করেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজেকে পরিশ্রমী ও জনপ্রিয় রাজনীতিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সামরিক শাসন থেকে এক ধরনের সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণও তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি একদলীয় ব্যবস্থার বদলে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুঃপ্রবর্তন করেন। তার শাসনমলে বেশ কয়েকটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান সংঘঠিত হয়। তিনি ৩০ মে ১৯৮১ তারিখের রাতে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাসদস্যদের হাতে শহিদ হন।[৩৯]

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২) গবেষক, লেখক ও শিক্ষাবিদ। বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মাওলানা হারিদুল্লাহ শাহ্ ছিলেন বগুড়া জামে মসজিদের ইমাম।[৪০] পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপক এবং পরে রাজশাহী টির্চাস ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও গবেষণাধর্মী রচনার জন্যই সমাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। নাজিরুল ইসলাম স্কুল জীবনে সাহিত্যের সেবা করেননি। তবে ঘটনা প্রবাহ তাকে সাহিত্যের দিকে টেনে নিয়েছে। একবার উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণতৎপরতায় যোগ দিয়ে মানুষের সেবা করতে গিয়েছিলেন। চারদিকে পানিতে ভাসছে, রেল লাইনের উপর দিয়ে পানির স্রোত। ঘরের ছাদে, কোনো উচু জায়গায়, নয়তো গাছের উপর মানুষ, তাদের খাবার নেই, রান্নার জন্য শুকনো জায়গা নেই, নাজিরুল ইসলাম সেই প্রথম গেছেন গ্রামে, গ্রামের মানুষকে দেখেছেন। অনেক দিন পর যখন কলকাতায় কলেজে পড়ছেন, তখন পুরানো সেই স্মৃতি রোমন্থন করেই লিখে ফেলেন একটি উপন্যাস। এর প্রথম দিকে বন্যার ছবি, তারপর কৃষক পরিবারের করুণ কাহিনী। নাজিরুল ইসলামের রচিত 'নিগৃহীতের ব্যথা' (পর 'দুর্বিপাক') ই ছিল প্রথম বাংলা উপন্যাস। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সোনালী স্বপন'। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এতে গ্রন্থকারের একটি পরিচয়লিপি লিখে দিয়েছিলেন। এই পরিচয়লিপিতে গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'নাজিরুল ইসলাম সাহিত্য আকাশে এসেছেন নব নক্ষত্রোদয়ের বিস্ময় নিয়ে। কাজেই তিনিবাগত হলেও তার পরিচয় করিয়ে দেবার ঔদ্ধত্য আমার নেই।

৩৯. www.bogra.gov.bd

৪০. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮

সাহিত্যাকাশের নীহারিকাপুঞ্জে যে অনাগত রবি-চন্দ্রের উদয় সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, নাজিরুল ইসলাম সেই নীহারিকা লোক-চারী। তার চোখে সেই অনাগত সৌরলোকের দীপ্তি , চন্দ্রলোকের স্বপন দেখেছি। এ লেখায় দেখতে পাই সীমাহীন সমস্যা, অনন্ত প্রশ্ন আর সে জিজ্ঞাসার পেছনে বিংশশতাব্দীর মানুষের পীড়িত চিত্তের আকুল আকুতি। এই যন্ত্রনিষ্পেষিত মানুষ-মনের সাথে চির-যৌবনা প্রকৃতির মিলন-মন্ত্রের অস্ফুট বাণী এর কণ্ঠে যেন শুনতে পাই।[৪১]

এর পথে নূতন, এর ভাষা নূতন,এর চিন্তার ভঙ্গী নূতন। গল্প বলতে আমরা যা বুঝি, এর লেখায় ঠিক সে জিনিস নেই। এর লেখা অপরিণত যুবক-যুবতীর চিত্ত বিনোদনের জন্য নয়, নিতল-স্তব্ধ পরিণত ধ্যানী-চিত্ত যাদের-এ শুধু তাদেরই আনন্দদান করতে পারবে।'

এমনি ভাবে নাজিরুল ইসলাম সাহিত্যিক বনে গেলেন। তিনি নিজেকে বরাবরই জানতেন ভবঘুরে বলে। যুক্তবাংলার ৩/4 টি ছাড়া সব জেলাতেই তিনি বসবাস করেছেন। ভারতেরও চৈত্যগ্রাম থেকে পুরুষপুর আর কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে শ্রীলংকার কলম্বো পর্যন্ত-প্রায় সবগুলি বড় শহরেই তিনি বাস করেছেন। কোনো কোনো শহরে ৫/৬ বার থেকে ১৫/১৬ বার পর্যন্ত গেছেন। নাজিরুল ইসলাম ইউরোপে গেছেন তিনবার, আমেরিকায় দু'বার। প্রথমবার ভ্রমণ করেছেন জাহাজে, দ্বিতীয় বার এরোপ্লেন। শেষবার রেলপথে অথবা বাসে, গ্রাম শহর বন্দরের মাঝ দিয়ে । যেখানে ইচ্ছা হয়েছে সপ্তাহ থেকে তিন চার মাস পর্যন্ত বাস করেছেন। ব্রিটিশ দ্বীপ্তপুঞ্জে বাস করেছেন কয়েক বছর, স্পেন ও ইটালিতে দু'মাস, তুরস্কে দু'মাস। অন্যান্য দেশে এক থেকে কয়েক সপ্তাহ। এমনি করে তার জীবনের সাত বছর কেটেছে পথে পথে-এক রাজ্যে ছেড়ে অন্য রাজ্যে। দেখেছেন বিভিন্ন পরিবেশে বাস্তবজীবনের ছবি। কর্ডোভা, আল্হামরা, মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, লন্ডন, প্যারিস, হেগ, আমস্টারডাম, হ্যানোভার, বার্লিন, ম্যানহাইম, মিউনিক, ফ্রাঙ্কফ্রুট, মিলান, জেনেভা, রোম, নেপলস, ভিয়েনা, বিউগার্ড, জাগরেব, ইস্তামবুল, আঙ্কারা, এলোপো, বৈরুত প্রভৃতির কাহিনী তিনি লিখেছেন তার 'দুরে দূরান্তরে' গ্রন্থে। ইউরোপ যাবার আগে নাজিরুল ইসলাম হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবদুল মালেকের সহযোগিতায় একটি পত্রিকা 'প্রস্তিকা' সম্পাদন করেছিলেন।[৪২] নাজিরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ছায়াবীথি' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছিল। এতে প্রসিদ্ধ লেখক ও শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল । কিন্তু দুবছরের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেনি।

এরপর নাজিরুল ইসলাম সমুদ্র পারি দিয়ে এডিনবরা যান শিক্ষালাভ করতে। সেখানে থেকে ফিরে এসে বহুদিন শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন পদে কাজ করেন।

---

৪১. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮
৪২. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮

কোলকাতার ডেভিট হেয়ার ট্রেনিং স্কুলের অধ্যাপক রূপেই তার বারো বছর কাটে। পূর্বপাকিস্তানে এসে ঢাকা ও ময়মনসিংহ কলেজে অধ্যাপক, পরে দৌলতপুর ব্রজেন্দ্রলাল কলেজে এবং রাজশাহী টিঁচাস ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি আমলে দেশে যখন উর্দু-বাংলা সমস্যা দেখা দেয়। তখন নাজিরুল ইসলাম বিভিন্ন উপায়ে বাংলা সমর্থন করেন। মাতৃভাষার অনুকুলে তিনি শুধু ভাব-প্রবণতা না দেখিয়ে সেই ভাষার প্রকৃত দান অনুসন্ধান করতে থাকেন। দেশ-বিদেশে পরীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া মাতৃভাষার বিশেষ পরীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া মাতৃভাষার বিশেষ গুণাবলি সংগ্রহ করে তিনি লিখছেন 'মাতৃভাষার আর্শীবাদ'। বাংলা ভাষা সর্ম্পকে উর্ধ্বতন মহলের বিরূপ ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন নাজিরুল ইসলাম।তিনি বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' লিখতে শুরু করেন দৈনিক ১৮ ঘন্টা সময় ব্যয় করে। তিনি অন্যত্র বদলি হন। তখন প্রয়োনীয় বই-পুস্তক পাবারও সম্ভাবনা রইলো না। এ সময় তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন, সুতারাং হুকুম মতো চাকুরিতে যোগ দেয়া সম্ভব হলো না। প্রথমে সবেতন, পরে বিনাবেতন ছুটি নিয়ে উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেন এবং ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসেই একখন্ড বের করে বাংলা ভাষায় বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই আলোড়ন তোলে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই, ড, সাজ্জাদ হোসায়েন এবং আরো অনেকে অভিনন্দন জানান। তার এই বই নতুন ভাব, ভাষা, সাহিত্যরুচি এবং মুসলমানদের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস। এতে তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সর্ম্পকে পূর্ববতী ভাষাবিদ ও গবেষকদের উপস্থাপিত তথ্য ও মতামতকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে নতুন বক্তব্যকে যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় প্রতিষ্ঠার সযত্ন প্রচেষ্ঠা গ্রহণ করেছেন। তার'মতে 'বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত নয়, আর্য ভাষা ও নয়, ইহা প্রাচীন দ্রাবিড় (পুণ্ডরিক) দিগের ভাষা।' বাংলাভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সর্ম্পকে তার মতামত পণ্ডিতমহলে সর্বত্র গৃহিত না হলে ও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত নতুন তথ্যাদির প্রতি কৌতুহলী গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তালিব লিখেছেন: 'লেখক বইয়ের নাম দিয়েছেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' আসলে এটি বাঙ্গালা সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষন করার কারণে লেখক একে ইতিহাস বলেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বাঙ্গালা জাতির উৎপত্তি, তার উৎস, বিকাশ এবং বিশেষ করে তার সাথে ইসলামি ও মুসলিম ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আধুনিক বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা ও বিশ্লেষণ, ইতিহাস আলোচনা সঠিক ধারায় অনুষ্টিত হয়েছে। বাঙ্গালা ভাষা যে একটি আর্য ভাষা নয়, এর মূলে সংস্কৃতের অবদান মুখ্য নয়, বরং এটি দ্রাবিড় ভাষা এবং এই জাতি ও এর ভাষার মূলের সাতে যুক্ত রয়েছে

সেমেটিক ও মধ্যত্রশীয় ধারা, একথা তিনি প্রমাণ করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি অভিনব, চমকপ্রদ ও ঐতিহাসিক সংযোজন এবং আধুনিক বাঙ্গালা মুসলমানের পদচারণা পর এটিই একজন বাঙ্গালি মুসলমানের লেখা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের পর যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ফলে এই ধারায় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়া এবং আরো গ্রন্থ রচনা করার পথ সুগম হয়। কিন্তু জাতীয় দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভিতরের ও বাইরের চক্রান্ত এই ধারাকে এগিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়।'

এই বই লেখার জন্য 'বগুড়া সাংস্কৃতিক সংঘ' নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানকে একটি মানপত্র ও স্বর্ণপদক দিয়ে সংর্বধিত করে। ১৯৮১ সালে সাহিত্য সাধনার জন্য তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এশিয়া,আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের শেষ রচনা The History of Muslim Education .এতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তের কথা প্রমাণপঞ্জিসহ আলোচিত হয়েছে।

নাজিরুল ইসলাম সবশুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ২২ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। বইগুলি হলো : বাংলা দুর্বিপাক (উপন্যাস).সোনালী স্বপ্ন (গল্প), পয়সা (উপেক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিচু শ্রেনীর জীবন-কথা), জীবনের জয়যাত্রা (উপন্যাস), স্বগীয় পলিটিক্স (গল্প), দূরে দুরান্তরে (ভ্রমন), দিগ দিগন্ত (প্রবন্ধ সংগ্রহ, বাঙালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস,প্রথম খণ্ড (ভাষার ইতিহাস). অজানা দেশ, ভুলে যাওয়া দেশ, নারী সমস্যা, বাংলা শিখানো,শিশু মানস-বিজ্ঞান, মনীষা নির্ধারণ পরীক্ষা,The Education of personality, Education Psychology,Method of Tecahing Geography, The History of Muslim Education, Psychology analysis for Everybody, The way to free Pakistan.[৪৩]

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ২৩ আগস্ট ১৯৮২ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রভাসচন্দ্র সেন (আনুমানিক ১৮৮১-৬৯) ইতিহাসবিদ ও আইনবিদ। তিনি বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলায় মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৪] পিতা শ্রীনাথ সেন ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মাতার নাম গয়ামণি দেবী। প্রভাসচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী শ্রীমতি কুমুদিনী দেবী। তিনি আত্নপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন 'মহেশপুর গ্রামটি পূর্বে সমৃদ্ধশালী ছিল। এই গ্রামের অতিগোত্রীয় সেনবংশীয় বরেন্দ্র কায়স্তগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশে গ্রন্থকারের জন্ম। ইহারা পূর্বে পলাগাছা গ্রামে ছিলেন। পন্ডিতা ডাকাইতের অত্যাচারে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছেন' (বগুড়ার ইতিহাস)।

৪৩. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১
৪৪. আজিজার রহমান তাজ (সম্পাদিত), "মল্লিকা" (একটি সাহিত্য সাময়িক) ৩০তম বর্ষ: ৫৪২তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ ১৭২

প্রভাসচন্দ্র সেন সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চতর বিএল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৭ সালে বগুড়া বারে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে বগুড়া বার সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মোট ৬ বৎসর উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার সততা আর যোগ্যতা জন্য তিনি ১৯৪৮ সালে বগুড়া বারে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ৪ বৎসর ঐ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে ও সম্পৃক্ত ছিলেন। তৎকালীন বগুড়া কংগ্রেস দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' পত্রিকার অন্যতম লেখক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হতো। ইতিপূর্বে কয়েকটি ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে অদির্ষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। তার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইংরেজি পুঠিয়া ও লোনসিংহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব হেড মাস্টার ছিলেন।

১৯১২ সাথে তিনিই সর্বপ্রথম. 'বগুড়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৫] প্রভাসচন্দ্রের পূর্বে বগুড়ার ইতিহাস সংক্রান্ত আর একখানি বইয়ের কথা জানা যায়, যার নাম' সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত' উক্ত বইটির কোনো অনুলিপি কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রভাসচন্দ্র সেন কৃত 'বগুড়ার ইতিহাস' পরবর্তীকালের বগুড়া সংক্রান্ত যেকোনো গবেষণার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর ও কয়েকটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় কিছু রচনা। তার Mahasthan and its Environs ছাড়া অন্য বইগুলো দুষ্প্রাপ্য।

প্রভাসচন্দ্র সেন 'বগুড়ার ইতিহাস' প্রকাশ করতে যেয়ে আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিশেষ করে নবাব সৈয়দ আব্দুস সুবহান চৌধুরী ও অন্যান্যদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। প্রভাসচন্দ্র সেন আর ও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম ' বরেন্দ্রী কাহিনী। লেখক উক্ত গ্রন্থ সর্ম্পকে লিখেছেন 'দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'বরেন্দ্রী কাহিনী' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস বহু মাসিক ও দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'কৃষ্ণ চরিত ও কায়স্ততত্ত্ব নামে আর ও দুইখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি ১৯৫২ সালের পরে ভারতে গমণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৬৯ সালে কলকাতাতেই পরলোকগমন করেন।

<u>মজিবর রহমান (১৯৩৬-২০০5)</u> মুক্তিযোদ্ধা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আইনজীবী । তিনি ১৯৩৬ সালের ২৮ শে আগস্ট বগুড়া শহরের আটাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ মনির উদ্দিন, মাতার নাম আছামুন বেওয়া। মজিবর রহমান ১৯৫৪ সালে গাবতলী হাইস্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি. ডিগ্রি লাভ করেন।

৪৫. সোহেল রানা (সম্পা). প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৯৬২ সালে বগুড়া বারে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে ঠাকুরগাও-এ ল' ইয়ার ম্যাজিস্টেট হিসাবে এক বছর দায়িত্ব পালন শেষে পুনরায় আইন পেশায় ফিরে আসেন। ১৯৭৩ সালে হাইর্কোট বারে যোগদান করেন।[৪৬] পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে পটুয়াখারলী জেলায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে এক বছর কাজ করেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে বগুড়া বারে আইনজীবী হিসাবে পুনরায় যোগদান করেন। তিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা ফৌযদারি আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এই সময়ের পর থেকে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে জাগদলে যোগদান করেন। ১৯৭৬-৮২ সালে বগুড়া জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ১৯৮৬ সালে বগুড়া বার এসোসিয়েশন এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৭] তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন।

প্রবীণ আইনজীবী মজিবর রহমান বিএনপি-র প্রতিষ্ঠালগ্নে বিএনপি-তে যোগদান করেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা বিএনপির শহর কমিটির সভাপতি ছিলেন। বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন। বগুড়া শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, লায়ন্স ক্লাব ও বগুড়া জেলা ক্রীড়া সমিতিসহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি চক্ষু হাসপাতালের আজীবন সদস্য ছিলেন।

মজিবর রহমান ৫ম ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া- ৬ আসন থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৮] ২০০৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বগুড়া শহরে একটি ক্লিনিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। তার মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে বলা হয়: 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ' এই সংসদ প্রস্তাব করছে যে, 'জনাব মজিবর রহমান এর মৃত্যতে দেশ একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং সমাজসেবককে হারালো। এই সংসদ তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ, তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। এই শোক-প্রস্তাবের একটি অনুলিপি মরহুম মজিবর রহমানের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

---

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪
৪৭. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪
৪৮. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪

মজিবর রহমান ভান্ডারী (১৯১৬-১৯৬৩) : শিল্পোদ্যোক্তা ও সমাজসেবক। ১ ডিসেম্বর ১৯১৬ তারিখে বগুড়ার জন্মগ্রহণ করেন। যতদূর জানা যায় ভান্ডারী পরিবারের পূর্বপুরুষগণ পাটনা থেকে বগুড়ায় প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে আগমন করেন।[৪৯] মজিবর রহমান ভান্ডারীর পিতার নাম শেখ ময়েজ উদ্দীন এবং পিতামহের নাম শেখ তমিজ উদ্দীন। বগুড়ার ঐতিহাসিক কাজী মোহাম্মদ মিছের লিখেছেন, 'সত্য কথা বলিতে কি, বগুড়া জেলা সংগঠন হইবার পর হইতে এরূপ লোকের আর্বিভাব হয় নাই। ইহাই প্রথম। লক্ষপতি-দক্ষদাতা-দানবীর। বগুড়ার মত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে বহুদিন হইতেই এইরূপ একজন লোকের অভাব ছিল, সত্যিই আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন করিয়া---- আমরা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তেমনি মজিবরের আবিভাব হওয়াতে বগুড়াবাসী চিরধন্য, চিরবরেণ্য হইবে। ইহা আমাদের চির বিশ্বাস হইয়া, আদরের হইয়া চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পঞ্চাশের দশকে বগুড়ার শিল্পস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন। অধ্যবসায়ী ও অসাধারণ মনোবলের অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সেই দশটি শিল্প স্থাপন করে এক বিরল দৃষ্টান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। একসময়ে বগুড়ার শিল্প, ব্যবসা ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও ভান্ডারীপরিবারের বিরাট রকমের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ভান্ডারী পরিবারের এই সাফল্যের সূচনা তিনিই করেছিলেন। তিনি একজন নগন্য বিড়ি কারখানার মধ্যে দিয়ে কর্মময় জীবনের সূত্রপাত করেন। প্রথম বেকার জীবনে বিড়ি তৈরির কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম বিড়ি পস্তুত প্রণালী শিক্ষাদান করেন। তার কারখানা হতে প্রতিদিন ১৮/১৯ লক্ষ বিড়ি প্রস্তূত হতো। একটি বিড়ি কারখানার অংশীদার হিসাবে জীবন শুরু করলেও তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় বগুড়ায় কটন মিলসহ বহুসংখ্যক শিল্প স্থাপন করে বগুড়ার অর্থনীতির চাকাকে সচল করেন। তার বিভিন্ন শিল্পস্থাপনায় সে সময় প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল।[৫০] তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের শিল্পপতিদের মধ্যে একজন হিসাব পরিগণিত হয়েছিলেন।

সমাজসেবায় মজিবর রহমান ভান্ডারীর অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন উদারপ্রাণসম্পন্ন ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। প্রতিবন্ধি, বিশেষ করে অন্ধ, পঙ্গু ও গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। অসহায় নারীদের সমাজে সু-প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি মাসিক বৃত্তি প্রদান করতেন। বগুড়ার 'ইসলামিয়া ইয়াতিম ও মুসাফিরখানা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। বগুড়ার বিভিন্ন শিক্ষা পতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ দান করতেন। দুঃখী ও দরিদ্রদের মধ্যে মুক্তহস্তে দান–খয়রাত করতেন। প্রথমত নিজ পাড়া প্রতিবেশী ও গরিব আত্নীয় স্বজনের মধ্যে জাকাতের টাকা বিতরণ করতেন।

৪৯. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬

৫০. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮

দ্বিতীয়ত বস্ত্রহীনদের বস্ত্র বিতরণ করতেন। তৃতীয়ত অবস্থাভেদে নগদ অর্থ বিতরণ করতেন। এছাড়া বগুড়া জেলার অধিকাংশ মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদে, বিশেষ করে পুরাতন মসজিদ সংস্কারের কাজে সাহায্য করতেন। স্কুল ও কলেজের গরিব ছাত্রদের মাসিক হারে বৃত্তি প্রদান করতেন। ১৯৬৩ সালে বগুড়ায় তার নামে 'মজিবর রহমান মহিলা কলেজ' স্থাপন করা হয়। এই কলেজে ভান্ডারীপরিবার জায়গা ও দুই লক্ষ টাকা দান করেন।

মজিবর রহমান ভান্ডারীর পুত্র ও ভাইগণ ছিলেন বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি। বগুড়া থেকে দুইবার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ) পদে নির্বাচিত জনাব হাবিবুর রহমান ভান্ডারী তার অন্যতম ভাই। তাই মজিবুর রহমান ভান্ডারীকে The self made man বলে আখ্যায়িত করলেও ভুল হবে না।[৫১] ৪ঠা মে ১৯৬৩ তারিখে মজিবর রহমান ভান্ডারী অকালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাকে নামাজগড় ভান্ডারী পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

<u>মফিজুর রহমান (১৯২১-)</u> : বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী মফিজুর রহমান ১৯২১ সালে কালেরপাড়া, ধুনট, বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডা: সেলিম রহমান। সহধর্মিণীর নাম মাজেদা রহমান।

তিনি শৈশবে নিজগ্রাম কালেরপাড়ার পাঠশালায় শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত করেন। এরপর নওখিলা পিএন, উচ্চবিদ্যালয়ের ভর্তি হন। তারপর বগুড়া জিলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই সময় বয়েজ স্কাউট ট্রুপস লিডার হয়ে জেলার মধ্যে প্রথম কিং স্কাউট ব্যাজপ্রাপ্ত হন। জিলা স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করে সোনাতলা হাইস্কুলে ভর্তি হন। এ সময় অবিভক্ত বাংলায় বয়েজ স্কাউট প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তৎসময়ের বাংলায় বয়েজ স্কাউট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তৎসময়ের বাংলার বিট্রিশ গভর্নর স্যার জন এন্ডারসনের নিকট থেকে ট্রফি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে সোনাতলা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে বগুড়ায় ফিরে আসেন। ১৯৩৯ সালে বগুড়ায় আযিযুল হক কলেজ স্থাপিত হলে তিনি উক্ত সময়ে কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মি. মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সহযোগিতায় এই কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি আযিযুল হক কলেজের ছাত্র থাকাকালে কলেজ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ কর্মী হিসাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সহকারী সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন।

---

৫১. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৮২

তৎপর জেলা মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের 'সালারে জিলা' মনোনীত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি মি. জেমস্ বুকাননের অধীনে আনসার এ্যাডজুট্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে প্রায় পঞ্চাশ ন্যাশনাল গার্ডকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই ন্যাশনাল গার্ডবাহিনী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডে যোগদান করেন। সে সময়ে পূর্বপাকিস্তানের জিওসি. ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি তার অধীনে পাঞ্জাব রেজিমেন্টে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে 'লেফটেনেন্ট' পদে উন্নীত হন।

তিনি বগুড়া জেলা ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর নির্বাচিত সদস্য হিসাবে বিহারে দাঙ্গা পীড়িত মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করেন। সিলেটের গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ভারত থেকে বিতাড়িত শরণার্থীদের সহযোগিতা ও পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫২] আনসার বাহিনীর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি বগুড়া শহরে 'শ্রীচরণেষু' নামে একটি জুতার দোকান খুলেছিলেন। পরে অয়েল কোম্পানীতে এজেন্সী গ্রহণ করেন। ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করে প্রভূত অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'রহমান ব্রাদার্স লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি আরও বহুবিদ ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন।

১৯৭০ সালে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি হিসাবে 'পাকিস্তান ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' এর পূর্ব জোনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যদিকে পাকিস্তান কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে বগুড়ার নারচী গ্রামে সহধর্মিণী মাজেদা রহমানের নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। উক্ত 'মাজেদা রহমান স্কুল' প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষাধিক টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করেন। গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য টিপসহির পরিবর্তে নিজেদের নাম লেখা-শেখা, খবরের কাগজ পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য উক্ত স্কুলে নৈশ শাখা স্থাপন করেন। স্কুলের ছাত্রদের জন্য মেধা বিকাশ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতি বৎসর দশজন ছাত্রছাত্রীকে 'মফিজ স্কলারশিপ' প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মফিজুর রহমানের অবদান রয়েছে। তিনি 'এপিপি' সংবাদ পরিবেশক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একসময় বগুড়ার সাধনা প্রেস হতে 'আনসার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে বহু অর্থ অনুদান করেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে মফিজুর রহমানের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও বহু অর্থ প্রদান করে সহযোগিতা করেন। বগুড়া শহর থেকে পেট্রোল, ডিজেল বিনামূল্যে সরবরাহ করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

৫২. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

স্বাধীনতার যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক তার দেড় লক্ষ টাকার বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। মফিজুর রহমান ছিলেন একজন সংস্কৃতিসেবী মানুষ। তিনি শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেকে অনুপ্রাণিতবোধ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মমতাজুর রহমান তরফদার ডক্টর (১৯২৮-১৯৯৭) : অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক। অধ্যাপক ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার বগুড়া জেলার মেঘাগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১লা আগস্ট ১৯২৮। তিনি শৈশবকাল থেকেই একজন কৃতিছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। যখন আযিযুল হক কলেজের ছাত্র, তখন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। পরবর্তীকালে সৈয়দ মুজতবা আলী যখন আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, তখনও তিনি উক্ত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের পর তিনি '১৪ই আগস্ট স্মারক' শীর্ষক একখানি কবিতা প্রকাশ করেন। উক্ত কবিতার মাধ্যমে পশ্চিমপাকিস্তানিদের বিমাতামূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। এ সময় অধ্যক্ষ সৈয়দ মুজতবা আলী 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা' নামক একখানি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে তিনি মুসলিম লীগ সরকারের রোষে পড়ে পদত্যাগ করে গোপনে দেশ ত্যাগ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব মমতাজুর রহমান ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। কমনওয়েলথ্ স্কলারশিপ পেয়েও লন্ডনে পিএইচডি. না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অধীনে পিএইচডি. করেন।

তিনি ছাত্রজীবন শেষ করেই ১৯৫১ সালে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক হিসাবের যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এই দায়িত্ব কর্মরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. এ এফ সালাহ্ উদ্দীন আহম্মদ তার এক নিবন্ধে মমতাজুর রহমান তরফদার স্মরণে লিখেছেন : 'অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদারের মৃত্যু আমার জন্য বড় বেদনাদায়ক। আমার চেয়ে বয়সে চার/পাঁচ বছরের ছোট হলেও আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ঐতিহাসিক; মধ্যযুগের ইতিহাসের যশস্বী পন্ডিত। যতদূর মনে পড়ে তরফদারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় ১৯৬১ সালের শেষের দিকে। সে বছরই আমি লন্ডন থেকে পিএইচডি. নিয়ে ফিরেছি। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি করতাম। সেখান থেকে শিক্ষাছুটি নিয়ে লন্ডনে গিয়েছিলাম। ওখানে থাকাকালীন মমতাজুর রহমান তরফদারের নাম প্রথম

শুনেছিলাম আমার বন্ধু বরুণ দে'র কাছে। বরুণ অক্সফোর্ডে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কলিন ডেভিস-এর তত্ত্বাবধানে ডি-ফিল ডিগ্রির জন্য কাজ করছিল। সে সময় আমি ও বরুন উভয়ই লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আমাদের থিসিসের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলাম। একদিন বরুণ কথা প্রসঙ্গে বললো যে তার অক্সফোর্ডের শিক্ষক অধ্যাপক ডেবিস ঢাকার এক তরুণ গবেষক মমতাজুর রহমান তরফদারের থিসিসটি পড়েছেন; তিনি এই থিসিসের বহিরাগত পরীক্ষক অধ্যাপক ডেভিস তরফদারের থিসিসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আগেই বলেছি যে, ১৯৬১ সারে দেশে ফেরার পর তরফদার সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়; প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হই। দৃঢ় চরিত্র ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকার, মৃদু অথচ স্পষ্টভাষী এই ব্যক্তিটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি। তার সহজ-সরল স্বভাবের জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আমার আপনজন হয়ে ওঠেন। তরফদার ছিলেন কোনো রকম ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার অথবা রাজনৈতিক বা দলীয় সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বস্তুত তরফদার ছিলেন একজন অসম্প্রদায়িক এবং উদার মানবতাবাদী চিন্তার ধারক। নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ক্ষেত্রে তিনি অনন্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার বিভিন্ন রচনায়। ড. তরফদারের প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো: Hussain Shahi Bengal 1494-1538: A Socio-Political study. এটি তার পিএইচডি. ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ। ১৯৬৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়। এই একটি বই তরফদারকে একজন প্রথম শ্রেণির ঐতিহাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তরফদার তার শিক্ষাগুরু আবু মহামেদ হবীবুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হন। মধ্যযুগে বিশেষ করে হোসেন শাহী সুলতানদের আমলে হিন্দু ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফিয়াবাদের প্রভাবে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাবজগতে যে অভূতপূর্ব রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিল তার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর বিবরণ পাওয়া যায় তরফদারের এই বইটিতে। ড. তরফদার তার ইতিহাস গবেষণাকে কেবল মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভূতি ক্ষেত্রে তিনি স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন। বস্তুত এ বিষয়গুলোতেও তার জ্ঞান ছিল অসামান্য, তরফদারের প্রকাশিত রচনার গুনগত মান দেশ-বিদেশের পন্ডিত মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তরফদারের মতো আত্মপ্রচার-বিমুখ ব্যক্তি আমি খুব কম দেখেছি। তিনি কখনও নিজের চাকরির উন্নতির জন্য বা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার আশায় কারো কাছে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেননি। তার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্রখর। যেটাকে অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করতেন, তার সঙ্গে তিনি কখনো আপোষ করেননি। পাকিস্তান আমলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে যখন ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চলছিল, সে সময় অধ্যাপক আবু মহামেদ হবীবুল্লাহর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে মুক্ত এবং

অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা। তরফদার ইতিহাস পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ইতিহাস পত্রিকা'র অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘকাল থেকে বহন করে এসেছেন। তাকে ইতিহাস পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে রাজি হননি। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯১ সালে ড. তরফদার, ড. অজয় রায় এবং আমার যৌথ সম্পাদনায় ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক 'আবু মহামেদ হবীবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। এটিতে তরফদার রচিত অধ্যাপক হবীবুল্লাহর জীবন ও কর্মের ওপর একটি অত্যন্ত সুলিখিত ও পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা সন্নিবেশিত হয়। 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' শীর্ষক তরফদার রচিত একটি মূল্যবান পুস্তক বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর তরফদার সাহেবের বেশ কিছুসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে গবেষণা পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক ও সমকালীন ইতিহাসের ওপরও তরফদার সাহেবের কিছু রচনা আছে, যেগুলো বর্তমান সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হবে। এরকম একটি রচনা হলো 'Cultural Conflict in Bangladesh'. এটি ড. তরফদার পাঠ করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস পরে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় বাংলাদেশের ওপর অনুষ্ঠিত একটি আর্ন্তজাতিক সেমিনারে। সেমিনারটি আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা বাংলাদেশের ওপর অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে। সেমিনারটির আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'র পক্ষ থেকে। আমিও সেই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা কলকাতায় থাকাকালীন একদিন আমার পুরোনো বন্ধু ড. বরুণ দে এসে বললেন যে, স্বনামধন্য অধ্যাপক সুশোভন সরকার যিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনি তরফদারের ও আমার প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য, মার্কস ক্লাব নামে তাদের একটা বসার জায়গা ছিল- সেখানে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সেখানে হাজির হই এবং সেখানে আমরা দু'জনেই আমাদের প্রবন্ধ পাঠ করে শোনাই। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ। ড. তরফদারের প্রবন্ধ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ফলপ্রসূ আলোচনার সূত্রপাত করে। অধ্যাপক তরফদার তার ঐ প্রবন্ধের শেষে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন সেটি আজো প্রণিধানযোগ্য। তরফদারের ভাষায় : 'Muslim is a split personality. History shows that he has always wavered between regional nationalism and exttra-territorialism without accepting either. Political nationalism may counter this exttra-teritorial outlook. But nationalism has its own defects.

Unless it can constantly go through a process of synthesis by receiving fresh ideas from other nationalities it may sink into sectionalism and such a narrow and stagnant national culture is likely to prove dangerous to the people. The Bengali Muslim has discoverd his political indentiy, but he is yet ot discover his cultural identity, and to know himself well.' (M.R Trafdar, 'Cultural Conflict In Bangladesh.' A Nation is Born. Calcutta. 1974. p-356).

ড. তরফদার ইতিহাস গবেষণা করেছেন অনেক, কিন্তু সে তুলনায় লিখেছেন কম। তিনি ১২ টি উচ্চমানের গবেষণাগ্রন্থ লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ১. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আওয়াধী হিন্দি পটভূমি, ২. ইতিহাসের দর্শন, ৩. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, ৪. মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, ৫. আবদুর রহমানের সন্দেস রাসক, ৬. জেনারেল গাইড টু দি ঢাকা মিউজিয়ম (General guide to the Dacca Museum). ৭. হোসেনশাহী বেঙ্গল এন্ড সোসিওপলিটিক্যাল স্টাডি (১৪৯৪-১৫৩৮ এডি) (Husain sahi Bengal a Socio-Political 1491-1538 AD), ৮. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও সম্ভাবনা, ৯. ট্রেড টেকনোলজি এন্ড সোসাইটি ইন বেঙ্গল।[৫৩]

তিনি সমাজ, প্রগতি, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত বেশকিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। মাসিক মোহাম্মদীতে তার কবিতা প্রকাশ হতো। পরবর্তীতে 'চতুষ্ক' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে গোপনে অর্থ সহায়তা দান করেন। তার এক পুত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ড. মমতাজুর রহমান তার কৃতিত্বের জন্য ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।[৫৪] তিনি ঢাকায় ৩০শে জুলাই ১৯৯৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

<u>মাহাবুবুর রহমান চৌধুরী (পুটু মিঞা)</u> : সমাজসেবী। তিনি বগুড়ার বিখ্যাত সাতানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জমিদার খানবাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী। বগুড়া শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। তিনি বগুড়ার সাতানী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তার পুত্র মামদুর রহমান চৌধুরী বাংলাদেশের এরশাদ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বগুড়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।[৫৫]

৫৩. আখতার উদ্দিন মানকি, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪২-২৪৬
৫৪. আজিজার রহমান তাজ (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭
৫৫. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৮০

মোজাফফর রহমান (১৯০৮-১৯৯৮) : চিকিৎসক ও সমাজসেবী। মানবকল্যাণে নিয়োজিত বগুড়ার কৃতি সন্তানদের মধ্যে ড. মোজাফফর রহমানের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ১৯০৮ সালে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[৫৬] পিতা- তমিজ উদ্দিন আহম্মদ। মাতা-জোবেদা খাতুন। পিতামহ-দিঘাপাতিয়া মহারাজার নায়েব ছিলেন। ডা. রহমান ছিলেন পিতা- মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বগুড়ার বিখ্যাত সমাজসেবী ডা. করিম তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তার সহধর্মিনী বেগম মহসিনা খাতুন ছিলেন। ঘুঘুডাঙ্গার জমিদার পরিবারের মেয়ে বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন। মেধাবী ও অধ্যবসায়ী।

১৯৩৩ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। তারপর কলকাতা ‘মেয়ে’ হাসপাতালে হাইজসার্জন হিসাবে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে বগুড়ায় ফিরে এসে চিকিৎসার মাধ্যমে মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং অচিরেই খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। ডা. মোজাফফর রহমান চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডে এবং জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৬ সালে বিহারের দূর্গত এলাকায় মেডিক্যাল টিম নিয়ে বিপন্ন মানুষের সেবায় অগ্রসর হন।[৫৭] তিনি বগুড়া জেলাবোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সরকার মনোনীত বগুড়া ফৌজদারি আদালতের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ও ন্যায়পরায়নতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তৎকালীন পাকিস্তান মেডিক্যাল সমিতি বগুড়া শাখার সভাপতি হিসাবে ওদায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে বগুড়া মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমানে অবলুপ্ত) সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। তিনি বগুড়ায় সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

হয়ে বগুড়া জেলা সমাবায় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ও রেডক্রসের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন । চিকিৎসাপেশাকে পবিত্র জ্ঞান করে মানবসেবার লক্ষ নিয়ে চিকিৎসা করতেন। ১৯৫৪ সালে বগুড়ার অন্ধত্রান সমিতির সেক্রেটারিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বগুড়া সিটি গালর্স স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ডা. মোজাফফর রহমান ছিলেন অসাসম্প্রাদায়িক ও উদার মানবহিতৈষী। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠতেন, নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। প্রতিবেশী সকল হিন্দু-মুসলমানের বাড়ি বাড়ি যেয়ে তাদের ডেকে তুলতেন দরজায় টোকা দিয়ে সকলকে নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করতে বলতেন। তিনি প্রিয় একটি এ্যালসিশিয়ান কুকুর সাথে নিয়ে পথে পথে হাটতেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। সততা ও নির্ভীকতা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ১৯৯৮ সালে ১লা জানুয়ারি ৭২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫৮]

৫৬. আমানুল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৫৭. পূর্বোক্ত।
৫৮. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭

মোতাহের হোসেন খান খানসাহেব (আনুমানিক ১৮৯০-১৯৫২): সমাজকর্মী । বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার বিশিষ্ট সমাজকর্মী খানসাহেব মোতাহার হোসেন খান আনুমানিক ১৮৯০ সালে দুপচাচিয়া উপজেলার গুনাহার গ্রামের প্রসিদ্ধ খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম- মেহেরজান খান। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই বগুড়ায় ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলায় এবং আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। ১৯০৯ সালে বগুড়ায় ছাত্রদের আন্দোলনমুখী করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর কলকাতায় শিক্ষাজীবন শুরু করেন। কলকাতা থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে ব্রিটিশ সরকারের আবগারি বিভাগের সুপারিন্ডেট পদে চাকুরি করেন। পেশাগত জীবনে দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'খানসাহেব' খেতাবে ভূষিত হন।[৫৯]

তিনি গুনাহার ইউনিয়নের তালুছেগ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় এলাকার দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উক্ত স্কুল স্থাপন ছাড়া ও তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গ্রামের দরিদ্র জনসাধরণের জন্য চিকিৎসাসেবার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তিনি সমাজ সেবামূলক বহুবিধ কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। আজীবন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত থেকে ২২ জুলাই ১৯৫২ তারিখে নিজগ্রামের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (১৯০৯-১৯৬৩ রাজনীতিবিদ, কুটনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক জীবনে তিনি পাকিস্থান আমলে বগুড়ার ' মোহাম্মদ আলী' নামে পরিচিত ছিলেন। বগুড়ার বিখ্যাত নবাব পরিবারে ১৯ শে অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।[৬০] পিতা বগুড়ার বিশিষ্ঠ

রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী। পিতামহ- ছিলেন ব্রিটিশ আমলে মুসলিম জাগরণের নেতা ও মন্ত্রী ধনবাড়ির বিখ্যাত নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর মাতার নাম বেগম জহুরা খাতুন।

মোহাম্মদ আলী বাল্যকালে তার পিতামহ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে বগুড়া শহরের করনেশন ইনস্টিটিউট কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরপর তাকে শিক্ষার জন্য কলকাতা পাঠানো হয়। ১৯২৬ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা হতে বৃত্তিলাভ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ. এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ. পাশ করেন। স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভের পরপরই পিতা নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরীর নির্দেশক্রমে বগুড়ায় ফিরে আসেন এবং পৈতৃক জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৫৯. পূর্বোক্ত।
৬০. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬

আর এই সময় থেকে তিনি পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পিতা আলতাফ আলী চৌধূরী ও আব্দুল বারী বিএল.এর অনুপ্রেরনায় তিনি ১৯৩০ সালে বগুড়ার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩২ সালে বগুড়া পৌরসভার চেয়াম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মনোনীত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে বগুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘খানবাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩৭ সালে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ায় এসে মুসলিম নেতাদের নিয়ে নবাববাড়িতে একটি আলোচনায় সভায় মিলিত হন। এই আলোচনাসভায় বগুড়া জেলা মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং মোহাম্মদ আলী চৌধুরী জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৩৯ মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৪-১৯৪৫ সালে অবিভুক্ত বাংলার প্রধামন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমূদ্দীনের মন্ত্রীসভার পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়ন লাভ করে পুনরায় বঙ্গীয় আইনপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় অর্থ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মর্ন্ত্রী ছিলেন।[৬১] এই সময় তিনি সাময়িকভাবে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ওপালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তানে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার), ১৯৪৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে কানাডায় এবং ১৯৫২-১৯৫৩ সালে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৩ সালের ১৯ ই এপ্রিল পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল ঘোষণা এবং ৯২ (ক) ধারা জারি করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। ১৯৫৪ সালের ২০ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রদবদল করেন। এই মন্ত্রী সভায় হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আইন মন্ত্রীরূপে মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। তখন জনাব আবু হোসেন সরকার ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই সময় জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভায় পাকিস্তানের দেশরক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

---

৬১. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

১৯৫৪ সালে মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে পাকিস্তানের ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামারিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও পাকিস্তান 'সেন্টো ও সিয়াটো'র সদস্য হয়। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৫-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পরে জাপানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে তিনি জাপানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পদে ইস্তফা দিয়ে বগুড়ায় এসে জাতীয় পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচন প্রার্থী হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনালে মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বগুড়া থেকে ডাক্তার হাবিবুর রহমানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, এই নির্বাচনের পরপরই বগুড়াবাসী কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় মোহাম্মদ আলী বগুড়া এডওয়ার্ড পার্কে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ভাষণ দান করেন। ১৯৬২ সালের ২৩ শে জুন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের আহ্বানে আইয়ুব খানের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ২২ শে জানুয়ারী মোহাম্মদ আলী চৌধুরী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন ১৯৬৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি রাত ৯টা ৫ মিনিট এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন দুই স্ত্রীঃ হামিদা মোহাম্মদ আলী ও আলীরা মোহাম্মদ আলী। এছাড়াও তৎকালীন গণ্যমান্য লোকজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- পিতৃব্য নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী, পূর্বপাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান, নবাবজাদা খাজা হাসান আসকারী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হকসহ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ও অজস্র গুনগ্রাহী।

মৃত্যুর সংবাদ বেতার মারফত প্রচারিত হয়। সমগ্র পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত রাখা হয়। সরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বৃহস্পতিবারের বৈঠক বন্ধ রাখা হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান বেগম মোহাম্মদ আলীকে শোকবাণী প্রেরণ করেন। জাতীয় পরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দীন খান, পূর্বপাকিস্তানের গর্ভনর আব্দুল মোনায়েম খান, পশ্চিম পাকিস্তানের গর্ভনর আমীর মোহাম্মদ খান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ শোকবাণী প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ আলীর জানাজা ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক লোক উক্ত জানাজায় শরিক জন। পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বপাকিস্তানে নিযুক্ত জিওসি, খান (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট্), প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী, খাজা নাজিমউদ্দীন ও উচ্চআদালতের

বিচারকগণসহ সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ এই জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। বগুড়া শহর মোহাম্মদ আলীর পিতৃভূমি। জেলা ছোট হলেও 'বগুড়ার মোহাম্মদ আলী' হিসাবে বগুড়া জেলা তার কল্যাণে সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত ছিল। বগুড়ার নবাববাড়িতে হাজার হাজার মানুষ তার মরদেহের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। স্থানীয় মসজিদে হাজার হাজার মানুষ তার আত্মার শান্তি কামনা করে। একটি বিশেষ ট্রেন যোগে তার মরদেহ বগুড়ায় আনা হয়। পথে বিভিন্ন স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ তার মরদেহ ফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করে। মিছিল সহকারে প্রথমে আলতাফুন্নেচ্ছা খেলার মাঠ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আনা হয়। তারপর বগুড়ায় স্বীয় বাসভবন 'নবাব প্যালেস' এ যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়। তিনি কাউকে না জানিয়ে কোরআন শরীফ পড়তেন। মৃত্যুর সময় তার বুকের কাপড়ের নিচে কোরআন শরীফ পাওয়া যায়।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মোহাম্মদ আলী তার জীবনে অনেক সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন। রাজনীতি ছাড়াও তিনি বহুজনকল্যাণকর কাজ করেছেন। একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি শত শত মুসলমানকে অতিসতর্কতার সঙ্গে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি যখন বগুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, তখন বগুড়া থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অবিভক্ত বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কলকাতার লেক হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং নদীয়ার যক্ষা হাসপাতাল স্থাপন করেন। এছাড়াও তার বহু জনকল্যাণকর কাজের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। মি. জিন্নাহ'র আহ্বানে তিনি শুধু বগুড়া নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেন। মোহাম্মদ আলী বাল্যকাল থেকেই বিনয়ী ও মিষ্টিভাষী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন আস্থাবান কর্মী, কঠোর পরিশ্রমী, খেলোয়াড় এবং বলিষ্ঠ শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন সফল রাজনীতিবিদ। সারাজীবন উদার চিত্ত, সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিদীপ্ত হিসাবে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং সুবক্তা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তার আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, আকর্ষণীয় বক্তৃতাভঙ্গি ও অন্যান্য গুণাবলির কারণে আমেরিকার তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাকে 'রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিভা' বলে অভিহিত করেন।

মোহাম্মদ আলীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বগুড়া শহরের সরকারি জেলা হাসপাতালটি তার নামে উৎসর্গীত। বগুড়ার 'মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল' তার স্মৃতিকে জাগরিত রেখেছে। বগুড়া থেকে সান্তাহারগামী রোড একসময় মোহাম্মদ আলী রোড নামে পরিচিত ছিল। দুপচাঁচিয়া উপজেলায় মোহাম্মদ আলী হাইস্কুল নামে

একটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া তার বাসভবনে পুরার্কীতি সংরক্ষিত হয়েছে। বগুড়ার আভিজাত্য ও গৌরবের প্রতীক হিসাবে তিনি ‘বগুড়ার মোহাম্মদ আলী’ নামে উপমহাদেশের ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে আছেন।

দেশ-বিদেশে মোহাম্মদ আলীর স্মরণে যেসব নামকরণ ও বিনির্মাণ হয়েছে, একনজরে তা হলোঃ

১। মোহাম্মদ আলী বগুড়া রোড, করাচী, পাকিস্তান।

২। মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া ।

৩। মোহাম্মদ আলী গোল্ডকাপ ফুটবল টুনামেন্ট, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

৪। মোহাম্মদ আলী স্পোটিং ক্লাব, বগুড়া

৫। মোহাম্মদ আলী দ্বিমুখী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, বিহার, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

আন্তজার্তিক অঙ্গনে মোহাম্মদ আলী।ঃ

১। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগদান করেন।

২। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া একাত্রীকরণে আন্তজার্তিক কমিটির চেয়ারম্যান।

৩। ১৯৬২ সালে ইন্দোনোশিয়ার বান্দুং- জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের সম্মেলনে যোগদান।

৪। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার, ট্রুম্যান, নিক্সন জন এফ কেনেডির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক।

৫। গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক (উপমহাদেশের সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে চীনের গুরুত্ব ও তার সমর্থক ছিলেন মোহাম্মদ আলী)।

৬। উপমহাদেশের মোহাম্মদ আলীই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি,যিনি পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার সর্ম্পক স্থাপনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখেন।

৭। আন্তর্জাতিক জোট সিয়েটো ও সেন্টো (বাগদাদ প্যাক্ট) এর সদস্য।

৮। সৌদিআরবের বাদশাহর রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে সপরিবার হজ্জ্বব্রত পালন

৯। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর সাথে দিল্লীতে বৈঠক ।

১০। প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে রাষ্ট্রীয় সফরঃ আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মিশর, সৌদিআরব, গ্রিস, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, কোরিয়া, জাপান, লেবানন, সিরিয়া, বাহরাইন, কোরিয়া, জাপান, বার্মা, ভারত প্রাভৃতি।

১। বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়াম্যানঃ ১৯৩২-৩৪।

২। বগুড়া ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান, ১৯৩৮।

৩। অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের কাউন্সিল, ১৯৩১।

৪। বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, ১৯৩৬।

৫। এমএলএ, ১৯৩৬।

৬। বাংলা আইন পরিষদের হুইপ,১৯৪৩।

৭। বাংলা আইন পরিষদের সদস্য, ১৯৪৬।

৮। অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য

৯। অবিভক্ত বাংলার অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৪৬।

১০। আইন পরিষদের সেক্রেটারি,১৯৪৬।

১১। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্তিতিতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন।

১২। অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৩।

১৩। মেম্বার, বগুড়া ডিস্ট্রিক্টবোর্ড, ১৯৩৩-৩৭।

১৪। ডিপুটি চেয়ারম্যান, পদ্মাপাড়া সেন্টাল কো- অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ১৯৩৩-৩৮।

১৫। সদস্য, বেঙ্গল সিল্ক কমিটি, ১৯৩৩।

১৬। সদস্য, বেঙ্গল ওয়াক্ফ বোর্ড, ১৯৩৭।

১৭। সদস্য, ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে এ্যাডভাইজার কমিটি, ১৯৩৭।

১৮। সদস্য, বেঙ্গল এগ্রিকালচার বোর্ড, ১৯৩৮।

১৯। সদস্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোর্ট, ১৯৩৯।

২০। ফেলো, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ১৯৩৯।[৬২]

৬২. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৩-২৬৬

মোহাম্মদ ইয়াছিন (১৯২২-১৯৩৭): চিকিৎসক ও সমাজসেবক। মোহাম্মদ ইয়াছিন ছিলেন বগুড়ার জনপ্রিয় চিকিৎসক। তিনি ১৭ই মে ১৯২২ তারিখে বগুড়া সদর উপজেলায় লতিফপুর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম- শাহ-মাহমুদ। তিনি পিতা-মাতার সর্বকনিষ্ট পুত্র ছিলেন। তার সহধর্মিণী জহুরা ইয়াছিন বগুড়ার নারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী। ডা. মোহাম্মদ ইয়াছিন বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকেই কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাশ করেন। তারপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং যথাসময়ে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। এমবিবিএস. পাশ করার পর বগুড়ায় চিকিৎসাপেশা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।[৬৩] তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ সমাজসেবী। ডাক্তার হিসাবে তিনি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, ন্যাশনাল ব্যাংক ও আরো কয়েকটি ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার এবং টিবি. এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ছিলেন। সরকারি চাকুরি, ব্যবসা ও রাজনীতির পথে পা না বাড়িয়ে তিনি মানবসেবা ও কল্যাণের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি যেমন ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, তেমনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। চিকিৎসা পেশার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহুবিদ কল্যাণের পথে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি লতিফপুর মহল্লায় সমাজের অবহেলিত প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপন করলেন 'মুক ও বধির বিদ্যালয়' যা সর্বসাধারণের কাছে 'বোবা স্কুল' নামে পরিচিত। এটি বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য সারা দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই বোবা স্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠা করেন প্রি-ক্যাডেট নার্সারি ও হাইস্কুল এবং লতিফপুর ফয়জুল্লাহ হাইস্কুল। এই স্কুলের জন্য তিনি প্রায় তিন বিঘা জমি দান করেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল মডেল প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আযিযুল হক কলেজ মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। তিনি বগুড়া সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাংকের সহ-সভাপতি এবং বগুড়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ও বগুড়া মেডিক্যাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছিলেন বয়স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ১০ বৎসরকাল 'স্বাউট সার্জন' হিসাবে এবং পরবর্তীকালে সহকারী কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। শিশুদের সংগঠন কচিকাঁচার মেলার পরিচালক হিসাবেও যথার্থ দায়িত্ব পালন করেন। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সহ সভাপতি ও অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তার নেতৃত্বে রেডক্রিস্টে সোসাইটির সহ সভাপতি অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তার নেতৃত্বে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নিজস্ব ভবন স্থাপিত হয়।[৬৪]

৬৩. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ২১৫

৬৪. পূর্বোক্ত।

এছাড়া ও তিনি পরিবারকল্যাণ সমিতি, বিএভিএস, (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি স্টেরিলাইজেশন), বগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতাল, শাহ সুলতান চক্ষু হাসপাতাল, দুস্থকল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে শ্রম ও মেধা ব্যয় করেন। তিনি বগুড়া ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি হিসাবে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তার প্রচেষ্ঠায় উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ে পাকা ইমারত তৈরি হয়। এছাড়া আর ও কয়েকটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় যক্ষা সমিতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রবীন হিতৈষী সংস্থা, ফতেহ আলী মাজার কমিটি, জেলা ক্রীড়া সমিতি, মজিবর রহমান মহিলা কলেজ, ইয়াকুবিয়া গালর্স হাইস্কুল, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজসেবা পরিযদ। তিনি এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কখনো সভাপতি, কখনো সহসভাপতি, কখোনো, সম্পাদক বা প্রতিষ্টাতারূপে নিজের সর্বাত্নক শ্রম ও সেবা দান করে গেছেন। তিনি প্রতিমাসে গরিব ও মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের মোটা অংকে অর্থ বৃত্তি প্রদান করতেন । ১৯৪৩ সালে মানিকগঞ্জের বন্যায় তিনি দুঃস্থদের সেবা করে অশেষ সুনাম অর্জন করেন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে সম্মানজনক খেতাব' ই- কায়েদে আজম' এ ভূষিত করে। তিনি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবামুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নিজস্ব জমি ও অর্থ দান করে গেছেন। তার বিনম্র আচরণ ও মিতব্যয়িতা জনমানুষের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সাদাসিধা জীবন যাপন করে তিনি যে সততা ও ন্যায়পরায়নতার মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা যুগ যুগ ধরে মানবকল্যাণের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে। ২৪ শে আগস্ট ১৯৯৭ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৫]

<u>মুস্তফা নুরুল ইসলাম ডক্টর (১৯২৫-)</u> অধ্যাপক ও গবেষক। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ সালে তিনি কর্ণপুর বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- কথাসাহিত্যিক সা'দত আলী আখন্দ। তিনি শৈশবে কৈশোরের অনেকগুলো দিন ময়মনসিংহ শহরে অতিবাহিত করেন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন । এই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ দিনাজপুর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর কলকাতায় গমন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ, ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি. ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের সভাপতি হিসাবে ও দায়িত্ব পালন করেন। ড. মোস্তফা নুরুল ইসলাম তার অনবদ্য সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮১ সালে একুশে পদক, ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার,১৯৭৯ সালে ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন।

---

৬৫. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮

এছাড়া তিনি রাজশাহী লেখক পরিষদ পুরস্কার, কুমিল্লা কালচারাল কমপেক্স সম্মমাননা এবং ১৯৯৭ সালে দেওয়ান মোর্তজা পুরস্কারে ভূষিত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ: মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম (১৯৬৯), বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (আনু. ১৯৬৯), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৯৭০), Bengali Muslim Public Opnion (১৯৭৬), উচ্চশিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ (১৯৭৬), সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯৭৭), সমকালে নজরুল ইসলাম (১৯৮৩), আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন (১৯৮৪), আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ (১৯৯৪), সময়ের মুখ, তাঁহাদের কথা (১৯৯৭),। সম্পাদনা : বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (১৯৯০), নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গে (১৯৯১), আবহমান বাংলা (১৯৯৩)।[৬৬]

রজিবউদ্দিন তরফদার (১৮৯১-১৯৫৯): রজিবউদ্দিন তরফদার প্রজাবন্ধু হিসাবে তার কালের বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ১৮৯১ সালে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৭] পিতার নাম- দারাছতুল্লাহ তরফদার । রজিবউদ্দিনের পূর্ব পুরুষগণ দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮৯৬ সালে তিনি নিজগ্রাম নারুলী এমভি. স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং পরে হরিণা এমই. স্কুলে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০২ সালে বগুড়া জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেনীতে ভর্তি হন। এই সময় তার ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। পিতার অকাল মৃত্যু, নিজের বসন্তরোগ এবং আর্থিক সংকটের কারণে তিনি সামাজিক আন্দোলনে এবং নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সত্যিকার অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলেন।

নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদুর অগ্রসর না হলে ও কর্মজীবনে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি রংপুরের বগুলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষকতা করেন। এর পরে সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে নিজ গ্রামে ফিরে এসে শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে নিজগ্রামে নারচীতে একটি এমই. স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং উক্ত স্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিত পদে শিক্ষকতা করেন। স্কুলটি উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ঠ শিক্ষানুরাগী ও জনদরদি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন অর্থাভাব এবং সুযোগের অভাবে গ্রামের অগণিত মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়ে শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম হয় না।

---

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ ২৭০

৬৭. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ১৯৯৪ সালে তিনি 'বগুড়া জেলা মোহামেডান স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্টা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষার পথ সুগম করেন। ১৯১৬ সালে নিজের ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করে ১০০০০ টাকা এবং জনসাধরনের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে নিজগ্রাম নারচীতে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ সালে 'খাদেমুল এনছান' নামে একটি সেবামুলক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল দুস্থদের জন্য সেবা। 'স্টার এসোসিয়েশন' নামে একটি তিনি একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এই পাঠাগারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সংবাদপত্র ও বইপুস্তক পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করে দেশ-বিদেশ সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে 'নারচী ইয়ংম্যানস্ স্টার এসোসিয়েশন' নামে আর একটি সমিতি গঠন করেন। ১৯১৪ সালে বগুড়া জেলার ঘরে ঘরে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের মানসে বগুড়া জেলায় শিক্ষক সম্মেলন নামে নামুজা গ্রামের মৌলভী কাজিমউদ্দিন সহযোগে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। একবার বগুড়ার পশ্চিম অঞ্চলে একটি ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। তখন প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদার সহকর্মীদের সাথে চিড়ার বস্তা মাথায় করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে দুস্থ মানুষের সেবা করেন। তিনি বগুড়ায় একটি কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন। ১৯৩৮ সালে তার বাড়িতে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সভা হয়। সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন মি. মোহাম্মদ আলী, সহসভাপতি ছিলেন রজিবউদ্দিন তরফদার এবং সেক্রেটারি নির্বাচিত হন ওসমান গনি। উক্ত কমিটির উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে বগুড়ার আযিযুল হক কলেজ প্রতিষ্টিত হয়।

রজিবউদ্দিন তরফদার ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন।[৬৮] ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯২২ সালে বগুড়ায় প্রজা আন্দোলনে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করেন এবং প্রজা আন্দোলনকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। প্রজাসাধরনকে উৎপাড়নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি 'বগুড়া জেলা প্রজা সমিতি' গড়ে তোলেন। প্রজাসাধরণের মধ্যে সংগঠনকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে জমিদারবিরোধী জনমত গড়ে তোলেন। এতে করে বগুড়ার জমিদারগণ রজিবউদ্দিন তরফদারের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হয়ে ওঠেন। যে সকল জমিদার তরফদারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন তাদের মধ্যে ছিলেন নবাবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী, খানবাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌর্ধুরী, নাটোর দিঘাপাতিয়ার মহারাজা, শেরপুর উপজেলার শ্যামকিশোর মুন্সি, হিরণার কাশীপ্রসাদ রায় প্রমুখ। কিন্তু অকুতোভয় রজিবউদ্দিন তরফদার প্রজা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে তিনি নবাবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী ও খানবাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী (সাতানী মিঞা) কে পরাজিত করেন।

৬৮. পূর্বোক্ত।

১৯২৪ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বাধীনে স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করে ব্রিটিশ সরকারবিরোধী দলে অবস্থান নেন। এই সময় তিনি প্রজাস্বার্থে একটি আইন পাশ করাতে তিনি সক্ষম হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তার স্বরাজ্য পার্টি গঠনের মাধ্যমে বাংলার হিন্দু-মুসলমান কৃষক জনসাধরণের মন জয় করতে সক্ষম হন। এই সময়ে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের মধ্যে ও অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতার জন্ম হয়েছিল। রজিবউদ্দিন তরফদার তার অন্যতম। ১৯২৫ সালে কৃষক-প্রজাদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় একটি বিরাট কৃষক সম্মেলনে আয়োজনের মধ্যদিয়ে রজিবউদ্দিন তরফদার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্যার আব্দুল রহিম, মৌলানা আকরম খাঁ, শামসুদ্দীন আহম্মেদ। তাদের চূড়ান্ত আলোচনার পর নবগঠিত দলের নাম হয় 'অলবেঙ্গল প্রজা এসোসিয়েশন'। প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির হয় কৃষকস্বার্থবিরোধী টেনেন্সি অ্যাক্ট সংশোধন করা।

১৯৩০ সালে রজিবউদ্দিন তরফদার দুর্বার প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় তিনি 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন স্যার আব্দুর রহিম এবং সেক্রেটারি ছিলেন মৌলানা মহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৯৫৩ সালে তিনি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বগুড়া হতে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে (ভারতে শাসন আইন-১৯৩৫) ভারত শাসন আইনের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি ডা. হাবিবুর রহমানকে নির্বাচনে পরাজিত করেন এবং বঙ্গীয় মহাজনী আইন ও ঋণ লাঘব আইন পাশ করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি ব্যপকভিত্তিক প্রজা সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের নাম দেয়া হয় 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি'। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং সেক্রেটারি নির্বাচিত হন প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদার।

সরকারি দলে থাকার সময়ে তার প্রস্তাবে কাউন্সিলে বিনা ওজরে গাছ কাটা, পুকুর ইঁদার প্রভৃতি আইনসভায় পাশ হয়। সে সময় তরফদার সাহেবকে বাংলার প্রজাগণ 'প্রজাবন্ধু' খেতাবে আখ্যায়িত করে। সে যুগের একটি জনপ্রিয় গাঁথার তার সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে।

'প্রজাবন্ধু রজিব মিয়া ইস্তাহার করে মুসকিল আসান চেরাগ লয়ে ফিরেন ঘরে ঘরে। কড়ি দিয়ে গাছ আর কাটিতে নাহি হবে, ট্যাক্স মাফের হুকুমনামা আমা হতে পাবে।' তিনি 'প্রজাবাহিনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জনসাধরণের অভাব অভিযোগ সরকার ও জনসাধণের গোচরিভূত করাই ছিল তার উদ্দেশ্যে। একসময় এদেশের জমিদার ও মহাজনদের সীমাহীন শোষণ ও নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের

জন্য দরিদ্র প্রজাসাধারণ আসামের বনে-বাদাড়ে পলায়ন করে। এভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আসামের বন-জঙ্গল পরিস্কার করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। ১৯১০ সালে এই সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষে উন্নীত হয়। এই সময় আসাম সরকার কর্তৃক বাঙালিদের আবাসন বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নদী তীর বরাবর দেয়া হয়। বাঙালিরা এই এলাকা অতিক্রম করে অন্যদিকে যেতে পারবে না এরকম নির্দেশ ছিল। এই 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদার আন্দোলন করেন এবং নিজে বাঙালিদের এই লাইন প্রথা ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দেন। নৌকার ওপর অবস্থানকারী বিপুল জনতা পুলিশ পাহারার দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে প্রবল জনস্রোতের মত লাইন প্রথা ভঙ্গ করে আসামে যেয়ে বসতি স্থাপন করল। এই সময় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রবাসী বাঙ্গালিদের বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দান করেন। তিনি প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদারকে অত্যন্ত সুনজরে দেখেছিলেন।

একবার প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যায় বগুড়া জেলা প্লাবিত হলে স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ রজিবউদ্দিন তরফদার, যতীন্দ্রমোহন, সুরেশদাস গুপ্ত ও অন্যান্য কর্মীগণ চিড়ার বস্তা মাথায় নিয়ে দুর্গত মানুষের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন। এর পুরোভাগে ছিলেন দানবীর দেশবরেণ্য আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায়। তৎকালীন অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় রজিবউদ্দিন তরফদার বগুড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে চাল, কাপড় প্রভৃতি সংগ্রহ করে বালুরঘাটে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সাহায্য করেন। তিনি বগুড়া অঞ্চলে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষও দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[৬৯] আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের সংগঠকগণ সমিতির সাহায্য নিয়ে রজিবউদ্দিন তরফদার ও যতীন্দ্রমোহন রায় দুঃস্থ মানবের সেবাদান করেন। ১৯১৫ সালে রজিবউদ্দিন তরফদার বগুড়া জেলাবোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় থেকে ১৯৫৯ সালে মৃত্যুর পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত তিনি বগুড়া জেলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি নয় বৎসরকাল বগুড়া লোকালবোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে বগুড়ার রাস্তাঘাট উন্নয়ন, জলকষ্ট নিবারণ, মানবিক প্রতিষ্ঠান গঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন।
তিনি আট বৎসরকাল বগুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান, চার বৎসরকাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকের ডিরেক্টর, চার বৎসর ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির সদস্য এবং এছাড়াও বগুড়া স্কুলবোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

রজিবউদ্দিন তরফদার ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। তার ভাষণ শোনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে জনসাধারণ আসতো। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধরনকে মোহিত ও আবেগে উচ্ছ্বাসিত করে ফেলতেন। দলে দলে জনসাধারণ সাক্ষাতের জন্য তার বাসস্থান ভিড় জমাতো।

৬৯. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৬

রজিবউদ্দিন তরফদার শুধু রাজনীতিবিদ নন, একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। ১৯৪০ সালের প্রথমভাগে বগুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান খানবাহাদুর মোহাম্মদ আলীর সাথে পরামর্শ করে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় তিনি 'টীপসহি' উঠানোর আন্দোলন করেন।

রজিবউদ্দিন তরফদার 'প্রজাবাহিনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৭০] প্রজা সাধারণের অভাব অভিযোগ সরকার ও জনগনের নিকট গোচরিভূত করাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্যে। বগুড়ার প্রাথমিক যুগের সংবাদপত্র হিসাবে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ন ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। বগুড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ (পরবর্তীকালে পূর্বপাকিস্তানের মন্ত্রী এবং ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর হাতে শহীদ) ফজলুল বারী এই প্রজাবাহিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রজিবউদ্দিন একজন দেশপ্রেমিক ও প্রতিভাধর প্রজাসংগঠক। তিনি প্রজাসাধরনের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এই সংগঠক ও জননেতা ৪টা সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ তারিখে শক্রবার বেলা চার ঘটিকায় ঢাকায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

শেখ আব্দুল আজিজ কবিরাজ (১৮৮১-) : রাজনীতিবিদ। ১৮৮১ সালে বগুড়া সদর উপজেলার নগরগ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে মামাবাড়ি বেড়েরবাড়ি বীরভিটায় গুরুর রাখাল হিসাবে কাজ করেন। তার পিতা শেখ ইব্রাহিম এবং মাতা- মাগরুবন নেছা।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ তেনম পাননি। কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রকাশ তার বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি বীরভিটা গ্রামে রাখালবালকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারী হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি শেরপুর উপজেলার ডিজে. হাইস্কুলের মুসলিম ছাত্রদের নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন শিক্ষাজীবন শেষে ১৯২১ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ।[৭১] জীবনে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সারে বগুড়া পশ্চিমাঞ্চলে একটি্ বড় রকমের বন্যা দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৯২২ সালে ধুনট উপজেলার খেলাফত ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে বগুড়া জেলা যুবক সমিতি গঠন করেন। তিনি এই যুবক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জেলা ব্যাপী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি তৎপর ছিলেন। এসময় বর্ধমানে বন্যা দেখা দিলে বাড়িবাড়ি থেকে চাউল, কাপড় সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। ভারতের আরা জেলায় শাহদাবাদে গো-কুরবানি উপলক্ষে মুসলমানদের হত্যাকান্ড তিনি সরেজমিন তদন্ত করে এবং দুঃস্থা মানুষদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন।

৭০. সোহেল রানা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৭১. আমানউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪

গাছ কাটা, পুকুর তৈরি করার অধিকার, জমিদারিপ্রথার বিরোধসাধন, সুদখোর মহাজনদের উচ্ছেদ, ভূমিহীন কৃষিকদের মধ্যে বিনামূলে জমি বন্টন, পাটের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি প্রজাআন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। আসামের 'লাইনপ্রথা' ও 'বাঙ্গালখেদা' আইনের বিরুদ্ধে তিনি প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদারের সাথে আন্দোলন পরিচালনা করেন । বগুড়া জেলা পাটচাষী সমিতি ও বঙ্গআসাম পাটচাষী সমিতির সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ সালে বালুঘাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিরে দুর্গত মানুষের মধ্যে দ্বারা দ্বারে ঘুরে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রবাদি সংগ্রহ করে বিতরণ করেন। কবিরজ শেখ আব্দুল আজীজ মূলত সারা জীবন দেশের কাজ করেছেন, সেই সাথে দরিদ্র প্রজাসরধারণের দাবি-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে যে নেতৃত্বদান করেছেন তার জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি তার এলাকায় গো কোরবানি প্রতিষ্ঠা কমিটি সেক্রেটারি হয়েছিলেন। কবিরাজ আব্দুল আজিজ ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জলিয়ানওয়ালাবাগে লর্ড ডায়ার কর্তৃক সংঘটিত নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ পরিদর্শনের জন্য অমৃতসর গমন করেন। ১৯২০ সালে আসামের কুখ্যাত 'বাঙ্গালখেদা' আইনের লাইনপ্রথা উচ্ছেদের জন্য আসামের মাইনকার চরের ও পানিরহাটে ভাটিয়ালী প্রজা সম্মেলনের বাংলার প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে ভারতের ছোটনাগপুরে নিখিলভার খেলাফত ও কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে সিরাজগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক বঙ্গীয় কংগ্রেস অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সমর্থনে যোগদান করেন এবং গাছকাটা অধিকার আইন স্থাপনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে তিনি জেলা রিলিফ কমিটির সহসম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩১ সালে নিজগ্রামে সমবায় ব্যাংকের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।[৭২] এই সময় তিনি বিয়েতে যৌতুক বা পণপ্রথা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে শিয়ালীহাটে কৃষকপ্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। বগুড়ায় আযিযুল হক কলেজ স্থাপনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সাল থেকে উক্ত কলেজের দুরদুরান্তের ছাত্রদের জন্য জায়গিরের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি 'কলেজ স্টুডেন্ট লজিং' কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। এভাবে তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে দেন।

১৯৪৪ সালে বগুড়া জেলা কৃষকপ্রজা সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি কলকাতায় নিখিলবঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালে বেড়েরবাড়ি বীরভিটায় একটি 'কালাজ্বর নিরাময় কেন্দ্র' স্থাপন করে প্রায় ২৪০০ রোগীর চিকিৎসাসেবার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন।[৭৩]

---

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৫

৭৩. আখতার উদ্দিন মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১০

১৯৫০ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগের সহসম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি নিষ্ঠার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান আমলে শেষের দিকে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পিডিএম). গঠিত হলে তিনি উক্ত সংগঠনের বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে বগুড়া পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, মহামারীতে তিনি দুঃখী মানুষের সাথী হিসাবে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমৃত্যু দেশ এবং জনসেবায় নিজেকে উজাড় করে দেন। তিনি ছাত্র-যুব আন্দোলন, আঞ্জুমানে ওলাময়ে বাংলা, জমিয়তে জলসা ও আহলে হাদিস আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। খেলাফত আন্দোলন ও কংগ্রেস আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। জমিদারবিরোধী আন্দোলন ও প্রজাস্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ যুগে বাংলাপ্রদেশ ও নিখিলভারতীয় বিভিন্ন সম্মেলন ও আন্দোলনে বগুড়ার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তিনি নিজ গ্রামে বেড়েরবাড়ি হাইস্কুল, জামে মসজিদ এবং আহলে হাদিস কতোয়ালি জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদার ও কবিরাজ আব্দুল আজিজ এসময় বগুড়া জেলায় দুর্বার প্রজাআন্দোলন গড়ে তোলেন। এজন্য তিনি বগুড়ার জমিদারদের রোষানলে পড়েন। কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হননি।

<u>সৈয়দ নবাব আলী (১৮৯২-১৯৬৭)</u> : আইনবিদ ও সমাজকর্মী। বগুড়া বারের খ্যাতনামা আইনবিদ সৈয়দ নবাব আলী ১৮৯২ সালে বগুড়া সদর উপজেলার টেংরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ কাশেম আলী। পিতামহের নাম সৈয়দ নেওয়াজ আলী। তিনি ১৯২৩ সালের ১৯ জুলাই বগুড়া বারে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন মেধাবী। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে পরচিতি লাভ করেন। তিনি বগুড়া বারের নেতৃত্বস্থানীয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে বগুড়া বারের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পর পর তিন টার্মে উক্ত পদে পুনর্নির্বাচিত হয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে প্রগতিশীল ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। বগুড়া পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমলীগ বিরোধী বগুড়ায় সংযুক্ত নাগরিক কমিটি গঠিত হলে তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন।[৭৪] তার নেতৃত্বে উক্ত কমিটি তৎসময়ে বগুড়ার পৌর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং সে সময়ে উক্ত ঘটনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে প্রখ্যাত আইনজীবীদের অনেকে তার সহকারী হিসাবে কাজ করে পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনে সুনাম অর্জন করেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত আইনজীবি এএইচ. খন্দকার, আনম. গাজীউল হক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩১

সৈয়দ নুরুল হোদা (১৯১৮-১৯৯০) : সমাজসেবক। সৈয়দ নুরুল হোদা ১৯১৮ সালে বগুড়া জেলার গুনাহার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সৈয়দ নজির আলীর বাসস্থান ছিল সোনাতলা থানার গড়ফতেপুর গ্রামে। তবে তিনি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট হতে তার পূর্বপুরুষগণ বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। তারা ছিলেন পীর বংশের। তাই প্রতি পুরুষেই তাদের বাসস্থান পরিবর্তিত হত। ১৯১৬ সালে তার পিতা সৈয়দ নাজির আলী ঐতিহাসিক কামরূপরাস নিলাম্বর রায়ের রাজধানীর ধ্বংসস্তুপের ওপর বসতবাড়ী নির্মাণ করেন। নুরুল হোদা কৈশোরে পিতৃহারা হন। তার মাতার নাম সৈয়দা আখতারুন্নেছা।

তিনি হুগলীর হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে প্রথম উচ্চশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' কাগজে প্রায় নিয়মিত লিখতেন। দেশ বিভাগের কিছুকাল পূর্বে একটি সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে দেশ ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জনসেবার জন্য এলাকায় অনেক 'সংস্থা' গড়ে তোলেন। পেশাগত জীবনে ছিলেন আয়কর উপদেষ্টা। আয়কর বার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর কৃষকদের জন্য 'অক্ষর শেখা' আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক কৃষককে তিনি সাক্ষর করে তোলেন। ১৯৩৬ সালে কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় 'যুবশক্তি' নামে একটি মনোজ্ঞ ও প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে সে যুগের যুবকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সৈয়দ নুরুল হোদা পিতা-মাতার স্মৃতিস্মরণে নিজস্ব ৩০ বিঘা জমি ও অর্থ-সম্পদ দান করে গড়ফতেপুর গ্রামে 'নাজির-আখতার কলেজ' স্থাপন করেন। এই কলেজ নির্মাণে স্থানীয় জনসাধারণও বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। তিনি ১৯৬০ সালে বগুড়ায় 'আঞ্জুমানে কাদেরিয়া' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রতি চন্দ্রমাসের ১১ তারিখে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান হতো। তিনি ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেন । তিনি ন্যাপের বগুড়া জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ন্যাপের প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পার্টি গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[৭৫]

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩২

তিনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন মনীষী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দী, রজিব উদ্দিন তরফদার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎ চন্দ্র বসু, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যও লাভ করেছেন (প্রায়ই শান্তিনিকেতনে গমন করতেন)।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাকে আওয়ামীলীগের পক্ষ হতে গাবতলী-সারিয়াকান্দি আসনে এমএনএ. পদে মনোনয়ন দেয়া হয়। পরে কোনো অজ্ঞাত কারণে উক্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তথাপি তিনি একজন সেবক হিসাবে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বগুড়ায় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সৈয়দ নুরুল হোদা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অন্যতম সংগঠন হিসাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বগুড়ার বন্দর সোনাতলায় তার নেতৃত্বে একটি সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১১ই মে পাকবাহিনীর অত্যাচার ও সন্ত্রাসের মুখে দেশ ত্যাগ করেন। স্ত্রী, পুত্রসহ পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার পথে তিনি হিলি সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা দু'পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বগুড়ার প্যারীশংকর স্ট্রিটে তার বাসভবন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা ভস্মীভূত হয়। তিনি ০১/১২/১৯৯০ তারিখে বগুড়ার মৃত্যবরণ করেন।

ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী (জ. ১৯৩৯ খ্রি.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

এ কে এম ইয়াকুব আলী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ০১ আগস্ট বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার হাটধুমা গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব বাসতুল্লাহ শাইখ এবং তার মাতার নাম ফাতিমা ওরফে কেওয়া। তাঁর পিতামহ শাইখ শামীর।
এ কে এম ইয়াকুব আলীর পিতা-মাতা ও পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু , ধার্মিক ও সত্যাশ্রয়ী। ইয়াকুব আলীরা চার ভাই ও তিন বোন। তন্মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় ।

শিক্ষা জীবন

এ কে এম ইয়াকুব আলীর নিজ গ্রামের হাটধুমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং একবার পড়ে মনে রাখার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। প্রত্যেক শ্রেনী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি প্রাইমারি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাইমারি পাসের পর তাঁকে ভাটরা নিউস্কিম মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়া হয়। এই মাদরাসাতেও তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় অনুরূপ স্থান অধিকার করেন। তাঁর উস্তাদ মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর সাহেবের পরামর্শক্রমে পিতা- মাতার দোয়া নিয়ে বগুড়া শহরের সন্নিকটে

জোড়া ওল্ডস্কিম মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এ মাদরাসা থেকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নবম স্থান এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে প্রথম গ্রেডের সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুস্তাবিয়া মাদরাসা থেকে প্রথম শ্রেনীতে হাদীস শাখায় কামিল বা মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ও অংক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আযিযুল হক কলেজ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বি এ প্রথম বর্ষে ভির্তি হন। তিনি ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে আযিযুল হক কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর মেধাবৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এমএ পূর্বভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে এম.এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁরই প্রিয় শিক্ষক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত ও গবেষক প্রফেসর ড. সফিউদ্দীন জোয়ার্দারের তত্ত্ববধানে Aspects of socity and Culture of the Barind. 12000-1576 A.D’ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় থিসিস করা অভিসন্দর্ভ রচনা করের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

এ কে এম ইয়াকুব আলী এম এ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পূর্বেই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে বগুড়া আযিযুল হক কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। নভেম্বর মাসে ফল প্রকাশের পর তিনি বিবাহাবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত জয়পুরহাট কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উক্ত বিভাগে স্থায়ী লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি কর্মজীবনে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন বছর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৯৯ পর্যন্ত কলা অনুষদের নির্বাচিত ডীন হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা, কর্মদক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অদ্যাবদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক ও আইবিএস ফেলোসহ সর্বমোট ১৪ জন পিএইচ.ডি ০৫ জন এম.ফিল ০৭ জন, মাস্টার্স থিসিস সম্পন্ন করেছেন। তিনি সৎ, নীতিবান ও আদর্শমতি শিক্ষক

হিসেবে অবসরগ্রহণের পরও তার নিরলস্ জ্ঞান সাধনা, গবেষণা ও ইতিহাস চর্চায় অন্যান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'প্রফেসর ইমেরিটাস' পদে নিয়োগ দান করে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং তিনি অদ্যাবধি উক্ত পদে নিয়োজিত থেকে এখনও জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় সর্বদা তৎপর রয়েছেন।

গবেষণা কর্ম: এ.কে.এম ইয়াকুব আলী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার সাথে সাথে গবেষণা কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪৩ বৎসর শিক্ষকতা জীবনে একজন সফল শিক্ষক হওয়া ছাড়াও ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুদ্রা, শিলালিপি এবং স্থাপত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান ও আকর গবেষণাধর্মী তাঁর ১২টি গ্রন্থ বাংলা একাডেমী, ইসলামীক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পঠিত হয়েছে। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে তাঁর বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশ-বিদেশে আন্তর্জাতিক মানের ত্রিশটির বেশি সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর মেধা, মনন ও পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং পন্ডিত মহলে প্রশংসিত হয়েছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহ হলো : ১. মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা। ২. মহানবী ও ইসলাম। ৩. আলোকিত পথ। ৪. আরব জাতীর ইতিহাসচর্চা। ৫. Select Arabic & Persian Epigraphs. ৬. মুসলিম মুদ্রা হস্তলিখন শিল্প। ৭. রাজশাহীতে ইসলাম। ৮। একটি বংশ; ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ৯। Except of Society & Culture of the Varendra, 1200 AD. ১০. Jihad in Islam : Its Implications. ১১. বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য। ১২. মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা খিলাফত ও ভারত উপমহাদেশ।

অন্যান্য কর্মপ্রয়াস: এ.কে.এম এয়াকুব আলী একজন মেধাবী ছাত্র, কৃর্তি শিক্ষক এবং নিষ্ঠাবান গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধান ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত এবং সামাজিক নানা কর্মকান্ডে তিনি অঞ্চলভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে অত্যান্ত সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সে সবের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয়, তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সিনিটের সদস্য ছিলেন (১৯৭৪-১৯৮৩)। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট (কুষ্টিয়া) সদস্য (১৯৯৬-১৯৯৮) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সভাপতি (২০০২-২০০৪) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ ইতিহাসের আজীবন সদস্য এবং বর্তমানে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি মহাপরিচালক, সেন্টার ফর

ইসলামীক রির্চাস বাংলাদেশ, রাজশাহী, প্রধান সম্পাদক- ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী এবং জীবন সদস্য, ইসলামীক আর্ট অর্গানাইজেশন, ঢাকা। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বগুড়া জেলা সমিতি প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলার শিল্পকলার (Bengal Art) উপর বগুড়ায় অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তজার্তিক কংগ্রেসে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, ঢাকা (The International Central for study of Bengal Art, Dhaka). তাঁর শিল্পকলাচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'অনারারী ফেলো'র (Honourary Fellow) পদ দিয়ে সম্মানিত করেছে।

উপরন্ত কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে নিম্নের আন্তর্জাতিক জীবন পরিচিত গ্রন্থে তাঁর জীবন কর্ম স্থান পেয়েছে:

Man of Achievement International Biographical Center, Combridge, 15th edition, 1993.

Five Thousand personalities of the word, in American Biographical Institute, INC 6th edition.

কর্মের স্বীকৃতি:

ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী প্রায় ৪৫ বৎসর ধরে শিক্ষকতা, গবেষণা, গবেষণা তত্ত্বাবধান ও গ্রন্থ রচনা, সমাজসেবা, মানবসেবাসহ নানা মহৎ কর্মের সহিত অত্যান্ত নিরলসভাবে নিয়োজিত রয়েছে। স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা লাভের যে গৌরব অর্জন করেছেন তা এখানে তুলে ধরা হল।

'মহানবী ও ইসলাম' গ্রন্থের জন্য ঢাকার সিরাত একাডেমী পুরস্কার, ১৯৭৪।

সার্বিক কর্মের মূল্যায়ন হিসেবে রাজশাহীস্থ বরেন্দ্র একাডেমী পদক, ১৯৮৩।

'মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প' গ্রন্থের জন্য বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, ১৯৯০।

অত্যন্ত সফলভাবে পিএইচডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মাননা, ১৯৯৪।

অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পিএইচ.ডি গবেষণা তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মাননা, ১৯৯৪ ও ২০০১।

শিক্ষা ও গবেষণার অনন্য অবদানের জন্য ঢাকা থেকে জাতীয়তাবাদী শিশু পদক লাভ, ২০০৩।

শিল্পচর্চা ও গবেষণার সামগ্রিক কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গীয় শিল্পকলাচর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের (ঢাকা) ২০০৭ অনারারি ফেলো সম্মাননায় ভূষিত।[৭৬]

৭৬ মোঃ আবুল ফজল, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে বগুড়া জেলার মাদরাসাসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব। অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পুন্ড, পৃ. ২২২-২২৫

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

বগুড়া জেলা উত্তর বঙ্গের একটি প্রাচীন জনপদ। করতোয়া নদীর তীর সংলগ্ন যে ভূমিটি ছিল হিন্দু আমলের গৌড়েশ্বরের রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন। আজও প্রাচীরঘেরা নগরের ভগ্নাবশেষ যার স্মৃতি বহন করছে। বৌদ্ধ সভ্যতার স্বারকচিহ্ন গোকুলের বৌদ্ধস্তুপ এবং বর্তমান বিহার নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনে এবং কালের করাল গ্রাসে যা বিলীন প্রায়।

শুধু যে প্রাচীনকালে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নয়। মধ্যযুগেও বগুড়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলে এসেছেন পাঠান সম্রাট শেরশাহ। যার নামে হয়েছে বর্তমান শেরপুর উপজেলা এসেছেন মোঘল সম্রাট শাহজাহান যার নামে হয়েছে বর্তমান শাহজাহানপুর উপজেলা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে জাহাঙ্গীরাবাদ। শাহজাদা সুজার নামে সুজাপুর গ্রাম। সেন বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীন আনেন তাঁর মৃত্যুর পর ১২০৬ সাল থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত ১৭ জন মুসলিম শাসক এ অঞ্চলে শাসন করেন। সর্বশেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র নাসির উদ্দীন বলবান ওরফে বগ্‌রা খান বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। বলা হয়ে থাকে “বগ্‌রা” খানের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম বগুড়া হয়। এখানে পাওয়া গেছে সুলতানি আমলের মুদ্রা, পাওয়া গেছে জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দুযুগের নানা মূর্তি ও পুবার্কীর্তি। যা মধ্যযুগের উজ্জল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্বাক্ষর বহন করে

আধুনিক কালের বগুড়াও কম গৌরবমন্ডিত নয়। বর্তমানে সোডিয়াম লাইট দীপ্ত এক আলোক ঝলমল করা আধুনিক নগরী। উত্তরবঙ্গের রাজধানী নামে খ্যাত তথা সমগ্র বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদর ‘উত্তরের সদর দরজা’ হচ্ছে হাজার বছর পূর্বের জনবসতি পুন্ড্রবর্ধন খ্যাত বগুড়া।

করতোয়া, যমুনা, ইছামতি, বাঙ্গালি নগর, চন্দ্রাবর্তী সহ অসংখ্যা ছোট-বড় খাল-বিল বিধৌত এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা প্রনালী, বাসগৃহ, খাদ্য, জীবিকা ইত্যাদিতে প্রভাবান্বিত করেছে। এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এ জনপদ বাসীর মনও মননের উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি জেলার ভূ-প্রকৃতিই এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নির্মান করেছে, সমৃদ্ধ করেছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, আদি অস্ট্রলয়েড যা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, অ্যালপাইন প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। পুন্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে জানা যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা পার হয়ে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে অস্ট্রিকভাষী

আদি অস্ট্রালয়েডরা। তারপর এখানে তিস্তা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত অঞ্চলে তারা গড়ে তোলে কৃষি ভিত্তিক গ্রামীন সভ্যতা। তবে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঐতিহাসিক যুগের নানা পর্বে উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন এই বগুড়া জনপদটিতে বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর আগমন অব্যাহত থেকেছে। কখনো রাজনৈতিক-সামরিক কারনে আবার কখনো অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক উপলক্ষে একের পর এক নতুন জনস্রোত এসেছে এ প্রাচীন জনপদ বগুড়ায়। আর এভাবেই সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে নানা আদিম জাতি, উপজাতি বর্ণশ্রেণী ও বিচিত্র নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে এখানকার চিরায়ত জনসমাজ।

গবেষণাকাল (১৯৪৭-২০০০) বগুড়া ছিল প্রধানত মুসলমান ও হিন্দু অধ্যুষিত। সংখ্যার বিচারে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তবে সমগ্র জেলার হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ধর্মীয় তথা সামাজিক নিয়মনীতি প্রভাব রাখে। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায়, বহুবিবাহ না থাকায় এবং বাল্য বিবাহের কারনে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার অধিক হওয়ায় একই আবহাওয়ায় একই পরিবেশে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করেও হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধি মুসলমানদের চেয়ে ছিল কম। বিশ শতকের মধ্যে ভাগেয় জেলার অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করতো। জেলার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, শিল্প, বাণিজ্য, পেশাজিবী ও অন্যান্যদের সংখ্যা পূর্বে কম থাকলেও যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমেয় বৃদ্ধি পাচ্ছে নগর ক্রেন্দ্রিক জীবন।

মধ্যযুগের অবক্ষয়ের কালেও বগুড়া জেলায় দেশীয় সনাতন শিক্ষার একটি বিস্তৃতধারা বিদ্যমান ছিল। তবে সময়োপযোগী ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে প্রাচীন ধারার টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা ক্রমাগতভাবে ক্ষীনতর হতে থাকে। অবশেষে বিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধের উপকণ্ঠে এসে তা বিলুপ্তির পথে চলে যায় এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। গবেষনাকালে জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ও বিশেষ শিক্ষার (কারিগরি, প্রশিক্ষণ, ব্যিালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা ও নারী শিক্ষা) উন্নয়ন ঘটে। বর্তমানেও শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে উর্ধ্বমুখী। শিক্ষার এই হার বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেলায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার, মুদ্রণযন্ত্র, সভ্যসমিতি ও সংগঠন আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই ছিল অগ্রগামী। মুসলমানগন তাদের রক্ষনশীল মনোভাবের দরুন নানাভাবে পিছিয়ে ছিল। তবে গবেষনাকালে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, আইনজীবি, ডাক্তার, শিক্ষক প্রমুখদের সৃষ্টি হয়। যারা নানাভাবে তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে

জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জেলার অধিবাসীদের পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটতে থাকে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক শিক্ষায় সম্প্রসারণের ফলে জেলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এখানকার অধিবাসীগন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এবং এর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। সর্বোপরি আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে জেলার অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এখানকার মানুষদের আঞ্চলিক ভাষা ছিল উত্তরবঙ্গীয় উদীচ্য, বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত। গবেষনাকালে সাধারণত পারিবারিক বা একান্ত পরিমন্ডলে শুধুমাত্র কথ্যরূপে এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হতো। তবে লেখ্য ও সর্বসাধারন্যে কথ্যরূপে চলিত ভাষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখ্য হিসেবে সাধু ভাষায় ব্যবহার ছিল লক্ষনীয়।

গবেষনাকালে দেখা যায় যে এখানকার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চিন্তা ও চেতনায় তৎকালীন মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কথাই অধিকতর ফুটে উঠেছে। কবি সাহিত্যিক তাদের লেখনীতে সামাজিক কুপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধে লেখেছেন। তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান সামাজিক ভেদ প্রসঙ্গ, নারীদের অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির কথা এখানকার সাহিত্যিকগন তাদের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখায় তুলে ধরেছেন। গবেষনাকালে এখানকার লেখকদের প্রায় সকলেই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং মাতৃভাষারূপে বাংলার মর্যাদার প্রশ্নে একমত ও অটল ছিলেন; জাতীয় জীবন ও সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে সর্বজনীন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

গবেষনাকালে এ অঞ্চলের বাড়িঘর পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ায় দুভাগে বিভক্ত। পূর্ব বগুড়ায় বাঁশ, ছন ও টিনের বাড়িঘর বেশি। এক্ষেত্রে বাঁশ, ছন, চাটাই, পাটখড়ি বা টিন দিয়ে দোঠালা বা চারচালা বাড়িঘর চোখে পড়ে। অন্যদিকে পশ্চিম বগুড়ায় অধিকাংশ বাড়িঘর মাটির। দোতলা মাটির ঘর এ অঞ্চলে বেশি

চোখে পড়ে। বাড়ি নির্মানের ক্ষেত্রে মোটা করে মাটির দেয়াল নির্মাণ করে তার ওপর চারচালা টিন বা ছন ব্যবহার করা হয়।

শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয় বাড়িঘরের পরিবেশগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায় বগুড়ার দু অঞ্চলে। পূর্ব বগুড়ার অধিকাংশ বাড়িঘর একটি বাড়ির সঙ্গে আরেকটি বাড়ি সংযুক্ত। এ ধরনের বাড়িকে যৌথবাড়ি বলে। এ অঞ্চলে এমন পাড়াও চোখে পড়ে এক বাড়িতে পা দিলে পুরো পাড়া ঘুরে আসা যায়। যৌথ বাড়িতে প্রতিটি বাড়ি একে অপরের সঙ্গে লাগোয়া হওয়ায় বাড়ির ভেতরে ও বাইরে থাকে দীর্ঘ উঠান। সংযুক্ত বাড়িগুলো সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গড়ে উঠে।

গবেষনাকালে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো এখানকার মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। ভাত হিসেবে আউশ, আমন ধানের মোটা চালেরই বেশি প্রচলন ছিল। তবে চাউল দুর্মূল্য হলে সাধারণত জনগন গম, চিনা ও কাউনের ভাত, কালাই সিদ্ধ, গমের রুটি ইত্যাদি খেতো। সাধারণভাবে লোকেরা দুপুর ও রাতে গরম ভাত এবং সকালের নাস্তা হিসেবে খেতো গরমের দিনে পান্তা এবং শীতের দিনে করকরা (বাসি ভাত)। শহর এলাকায় বিভিন্ন পেশাজিবী ও বিশেষ করে হিন্দু পরিবার রুটি, পরোটা, লুচি, ভাজি, মিষ্টি এবং চা দিয়ে নাস্তার কাজ সারতো। জনসাধরণের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন খুব বেশী ছিল না। তবে জামাই বা আত্মীয়-স্বজন আসলে সাধারণত মুরগি জবেহ করা হতো। অধিকাংশ পরিবারই গরু পালন করতো ফলে ধনী-গরিব নির্বিশেষে দুধ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এমনকি যাদের বাড়িতে গরু ছিল না তারাও সাধ্যমতে দুধ কিনে খেতো। ধনীদের শখের বা আতিথেয়তার খাদ্য তালিকাতে ছিল কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানি, জর্দা, পরোটা, লুচি, নিমকি, হালুয়া, ফিরনি, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি।

গবেষনা সময়কালে দেখা যায় বগুড়া জেলায় পোশাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুসলমান পুরুষরা সাধারণ লুঙ্গি পরে। লুঙ্গি বিচিত্র রঙের দেখা যায় কেবলমাত্র বয়স্ক কিছু লোক সাদা রঙের লুঙ্গি ও টুপি পড়ে। লুঙ্গি, গেঞ্জি, এবং গামছা এ জেলায় লোকদের সাধারণ পোশাক। শীতকাল ছাড়া দরিদ্র ব্যক্তিরা খুব কমই লুঙ্গির অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করে। শীতকালে বাহিরে বের হবার সময় তারা গেঞ্জি, সোয়েটার, শার্ট ও চাদর ব্যবহার করে। সাধারণত হিন্দুরা ধুতি পরে ৪ গজ থেকে ৫ গজ মাপের বস্ত্র খন্ডটিকে তারা কোমরের চারপাশে জড়িয়ে পরিধান করে। তবে বর্তমানে সাধারণভাবে সকলেই লুঙ্গি পরিধান করে। মধ্য ও উচ্চ-বিত্ত শ্রেণীর মুসলমান অধিবাসীরা পায়জামা, শার্ট ও পাঞ্জাবী পরিধান করে। অবশ্য গৃহে লুঙ্গিই তাদের সাধারণ পোশাক। দরিদ্র গ্রামবাসীরা খুব কম ক্ষেত্রেই জুতা পরত। পূর্বে তারা খরম ব্যবহার করলেও বর্তমানে স্যান্ডেলই ব্যবহার করে। তবে এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির

সাথে সাথে পোশাক, পরিচ্ছেদই আধুনিকতার ছোয়া লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানকালে যুগোপযোগী চলনসহ পোশাকই পড়ে সামর্থ্য অনুযায়ী।

গবেষনাকালে এ অঞ্চলে নানা সামাজিক উৎসবের প্রচলন দেখা যায় উল্লেখযোগ্য উৎসববলীর মধ্যে হলো মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব যেমন 'মুহররম' মাসের দশম তারিখে হযরত আলী (রা:) পুত্র ইমাম হোসেন কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। এ দিনটিকে উপলক্ষ্য করে পালিত হয় 'মহররম'। এই দিনটিকে আশুরা বলে। মুসলমান সমাজের একটি বড় উৎসব হচ্ছে শবে বরাত। চন্দ্র বছরের শাবান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতই হচ্ছে শবে বরাত। গবেষনাকালে ভাগ্যরজনীর এই রাতে এ অঞ্চলের মুসলমানগন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে কাটায়। রোজাশেষে মুসলমানগন ধর্মীয় প্রথা অনুসারে ঈদ-উল ফিতর এবং যিলহজ মাসের দশ তারিখে ঈদ-উল-আযহা পালন করে থাকে। এ দুটি উৎসবই হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। গবেষনাকালে এ অঞ্চলের লোকেরা ঈদ-উল-ফিতর কে 'রোজার ঈদ' বলে অভিহিত করে এবং ঈদ-উল-আযহা কে 'কুরবানীর ঈদ' বলে অভিহিত করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবগুলো অধিক জাকজমকপূর্ণ। দুর্গাপুজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, বাসন্তীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, পুষ্পদোল উপলক্ষে এ জেলায় স্থানে স্থানে বিশেষ আমোদ উৎসব হয়। এছাড়া ১লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে "হালখাতা" উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ পার্বন উৎসব, ইছালে সওয়াব উৎসব, নৌকা বাইচ উৎসব। উৎসব গুলোকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এখানকার মানুষদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল সমৃদ্ধময় গবেষনা সময়কালে এখানে নাগরিক পরিমন্ডলে পরিবেশিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও আধুনিক কাব্য সঙ্গীতের চর্চা যেমন ছিল তেমনি বিপুল জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা আর হাসি-কান্নার মূর্ত প্রতীক হয়ে বিস্তৃত ছিল বাউল গান, মাজারের গান, কর্মসংগীত গান, গাইনের গীত, লোকগান, মেয়েলী গীত, বিয়েরগীত, বিরহগীত, জারিগান, সারিগান ও নারী ও পুরুষের পালাগান প্রভৃতি লোকসঙ্গীত। এ অঞ্চলের জনসাধরণের চিত্তবিনোদন ও সমাজ সচেতনতার অংশ হিসাবে নাট্য ও যাত্রার প্রসার ঘটেছিল। এখানকার প্রচলিত ছড়া, ধারা, প্রবাদগুলোর মধ্য দিয়ে এ জনপদবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বিষয়ের প্রতিফলন ছিল লক্ষনীয়। ঐতিহ্যবাহী জনপদ হিসাবে লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বগুড়া ছিল সমৃদ্ধ।

গবেষনাকালে লক্ষ্য করা যায় বগুড়া হলো সংবাদ পত্র প্রকাশের দিক থেকে উত্তর জনপদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় স্থানে রয়েছে। বগুড়াকে বলা হয় সংবাদ পত্রের নগরী। এ জেলা থেকে প্রকাশিত

সবচেয়ে প্রচারিত দৈনিক হলো ‘দৈনিক করতোয়া’। এছাড়া প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরো দৈনিক চাঁদনী বাজার, দৈনিক বগুড়া, দৈনিক আজও আগামীকাল, দৈনিক সাতমাথা, দৈনিক উত্তরকোণ, দৈনিক উত্তরবার্তা, ইত্যাদি। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এ অঞ্চল ঐশ্বর্যমন্ডিত।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আমাদের গবেষনাকালে এ ঐতিহ্যবাহী জেলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক কার্যবলী বিশ্লেষণ করলে বলা যায় হাজার বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা “পুন্ড্র” আজকের বগুড়া। বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ। বগুড়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বেশ সমুজ্জ্বল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ

অজিত কুমার ঘোষ, ড., বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, কলিকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২ইং।

অতুল সুর, ড., বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, ১৯৭৬ইং।

----------, আঠার শতকে বাঙলা ও বাঙালী, কলকাতা : সাহিত্যলোক, বিডন স্ট্রীট, ১৯৮৫।

অঞ্জলী বসু, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ২য় খণ্ড, কলিকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা ঃ লিঃ, ২০০১।

আবদুর রহিম, ড. মুহম্মদ ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬।

আব্দুর রশিদ, খন্দকার, বগুড়ায় ইসলাম, ঢাকা : মদিনা পাবলিকেশনস, ২০০২।

আব্দুর রহিম বগ্‌রা, বগুড়ায় নওয়াব বাড়ীর ইতিহাস, বগুড়া : রুহানী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২।

আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

-----------, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

-----------, বাংলার ইতিহাস : ১২০০-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

-----------, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

আব্দুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলাদেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।

আব্দুল হামিদ, আজিজুল হক কলেজের ইতিকথা

আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, মো :, ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

আব্দুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩ইং।

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০।

আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী,২০০৩।

আফজাল, খান সাহেব মোহাম্মদ, মহাস্থানগড়ের ইতিহাস, বগুড়া জেলাবোর্ড প্রেস, ১৯৭৬।

আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২ইং।

আবদুল মতিন, আহমদ রফিক, ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য, ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৯২।

আবদুস সাত্তার, অনুবাদ : মোস্তফা হারুন, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ইং।

আবদুস সাত্তার, ড., বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ইং।

আবদুস সালাম, ড. শেখ ও সুধাংশু শেখর রায়, সংবাদের জগৎ, ঢাকা : পিআইবি, ১৯৯৮ইং।

আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০০।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক পরিচিতি।

আমানউল্লাহ্ খান, আজকের বগুড়া, বগুড়া : গ্রন্থমেলা প্রকাশনী, মালতীনগর, ১৯৬৮।

আলমগীর, মোহাম্মদ, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং।

আশরাফ, খোন্দকার আলী, সংবাদ সম্পাদনা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং।

আখতার উদ্দিন মানিক, বগুড়া চরিতকোষ, ঢাকা : বাংলারমুখ, ২০১১।

আজহার আলী ড. মোঃ ও ড. আবদুল আউয়াল খান, শিক্ষার ভিত্তি, ঢাকা :মিতা ট্রেডার্স, ২০০৩।

আজহারুল ইসলাম, এ.কে.এম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম (মক্কা ঘোষণার আলোকে মূল্যায়ন), প্রকাশক দি-ইসলামিক একাডেমী, ২০৫ গিলবার্ট রোড, ক্যামব্রীজ, যুক্তরাজ্য।

আজাহার আলী, মোহাম্মদ, শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

আনিসুজ্জামান, মোঃ মুসলিম বাংলার মাসয়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০) ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ইং।

ইবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

ইয়াকুব আলী, ড. এ.কে.এম, বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য, ঢাকা : সময় প্রকাশ, ২০০২।

ইনাম-উল-হক, ড. মুহাম্মদ, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭০৭-১৯৪৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

একাডেমী পরিচিতি ও নিয়মাবলী, জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষন ও গবেষণা একাডেমী, জাহাঙ্গীরাবাদ, বগুড়া।

ওয়াকিল আহমদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮ইং।

-----------, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭।

আব্দুর রউফ, অধ্যাপক কাজী, বগুড়া গাইড, ঢাকা : বিজনেস পোস্ট পাবলিকেশন, ১৯৯০।

কুলদা প্রসাদ চৌধুরী, শ্রী, শিক্ষা বিস্তারের মূলনীতি, কলকাতা : মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৭ইং।

কৃষ্ণধর ও মিহির ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), বাংলার কজন সেরা সাংবাদিক, কলিকাতা : গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩।

খন্দকার মুস্তফিজুর রহমান, শিক্ষা দর্শন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০ইং।

খুরশীদ আলম, মোহাম্মদ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ঢাকা : সুবর্ন, জুন ১৯৯২ইং।

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিকাশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৫

ছালামত উল্লাহ, প্রফেসর এ কে এম (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), স্মারক গ্রন্থ, সরকারি আজিজুল হক কলেজ , বগুড়া, ২০১১।

জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), সাংবাদিকতা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, আগষ্ট, ১৯৯১ইং।

জিল্লুর রহমান মোহাম্মদ ও সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ, বাংলার ঐতিহ্য, ঢাকা : বইপাড়া, ২০০৫।

জ্যোতি বিশ্বাস, সান্ধ্যকরনন্দীর রামচরিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

তপন বাগচী, বাংলাদেশের যাত্রাগান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

তারাপদ পাল, ভারতের সংবাদপত্র, কোলকাতা : সাহিত্য সদন, ১৯৭২ইং।

তাহমিনা আলম, বাংলার সমিয়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, ঢাকা : একাডেমী, ১৯৯৮ইং।

তসিকুল ইসলাম, বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

দেশাই, এ. আর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কলকাতা : কে.পি.বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮৭ইং।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটে, ১৩৮১বাংলা।

নৃপেন ভট্টাচার্য, বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯০বাংলা।

নারায়নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫ইং।

নাজিমুদ্দীন আহমেদ, ড., মহাস্থান-ময়নামতি-পাহাড়পুর, ঢাকা : গতিধারা, ১৯৬৫।

নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

প্রভাস চন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস, বগুড়া :ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, পুনমুদ্রন, ২০০০।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিকতা, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৪), ।

-----------, বিষয় সাংবাদিকতা, কোলকাতা : লিপিকা, ১৯৯০ইং।

বংশী মান্না, ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস, কলকাতা : সুবর্না প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং।

বেলাল হোসেন, ড., লোক সাহিত্যের কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য পূর্ব বগুড়া, বাংলা একাডেমী, জুন-২০০৮।

বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলকাতা : প্রাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১।

-----------, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১৮৪০-১৯০৫, ১ম খণ্ড, কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

-----------, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪।

মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান (সম্পা), বগুড়ায় ইসলাম আগমন প্রচার ও প্রসার, বগুড়া : ইসলামিক স্টাডিজ গ্রুপ, ২০১১।

মাযহারুল ইসলাম তরু, বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২।

মাহবুব আজিজ , ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা সাহিত্য, ঢাকা : ঐতিহ্য, রুমী মার্কেট, প্যারীদাস রোড, ২০০৭।

মাহবুবর রহমান, ড. মো. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৯।

-----------, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-৪৭, ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮।

মতিয়ার রহমান, মোঃ :, অতীতের বগুড়া, প্রকাশক : মেহবুবা সুলাতানা রূপ, ১১৯ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, ২০০৮।

মুস্তফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ইং।

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা-সমিতি, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৪ইং।

-----------, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৫৭-১৯০৫), ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬ইং।

-----------, উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সময়িকপত্র, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ইং।

মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

মিছের, মুহম্মদ কাজী, বগুড়ার ইতিকাহিনী, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭।

মিনহাজ-উস-সিরাজ, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী।

যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, কলিকাতা : এন.সি.পাবলিকেশন, ১৯৮৫।

যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম ২য় ৩য় খণ্ড, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২য় সংস্করণ মাঘ-১৩৮১।

রওশন আলী, কাজী, সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), বিভাগ গাইড রাজশাহী, ১ম খণ্ড নওগাঁ : নিউ বিজসেন পোস্ট পাবলিককেশনস, ১৯৯৫।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী, শ্রী, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : ৭৬ নং বলরাম দে স্ট্রীট, মেটকাফ প্রেস, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

রাজ্যেশ্বর মিত্র শ্রী প্রণীত, বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা : টি.কে. ব্যানার্জি এন্ড কোং,।

রামশর শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলকাতা : ১৯৬৬

রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায়, বাঙলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৮৮৮।

রহিম, এম.এ., বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮।

-----------, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৫।

রহিম, ড. এম.এ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুদিত), বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১২০৩-১৫৭৬), ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ইং।

রতনলাল চক্রবর্তী ও কালী কমল সার্বভৌম, সেতিহাস বগুড়া, ঢাকা : দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ২০১১।

রেজোয়ান সিদ্দিকী, ড. (প্রধান সম্পা.), বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস, ১৭৮০-১৯৪৭, ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০০৩।

রোল্যান্ড ই উলসুলে সম্পাদিত, আশফাক-উল-আলম অনুদিত, আধুনিক ভারতের সংবাদিকতা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং।

শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ডা., ঢাকার ইতিহাস (ইতিহাস ও নগর জীবন), ঢাকা : একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০১।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা), বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৬।

------------(প্রধান সম্পাদক) বাংলা একাডেমী লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা বগুড়া, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন,২০১৪।

শাহজাহান আলী, মোঃ, (সম্পা.), বগুড়ার অতীত দিনের গৌরবোজ্জল ফুটবল, বগুড়া ঃ হেলাল প্রেস, ২০০৯।

শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন (সম্পা.), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৫।

শফিকুর রহমান, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯ইং।

শফিকুল আলম সৈয়দী ও অধ্যাপিকা রাফিনা আহমেদ, জেলা পরিচিতি বগুড়া ১ম খণ্ড বগুড়া : সাদ প্রিন্টার্স এন্ড সায়িদ প্রকাশনী, ১৯৯৯।

শফিকুল আলম সৈয়দী, বগুড়া জেলার অতীত ও বর্তমান, বগুড়া, বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ, বগুড়া, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

সিরাজ মান্নান, মোহাম্মদ, বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

সোহেল রানা (সম্পা.) বগুড়া তথ্যকোষ, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১২।

সত্যেন সেন, শহরের ইতিকথা, ঢাকা :............১৯৭৪।

সফর আলী আকন্দ (সম্পা.), বাঙালীর আত্মপরিচয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১।

সাঈদা জামান, বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান, ঢাকা : বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ১৯৯৮।

সামছুদ্দীন তরফদার, এ.জে.এম., দুই শতাব্দীর বুকে, ১ম ও ২য় খণ্ড, বগুড়া : প্রজাবাহিনী প্রেস, ১৯৭০।

সালাহ উদ্দীন আহমদ, বরণীয় ব্যক্তিত্ব স্বরণীয় সুহৃদ, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০৩।

সুবোধ সেন, উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২ইং।

সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিদান, ১ম খণ্ড, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লি :,১৯৯৮।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়, শ্রী, তিনহাজার বছরের লোকায়ত জীবন, কলিকাতা : এ. মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৩ বাংলা।

সুধাংশু শেখর রায়, সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র, ঢাকা : ম্যাসেলাইন প্রিন্টার্স, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, ২য় প্রকাশ, জুন ২০০৩ইং।

সুনীল কান্তি দে, ড., আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি, কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিঃ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০০ বাংলা।

সুব্রত শংকর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।

সুলতান আহম্মদ, ড., ইতিহাস শব্দ সংহিতা, ঢাকা : একাডেমিক কনসালটেন্ট, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন, কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী, ২০০১ইং।

সুকুমার সেন, বাংলা স্থান নাম, কলিকাতা : আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস, ১৯৮২-৮৩।

সুখময় সেনগুপ্ত, বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

সুপ্তিকণা মজুমদার, বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

হোসনে আরা শাহেদ (সম্পা.), বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবসথা, ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০২।

হান্টার, ডবি□উ. ডবি□উ., ওছমান গণি (অনুদিত) পল্লী বাংলার ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

হাটকিনস, রবার্ট এম, অনুবাদ-রাহাত খান, শিক্ষা ও সমাজ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ইং।

হামিদুল হোসেন তারেক-বীরবিক্রম, রোড-টু-বগুড়া, ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯।

হাবিবুল্লাহ, ড., মোঃ, পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯০০-১৯৪৭) বাংলা একাডেমী-২০০৯।

ব্রিগেডিয়ার এম. মসাহেদ চৌধুরী (অব ঃ) (সম্পা.), বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বগুড়া, ঢাকা : সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৮৯।

২. প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী ও স্মরণিকা

অনুশীলন-২০০৬ ম্যাগাজিন, পুলিশ লাইন্স হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া।

আব্দুল খালেক (সম্পা.), শিকড়, বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন এ্যান্ড কলেজ এর এস এস সি ১৯৮৫ শিক্ষার্থীদের সংগঠন, ২০১১।

আবদুল মান্নান, মোঃ (সম্পা.), জেলা উন্নয়ন পরিক্রমা বগুড়া, অক্টোবর ২০০১-জুন ২০০৫, ঢাকা : গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

আমিনুল ফরিদ (সম্পা.), ১২৫ বৎসর পুর্তি উৎসব স্মরণিকা, বগুড়া পৌরসভা ১ জুলাই, ২০০১।

আজিজার রহমান তাজ (সম্পা.) মল্লিকা, একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সাময়িকী পত্রিকা, বগুড়া : পপুলার প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৭।

ইয়াকুব আলী, ড. এ.কে.এম., প্রবন্ধ : ইতিহাসের আলোকে মাদরাসা শিক্ষা, আল-ইসতিকা, প্রাক্তন ছাত্র পূনর্মিলনী, সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা বগুড়া, ১৯৮৩।

এক নজরে বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৮।

কলেজ থিয়েটারের প্রানোজ্জল ২৭ বছর, কলেজ থিয়েটার, বগুড়া।

গাগন চন্দ্ররায় (সম্পা.), আবির্ভাব, শারদীয় সংকলন, বনানী, বগুড়া, ২০১০।

নবাব প্যালেস মিউজিয়াম লাইব্রেরী রেকর্ড রুম।

নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ (সম্পা.), নির্ভর ২০০৩, বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি ম্যাগাজিন।

পলাশ খন্দকার (সম্পা.), ঐতিহ্যে পুণ্ড্র চেতনা, ২য় শিল্পী মহাসম্মেলন ২০০৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, বগুড়া : সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ২০০৯।

প্রদীপ মিত্র, জন্ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী, এস.কে.এম. রোস্তম আলী কর্ণপুরীর স্বপ্ন ও মনস্তত্ত্ব, দৈনিক সংবাদ, ২৪ জানুয়ারি, ২০০২।

পুটু আখতার, ‘সুভেণীর’ কারুপল্লীর নবম বর্ষ পুর্তি উৎসব, বগুড়া।

বদরুল হুদা ও মাহবুব আহমেদ ববি, মোঃ (সম্পা.), বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউট এন্ড কলেজ এর শর্ত বর্ষ উদযাপন উৎসব, বগুড়া, মার্চ-২০১১।

বিকিরন, কলেজ প্রতিষ্ঠার যুগ পূর্তির স্মারক, এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ বার্ষিকী ২০১০-২০১১, বগুড়া।

বগুড়া সেন্ট্রাল হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কল্যাণ সমিতি আয়োজিত গৌরবের ৫৫ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান-২০১০ এর সরণিকা, ২৫ ডিসেম্বর-২০১০।

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ৫০ বছর পূর্তিতে প্রজন্মের (১৯৬০-২০১২) সেতুবন্ধন, সবর্নজয়ন্তী-২০১২।

শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকের কলেজ ও হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন স্মরনিকা, আগষ্ট-২০০৬।

সংকলন, সূভেণীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বগুড়া জেলা শাখা-২০০৮।

সঙ্গলন, সূভেণীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বগুড়া জেলা শাখা-২০০৮।

সরকারি আজিজুল হক কলেজ পরিচিতি (প্রসপেক্টাস), ১৯৯৮ইং।

সামছুদ্দীন স্বপন, এ.জে.এম (সম্পা.), ১০০ বছর পুর্তি উৎসব স্মরণিকা (১৮৯২-১৯৯২), বগুড়া জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি।

সুলতানা শাহীনা আখতার (সম্পা.), উদয়ন, ২০০৫ ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া।

হ্যানিম্যান স্মরনিকা-২০০৩, ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এর ২৪৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বগুড়া হোমিও প্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশেষ প্রকাশনা-২০০৩।

নন্দলাল গোয়াল, 'বগুড়ার জ্বলন্ত প্রতীক প্রফুল্ল চাকী', মোঃ মতিয়ার রহমান, অতীতের বগুড়া, ঢাকা : টেকনো ফেয়ার সার্ভিসেস, ২০০৮।

প্রদীপ মিত্র, জন্ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী, কবি এস.কে.এম রোস্তম আলী কর্ণপুরী'র জীবন ও সাহিত্য সাধনা, দৈনিক বাংলা বাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০২।

৩. অভিসন্দর্ভ (প্রকাশিত/অপ্রাকাশিত) ও বিশ্বকোষ

আবদুল হক ফরিদী, আ.ফ.ম. (সম্পা.), ইসলামী বিশ্বকোষ (১), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

আবদুল হাকিম, কান বাহাদুর (সম্পা.) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২।

তাপস কুমার সরকার, রাজবাড়ী জেলা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

আতিকুর রহমান, মোঃ, 'বাংলাদেশে তৃণমুল সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ', অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

কামরুল আহসান, মোহাম্মদ, 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯৫)', অপ্রকাশিত পিএই.ডি থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

ফজলে রাব্বি, মুহম্মদ, 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বগুড়া সরকারি মুস্তফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভূমি', অপ্রকাশিত এম.এ থিসিস, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

মনিরুজ্জামান, 'সাংস্কৃতিক জনপদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের ভৌগলিক সমীক্ষা', অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

মনিরুল হুদা, মো :, 'জেলা বিচার ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং জনজীবনে এর প্রভাব : প্রেক্ষাপট পিরোজপুর জেলা', অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

মুহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান, ড. বগুড়া শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৮২১-২০০৬, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-২০১৩।

রফিকুর রহমান, এ.এস.এম, 'যশোর জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ১৯৪৭-১৯৭০ :একটি সমীক্ষা', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যলয়, ২০১০।

শামসুন নাহার, 'বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ সাময়িকপত্রের ভূমিকা (১৯০৬-১৯৪৭)', অপ্রাকিশত পিএইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

সালেহ আহমেদ, মো:, 'বগুড়া শহরের একটি নগর ভৌগলিক সমীক্ষা', এম.এস.সি থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ

Abdul Karim, History of Bengal, Mughal Period, Vol, I & II, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1995.

Adams William, C., History of the Rivers in the Gangetic Delta 1750-1918, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1919.

Ahmed Alim, Muslims of Chittagong : A socio-Cultural Study 1857-1931, Unpublished Ph.D Thesis, Chittagong University, 1987.

Ahmed, S.U., Dacca, Study in Urban History and Development, London : Centre of South Asian Studies, 1986.

Akanda, S.A. (ed.), Students in Modern Bengal, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981.

Azizur Rahman Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856, Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Ballhatchet K. and John Harrison (ed.), The City in South Asia, London : Curzon Press, 1980.

Bose, S., Agrarian Bengal : Economic, Social Structure and Politics, 1919-1947, Cambridege : Cambridge University Press, 1986.

Chas. A. Bentley, Fairs and Festivals in Bengal, Calcutta : The Bengal Secretariat book Depot, 1921.

Datta, A., Urban Government, Finance and Development, Calcutta : The world Press, 1970.

David Kopf Sanfuddin Joarder (Ed.), Reflections on The Bengal Renaissance, Institute of Bangldesh Studies, Rajshahi University, 1977.

Dutt, R., The Economy History of India, Vol II, 7th (ed.), London : Routledge and Kegan Paul, 1950.

Franchis Buchanen Hamilton, A Geographical Statistical and Historical Description of District or Zilla of Dinajpur in the Province or Subah of Bengal, Kolkata : Baptist Mission Press, 1833.

Gadgil, R., The Industrial Evolution of India in Recent Times, 4th (ed.), Kolkata : Oxford University Press, 1942.

George Dunbar, Sir a History of India, London : Printed in great Britain by the Edinburgh Press, Edinburgh and London, 1936.

Ghosal, H.R., Econimic Transation in the Bengal Presidency, 1973-1833, Patna : Patna University, 1950.

Government of Bengal, Progress of Education in Bengal, (1897-1902), Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905.

Hampton, H.V., Biographial Studies in Modern Education, Oxford : At the University Press, 1947

Hunter, W.W., A Statistical Accont of Bengal (Bogra, Rajshahi), Vol- VII, London :1876.

Islam, M.M., Bengal Agriculture, 1920-1986, Cambridge : Cambridge University Press, 1978.

Jadu Nath Sarker, The History of Bengal, Vol. II, Dhaka : 1972.

Jafar, S.m., Education in Muslim India 1000-1800 A.D., Delhi : Idarahi adabiyat, 1973.

Mahmood, A.B.M., The Revenue Administration of Northern Bengal 1765-1793, Dhaka : NIPA, 1970.

Majumdur, R.C., History of the Modern bengal, Part-I, Kolkata : G. Bharadwag and Co., 1978.

Mohammad Mohabbat Khan, Administrative the forms in the Civil Service, Dacca University Studies, Vol-25 part-A. December, 1976.

Mohsin, K.M,. A Bengal District in Transition : Murshidabad 1765-1793, Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1973.

Mohsin, K.M. (e.d.), Asiatic Society of Bangladesh Culture Survery of Bangladesh, Dhaka : Asiatic Society, 2007.

Mojumder, R.C., Glimpses of Bengal in the 19th Century, Kolkata Firma K.L. Mukhopahyay, 1960.

Muhammad Ghulam Kabir, Minority Politics in Bangladesh, New Delhi : Vikas Publishing Home, 1980.

Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, 1985.

Muntasir Mamun, Source Materials of the Cultural History of Dhaka City, Dhaka : International Centre for Bengal Studies, 2001.

Peter Hardy, Muslims of British India, Cambridge : 1972.

Philip Hartog, Sir, Some Aspects if Indian Education Past & Present, London : Oxford University Press, 1939.

Purkait, B.R., Administration of Primary Education in West Bengal, Kolkata : Firma K.L.M., 1984.

Rapson E.J., (Ed.), The Cambridge History of India, Vol. I, S.Chand and Co. by Arrangement with Cambridge University Press, London.

Salahuddin Ahmed, A.F., Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835 India, Leiden : E.J. brill, 1965.

Sayed Mahmood, History of English Education in India, Aligarh : M.A.O. College, 1895.

Sen, S.P. (ed.), Dictionary of National Biography if India, Vol. II, Calcutta : Institute of Historical Studies, 1973.

Sharp, H. (ed.), Selection from Educational Records, Part-I, 1771-1839, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1920.

Sinha, N.K., Economic History of Bengal, Vol-I, Kolkata : Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1965.

Sirajul Islam (ed.), Bangladesh District Recored, Vol. I, 1760-1785, Dacca : The University of Dacca, 1978.

Sirajul Islam, Rural History of bangladesh : A Source Study, Dhaka : Titu Islam, 1977.

Sonai Nishat Amin, The World of Muslim Women in Colonical Bengal 1876-1939, New Yourk : E.J. Brill. 1996.

Sovani, N.V., British Impact on India, Calviersd Historic Mondiale, 1954.

Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947, Delhi : Macmillan India Ltd., 1984.

Syed Mahmood, History of English in India 1781-1893, Aligarh : M.A.O. College, 1895.

Syed Nurullah & J.P. Naik, A Students History of Education in India 1880-1973, Kolkata : MacMillan Company of India, 1974.

Syed Nurullah & J.P. Naik, History of Education in India, Bomby : Macmillan & Co., 1951.

Tarafdar, M.R., Culture Conflict in Bangladesh, A Nation in Born, Calcutta:...1974.

Zaidi, A.M., Evolution of Muslim Political Thought in India, Vol-I, New Delhi : Michiko & Punjathan, 1975-1978.

৫. ইংরেজি ভাষায় রচিত রিপোর্ট, গেজেটিয়ার ও ইনসাইক্লোপিডিয়া

Ashraf Siddiqui, Dr., Bangladesh District Gazetteers Bogra, Dacca : bangladesh Government Press, 1976 A.D.

Annual Report on the Working of the Indian Factories Act-1911 in the Punjab, For the Year-1923, Lahor : Government Printing, 1924.

Anath Nath Basu, Introduction to Adams Reports, (here after referred to as introduction) See also Bengal Past & Present, Vol-8, Part-2, April-June, 1914.

Bogra District Statistcs 1983, Dhaka : Bangladesh Bureue of Statistics, A.D.

Clio, Journal of the Department of History, Jahangirnagar University, Dhaka-2010.

Census of Agriculture-1996, Zilla Series Bogra 2003, Dhaka : Bangladesh Bureaae of Statistics, 2003 A.D.

Bogra District Statistics 1983, Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 1984, A.D.

Dictionary of Education, Edited, New York : McGraw Hill Book Company, Inc., 1959.

Encyclopedia of Britanica, Vol. VIV

Encyclopedia of Social Sciences, Voll. IX-X, New York : The Macmillan Co., 1959 A.D.

Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. V, edited, New York : T and T Clark, 1981.

Firminger, W.K., Historical Introduction to the Bengtal Portion of the Fifth Report, Calcutta : Indian Studies Series, 1962.

Government of Bengal, Report of the Progress of Education in Bengal, 1882, Kolkata : bengal Secretariat Book Depo., 1884.

Government of bengal, Report on the publish Instruction of Bengal 1904-1905, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1905. (here after Report on Education).

Gupta, J.N., District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam Bogra, Allahabad : Poineer Press, 1910.

H, Beverley, Report Census of Bengtal 1872 (Calcutta : Printed at the bengal Secretariat Press, 1872).

Khan Tahawar Ali (ed.), Biogrphical Encyclopaedia of Pakistan, Lahore : Institute of Historical Research, 1965-66.

Latiful Bari, K.G.M., Bangladesh District Gazetteers Bogra, Dacca : Bangladesh Government Prss, 1979 A.D

Mohammad Ali & Swapan Bikash Bhattacharjee, Archaeological Survey Report (Bogra District), 1986.

O'malley L.S.S, Bengal Distirct Gazetteers Rajshahi, Kolkata : Bengal Secretariat Book Report, 1916 AD.

O'malley L.S.S, Bengal Distirct Gazetteers Khulna, Kolkata : Bengal Secretariat Press, 1919.

Population Census 2001 prlimimary Report, Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 2002 A.D.

The World Book of Encyclopedia, Vol. IV, 1985.

The New Encyclopedia Britannica, Vol. VIII, London : Helen Heming way Benton, 1973-1974 A.D.

The Report of Indian Statutory Commission, 1930, Vol. I (Simon Commission), The Government of Bengal

The new Oxford Encyclopedia Dictionary, Oxford : Oxford University Press, 1983, S.D.

William Adam, Reports on the State of Education in Bengal 1835-1838 (ed.)Anath Nath Basu, Kolkata : University of Calcutta, 1941, here after Adams Report.

William Adam, Second Report on the State of Education in Bengal, Kolkata : G.H. Huttmann, 1836.

৬. ইংরেজি ভাষায় রচিত অভিসন্দর্ভ(প্রকাশিত/অপ্রকাশিত)

Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D.1538), Unpublished Ph.D Thesis, Social Science Department, Dhaka University, 1958

Abdul Mottalib, The Socio-Economic History of Pabna District, 1872-1935, Unpublished Ph.D Thesis, Institure of Bangladesh Studies, Rajshahi university, 1989

Golam Murtaza, Md., Urban Poverty and its Spatial Consequences : A Case Study of Khulna City, Unpublished Ph.D. Thesis, Rajshahi Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 2002.

Habiba Khatun, Sonargaon : Its History and Moment (1336-1608 A.D), Unpublished Ph.D Thesis, Islamic History and Culture Department, Dhaka University, 1987

Islam M.R., Establishment and Growth of Industrial Comples in Bogra, Unpublished M.phil Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1977.

Matin khan A., Residence background and fertility in Urban Bangladesh, Unpublished Ph.D Thesis, Institute of Statistics Research and training, Dhaka University.

Mohibullah Siddique, Socio- Economic Development of a bengal District: A Study of Jessore, 1883-1995, Unpublished Ph.D Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1997.

Molla, M.K.U., The Growth and Development of Rajshahi Municipal Town, In S.A. Akanda (ed.), The District of Rajshahi : Its Past and Present, Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1983.

Nurun Nabi, Development of Modern and Traditional Education in Rajshahi Town : A Study of the Role of Rajshahi College and Rajshahi Madrasha 1873-1920, Unpublished Ph.D Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1997.

Rana Ahmed, Education Progress of the Muslim Community in Bengal (1911-1935), Unpublished Ph.D Thesis, History Department, Dhaka University, 1996.

Zahid hossain, Gazi, Pattern of Migration : Push and Pull Factors Analysis-A Socio-economic Study of Barisal Town, Unpublished M.Phil. Thesis, Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989.

‘পরিশিষ্ট-ক’*

বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী --------- অর্থসহ)

অ

অ[১]---স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ, প্রথম স্বরধ্বনি, শিশুর প্রথম বর্ণ পরিচয়সূচক অক্ষর। পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

অ[২]---অনিদের্শক স্বর, অন্যমনস্কতার জবাব; অভাব, বৈপরীত্য, অল্পতা ইত্যাদি সুচক অব্যয়। জেলার আঞ্চলিক ভাষায় “র” এর স্থলে ব্যবহৃত হতেদেখাযায় রক্ত> অকরো রং>অং।

অং > রং।

অক------------ ওকে।

অক্খা > রক্ষা।

অক্তো > রক্ত।

অকর্মা --------- অকর্মণ্য, অলস।

অকাম --------- খারাপ কাজ।

অখিন্দ্যা ---------ঐদিক দিয়ে।

অগা --------- বোকা ধরণের লোক।

অগেরে --------- ওদের।

অছিল্যা > অছিলা, টালবাহানা।

অজ্গুবি ---------অর্থহীন। ‘তুই অজ্গুবি এ্যাক্ কথা কোশ্?”

অজোগাঁও --------- পশ্চাদপত্র গ্রাম।

অটে --------- অইখানে।

অদ্দুর --------- অতদূর।

অদে --------- ঐ যে, একটু দূরে নির্দেশ করা।

অদেক্ল্যা --------- যে কোন কিছুই দেখেনি এমন ভাব।

অদ্দেক --------- অর্ধেক

অদিশ্টো > অদৃষ্ট।

অন্দোর --------- ভিতর।

অন্দিশোন্দি --------- খুঁটিনাটি, অন্ধিসন্ধি। অপ্রেশন > অপারেশন, অস্ত্রোপচার।

অবাট্ > রাবার।

অবিমত্ > অভিমত।

অব্ব্যাশ > অভিমত।

অব্ব্যাশ > অভ্যাস।

অব্যায় --------- অযথা।

অব্যালা --------- অযথা।

অব্যালা > অবেলা, পড়ন্ড় বেলা।

অম্জান > রমজান, রোজার মাস।

অমাক্ --------- ওকে। ---------জয়)

আমার --------- তার ---------জয়)

অয়ে --------- দাঁড়িয়ে থাকা, অপেক্ষা করা। “তুই এটি অয়ে থাক্।’

অরগোরে --------- ওদের ।

অল্পোজিয়্যা --------- সংকীর্ণ মন---মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ

অল্যাজ্জো --------- অনুচিত।

অশ্ > রস।

অশদ্---------ওষুধ। ---------জয়)

আ

আ---স্বরবর্ণের দ্বিতয়ি বর্ণ। বিস্ময় আনন্দ, ক্ষোভ ইত্যাদি সূচক অব্যয়। “া” কার। পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

আঃ --------- আরামসূচক ও আঘাতজনিত উচ্চরণ।

আংগা[১] > রাঙা।

আংগা[২] > জামা। ---------জয়)

আংগে---------আমার।

*সূত্র: সংগ্রহ, সকংলন, সম্পাদনা, প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বগুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহৃত শব্দাবলী (অর্থসহ)। অর্কেষ্ট্রা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০১০, বগুড়া।

আংটা---------আংটির আকার বিশিষ্ট হাতল।

আংরা --------- কাঠপোড়া আগুন।

আঁউট্যা ---------এঁটে।

আউল্যা --------- এলোমেলো।

আউল্যান্---------এলোমেলো করে দেওয়া।

আউর --------- খড়, গোখাদ্য। --------- জয়)

আউশ--------- বর্ষাকালে উৎপন্ন মোট ধান।

আও --------- শব্দ। 'আও কোরবু ন্যা।'

আওছে --------- আসছে ---------জয়)।

আঁক্ --------- অঙ্ক, অঙ্কন।

আক্রা --------- দূর্মূল্য।

আককোশ --------- কান্ডজ্ঞান।

আকা --------- বড় চূলা।

আকাম --------- খারাপ কাজ।

আকাল্ --------- অসময়, অযোগ্য কাল।

আকির --------- কুচি পাথর

আখা > রাখা

আখ্ত্র্যা দ্যাওয়া > রেখে দেওয়া।

আগ্ > রাগ

আগুন্যা > অঙিনা, উঠোন।

আগার > সম্মুখভাগ।

অ্যাগ্ল্যা[১] --------- আগের।

অ্যাগল্যা[২] --------- আগের।

আগোন্ --------- অগ্রহায়ন মাস।

আগোত্ --------- আগে।

আগ্যান্ --------- এগারো, এগিয়ে যাওয়া।

আগোত্ --------- আগে।

আগ্যান্ --------- এগোনো, এগিয়ে যাওয়া।

আঁচ --------- তাপ।

আচ্চি --------- এসেছি। 'হামি আচ্চি'

আচ্চু --------- এসছিস।'তুই আচ্চু'

আচু --------- আছিস অর্থে। "তুই ক্যাংবা আচু"

আচে --------- আছে।

আছ্তা --------- রাস্ত্র।

আছ্নু --------- ছিলাম।

আছ্নো --------- দেখুন আছ্নু।

আছোর[১] --------- বিকেলে নামাযের সময়।

আছোর[২] --------- প্রভাব।

আছিলো --------- ছিল।

অ্যাছ্লো --------- =দেখুন আছিলো।

অ্যাছি --------- আসছি (জয়)

অ্যাছে --------- আসছি (জয়)

আজ্গ্যা --------- আজকে।

আজ্র্যা --------- মজুরী।

আজা > রাজা।

আজার্ -------- খালি। 'বস্ত্র আজার কর্‍্যা দ্যাও'

আজার্যা ------ অনর্থক। 'আজার্যা প্যাচাল্ থো'

আজান্[১] --------- নামাজের আহ্বান।

আজান[২] --------- আবর্জনা, ময়লা।

আটা[১] --------- আঠা।

আটা[২] --------- গম,যব,ডালের গুঁড়া।

আঁটো --------- শক্ত ।

আঁটি --------- বোঝা।

আঁটিশ্শোরি --------- এক ধরণের ছট্কাজাতীয় জংলী মাছ।

অ্যাঁটে১ --------- কলাগাছের কান্ডের মধ্য অংশ।

অ্যাঁটে২ --------- এঁটে আসা, কঠিন অবস্থা।

আলোআন্ --------- গায়ের চাদর।

আ্পর্দা --------- স্পর্ধা।

আশ্কারা --------- প্রশ্রয়।

আঁশ্রো --------- তেলেপোকা।

আশ্লু --------- দেখুন আলু ১

আশ্মুনি --------- আসার প্রতিশ্রুতি।

আশ্মো--------- আসবো অর্থে।

আশ্মু --------- দেখুন আশ্মো।

আশ্পি --------- আসবে অর্থে। 'রহিম আজ ঢাকাত্থিনি আশ্পি।'

আশ্পু --------- আসবি অর্থে। 'তুই ককোন্ আশপু।'

আশ্মোহিনি --------- আসার ইচ্ছে অর্থে। 'হামি ক্যাল্ আশ্মোহিনি।

আশিচে --------- এসেছে।

আশিন্ --------- আশ্বিন মাস।

ই

ই---স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ, বস্মিয়, বেদনা, অধীরতাসূচক শব্দে ব্যবহৃত। যে কোন পদে জোর দেওয়ার জন্যও ব্যবহার হয়।

যেমন--- জামো---ই।' 'ি' কার। পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

ই--- আ --------- বেশ বড়।'ইয়া' বড়।

ইংক্যান --------- এমন।

ইক্শা --------- রিক্শা

ইগ্ল্যা --------- এগুলো।

ইগ্ল্যান্ --------- দেখুন ইগ্ল্যা।

ইচ্যা ---------চিংড়ি মাছ।

ইছ্কেল > স্কেল।

ইছ্কুরু > স্ক্রু

ইছ্তারি > ইফতারি।

ইছতিরি১ --------- স্ত্রী, পরিবার।

ইছতিরি২ --------- ইস্ত্রি, কাপড় সমানকরার জন্য লোহার পাত বিশেষ।

ইজারা ---- টাকার বিনিময়ে জায়গা-জমি দেওয়া।

ইঁট্যা --------- ইঁট।

ইত্র্যামি --------- খারাপ আচরণ।

ইদিংকা --------- ঐদিন।

ইদিন্ক্যা ------ দেখুন ইদিংক্যা।

ইন্দুর --------- ইঁদুর।

ইন্দারা --------- বাঁধানো বড় কূপ, ইঁদারা।

ইমিন্দ্যা --------- এদিক দিয়ে।

ইপ্ত্যার --------- ইফ্তার।

ইল্শ্যা --------- ইলিশ মাছ।

ইল্লোত্ --------- নোংরা।

ইশৃপিশৃ --------- অস্থির।

ইশ্কা ------ দেখুন ইক্শা।

ইশ্কুল্ > স্কুল।

ইশ্কুলোত্ > স্কুল।

ইশ্টিমার > ষ্টিমার।

ইশ্টিশন্ >ষ্টেশন

ইশটিকিন > ষ্টকেন, মোজা।

উ

উ--- স্বরবর্ণের পঞ্চম বর্ণ। ডাকের উত্তরে সাড়া দেওয়া। ‘ ু ’ কার। পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

উঃ--- আঘাত জনিত অনুভবের উত্তর।

উংক্যা--- ঐ রকম।

উঁই--- সে, নির্দিষ্ট লোক। ‘উঁই আজ আচচ্লো।’

উগী---রুগী, রোগী।

উক্কায়---আন্দাজ। ---------জয়)

উগ্ল্যা--- ঐগুলি।

উগ্ল্যান--- দেখুন উগ্ল্যা।

উগ্র্যা--- বমন, মুখ থেকে কিছু বের করা।

উচুংগ্যা--- আরশোলা।

উজু--- সোজা।

উজি > রুজি

উজ্যান > উজান, উল্টোস্রোত।

উত্তুর্যা--- উত্তর দিকে, ;উত্তুরে বাতাস।

উত্যাল্--- উথলে উঠা।

উদ্এ্যান্--- খোলা।

উদে--- ঐ যে, দূরে নির্দেশ দেওয়া।

উদাই--- সূর্য। ---------জয়)

উদিংক্যা--- ঐদিন, পরশুদিন।

উদিন্ক্যা--- দেখুন উদিংক্যা।

উদোন্--- উলঙ্গ।

উদ্দিশ্--- খোঁজ।

উটি১ > রুটি

উটি২ ---ওখানে।

উট্যান্ > উঠোন।

উটিচ্চে--- উঠছে।

উট্ক্যা--- অপরিচিত লোক।

উট্ক্যান্--- খোঁজাখুজি।

উট্প্যান্যা--- উঠতে বলা অর্থে।

উন্দ্যান--- দেখুন উদ্এ্যান। ---------জয়)

উর্ম্যাল্ > রুমাল।

উল্ > রুল।

উলু--- হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে বা কোন উৎসবে মেয়েরা

জিভ তালুতে ঠেকিয়ে বিশেষ ধরণের শব্দ প্রকাশ করে।

উশুম--- উষ্ণতা।

উশ্যান্--- সিদ্ধ করা। ‘আজ ধান উশ্যান্ লাগ্বি।

উশি--- ঈষদুষ্ণ।

এ

এ--- স্বরবর্ণের অষ্টম বর্ণ। ‘ ে ’ কার। নিকট নির্দেশক স্বর। মাত্রাহীন বর্ণ।

এ্যাছে২

এ্যাংকা--- এরকম। ‘এ্যাংকা’ কোরিশ্ ক্যাক। ’

এ্যাক্ > এক

এক্কেরে--- একেবারেই।

এক্নে--- এইটুকু।

এ্যাক্না--- একটা। ‘হামার এ্যাক্নাই ব্যাটাছেলে্ ।’

এ্যাক্টি১--- একটি।

এ্যাক্টি২--- একত্র। ‘সগ্লি এ্যাক্টি হও।’

এ্যাকজাই--- বারবার বলা।

এ্যাকঝোন্--- একজন।

এ্যাকোনি > এখনি।

এ্যাগেরে--- এদের।

এগ্লে--- এগুলি।

এছে--- এদিকে। ---------জয়)

এ্যাছে১--- দেখুন এছে। ---------জয়)

এ্যাছে ২--- এসেছে। ---------জয়)

এটি--- এখানে। ‘ক্যারে তুই ক্যা এটি?’

এডে--- এইটি। ‘এডে হামার কলম।’

এত্তুকোনা--- অল্প একটু, ছোটখাট।

এ্যাদ্দুর--- এতদূর ।

এ্যাদে--- এই যে।

এ্যাদ্দিন--- এতদিন।

এন্দুর--- ইঁদুর।

এ্যানা--- অল্প একটু।

এ্যানাতি--- একটুকুতেই, অল্পেই।

এ্যান্দা--- কাঠের অসমান জায়গা সমান করার যন্ত্রবিশেষ।

এ্যাডো--- দেখুন এ্যাক্না। ---------জয়)

এ্যামিন্দ্যা--- এদিক দিয়ে।

এমুরো--- এদিকে।

এমোকে--- দেখুন এমুরো।

এল্লে--- এগুলি।

এল্গাড়ি > রেলগাড়ি।

এবা--- সম্বোধন।‘এবা, তুই কুন্টি জাচ্চু।’

এশ্কা--- রিক্শা।

ঐ

ঐ--- স্বরবর্ণের নবম বর্ণ। ‘ ৈ ’ কার। দূর নির্দেশক স্বর। মাত্রহীণ বর্ণ।

ঐমিনদ্যা--- ঐদিক দিয়ে।

ঐখিনদর‌্যা--- দেখুন ঐমিন্দ্যা।

ও

ও--- স্বরবর্ণের দশম বর্ণ।‘ ো ’ কার। সম্বোধন, স্বরণ বা বিস্ময়সূচক স্বর। আঞ্চলিক ভাষায় ‘র’ স্থলে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ওংকা--- ঐ রকাম।

ওংগিল--- রঙিন।

ওক্নে--- অইটুকু।

ওক্রা--- নরম কাঁটাযুক্ত ঘাস, চোঁরকাটা।

ওক্তো--- সময়, ওয়াক্ত।

ওগ্ > রোগ।

ওগ্ল্যা--- ঐগুলি।

ওজ্গার--- রোজগার।

ওজা > রোজা।

ওজু--- হাত---পা ধোয়া, নামাজের জন্য অযু।

ওছ্তাদ্ > ওস্তাদ, গুরু।

ওছ্যা--- ঐদিক। ---------জয়)

ওঁট্--- ঠোঁট।

ওট্পিট্এ্যা--- বড় আকৃতির এক ধরনের ঝালপিঠে যা কলাপাতায় মুড়িয়ে পোড়ানো হয়।

ওট্মো--- উঠবো অর্থে।

ওটি--- ওখানে।

ওড্যা--- ঐটে।

ওড়োং--- ডাল বা পানি তোলার হাতা।

ওতোঁত--- আড়াল।

ওদ্ > রোদ।

ওন্না > ওড়না।

ওপ্রে--- উপরে।

ওব্বার--- রোববার।

ওবি--- রবি।

ওব্বেশ--- অভ্যাস।

ওমিন্দ্যা--- ওদিক দিয়ে।

ওমুক্১--- অন্যজন।

ওমুক্২--- ওদিক।

ওমুরো--- ওদিকে।

ওমোকে--- দেখুন ওমুরো।

ওরি--- তারই।

ওরোশ্ > ওরস। পীর--- আউলিয়াদের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে ধর্মসবা।

ওল্পিশ্---অল্প একটু।

ওলান্--- গাভীর স্তন।

ওল্যা---ওগুলো।

ওশ্১--- শিশির।

ওশ্২--- থামতে বলা।

ওশ্নি--- উজ্জ্বল, রোশনাই।

ওশার--- প্রস্থ।

ওশুন্ > রসুন।

ওশুদ্ > ওষুধ।

ক

ক১---ওব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ। কণ্ঠধ্বনি। 'ক' বর্গ। পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

ক২--- কিছু বলতে বলা।

কআ ---ওয়া।

কওছে--- বল্ছে -জয়)

ককোন্ > কখন।

কচ্চু ---বলছিস্ অর্থে।

কছে--- বলেছে।

কছিনিন্--- বলেছিলেন। ---জয়)

কট্কোটি১--- চালের গুড়ার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তৈরি বিশেষ স্বাদযুক্ত খাবার।

কট্কোটি২--- হাড়ের প্রচন্ড ব্যথার বহিঃপ্রকাশ। কট্কট্ করা।

কত্ব্যাল--- ফল বিশেষ।

কত্পা--- অনেক।

কত্পাকাল--- অনেককাল।

কত্পাদুর--- আর ও কতদূর।

কতর--- কবুতর। ---------জয়)

কদোর১--- সম্মান।

কদোর২--- তরকারি বিশেষ।

কনু---বললাম অর্থে।

কপাল্যা--- সোভাগ্যবান।

কবাট্---দরোজা।

কব্বোর--- কবর।

কমো---বলব অর্থে। 'অর সাতে হামি কতা কমো।'

কয়্যা--- বলে।

কর্মো--- করবো।

কর্নো--- করলাম।

কর্ভানি--- সকালবেলা। ---------জয়)

কল্---নলকূপ।

কল্মা---ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য।

কলা১--- খাওয়ার কলা

কলা২--- নানা ধরনের শৈল্পিক কাজ।

কল্যাম্--- দেখুন কনু।

কলেজোত্--- কলেজে। 'আজ কলেজোত' জামো না।'

কশি১ --- রেখা।

কশি২--- পাজামার দড়ি।

কশোণ---মার দেওয়া। আঘাত করা । ---------জয়)

কাইল্যা---কাহিল রোগী।

কাউন---ধান জাতীয় শস্য। ভাতের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত। কাউনের পায়েশ ইত্যাদি সুখাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

কাউয়্যা---কাক।

কাক্---কাকে। 'তুমি কাক্ চাও?'

কাকু১---কাকা, চাচা।

কাকু২--- কাউকে।

কাঁকাল্---কোমর, কটি।

কাকি---কাকার স্ত্রী।

কাঁকোই---চিরুণী।

কাঁচি--- কাস্তে।

কাচু---মাচু--- কোন কারণে ক্ষমা চাওয়ার ধরনের কথা বলা।

কাট্ > কাঠ।

কাট্মোল্লা--- ধর্মান্ধ পুরোহিত।

কাট্রা---গরু--- মহিষের খাবার জায়গা।

কাঁটোল--- কাঁঠাল।

কাত্লা---কাতল মাছ বিশেষ।

কাতি---কার্তিক মাস।

কাদো---কাদা।

কাঁনদা১---পাতিলের কাঁধ।

কাঁনদা২---কান্না।

কাঁন্দি--- কলার কাঁদি।

কাঁনদোত্--- কাঁধে।

কাঁন্দোন--- দেখুন কাঁন্দা।

কান্চি--- ঘরের কোণা। ---------জয়)

কান্শারা--- কান লক্ষ্য করে থাপ্পড় দেওয়া।

কানা---চক্ষুহীন।

কানোচ--- শিং মাছ।

কাবারি---বাঁশের বাতা।

কাম্১--- কামনা---বাসনা।

কাম্২--- কাজ।

কাম্লা--- যে দিন চুক্তিতে খেটে খায়।

কামাই১--- কাজে অনুপস্থিতি।

কামাই২--- উপার্জন

কামোত্--- কাজে।

কারবার--- বাণিজ্য, কেনাবেচা।

কাঁরি--- শামটা বাধার জন্য বাছাই করা খড়।

কারুবারু--- অনুনয়--- বিনয় করা।

কাঁরোল--- খড় একত্রিত করার জন্য বাঁশের তৈরী লগি বিশেষ।

কার্--- ছোট বাচ্চাদের কোমরে লাগানো কালো সুতা।

কারেংগা--- কামরাঙা ফল বিশেষ।

কালাই---রবিশস্য বিশেষ।

কাল্লা---গলা।

কালি১--- লেখার কালি।

কালি২---আগামীকাল।

কাশ্১---কাশি, রোগ বিশেষ।

কাশ্২---সাদা ফুল বিশেষ।

কিচ্চ্যা --- কেচ্ছা, গল্প।

কিপ্ট্যা --- কিপ্টে, কৃপণ।

কির‍্যা --- শপথ।

কিশ্প্যা --- কি যেন।

কিশোক্ --- কেন।

কিশ্যান --- কৃষক।

কও১ --- কুয়া, কূপ।

কও২ --- বিলের মাঝে গর্ত।

কও৩ --- শিশির।

কুগাল্যা --- কোন গুলো।

কুচ্ছিত > কুৎসিত।

কুঁজ্ত্র্যা > কুঁজা।

কুজ্যাত্যা --- মন্দলোক।

কুট্ক্যার --- কোথাকার।

কুট্কুটি --- কোন কিছু করার জন্য আগেই অস্থির হওয়া বা বাড়াবাড়িকরা হয়।

কুটুম্বো --- আত্মীয়।

কুত্কুত্ --- মেয়েদের বিশেষ ধরণের খেলা।

কুত্কুতি --- কাতুকুতু।

কুত্ত্যা --- কুকুর।

কুত্তি --- মাদী কুকুর।

কুন্টি --- দেখুন কুটি।

কুনটিহিনি --- কোথা থেকে।

কুন্দিন্ --- কবে।

কুন্মিন্দ্যা --- কোন্দিক দিয়ে।

কুনুটি --- কোথাও।

কপি --- বাতি।

কুম্র‍্যা --- কুমড়ো, তরকারি বিশেষ।

কুমিন্দ্যা --- দেখুন কোন্মিলদ্যা।

কুরোল > কুড়াল।

কর‍্যা১ > কুড়িয়ে

কুর‍্যা২ > ধানের কুঁড়া।

কুর‍্যা৩ > অলস।

কুল্যা --- শস্যাদি ঝাড়ার ডালাবিশেষ।

কুশ্যার --- ইক্ষু, আখ

কুশুন্নি --- অচয়া। (জয়)

কেঁচি --- কাপড় কাটার কাঁচি।

কেন্জল্ --- চোখের কেঁজুল।

ক্যা- কেন।

ক্যাবারে --- সম্বোধন। ‘ক্যাবারে. তুই ইংক্যা মানুশ?

ক্যাংকা --- কেমন।

ক্যাচাল্ --- ঝগড়া বা পন্ডগোল।

ক্যাঁচ্যল্ --- অপক্ক।

ক্যাঁচ্যা১ --- অপক্ক।

ক্যাঁচ্যা২ --- কাপড় কাঁচা।

ক্যাঁচ্যাছোল্ --- অপরিণত বয়সের ছেলে।

কেডা১ -- কে।

ক্যাম্বা --- দেখুন ক্যাম্বা।

ক্যাম্কা --- দেখুন ফ্যাম্বা।

ক্যামুন --- কেমন।

ক্যাবা --- কেউ।

কেল্লে --- বিশেষ ধররেন পোকা যার অসংখ্যা পা আছে। আঘাত কলে শরীর গুটিয়ে নে।

ক্যালান্ --- ইয়ার্কি করা।

ক্যাল্যা --- কালো রঙের কিছু।

ক্যাল্যানি --- কালো মেয়েকে বোঝায়।

ক্যারাশিন --- কেরোসিন তেল।

ক্যার্দানি --- বাহাদুরি।

কোই১--- কই মাছ বিশেষ।

কোই২ --- কোথায় আছে তা জানতে চাওয়া।

কোইজালা --- কই মাছ ধরার বিশেষ ফাঁদ।

কোচ্চেন --- বলছেন।

কোচ্চি --- বলছি।

কোচ্চে --- বলছে।

কোচ্চু --- বলছিস।

কোচু১ --- খাওয়ার কচু।

কোচু২ --- কোর্ট, আদতালাত

কোট১ > কোর্ট, আদালত

কোট্১ --- গায়ে দেওয়া শীতবস্ত্র।

কোটা১ --- কোন কিছু ভাঙানো আটাকোটা।

কোট২ > কোঠা।

কোটে --- দেখুন কুটি।

কোট্ত্র্যা --- কৌটা।

কোঁতা --- ব্যথায় কষ্ট পাওয়া।

কোদ্দিন --- কোন্দিন।

কোদ্দুন --- দেখুন কার্।

কোদ্দো --- অভিমান।

কোদাল --- মাটি কাটার অস্ত্রবিশেষ।

কোন্চি --- বাঁশের কান্ডবিশেষ।

কোন্চই--- কোথায়। (জয়)

কোনু --- বললাম।

কোনে১ --- কোথায়।

কোনে২ --- বিবাহযোগ্য মেয়ে।

কোপান --- আঘাত করা।

কোপি --- সব্জীবিশেষ, ফুলকপি, বাঁধাকপি।

কোবান্ --- মারধর করা।

কোল্ক্যা --- তামাকের ছিলিম।

কোমা --- যে। 'তুই কোমা কতা কোশ্ন্যা?'

কোমাটে --- কোথাও।

কোম্বাটে --- কোথয় যেন।

কোরিচ্চি --- করিছ।

কোরিচ্চিলো --- করছিল।

কোর্তিচ্চিলো --- দেখুন কোরিচ্চিলো

কোর্তিচ্চিনু --- করছিলাম।

কোল্জ্যা --- কলিজা।

কোল্মি --- বিশেষ শাক।

কোল্শি --- কলস।

কোল্ত্র্যা১ --- কিন্তু। 'হামি কোল্ত্র্যা জামো না।'

কোল্ত্র্যা২ --- বললে। 'হামি কোল্ত্র্যা, তুই যাবু।'

কোলু১ --- বললি। 'তুই ব্যান্ কি কোলু, হামি শুনিন।

কোলু২ --- তেলী সম্প্রদায়।

কোব্র্যাজ > কবিরাজ, ভেষজ চিকিৎসক।

কোল্ক্যা --- তামাকের ছিলিম।

কোশ্১ --- বলিস।

কোশ্২--- ক্রোশ,পথের দূরত্ব।

কোশ্যান্ --- কোন্দিন 'উঁই ব্যান্ কোশ্যান আপ্পি, জানি না।

খ

খ --- ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। কন্ঠধ্বনি। অর্ধমাত্রা। 'ক' বর্গেঙর অন্তর্ভূক্ত।

খন্তা --- মাটি খোঁড়ার যন্ত্রবিশেষ।

খন্দক্ --- গর্ত।

খপ্প্র --- কবল, ফাঁদ।

খরো --- বেশিলবণ দেওয়া তরকারি বা ভাজি।

খরোম --- কঠোর পাদুকা।

খরিদ্দার --- ক্রেতা।

খল্শ্যা --- খল্শা মাছ বিশেষ।

খল্শানি --- বাঁশের খিল দিয়ে তৈরিমাছ ধরার ফাঁদ।

খলা --- বাড়ির বাইরে খোলা প্রাঙ্গন।

খাংগা --- বাড়ির বাইরের দিকের বৈঠকখানা। খান্কা

খাঁই১ --- গর্ত।

খাঁই২ --- চাহিদা।

খাচু --- খেয়েছে কিনা বিজ্ঞেস করা।

খাজর > খেজুর। (জয়)

খাজুর --- দেখুন খাজর।

খানু --- খেলাম।

খাম্ --- খেলাম।

খাম্ --- আঘাত।

খাম্চা --- আঁচড়।

খাম্চান্ --- আচঁড় দেওয়া।

খাঁরা --- সোজা হয়ে দাঁড়ান।

খালা --- মায়ের বোন। (মুসলিম সম্বন্ধ)

খালু[১] --- এইমাত্রা কেয়ে ওঠা। 'তুই ভাত্ খালু'

খালু[২] --- বোনের স্বামী। (মুসলিম সম্বন্ধ)

খাব্লা --- হাতের এক থাকা।

খাবু --- খেতে বলা অর্থে।

খাবোলয় --- না খেতে চাওয়া। (জয়)

খিঁচ্র্যা --- খিচুড়ি।

খিদ্ত্র্যা --- ক্ষুধা।

খির্যা --- শশা জাতীয় ফল বিশেষ।

খির্কি --- জানালা।

খিল১--- শলাকা।

খিল২--- তরজা আটকানোর জন্য কাঠ দিয়ে তৈরি একধরনের হুড়কা।

খিল৩ --- হঠ্যাৎ দম আটকানোর অবস্থা।

খুটি --- ছোট বাচ্চাদের খেলনা পাতিল।

খুঁটি --- চালাঘর বা মাচান তৈরির নিমিত্ত বাঁশ কা কাঠের স্তম্ভ।

খুঁট্যা --- গরু-ছাগলের গলার দড়ি যার সঙ্গে বাঁধা হয়।

খুদ্ --- চাউলের ভাঙ্গা অংশ।

খুন্খুন্যা --- শীর্ণকায় অতি বৃদ্ধলোক।

খন্তি --- রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হাতা বিশেষ।

খুপা > খোঁপা।

খুর্প্যা --- মাটি খোঁড়ার ছোট হাতা।

খুর্যা > খুড়া, পিতৃব্য। (হিন্দু সম্বোধন)

খুরি --- মাটি ভাঁড় বিশেষ।

খুলি১ --- ধেকুন খলা।

খুলি২ --- মাথার খুলি।

খুলু --- দেখুন কলু।

খেপে যাওয়া --- রেগে যাওয়া।

খ্যাওআন্[১] --- খেয়া নৌকা পারাপার করা।

খ্যাওআন্[২] --- মাছ খরার জন্য পানিতে জাল ছুঁড়ে দেওযা।

খ্যাত্[১]--- ক্ষেত, জমি।

খ্যাত্২ --- নির্বোধ বোকা লোক বুঝানো হয়।

খ্যাঁতা --- সূচিকর্মযুক্ত মোটা কাপড়। নক্শী কাজ থাকে। হালকাশীতে ব্যবহারযোগ্য।

খ্যাট্যা১ --- খেটে খাওয়া, পরিশ্রম করা।

খ্যাট্যা২ --- যার ওপর রেখে আঘাত করা হয়।

খ্যাপ্ --- কাজ নিয়ে আসা ও যাওয়ার এক খেপ, দুই খ্যামোতা > ক্ষমতা।

খ্যার্ > খড়।

খ্যারখ্যারা > খড়খড়ে, র‍ুক্ষ।

খ্যারাচি > ধান জাতীয় শস্য।ভাত হিসেবে ব্যবহৃত।

খেল্ত্চে > খেলছে অর্থে।

খ্যালা > খেলা।

খ্যাল্যাম্ > দেখূন খানু।

খোরা --- ছোট বাটি।

খোল্ --- খইল, তেল বের করার পর ছিবড়ে।

খোল্প্যা --- দর্জি, খলিফা।

খোলা --- কিছু ভাজার পাত্র।

খোলি --- মাছ রাখার জন্য বাঁশের খিল দিয়ে তৈরি ঝুর বিশেষ।

গ

গ --- ব্যঞ্জনবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। অর্ধমাত্রা। কণ্ঠধ্বনি। ‘ক’ বর্গের অন্তর্গত।

গইগাঁও --- অজপাড়া গাঁ।

গচ্চা--- ক্ষতি।

গচি --- মাছ বিশেষ।

গছা১ --- হাঁটুর নিচে মাংমপেশী।

গছা২ --- কুপি বা বাতি রাখার কাঠের উঁচুদন্ড।

গজি --- গায়ে দেওয়ার চাদর। (জয়)

গজোব্ --- দূর্যোগ।

গতোর --- দেহ।

গলি১ --- সর‍ুরাস্তা

গলি২ --- নৌকার গুলুই।

গয়না --- গহনা।

গয়েন্দা --- চালবাজ লোক।

গাই --- গাভী।

গাঁইয়া--- গেঁয়ো, পাড়াগাঁয়ের লোক। বোকা-বোকা ভাব বোঝাতেও ব্যবহার হয়।

গাও --- দেহ, শরীর।

গাওত্ --- দেহে শরীরে।

গাওজুরি --- গায়ের জোর দেখানো।

গাঁও --- গ্রাম।

গাঁওত্ --- গাঁয়ে, গ্রামে।

গাঁওত্থিনি --- গ্রামে থেকে।

গাঁওত্হিনি --- দেখুন গাঁওতথিনি।

গাচ > গাছে।

গাদা > গাধা।

গাদি --- স্তূপ কারে রাখা।

গাদোল্ --- দাঁড়িয়া বান্ধা খেলা।

গাঁন্জা --- গাঁজা।

গাব্লা --- গামলা।

গাবার --- মাছ ধরার ডোবা।

গাবিন্ --- গর্ভিনী ; গর‍ু-ছাগলের গর্ভ হওয়া।

গাম্ছা --- গা-মোছা তোয়ালে।

গামোর্ --- ধান পাকার আগের অবস্থা।

গারা --- জলবদ্ধ এলাকা।

গাঁরা --- প্রোথিত করা ; মাটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া।

গারোছ্তো --- গৃহস্থ।

গারিছ্তো --- দেখুন গারিছ্তো।

গাল্শি --- ঠোঁটের দুই কোন।

গাশ্ > গ্রাস।

গির‍্যা --- গাঁট, গ্রন্থি।

গিল্যাশ্ > গ্রাস।

গিল্ত্র‍্যা[১] --- সর্‍রাস্ড়।

গিল্ত্র‍্যা[২] --- নৌকার গলুই।

গয়েন্দা --- চালবাজ লোক।

গাই --- গভী।

গাঁইয়া -- গেঁয়ো, পাড়াগাঁয়ের লোক। বোকা-বোকা ভাব বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।

গাও --- দেহ, শরীর।

গাওত্ --- গাঁয়ে, দেহে, শরীরে।

গাওজুরি --- গায়ের জোর দেখানো।

গাঁও --- গ্রাম।

গাঁওত --- গাঁয়ে, গ্রামে।

গাঁওতথিনি --- গ্রাম থেকে।

গাঁওত্হিনি --- দেখুন গাঁওতথিনি।

গাচ > গাছে।

গাদা > গাধা।

গাদি > স্তুপ করে রাখা।

গাদোল্ --- দাঁড়িয়াবন্ধা খেলা।

গাঁন্জা > গাঁজা।

গাব্লা > গামলা

গাবার > মাছ ধরার ডোবা।

গাবিন্ ---গর্ভিনী; গর্‍-ছাগলের গর্ভ হওয়া।

গাম্ছা --- গা-মোছা তোয়ালে।

গামোর্ --- ধান পাকার আগের অবস্থা।

গারা --- জলাবদ্ধ এলাকা।

গাঁরা --- প্রোথিক করা; মাটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া।

গরোছ্তো --- গৃহস্থ।

গারিছ্তো --- দেখুন গরোছ্তো।

গাল্শি --- ঠোঁটের দুই কোনো।

গাশ্ > গ্রাস।

গির‍্যা --- গাঁট, গ্রন্থি।

গিল্যাশ্ > গ্রাস।

গিল্ত্র‍্যা[১] --- পাকস্থলী।

গিল্যাপ --- শীতের চাদর।

গুচি --- দেখুন গচি।

গুছোল্ --- গোসল, স্নান।

গুটুগুটু --- হা-ডু-ডু খেলা।

গুড্ডি --- ঘুড়ি।

ঘুন্জি গোঞ্জ।

গুনা[১] --- পাপ

গুনা[২] --- চিকন তার।

গুঁরি[১] --- লাথি, পায়ের গোড়ালিদিয়ে আঘাত।

গুঁরি[২] ---আগুন ধরবার জন্য বিশেষভাবে তৈর মণ্ড।

গুল্[৩] --- বিশেষভাবে তৈরি দাঁতের মাজন।

গুল্তানি --- গল্পগুজব করা।

গুল্মারা --- মিথ্যা বলা।

গুল্মাক্ --- ছোট লোহা।

গুল্যাল্ --- ত্রিকোণাকৃতি ডাল, যার সঙ্গে রাবার লাগিয়ে ঢেলা বানিয়ে পাখি মারা হয়।

গুয়া --- সুপারি।

গুয়ামরি --- মিচকি হাসি।

গুশ্‌টি --- বংশ, কুল।

গেছু --- গেছে কিনা জিজ্ঞেস করা অর্থে।

গেচ্‌নু --- গিয়েছিলাম অর্থে।

গ্যাচ্‌নো --- দেখুন গেচ্‌নু।

গ্যাজান্‌ --- আড্ডায়মজে যাওয়া।

গেনু --- গেলাম অর্থে।

গেরো --- বিপদ, বাধা।

গেরোছ্‌তো --- দেখুন গারিছ্‌তো।

গেরোছ্‌তালি --- গৃহস্থালী কাজ।

গেরাম্‌ --- গ্রাম।

গ্যাঁট্যা১ --- বেঁটে, ছোটখাটি বলিষ্ঠ লোক।

গ্যাঁট্যা১ --- বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে লোহার খোলেবারুদ ভরে অগ্নিসংযোগ করে ফোটানো হতো, এখন যা লুপ্ত হওয়ার পথে।

গ্যার‍্যাল্‌ --- গাড়োয়ান।

গ্যান্‌জাম --- গন্ডগোল।

গ্যানো --- গেলাম।

গ্যান্‌দা--- গাঁদা ফুল। ব্যক্তির নামেও ব্যবহৃত হয়।

গ্যাঁর‍্যা --- নপুংসক।

গেল্‌চে --- যাচ্ছে। (জয়)

গ্যাল্‌পারা--- বকাঝকা করা।

গ্যালাম --- দেখুন গেনু।

গোঁতা --- কাদা বা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া।

গোছোল্‌ --- দেখুন গুছোল্‌ ।

গোন্‌দো --- গন্ধ।

গোমা --- বিষাক্ত সাপ বিশেষ।

গোমর্‌ --- গর্ব, দম্ভ।

গোব্‌দা বেমানান রকম মোটা।

গোর্‌ --- কবর।

গোরো --- ফর্সা, গৌরবর্ণ।

গোরোছ্‌তান --- কবরস্থান।

গোল্‌১ --- গোয়াল।

গোল্‌২ --- বল জামে ঢুকিয়ে দেওয়া।

গোল্‌লা১ --- গোলাকার।

গোল্‌লা২ --- শূন্য।

গোল্‌লা৩ --- গোলাকার মিষ্টান্ন বিশেষ।

গোশ্‌ --- গোশ্‌তো, মাংস।

ঘ

ঘ --- ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্থ বর্ণ। কণ্ঠধ্বনি। পূর্ণমাত্রা। “ক” বর্গের অন্তর্ভূত।

ঘরা --- বানানো ছোটঘর। ছোট প্রানীদের বাসস্থান।

ঘরোত্‌ --- ঘরে।

ঘাই --- পানিতে মাছর জোরেশোরে নড়ে ওঠা।

ঘাউর --- করার কাঁদি।

ঘাও --- ফোঁড়া।

ঘাগু --- চাল্‌বাজ লোক।

ঘাঁটা১ --- পথ।

ঘাঁটা২ --- জিনিসপত্র এদিক-সেদিক করা।

ঘাঁটি১ --- ঘন্ট বিশেষ। মুড়ি ঘন্ট।

ঘাঁটি২ --- আস্তানা।

ঘাপ্‌টি --- লুকিয়ে থাকা।

ঘাঁস --- তৃণ।

ঘিউ --- ঘি।

ঘিন্‌জি --- সংকীর্ণ এলাকা।

ঘিন্‌নি --- ছোটদের বিশেষ ধরণের খেলনা, যা গ্রামীণ মেলায় পাওয়া যায়।

ঘুংগুর --- নূপুর।

ঘুংরু --- দেখুন ঘুংগুর।

ঘুঁট্যা --- ঘুটে, শুকনো গোবর, জ্বালানী বিশেষ।

ঘুঁত্‌এ্যা --- গুঁতো, জোরে ধাক্কা দেওয়া।

ঘুপ্‌শি১ --- পতিতা ; নষ্ট মেয়েলোক।

ঘুপ্‌শি২ --- সংকীর্ণ ও অন্ধকার এলাকা।

ঘুরিচ্‌চে --- ঘুরছে।

ঘ্যাংগান্‌ --- কাতরধ্বনি, বারবার চাওয়া।

ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ --- দেখুন খ্যাংগান্‌।

ঘোর্‌মো --- ঘুরবো।

ঘোরোছে --- দেখুন ঘুরিচ্‌চে। (জয়)

ঘোল্‌১ --- পানির সাথে পাতলা করে মেশানো গোলা দই।

ঘোল্‌২ --- অসুবিধায় পড়ে অস্থির হওয়া, বেকায়দায় পড়া। (ঘোল খাওয়া)।

চ

চ১ --- ব্যঞ্জনবর্ণের ষষ্ঠ বর্ণ। তালব্যবর্ণ। 'চ' বর্গের অন্তর্গত। পূর্ণমাত্রা।

চ২ --- যেতে বলা। 'হামার সাতে চ।'

চর্‌ --- হাতের তালু দিয়ে আঘাত করা।

চর্‌মো --- চড়বো। 'হামি গাড়িত্‌ চরমো।'

চর্‌পোটা --- উরু।

চরান১ --- বিচরণ করানো; গরু চরাণ, ছাগল চরাণ।

চরান্‌২ --- চড়-থাপ্পড় দেওয়া।

চরোক্‌ --- আকাশ থেকে পড়া বজ্রপাত।

চরোপ্‌ --- দেখুন চরোক্‌।

চাংগারি --- বড় ঝুরি বিশেষ।

চাওছোনো --- চেয়েছিলাম। (জয়)

চাক্‌রানি --- মেয়ে-দাসী।

চাকা১ --- জিহ্বায় স্বাদ নেওয়া।

চাকা২ --- গাড়ির চাকা। সাইকেল, মটর ইত্যাদির চাকা।

চাকু --- বড় ছুরি।

চাকোর --- ভৃত্য।

চাঁচি --- জ্বাল দেওয়া দুধের অবশিষ্টাংশ, যা কড়াইতে লেগে থাকে। ভাত খাওয়ার পর থালার সাথে লেগে থাকা অংশ।

চাচ্‌চু --- চেয়েছিস। 'তুই কী চাচ্‌চু?'

চাচা --- চাচা মিঞা।

চাচিমা --- চাচি আম্মা।

চাচ্‌নু --- দেখুন চাওচোনো।

চাদ্‌দোর > চাদর।

চান্‌১ --- স্নান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ব্যবহৃত।

চান্‌২ --- চাঁদ্‌

চান্‌দা১ --- চাঁদা মাছ বিশেষ।

চান্‌দা২ > চাঁদা। অর্থ-কড়ি প্রদান।

চাঁটিমারা --- হাতের তালু দিয়ে মাথায় আঘাত করা।

চাটা --- কোন কিছু চেটে নেওয়া।

চাটাই --- দরমা।

চান্‌দি --- ব্রহ্মতালু।

চাম্‌ --- চামড়া।

চামার --- চর্মকার। গালি দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

চাঁর্[১] --- তোলা বা ভাঙার জন্য শক্ত দন্ড দিয়ে চাপ দেওয়া।

চাঁর্[২] --- তাড়া। 'তোর কোমা যাওয়ার চাঁর্ নাই।'

চারি --- গরু-মহিষের খাবার দেওয়ার জন্য বড় আকৃতির মাটির পাত্র।

চাল্[১] --- ঘরের চাল, ছাউনী বিশেষ।

চাল্[২] --- স্বভাব।

চালুন --- অসংখ্য চিত্র সংবলিত চালুনী বিশেষ।

চাশা --- জমিতে চাষ করে যে। নিম্ন শ্রেণী মনে করে অনেক সময় গালি হিসেবেও চালু আছে।

চিক্নাই --- লাবণ্য।

চিক্কোর --- চিৎকার।

চিকিশ্শ্যা --- চিকিৎসা

চিগ্র্যান --- চিৎকার করা।

চিটি > চিঠি।

চিট্যা[১] --- চাউলবিহীন ধান।

চিট্যা[২] --- কাপড়ে ছাতা পড়া দাগ।

চিঁড়্যা --- খাওয়ার চিড়া।

চিপ্ --- জুলফি।

চিপ্এ্যা --- কৃপণ।

চিপ্ট্যা --- দেখুন চিপ্এ্যা।

চিম্শ্যা --- ভ্যাপসা, চিটমিটে গরম।

চিল্ল্যান্ --- দেখুন চিগ্র্যান্।

চিল্এ্যা[১] --- বড় ঘুড়ি।

চিল্এ্যা[২] --- ছাদের ওপরে ছোটঘর, চিলেকোঠা।

চিয়্যার > চেয়ার।

চিয়্যারম্যান > চেয়ারম্যান।

চিঁয়্যার --- বিষাক্ত লম্বা পোকা।

চুকা --- টক্।

চুক্যা --- কাজ শেষ হওয়া।

চুদুরবুদুর --- ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু বলার চেষ্টা।

চুন্নি --- মেয়েচোর।

চুমো > চুমু।

চুব্র্যান্ --- ডোবানো।

চুও --- বিলের মাঝে গর্ত।

চুয়্যা --- ইঁদুর।

চ্যাং --- টাকি মাছ।

চ্যাংটা --- দেখুন চিম্শ্যা।

চ্যাংরা --- ছেলে।

চেংরি --- মেয়ে।

চ্যাক্র্যা --- চাকুরিজীবী।

চ্যাঁচ্ --- দরমা।

চ্যাঁচ্ --- রং করার জন্য বিশেষ পদার্থ।

চ্যাটাং চ্যাটাং --- বিশেষ ধরনের কথা বলার ভঙ্গি ; ঠেশ দিয়ে কথা বলা।

চ্যারড্যা --- চারটে।

চ্যাতা --- রাগ, উত্তেজনা।

চেতে ওঠা --- রেগে যাওয়া।

চ্যাতান্ --- রাগিয়ে দেওয়া।

চ্যাম্চ্যা --- তল্পিবাহক।

চ্যার --- ৪ সংখ্যক।

চ্যারা --- কেঁচো।

চ্যারাগ্ --- বাতি।

চেল্লে --- দেখুন চিয়্যার।

চ্যাল্শা --- খারাপ অবস্থা।

চ্যালা --- সাগরেদ, সঙ্গী।

চোক্ > চোখ।

চোক্এ্যা --- চুলা।

চোঁকা --- তীক্ষ্ণ।

চোকি > চৌকি, চারপায়া

চোকিদার > চৌকিদার।

চোং --- বিশেষ বার্তা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত চোঙ্।

চোগ্লামি --- নিন্দা করা।

চোগোল্খোর --- একের কথা অন্যকে বরে বেড়ায় যে।

চোত্ --- চৈত্র মাস।

চোদ্রি --- পদবী বিশেষ।

চোদ্দো --- ১৪ সংখ্যক।

চোট্টামো --- ছলচাতুরি।

চোপা --- মুখমন্ডল।

চোল্নু --- চললাম অর্থে।

চোশোক্ --- কোন কিছু চুষে নেওয়া।

ছ

ছ --- ব্যঞ্জনবর্ণের সপ্তম বর্ণ। তালব্যবর্ণ। 'চ' বর্গের অন্তর্গত। পূর্ণমাত্রা।

ছক্কা --- ছয়। ৬ সংখ্যা কিছু। ছয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস।

ছট্কা[১] --- ধানগাছেল পোকা বিশেষ।

ছট্কা[২] --- গবাদি পশু তাড়ানোর জন্য দড়ি লাগানো বিশেষভাবে তৈরি ছোট লাঠি।

ছট্ফটানি --- অস্থিরতা।

ছন্ --- তৃণ বিশেষ।

ছনচ্যা --- গ্রামের বাড়ি-ঘরের চিকন গলি।

ছপ্পর্ --- ভাগ্য।

ছল্ --- ছলনা।

ছয়লাব্ --- প্লাবিত হওয়া, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়া।

ছাও[১] --- বাচ্চা, শাবক।

ছাও[২] --- দিক। 'অই ছাও হামার।'

ছাওড়া --- ছেলেটা বা মেয়েটা।

ছাওয়া --- আচ্ছাদন। ঘর ছাওয়া।

ছাঁচি --- দেশি, ছাঁচি পান, সুগন্ধি বিশেষ।

ছাঁচি ত্যাল --- সরষের তেল।

ছাঁট্[১] --- বাতাসবাহিত পানির ছটা।

ছাঁট্[২] --- টুকরা, কাপড়ের ছাঁট ইত্যঅদি।

ছাতি[১] > ছাতা।

ছাতি[২] --- বুক।

ছাতু --- যব, ছোলা, গমের গুঁড়া, যা খাওুয়া হয়।

ছান্দা[১] --- ঘেরাও।

ছান্দা[২] --- ভাগ, অংশ। (জয়)

ছাপোর --- নিচু।

ছালা --- চটের বস্তা।

ছালুবালু --- ইতস্তত।

ছালোন্ --- রান্না করা ব্যঞ্জন।

ছায়া --- পেটিকোট।

ছিঁএ্যা --- ছায়া।

ছিক্যা --- পাটে তৈরি সুদৃশ্য আকৃতির ঝুড়ি যা ঘরের আড়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

ছিক্যান্ --- সর্দি।

ছিক্কো --- ছিঃ ছিঃ করা, ঘৃণা প্রদর্শন।

ছিগ্ন্যাল > সিগ্ন্যাল্, সংকেত।

ছিঁচ্ক্যা --- যে চোর ছেঅটখাট জিনিস চুরি করে।

ছিটকানি --- দরজা বন্ধ করার জন্য বিশেষ যন্ত্র।

ছির‌্যা > ছেঁড়া।

ছিরা --- ছোট জলাশয়। (জয়)

ছিল্ক্যা --- ছাল।

ছিল্যা --- চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া।

ছিল্যান্ > ছিনাল। খারাপ মেয়ে অর্থে।

ছিল্লি --- বাচ্চাদের জেদের কান্না।

ছিশ্‌টি --- সৃষ্টি।

ছুঁচ্‌ছালা --- পুঁতি গন্ধময় পচা নর্দমা।

ছুঁচুবাই --- ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা।

ছুঁচ্যা --- লোহার তৈরি বড় সূচ।

ছুত্যা --- ছল।

ছুতোর --- কাঠমিস্ত্রি।

ছুর‍্যাত্ --- ধারণকৃত আকৃতি।

ছুট্‌কিছ > সুটকেস।

ছেকোল্ > শিকল।

ছেগ্‌রেট্ > সিগারেট।

ছেনি১ --- বাটালি।

ছেনি২ --- জমিতে পানি দেওয়ার জন্য টিনের তৈরি ত্রিকোণাকৃতির পাত্র।

ছেরি --- মেয়ে।

ছ্যাংগা --- বিষাক্ত পোকা জাতীয় সরিসৃপ।

ছ্যাও --- ফাঁক।

ছ্যাওট্ --- পরিধেয় কাটা কাপড়। (জয়)

ছ্যাঁক্ --- ছেঁকা লাগা।

ছ্যাক্‌ছিল্ল্য --- বিব্রতকর।

ছ্যাঁচ --- চালের পানি যেখানে পড়ে।

ছ্যাঁচা১ --- সেচন করা অর্থে

ছ্যাঁচা২ --- থেতলানো কোন জিনিস।

ছ্যাঁচা৩ --- গোটা বাঁশ ছেঁচে তৈরি ঘরের বেড়া।

ছাঁচ্‌রা --- নাছোড়বান্দা।

ছ্যাঁত্ --- বুকের ভিতর ভীতিজানিত অনুভূতি।

ছ্যাঁদ্ --- ছিদ্র।

ছ্যাপ্ --- মুখের থুথু।

ছ্যাব্‌লা --- ভাঁড় টাইপের লোক।

ছ্যারা --- ছেলে।

ছোই --- গরুর গাড়ি বা নৌকার চাল বা ছাদ।

ছোক্‌রা --- ছেলে।

ছোঁচা --- শৌচকার্য করা।

ছোতর --- কলাগাছের আবরণ বা কান্ড।

ছোনো > স্নো।

ছোন্‌নাত --- খৎনা করা। (মুসলিম রীতি)

ছোরা১ --- বালক অর্থে।

ছোরা২ --- বড় ছুরি।

ছোরানি১ --- দেখুন ছোরা২।

ছোরানি২ --- তালাচাবি।

ছোল্ --- ছেলে বা মেয়ে সন্তান। 'হাম্‌রা বোগ্‌র‍্যার ছোল্।'

ছোল্‌কোনা --- ছেলেটা, স্নেহবশত বলা।

ছ্যায়া ছ্যায়া --- থেকে থেকে, বিরতি দিয়ে।

জ

জ --- ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। তালব্যবর্ণ। 'চ' বর্গের অন্তর্গত।

জং১ --- যুদ্ধ।

জং২ --- মরচে।

জংল্যা --- নোংরা বা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা।

জংগোল্১ --- জঙ্গল সম্বন্ধীয় বন।

জংগোল্২ --- আবর্জনা।

জকোন্ > যখন।

জত্‌দিন > যতদিন।

জন্‌না --- মেয়ে।

জন্‌তোনা > যন্ত্রণা।

জন্‌তোর > যন্ত্র।

জবর --- বড় ধরনের কাজ।

জব্‌বোর --- কেউকেটা ; অধিক পরিচিত ব্যক্তি।

জবান্ --- কথা।

জবুনা > যমুনা নদী

জবো --- জবাই।

জল্‌শা --- আনন্দ সম্মেলন, মহফিল।

জলা --- জলমগ্ন নিম্নভূমি।

জলান্[১] --- জ্বালানো, আলো জ্বালানো অর্থে।

জলান্[২] --- জ্বালাতন করা অর্থে।

জাংগি --- হাফপ্যান্ট।

জাংগ্যা --- জাঙ্গিয়া।

জাংলা[১] --- জানালা।

জাংলা[২] --- বাঁশের কঞ্চি বা বাতা দিয়ে তৈরি মাচা যাতে লতানো গাছ বেড়ে ওঠে।

জাংগাল্ --- জমির মধ্যে দিয়ে সরু সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

জা --- দুই ভাইয়ের স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক।

জাও --- দেখুন জা।

জাউ --- নরম ভাত।

জাউর‍্যা --- জারজ।

জাঁকোই --- খালে-বিলে মাছ ধরার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ত্রিকোণাকৃতি ফাঁদ।

জাগির > জায়গীর।

জ্যাত্[১] --- আসল।

জ্যাত্[২] --- জাতি, বর্ণ।

জাত্‌মো --- পেটাবো অর্থে। (জয়)

জাঁত্ --- বিশেষ ধরনের ডোঙ্গা, যা দিয়ে জমিতে পানি দেওয়া হয়।

জাঁত্ --- ডাল বা রবিশস্য ভাঙ্গার জন্য দুই প্রস্থ পাথরের চাকতিবিশেষ, যার উপরের অংশের ছোট গর্তে লাঠি দিয়ে ঘোরানো হয়।

জান্ --- জীবন।

জাব্‌রা --- আবর্জনা (জয়)।

জাম্না --- যাবো না।

জামু --- দেখুন জামো।

জামো --- দেখুন জামু।

জামা[১] --- যমজ। 'করিমের বউএর জামা ছোল্ হছে বারে।'

জামা[২] --- ফ্রক বা শার্ট।

জামির --- লেবু।

জার ---শীত।

জাল্ --- মাছ ধরার জাল।

জাল্ মাছ --- ছেঅট চিংড়ি মাছ।

জালা --- পানি রাখার বড় মাটির কলস।

জালি --- বাঁশের তৈরী ঢাকনা।

জাশুশ --- ধরিবাজ লোক।

জিংক্যা --- যেমন।

জিউ --- দেখুন জান্।

জিকির --- জিগীর; মাতম।

জিগ্‌রি --- গরু বা ছাগলের ভুঁড়ি রান্না করার পর যে অবস্থা।

জিব্‌এ্যা > জিভ।

জির‍্যান্ --- বিশ্রাম নেওয়া।

জিয়্যান্ --- বাঁচিয়ে রাখা।

জুগ্গি > যোগ্য।

জুত্ --- সুবিধা।

জুত্যান্ --- জুতা দিয়ে প্রহার করা।

জুতো > জুতা।

জুদি --- যদি।

জুদিল্ --- দেখুন জুদি।

জুদুল --- দেখুন জুদিল।

জুলি --- দেখুন জুদুল।

জ্যাঁউই --- জামাই।

জেংকা --- দেখুন জিংক্যা।

জ্যান্ --- যেমন।

জ্যাটো > জ্যাঠা, পিতার বড় ভাই, বড় চাচা।

জেপোত্ --- দাওয়াত।

জ্যাব্ --- শার্টের পকেট।

জ্যাল্যা > জেলে।

জেশে --- কড়া, বেশি। 'জেশে আন্দার লয়!'

জ্যাশুই --- স্ত্রীর বড় বোন। জ্যাঠ্শালী।

জোআন --- যাবুক বয়স।

জোঁআল্ --- গরু বা মহিষের গাড়ি বা এই জাতীয় গাড়ি টানার জন্য মোটা বাঁশের তৈরি যে দন্ডটি গরু বা মহিষের ঘাড়ে রাখা হয়।

জোঁক্ --- পানিতে বাস করা রক্তচোষা পোকা বিশেষ।

জোগ্গো > যোগ্য, সঠিক।

জোমি > জমি।

জোলা১ --- যারা সুতো দিয়ে হাতে কাপড় তৈরি করে।

জোলা২ --- রাস্তা বা জমির ধারে পানিবাহিত নালা।

জোলিচ্চে --- জ্বলছে অর্থে।

জোশ্টি --- জ্যৈষ্ঠ মাস।

ঝ

ঝ --- ব্যঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। তালব্যবর্ণ। 'চ' বর্গের অন্তর্গত।

ঝক্মকা --- চকচকে, উজ্জ্বল।

ঝগ্রা --- বাক্বিতন্ডা, বাদ-বিবাদ।

ঝাঁওআ --- গরম বাতাসবাহিত প্রচন্ড উত্তাপ।

ঝাঁওআল্ --- দেখুন ঝাঁওয়া।

ঝাউ১ --- আবর্জনা।

ঝাউ২ --- সুদৃশ্য গাছ বিশেষ।

ঝাঁটা --- ঝাড়ু।

ঝারা১ --- ঝেড়ে ফেলা।

ঝারা২ --- প্রহার করা অর্থে।

ঝারা৩ --- ঝাড়ফুঁক দেওয়া।

ঝারাফেরা --- পায়খানা করা।

ঝারোন১ --- ঝাড়ু দেওয়া।

ঝারোন২ --- প্রহার।

ঝাল্১ --- লংকার তুল্য স্বাদ।

ঝাল্২ --- গালি দিয়ে নিজের উত্তেজনা লাঘব করা।

ঝ্যাওর্যা --- ঝিমিয়ে যাওয়া।

ঝোগ্রি --- ঝগড়া করায় পটু যে মেয়ে।

ঝোরি --- বৃষ্টি।

ঝোরিচ্চে --- ঝরে পড়ছে।

ঝোর্তিচ্চে --- দেখুন ঝোরিচ্চে।

ঝোর্মো --- প্রহার অর্থে।

ঝোরা --- বাঁশ বা ডাল ইত্যাদি ঝোরানো।

ঝোল্ --- তরল ব্যঞ্জন, সুরা।

ঝোলা --- কাপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার বড় ব্যাগ।

ট

ট --- ব্যঞ্জনবর্ণের এগারতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। 'ট' বর্গের অন্তর্গত।

টং[১] --- রেগে অগ্নিমূর্তি হওয়া।

টং[২] --- উঁচু মঞ্চ।

টগ্‌রা --- বড় বড়। টগ্‌রা চোখ।

টন্‌টনা[১] --- টানটান।

টন্‌টনা[২] --- অধীত বিদ্যায় জ্ঞান।

টর্‌টোরি --- বাচ্চাদের খেলনা বিশেষ, গ্রামীণ মেলায় পাওয়া যায়।

টশ্‌টশা --- যে কোন পাকা রসালো ফল।

টাংমো --- টাঙ্গাবো। কোন কিছু টাঙ্গিয়ে দেওয়া।

টাংগামো --- দেখুন টাংমো।

টাংগোন্ --- শহর, টাউন।

টাংগোনোত্ --- শহরে।

টাইট্ দ্যাওয়া --- ঠেঙানো, জব্দ করা।

টাউন্ --- দেখুন টাংগোন্।

টাউনোত্ --- দেখুন টাংগোনোত্।

টাউট --- প্রতারক।

টাউটোমি --- টাউট বা প্রতারকদের কাজ।

টাওর --- প্রচণ্ড রোদে মাথা ঘোরা।

টাটান্ --- টনটনে ব্যথা।

টাল্‌টি-মাল্‌টি --- এদিক-ওদিক করা।

টিং-টিংএ্যা --- সরু, লিকলিকে।

টিউবল্ --- নলকূপ।

টিপ্‌এ্যা --- মর্দন।

টুঁই --- দোচালা বা চৌচালা ঘরের মাথায় টিনদিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়।

টুক্‌রি --- মাটি বা অন্যান্য জিনিস বহনকারী বাঁশ বা বেতের তৈরি ঝুরি।

টুঁটি --- কণ্ঠনালী।

টেংগুল্ --- উস্কে দেওয়া।

টেংর‌্যা --- বদমেজাজী পুরুষ।

টেংরি --- বদমেজাজী মহিলা।

ট্যাংরা --- মাছ বিশেষ।

টেংল্যান্ --- উস্কানো।

টেংশ্যা --- একরোখা ধরনের লোককে বোঝানো হয়।

ট্যাক্ --- পকেট।

ট্যাকা > টাকা।

ট্যাকো --- চুলবিহীন মাথা।

ট্যাটোন্ --- চালাক্‌চতুর।

ট্যাপ্‌ট্যাপা --- বেশি পাকা।

ট্যাপা --- ট্যাপ খাওয়া জিনিস।

টেপি --- নরম-নাদুস চেহারার মেয়েকে এই নামে ডাকা হয়।

ট্যাম্‌না --- টোল খাওয়া।

ট্যারা --- বাঁকা চোখ।

টেরে --- দেখুন ট্যারা।

টেরিবেরি --- এদিক-ওদিক।

টোকা --- জানান দেওয়া।

টোকি --- চলচ্চিত্র, সিনেমা।

টোটা --- বন্দুকের কার্তুজ।

টোগ্‌লা --- ছোট পুট্‌লি।

টোপ্‌লা --- দেখানু টোগ্‌লা।

টোল্[১] --- গালের টোল।

টোল্২ --- পন্ডিত পরিচালিত পাঠশালা।

টোল্৩ --- হাট-বাজার থেকে আদায়কৃত অর্থ।

ঠ

ঠ --- ব্যঞ্জনবর্ণের বারোতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। 'ট' বর্গের অন্তর্গত।

ঠক্ --- প্রতারক, নানা ছলে ঠকায় যে।

ঠন্ঠনা --- শুধু বাজনা, ফাঁকা।

ঠশা --- বধির।

ঠাওর --- মনোযোগ।

ঠাক্মা --- ঠাকুরমা, দাদী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ব্যবহৃত।

ঠাট্ --- ভাবভঙ্গি।

ঠিক্যা --- অল্প সময়ের জন্য নিযুক্তি। (ঠিকা ঝি)।

ঠুন্ক্যা --- হাল্কা।

ঠুশি --- পাতলা ব্যাগ।

ঠ্যাং --- পা।

ঠ্যাংগান্ --- প্রহার, মারধোর করা।

ঠ্যাকা১ --- ঠেকে যাওয়া।

ঠ্যাকা২ --- বাদ সাধা। 'হামার ঠ্যাকা পরিছে ওটি জাবার।'

ঠ্যাটা --- ধূর্ত।

ঠ্যানা --- পর্যন্ত। সীমানা বা এলাকা বোঝাতে। 'এই ঠ্যানা হামার।'

ঠ্যালা --- ধাক্কা।

ঠ্যাশ্ --- জোর।

ঠোংগা --- কাগজের তৈরি প্যাকেট।

ঠোক্না --- আঙ্গুল দিয়ে চিবুকে আঘাত।

ঠোক্কোর --- হোঁচট খাওয়া।

ঠোনা --- দেখুন ঠোক্না।

ঠোশ্ --- মাদুলী।

ড

ড --- ব্যঞ্জনবর্ণের তেরতম বর্ণ। পূর্ণমাত্র। 'ট' বর্গের অন্তর্গত।

ডর্ --- ভয়।

ডাংগোর্ --- বড় হওয়া, সেয়ানা হওয়া।

ডাক্তোর্ > ডাক্তার।

ডাবোর্ --- ধান রাখার জন্য বড় আকৃতির মাটির পাত্র।

ডাঁট্ --- দেমাক।

ডাঁটা --- সরু ডাল, তরকারি বিশেষ।

ডাঁরি১ --- দাঁড়িপাল্লা।

ডাঁরি২ --- পানি প্রবাহের জন্য ঈষৎ প্রশস্ত নালা।

ডাল্ --- বৃক্ষ শাখা।

ডালা১ --- ঝুরি বিশেষ।

ডালা২ --- ঢাক্নি।

ডুক্র্যা --- ডাক ছেড়ে কাঁদা।

ডুক্কি --- ডুব।

ডুক্কি দ্যাওয়া --- পানিতে ডুব দেওয়া।

ডুবিচ্চে --- ডুবছে। 'বেল্ ডুবিচ্চে।'

ডুর‍্যা --- ডুরেকাটা শাড়ি।

ড্যাও --- লাফ দিয়ে পার হওয়া।

ড্যানা > ডানা ; ছোট বাচ্চাদের হাত বুঝানো হয়।

ড্যারক্যা --- ডান্কিনে মাছ।

ড্যাল্ --- মুগ, মসুর ইত্যাদি রবি শস্য।

ডোংগা --- ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত ডিঙি।

ডোবা --- ছোট জলাশয়।

ডোরা --- পাজামার ফিতা।

ডোল্ --- বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি এক ধরণের বড় আকৃতির ঝুড়ি যাতে ধান রাখা হয়।

ঢ

ঢ --- ব্যঞ্জনবর্ণের চৌদ্দতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। 'ট' বর্গের অন্তর্গত।

ঢং --- ন্যাকামি ; ছলাকলা।

ঢংগি --- ঢং করে যে ; ন্যাকামিপন া।

ঢন্ঢনা --- কিছু নেই এমন।

ঢপ্ --- গড়ন।

ঢব্ --- দেখুন ঢপ্।

ঢল্ --- প্রবাহিত জলরাশি।

ঢল্ঢলা --- ঢিলা বা আলগা।

ঢকোন্ ---আবরণ।

ঢিঁকি --- কাঠের তৈরী ধান ভানার যন্ত্র।

ঢিপি --- মাটির স্তুপ।

ঢিম্এ্যা --- দলা ; গুড়ের ঢিমা।

ঢিল্এ্যা --- ঢল্ঢলে।

ঢিঁশ্ মারা --- গরু বা মহিষের শিং- এর আঘাত।

ঢুড্ড্যা --- ভবঘুরে।

ঢেঁকি --- দেখুন ঢিঁকি।

ঢ্যাক্কা মারা --- ধাক্কা মারা।

ঢ্যাংগা১ --- কলা, সুপারি তাল গাছের কান্ডের আবরণ।

ঢ্যাংগা২ --- দীর্ঘকায় বেটপ আকৃতির মানুষ।

ঢ্যাপোশি --- মোটা মেয়ে।

ঢ্যাল্ > ঢিল।

ঢোক্ --- তরল জাতীয় পদার্থ একেবারে গিয়ে ফেলা।

ঢোক্শা --- মাটির পাত্র বিশেষ।

ঢোঁরা১ --- খুঁজে বেড়ানো।

ঢোঁরা২ --- সাপের জাত।

ত

ত --- ব্যঞ্জনবর্ণের ষোলতম বর্ণ। দন্তধ্বনি। পূর্ণমাত্রা। 'ত' বর্গের অন্তর্গত।

তক্তকা --- পরিস্কার, ঝক্ঝকে।

তপন --- লুঙ্গি।

তরপানি --- লাফালাফি।

তল্লা --- বাঁশের জাত।

তাংকুর --- তামাক।

তাঁই --- তিনি।

তাওঅই --- বড় ভাইয়ের শ্বশুর।

তাঁওত্যা --- পাকানো দড়ি।

তাগেরে --- তাদের।

তাম্দারি --- মৃত ব্যক্তির কুলখানি। (জয়)

তাম্কু --- দেখুন তাংকুর।

তামান --- সবকিছু।

তারগেরে --- দেখুন তাগেরে।

তালা১ --- স্তর; একতালা, দুইতালা।

তালা২ --- ঘর আবদ্ধ রাখার তালা।

তালি১ --- ছিন্ন অংশের আবরণ।

তালি২ --- তালি দেওয়া, হাততালি।

তালুক --- সম্পত্তি।

তিত্এ্যা --- তিক্ত।

তিরিক্কি --- উগ্র মেজাজ।

ত্যাজ্ > তেজ।

ত্যাজ্পাতা > তেজপাতা, রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত।

ত্যাঁত্র্যা --- চিকন দড়ি।

ত্যানা --- ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো।

ত্যারো --- তেরো ; ১৩ সংখ্যা।

ত্যাল্ > তেল।

ত্যাল্চাটা --- তেলেপোকা, আরশোলা।

ত্যালানি --- তেল-মশলা দিয়ে ডাল বা তরকারি কড়াইতে ছেড়ে দেওয়া।

তোক্ --- তোকে অর্থে।

তোকথ্নি --- তোর কাছ থেকে।

তোমাক্ --- তোমাকে।

তোমাক্থিনি --- তোমার কাছ থেকে।

তোমাগেরে --- দেখুন তাগেরে।

তোবিল্ --- মজুদ টাকা।

তোর‍্যাজাল্ --- মাছ ধরার জাল।

থ

থ১ --- ব্যঞ্জনবর্ণের সতেরতম বর্ণ। দন্তধ্বনি।

থ২ --- হতবাক হওয়া।

থল্এ্যা --- থলি।

থাক্১ --- থাকতে বল।

থাক্২ --- স্তর।

থাক্মো --- থাকবো অর্থে।

থামিচ্চে --- থামচে অর্থে।

থামেক্ --- থামতে বলা।

থাল্ > থালা।

থালি --- দেখুন থাল্।

থিত্ --- টের পাওয়া।

থুচ্চি --- রাখচি অর্থে।

থুছি --- রেখেছি অর্থে।

থুত্নি --- চিবুক।

থুয়্যা --- রেখে।

থ্যাক্যা --- হতে।

থ্যাক্না --- আছাড় খাওয়া, পতিত হওয়া।

থ্যাব্রা --- চ্যাপ্টা।

থো --- রাখ্ অর্থে।

থোআ --- রাখা।

থোই --- তল, সীমা, তলদেশ।

থোঁতা১ --- বিকৃত, বিদীর্ণ মুখমন্ডল। ‘তোর থোঁতা মুক ভোঁতা করে দেমো।’

থোঁতা২ --- থুত্নী।

থোঁপ্ --- গুচ্ছ ; বাঁশের থোপ্।

থোর্ --- কলার মুচি মোড়ানো যে অংশ।

দ

দ১ --- ব্যঞ্জনবর্ণের আঠারোতম বর্ণ। দন্তধ্বনি। পূর্ণমাত্রা। ‘ত’ বর্গের অন্তর্গত।

দ২ --- গর্ত।

দও --- বিলের মধ্যে গর্ত।

দওত্ --- গর্তে।

দজ্জাল --- দুরন্ত অত্যাচারী।

দম্ --- শ্বাস-প্রশ্বাস।

দর্মা১ --- চাঁচ।

দর্মা২ --- দাম, মূল্য।

দলা১ --- পিন্ড।

দলা২ --- মর্দন করা।

দর‍্যাত্ --- দরিয়ায়, নদীতে।

দাছ্তো --- পায়খানা।

দাপা --- দল।

দাপান্ ---ছটফট করা।

দাব্রান্ --তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

দামান্ --- জামাই।

দাম্‌রা --- এঁড়ে বাছুর। উঠতি যুবককেও সম্বোধন করা হয়। 'দামরা ছেলে।'

দার্‌গা্ --- দারোগা।

দিংল্যা --- দীর্ঘ।

দিচু ---দিয়েছিস।

দুআরোত্ --- দুয়ারে।

দুওর ---দরোজা।

দুকক্যো > দুঃখ।

দুক্‌ন্যা --- দুইখানা, দুইজন।

দুকান > দোকান।

দুগ্‌গা > দুর্গা (দেবী)

দুদ্ > দুধ।

দুন্‌এ্যা --- দুনিয়া, পৃথিবী।

দুব্‌ল্যা --- দুর্বা ঘাস।

দুর‍্যা --- কচ্ছপ।

দুলামিয়া --- দেখুন দামান্।

দেখিচ্‌চি --- দেখছি অর্থে।

দ্যাও১ --- দিতে বলা।

দ্যাও২ --- দৈত্য।

দ্যাওর --- দেবর।

দ্যাওআ -- মেঘ।

দ্যাক্‌মো --- দেখবো অর্থে।

দ্যাক্‌মোহিনি --- দেখবো ক্ষণ অর্থে।

দ্যাক্‌না --- দেখার মতো।

দ্যাঁত্যা --- দাঁত উঁচু ব্যাক্তি।

দ্যাঁত্‌লা --- দেখুন দ্যাঁত্যা।

দ্যাদ্‌মা --- দাদীমা।

দেম্‌না > দেবনা অর্থে।

দেমো > দেব অর্থে।

দেমোনি --- দিতে চাওয়া অর্থে।

দ্যামাক্ > দেমাগ, গর্ব।

দেল --- হৃদয়।

দ্যার্ > দেড়খান।

দ্যার‍্যা --- দাড়িওয়ালা ব্যাক্তি।

দ্যাশ > দেশ।

দেশি --- দেশবাসী, স্বদেশজাত।

দোআন্ --- দোহানো।

দোই > দই, দধি।

দোক্‌ন্যা --- দক্ষিণ দিক। দক্ষিণ এলাকার অধিবাসী।

দোছ্‌তো --- বন্ধু।

দোছ্‌তালি --- বন্ধুত্ব।

দোজবরে --- দ্বিতীয়বার বিয়ে করা ব্যক্তি।

দোন্ --- বড় চাঙারি।

দোনা --- খাদ্যনালি।

দোনোমোনো --- দোদুল্যমানতা, সংশয়।

দোপর্ --- দুপুরবেলা।

দোম্ --- দৌড়।

দোম্‌মারা --- দৌড় দেওয়া।

দোরি > দড়ি।

ধ

ধ --- ব্যঞ্জনবর্ণের উনিশতম বর্ণ। অর্ধমাত্রা। 'ত' বর্গের অন্তর্গত।

ধকল --- ধাক্কা, উৎপাত, সহ্যক্ষমতা।

ধক্‌ধক্ --- একানা শব্দ, হৃদস্পন্দনের শব্দ।

ধত্‌তো --- ধরতো, ধরতে বলা।

ধন্ --- সম্পত্তি।

ধন্না > ধর্ণা; ধর্ণা ধরা।

ধন্চে --- জমির আলে লাগানো লম্বা পাতাযুক্ত গাছ।

ধন্এ্যা > ধনিয়া, মশলার জাত।

ধম্মো > ধর্ম।

ধরা১ --- পৃথিবী।

ধরা২ --- ধরে ফেলা।

ধরা৩ --- পাঁচ সেরে ১ ধরা।

ধলা --- ফর্সা, শাদা।

ধাউর --- চতুর।

ধাউর‍্যা --- দেখুন ধাউর।

ধাপ্পা --- প্রতারণা।

ধান্দা১ --- ধাঁধাঁ।

ধান্দা২ --- খুঁজে বেড়ানো।

ধাবার --- ধাওয়া করা।

ধামা --- বড় চাঙারি।

ধুও --- ফাঁকা।

ধুক্ধুক্ --- অস্থিরতা ইত্যাদির প্রকাশ।

ধুত্তোরি --- বিরক্তি প্রকাশ করা।

ধুম্রি --- মোটা মেয়ে।

ধুম্সী --- দেখুন ধুম্রি।

ধুর্এ্যা --- গরুর গাড়ি বা এই জাতীয় গাড়ির যার ওপরে অবস্থান।

ধ্যান্দা --- মাছ বিশেষ।

ধোন্১ --- শিশ্ন।

ধোন্২ --- আদরের সম্বোধন। 'কেংকা আছু ধোন্?'

ধোম্ --- চুপ।

ধোম্মারা --- চুপ করা। 'তুই ধোম্মার্।'

ধোরিচ্চি --- ধরছি।

ধোরতিচ্চি --- দেখুন ধোরিচ্চি।

ধোলাই১ --- প্রহার।

ধোলাই২ --- ধোয়া অর্থে। কাপড় ধোলাই।

ন

ন --- ব্যঞ্জনবর্ণের বিশতম বর্ণ। দন্তধ্বনি। পূর্ণমাত্রা। নাসিক্যধ্বনির পর্যায়ের। 'ত' বর্গের অন্তর্গত।

নক্ --- চুপ।

নক্কর্ --- চুপ থাকতে বলা।

নকুল --- খাওয়া। (জয়)

ননোদ্ > ননদ। স্বামীর বোন।

নম্লা > নরম অর্থে।

নম্বা > লম্বা।

নবোন্ > লবন।

নাং --- উপপতি অর্থে। মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সময় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

নাংল্যা --- জমিতে নিড়ানি দেওয়ার বিশেষ যন্ত্র।

নাংগোল্ > লাঙ্গল।

নাইওর --- বিবাহিতা মেয়ের বাবার বাড়িতে যাওয়া।

নাই --- নাভী।

নাইক্যা > নায়িকা।

নাউ > লাউ।

নাএর --- দেখুন নাইওর।

নাগাল্১ --- মতো।

নাগাল২ --- থৈ পাওয়া।

নাগিছে --- লাগ্ছে।

নাদি --- ছাগলের পায়খানা।

নাল্ > লাল।

নিংরানি --- শেষ তলানী।

নিওত্ --- ইচ্ছা।

নিওর --- শিশির।

নিক্এ্যা > নিকা। পুনরায় বিবাহ।

নিক্যারি --- তরকারি বিক্রেতা।

নিকি --- নাকির রূপ। ‘তুই যাবু নিকি?’

নিন্[১] --- নিদ্রা

নিন্[২] --- গভীর গর্ত।

নিন্দোত --- ঘুমিয়ে থাকা।

নিন্পারা --- নিদ্রা যাওয়া, ঘুমানো।

নিন্দ্যা --- নিন্দা।

নিনু --- নেওয়া অর্থে।

নিম্কি --- নোন্তা জাতীয় খাদ্য বিশেষ।

নিশ্এ্যা > নেশা।

নুছ্নি --- রান্না করা পাতিলের কাঁধ মোছার সংক্ষিপ্ত কাপড়।

নুন্ --- দেখুন নবোন।

নুনু --- শিশ্ন ; ছোট ছেলে-সন্তানদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

নেংটি --- স্বল্প বস্ত্র কোমরে পেঁচিয়ে পরা।

নেংগুর্ --- লেজ।

ন্যাংটা --- উলঙ্গ।

ন্যাংগোরভ্যাংগোর --- ঢং করা।

ন্যাংরা --- খোঁড়া।

নেবু > লেবু।

ন্যাও --- নাও, নিতে বলা।

ন্যাকা --- সাধুতার ভানকারী।

ন্যাক্রা --- ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা।

ন্যাকাপরা > লেখাপড়া।

ন্যাজ > লেজ।

ন্যাতা > নেতা।

ন্যাদ্ন্যাদা --- বেশি পাকা।

ন্যাশ্মা --- দুর্বল।

নেমো --- নেব।

নেম্না --- নেব না।

নেমোনি --- পরে নিতে চাওয়া।

ন্যান্ --- নিতে বলা।

ন্যাপা > লেপা।

নেমোন্তন্নো > নিমন্ত্রণ।

নোআ > লোহা।

নোক্ > নখ।

নোকশান্ > লোক্সান।

নোন্দ্যা --- ননদের স্বামী।

নোন্তা --- লোনা স্বাদযুক্ত।

নোনা --- দেখুন নোন্তা।

নোম্না --- দেখুন নেম্না।

নোমো --- দেখুন নেমো।

প

প --- ব্যঞ্জনবর্ণের একুশতম বর্ণ। ওষ্ঠধ্বনি। অর্ধমাত্রা। ‘প’ বর্গের অন্তর্গত।

পওর --- প্রহর।

পক্টোত্ --- পকেটে। ‘তোর পক্টোত্ কয় ট্যাক্যা আচে?’

পগার --- সীমানা।

পট্ --- দ্রুততার সাথে।

পটান্ --- রাজী করানো।

পত্যান্ --- পায়ের দিক।

পবা --- পাবদা মাছ।

পর্‌তা --- সুবিধা।

পরাটা --- ঘিরে ভাজা রুটি।

পরান্ > প্রাণ।

পরার --- অপরের।

পরোব্ --- পর্ব; উৎসব।

পল্ --- খড়

পলের পালা --- খড়ের পালা।

পলা১ --- পয়লা।

পলা২ --- পলি এলাকার ‘বাসিন্দা।’

পলা৩ --- পালিয়ে যেতে বলা।

পশ্‌টো > স্পষ্ট।

পশা > পয়সা।

পশোম্ > পশম।

পা১ --- আপার সংক্ষিপ্ত রূপ। বিনাপা, রিনাপা।

পা২ --- পদযুগল।

পাঁউরো --- রোদে শুকনো ধান একত্র করতে কাঠের তৈরি একটি তক্তা যা সঙ্গে একটি লম্বা লগি থাকে যা দিয়ে টানা হয়।

পাঁউশ --- আবর্জনা ফেলার জায়গা।

পাঁউউটি > পাউরুটি।

পাঁইতিরিশ > পঁয়ত্রিশ সংখ্যা, ৩৫।

পাওত্ --- পায়ে। ‘হামি তোর পাওত্ পরি, হামাক বাঁচা!’

পাক্১ --- পরিস্কার হওয়া বা থাকা।

পাক্২ --- রান্না।

পাক্৩ --- প্যাচ দেওয়া।

পাগ্‌রান --- ঘোরা।

পাগ্‌লা --- উন্মাদ।

পাগার --- জমির সীমানা নির্দেশক খাত।

পাগোল্ --- দেখুন পাগলা।

পাগ্‌লী --- উন্মাদিনী।

পাঁচন --- নিড়ানি।

পাঁচি --- প্রাচীর।

পাঁচিল্ --- দেখুন পাঁচি।

পাছ্‌নো --- পেয়েছিলাম অর্থে।

পাছা --- নিতম্ব।

পাছাব্যালা --- বিকেলবেলা।

পাচু --- পেয়েছিস অর্থে।

পাজি --- দুষ্ট অর্থে।

পাঁজি --- ঠিকুজি।

পাট --- পর্ব বা পর্যায়।

পাটা১ --- রান্নার উপকরণ পেষার জন্য বিশেষ আকৃতির পাথর।

পাটা২ --- সাহস, বুকের পাটা।

পাটি --- মাদুর বিশেষ।

পাট্‌টি --- দল।

পান্‌টি --- ছোট লাঠি।

পান্‌তা --- পানিতে ভিজিয়ে রাখা বাসি ভাত।

পানান্ --- দুধ দোহানোর আগে বাছুর দিয়ে গাভীর স্তনে দুধ পূর্ণ করা।

পাত্‌তোরো --- বিয়ের বর।

পাত্‌তিরি --- বিয়ের কনে।

পাতান্ --- চিটা ধান।

পাঁতার --- পান্তর ; খোলা মাঠ।

পাতাল১ --- প্রস্থ।

পাতাল২ --- মাটির নিচের।

পাদ্ --- বাতকর্ম।

পানো ---পেলাম অর্থে।

পামো --- পাবো অর্থে।

পার্‌ল্ --- পারলি অর্থে।

পার্‌বোন্ > পাবন ; পর্ব।

পারাগাঁও > পাড়াগাঁ ; পিছিয়ে পড়া গ্রাম।

পারিচ্‌চি --- পারছি অর্থে।

পারতিচ্‌চি --- দেখুন পারিচ্‌চি।

পারাপারি --- তাড়াহুড়া করা।

পাল্‌লা১ --- দরোজা।

পাল্‌লা২ --- দাঁড়ি-পাল্লা।

পালা১ --- পালন করা।

পালা২ --- পালিয়ে যেতে বলা।

পালা৩ --- স্তুপ।

পালু১ --- দেখুন পারলু।

পালু২ --- কি পেলি অর্থে।

পিচ্‌চি --- অল্পবয়স্ক ছেলে।

পিছ্‌ল্যা --- পিছল।

পিগ্‌লুচ --- অল্পবয়স্ক চালাক-চতুর ছেলে।

পিত্‌এ্যা --- তিক্ত।

পিত্‌ল্যা --- পিতল জাতীয়।

পিত্‌র‍্যাজ --- এক ধরনের গাছ, যে গাছে কালো গোটা ফল ধরে, ফল থেকে তেল হয়।

পিট্‌এ্যা > পিঠা।

পিন্‌দ্যা --- পরিয়ে দেওয়া অর্থে।

পিরিজ > পিরিচ্।

পিরিত্ --- প্রেম।

পির‍্যান্ --- জামা।

পির‍্যা --- পিঁড়ি।

পিলাই --- পিলে।

পিশ্‌ট্যা > পৃষ্ঠা।

পিশি --- পিতার বোন। (হিন্দুরীতি)

পিশ্যা --- পিশির স্বামী। (হিন্দুরীতি)

পুঁইয়্যা --- ছোট।

পুঁইয়াচেলা --- কৃপণ। (জয়)

পুঁইয়াচোকে --- ছোট-ছোট চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পুছ্ --- জিজ্ঞাসা।

পূব > পূর্ব।

পুব্‌এ্যা --- পূর্ব এলাকার অধিবাসী।

পুর্‌পুরি --- চচ্চড়ি।

পুশ্ --- পৌষ মাস।

পুশ্‌ন্যা --- পৌষ মাসে নানাধরনের পিঠা খাওয়ার আয়োজন।

পুশ্‌শি --- পোষ্য।

প্যাংগ্যা --- খোঁড়া বা ঢেড়া লোক।

প্যাংশ্যা --- পাংশু, বিবর্ণ।

প্যাগ্‌না --- ঘ্যানঘ্যান করা, বিরক্ত করা।

প্যাচাল --- বেশি কথা বলা।

প্যাচ্যা --- পেয়েছ অর্থে।

পেজ > পেঁয়াজ।

প্যাট্ > পেট।

পেটান্ --- প্রহার।

পেটি --- মাছের পেটের অংশ ; কাপড়ের গাঁট।

পেন্‌দা --- পরা।

পেন্দেক্ --- জামা-কাপড় পরতে বলা অর্থে।

প্যান্ > প্যান্ট।

পেনি --- বাচ্চাদের জামা।

প্যান্শ্যা --- ফ্যাকাশে।

পেন্নাম্ > প্রণাম (হিন্দুরীতি)।

প্যালা --- খারাপ অবস্থা বোঝাতে। 'আজ প্যালা দিবিহিনি!'

প্যালাজাল্ --- বাঁশ ও জাল সহযোগে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ।

প্যাল্ল্যা --- পাতিল।

পেশাব --- প্রসাব ; মূত্র।

পোংগা --- পাছা।

পোঁআতা --- ভেঅরবেলা। (জয়)

পোঁআতাতারা --- প্রভাতি তারা। (জয়)

পোআতি --- গর্ভবতী রমণী।

পোআন্[১] --- সহ্য করা।

পোআন্[২] --- রোদ বা আগুন পোহানো।

পোকর --- পুকুর। (জয়)

পোকুর --- দেখুন পোকর।

পোচ্চিম্ > পশ্চিম।

পোচ্চিম্যা --- পশ্চিম এলাকার অধিবাসী।

পোঁচ্পাননো > পঞ্চান্না, ৫৫ সংখ্যক।

পোঁচ্চল্লিশ্ > পঁয়তাল্লিশ, ৪৫ সংখ্যক।

পোছা --- জিজ্ঞাসা করা।

পোঁটা --- নাকের শুকনো শ্লেষ্মা।

পোট্এ্যা --- পৈঠা ; বারান্দা।

পোট্টি[১] --- আঘাতযুক্ত জায়গায় জড়াবার জন্য মোটা কাপড়ের ফালি।

পোট্টি[২] --- এলাকা। প্রেসপট্টি, ডালপট্টি।

পোত্ত্যা --- মরিচ।

পোদদি --- পদবী।

পোন্তা --- দেখুন পানত্।

পোনত্ব্যালা --- সকালবেলা।

পোন্রো --- ১৫ সংখ্যা।

পোরিচ্চি --- পড়ছি অর্থে।

পোরতিচ্চি --- দেখুন পরিচ্চি।

পোর্জাপতি --- প্রজাপতি।

পোর্থম --- প্রথম।

পোর্তিমা --- প্রতিমা।

পোরিক্ক্যা --- পরীক্ষা।

পোরিবার --- স্ত্রীকে বোঝানো হয়।

পোলা --- পোলাও।

পোল্লা --- পটল, তরকারি বিশেষ।

পোলি --- বাশেঁর খিল দিয়ে তৈরী কাদাযুক্ত কম পানিতে মাছ ধরার ফাঁদ।

পোশব > প্রসব হওয়া।

পোশ্মি --- পশমযুক্ত কাপড়।

ফ

ফ --- ব্যঞ্জনবর্ণের বাইশতম বর্ণ। ওষ্ঠধ্বনি পূর্ণমাত্রা। 'প' বর্গের অন্তর্গত।

ফককা --- ফাঁকা।

ফক্কর্ --- প্রগলভ, ধড়িবাজ লোক।

ফট্ফটা --- পরিষ্কার।

ফটো --- ছবি।

ফটোরফটোর --- অকারণে বেশি কথা বলা।

ফদ্দি --- ফর্দি, জিনিসের তালিকা।

ফাও --- অতিরিক্ত পাওয়া।

ফাক্‌শা --- মাকড়সার ঝাল-ঝুলকালি সহযোগে অপষ্কার জায়গা।

ফাগুন --- ফাল্গুন মাস।

ফাজ্‌ল্যামি --- বখাটেপনা।

ফাজ্‌িল --- বখাটে।

ফাত্‌রা --- খারাপ লোক, বাজে কথা।

ফান্‌দ > ফাঁদ।

ফাঁপোর --- অস্থির বোধ হওয়া। ‘হামার কোমা খুব ফাঁপোর হচে।’

ফাঁরা[১] --- চেরা।

ফাঁরা[২] --- মৃত্যুযোগ।

ফাল্‌তু --- তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত।

ফাশ্‌কতা --- খারাপ কথা।

ফিঁকর্‌্যা --- থেকে থেকে রান্না।

ফিরিজ --- ফ্রিজ।

ফুক্‌কি --- লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা। (জয়)

ফুট্‌এ্যা --- ছিদ্র।

ফুট্যানি --- অহঙ্কার।

ফুবু > ফুফু। (জয়)

ফুশুরফুশুর --- চুপি চুপি কথা বলা।

ফেঁউশ্যা --- পাটের আঁশ।

ফ্যাক্‌রা --- বাধা বা গোলমাল।

ফ্যাচাং --- দেখুন ফ্যাক্‌রা।

ফ্যাটান্‌ --- নেড়ে নড়ে পেলা।

ফ্যাঁপ্‌রা --- নারকেলের ভেতরের শ্বাস।

ফেঁশ্‌এ্যা --- দেখুন ফেঁউশ্যা।

ফোউত --- শেষ হওয়া।

ফোঁকর --- ফাঁক।

ফোক্‌রান্‌তি --- ফকির দিয়ে তুক্‌তাক্‌ করা।

ফোকির --- ভিখারি।

ফোকিন্‌নি --- ভিখারিনী।

ফোকিন্‌নি --- দেখুন ফোকিন্‌নি।

ফোচ্‌কা --- বাচাল।

ফোট[১] --- ঘা, ফোঁড়া।

ফোট[২] --- ভাগিয়ে যেতে বলা।

ফোট্‌এ্যা --- অকাজের লোক।

ফোত্‌ --- দেখুন ফোউত্‌।

ফোত্‌এ্যা[১] --- মৃত ব্যাক্তির কুলখানি।

ফোত্‌এ্যা[২] --- কপর্দকহীন ব্যাক্তি।

ফোতুর --- দেখুন ফোত্‌এ্যা[২]

ফোন্‌দি --- বুদ্ধি।

ফোঁরা --- দেখুন ফোঁট্‌[১]

ফোর্‌এ্যা[১] --- পাখির পলক।

ফোর্‌এ্যা[২] --- ফড়িয়া, পাইকার।

ফোশ্‌কা[১] --- জলীয়দ্রব্যপূর্ণ স্ফীত ত্বক

ফোশ্‌কা[২] --- ক্রোধপূর্ণ আচরণ। ‘হামার কতাত্‌, তোর গাওত, ফোশ্‌কা পরে ক্যা?

ব

ব --- বর্গীয় ব। ব্যঞ্জনবর্ণের তেইশতম বর্ণ। ওষ্ঠধ্বনি পূর্ণমাত্রা। ‘প’ বর্গের অন্তর্গত।

বএ্যা --- বেয়ে।

বএ্যাম্‌ --- চিনামাটির নির্মিত বোতল।

বজা --- মাছের ডিম।

বজ্‌জাত --- দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

বত্‌তা --- জীবিত।

বদ্‌না --- পানির পাত্র বিশেষ।

বনা --- মনের বা মতের মিল হওয়া।

বনাবনি --- দেখুন বনা।

বন্‌দোক > বন্ধক। ঋন গ্রহণের জন্য কোন জিনিস রক্ষিত রাখা।

বর্‌ভান্‌ --- সকাল। (জয়)

বর্‌গা --- ভাগে চাষযগ্য জমি বা তার বন্দোবস্ত।

বরগাদার --- যে অন্যের জমি ভাগে চাষ করে।

বরাং --- অহঙ্কার। (জয়)

বলোক্‌ --- উথলে ওঠা। ভাতের বলক।

বলোদ --- দামড়া গরু।

বরোপ্‌ --- বরফ।

বশ্‌শি --- বড়্‌শি।

বশন্‌ --- প্রহার করা অর্থে।

বয়রা --- কানে কম শোনে যে।

বা[১] --- সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘আজগ্য চাউল কতো কর‌্যা বা?’

বা[২] --- বাবা।

বাঁ --- বাম।

বাংগালি[১] --- বাঙালি জাতি।

বাংগালি[১] --- বাঙালি নদী। সারিয়াকান্দি উপজেলা পশ্চিমপাড়া দিয়ে প্রবাহিত।

ব্যাং --- ভার বহনকারী বিশেষভাবে তৈরী বাঁশের লাঠি।

বাই --- বাতিক।

বাইকারা --- বের করা।

বাইমারা --- বাতকর্ম করা।

বাউর --- ঘূর্ণি বাতাস।

বাউরুল --- চৈত্র-বৈশাখের ধূলিঝড়। (জয়)।

বাঁউশ্যা --- ফালতু, তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত।

বাঁও --- দেখুন বাঁ।

বাঁওশানো --- গা থেকে পানি শুকানো। (জয়)

বাগুন --- বেগুন।

বাগ্‌রু --- বর (বিয়ের পাত্র)। (জয়)

বাচ্চা[১] --- শিশু সন্তান, পশু-পাখির ছানাকেও বোঝায়।

বাছুর --- গোবৎস।

বাজ[১] --- বজ্র।

বাজ[২] --- শিকারী পাখি বিশেষ।

বাজান --- দেখুন বা[২]

বাজারোত্‌ --- বাজারে।

বাজ্‌জি --- মল।

বাজিচ্‌চে --- বাজছে অর্থে।

বাত্‌শা[১] --- বাদশা, রাজা।

বাতশা[২] --- চিনির তৈরী হালকা জাতীয় বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন।

বাতা --- কিনারা। (জয়)

বাত্‌তি --- পোক্ত।

বাতান্‌ > বাথান, যেখানে গরু-মহিষ রাখা হয়।

বাদ্‌লা --- বর্ষাকালের বৃষ্টি।

বাদা --- বিস্তীর্ণ জলভূমি।

বাদাম[১] --- নৌকারপাল।

বাদাম[২] --- চীনাবাদাম।

বাদাম[৩] --- বড় গাছ- বাদাম, বাতাবি লেবু।

বান্‌ --- বন্যা।

বান্‌জি --- বন্ধ্যা।

বান্‌দি --- বাঁ।

বান্‌দোর --- বাবা। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হ‍‌‌ে দেখা যায়। 'ক্যা ছকিনার বাপ্' আজ হাটোত্ য্যাবা না?'

বাপ্‌জান --- দেখুন বাপ্।

বাপোক্ --- বাবাকে।

বাবা --- পিতা।

বা-বা --- বাহবা দেওয়া।

বারাবানা --- ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া।

বারানি --- লজ্জাহীন নারী। (জয়)

বারামো --- বের হবো অর্থে।

বাল্‌টি --- বাল্‌তি।

বালা --- বালিকা।

বালু --- বালি।

বালুশ্ > বালিশ।

বাশ্‌কো > বাক্স।

বাশ্‌না --- গন্ধ।

বাশা > বাসা, বসতবাড়ি।

বায়না১ --- মূল্যের অগ্রিম প্রদত্ত অংশ।

বায়না২ --- আবদার।

বিচি --- ফলের ভিতরের অংশ।

বিছ্‌ন্যা > বিছানা।

বিছ্যান্ --- বিছানো, ছড়িয়ে, ছিটিয়ে দেওয়া।

বিছোন্ --- ধানবীজ, যা থেকে চারা উৎপন্ন হয়।

বিছ্যা১ --- মেয়েদের কোমরের অলঙ্কার বিশেষ।

বিছ্যা২ ---বৃশ্চিক, বিষাক্ত পোকা।

বিজ্‌ল্যান্ --- বানর।

বিজ্‌লি --- বিদ্যুৎ ।

বিতিকিচ্‌চি --- বিচ্ছিরি।

বিদ্‌বা --- বিধবা।

বিটি --- মেয়ে-সন্তান।

বিটিছোল্ --- দেখুন বিটি।

বির‍্যা১ --- খড় দিয়ে পাকানো জিনিস, যার উপর মাটির পাত্র রাখা হয়।

বির‍্যা২ --- আঁটি, পানের বিড়া।

বির‍্যান্১ --- জনশূন্য।

বির‍্যান্২ -- তেল-লবন-হলূদ সহযোগে রান্না করা বাসি ভাত।

বির‍্যানী --- ঘি, আতপ-চাল ও মাংস মিশ্রিত রান্না করা খাদ্য।

বিল --- জলমগ্ন নিম্নভূমি।

বিল্যা --- চাউর হওয়া।

বিল্যাই --- বিড়াল।

বিশ্ --- কুড়ি সংখ্যা।

বিশ্‌টি > বৃষ্টি।

বিশ্‌নি --- হিংসুটে রমণী।

বিশ্‌শোদ্‌বার --- দেখুন বিশ্‌শোদ্‌বার।

বিশুদ্‌বার --- দেখুন বিশুদ্‌বার।

বিয়্যা --- বিয়ে, বিবাহ।

রিয়্যাই --- পুত্র-কণ্যার শ্বশুর।

বিয়্যান্১--- ভোরবেলা।

বিয়্যান্২--- প্রসব করা।

বিয়্যান্৩--- পুত্র-কণ্যার শাশ্বড়ী।

বু --- বুবুর সংক্ষিপ্ত রূপ, জোশ্‌নাবু, জরিনাবু।

বুজি --- বোন।

বুদ্দি --- বুদ্ধি

বুন্ --- দেখুন বুজি।

বুন্দি --- আগুনসহ খড়ের বেণী।

বুন্দ্যা --- বুঁদিয়া, মিষ্টান্ন দ্রব্য।

বুন্জ্যা --- বন্ধ করে দেওয়া।

বে --- সম্বোধন, তুচ্ছার্থে। "যা -বে তুই কি জানিশ্?

বেউল্যা --- বেহুলা।

বেংট্যা --- বাঁকা।

ব্যাক্ --- সব।

ব্যাকগুলো --- সবগুলো।

ব্যাঁক ---বাঁকা।

ব্যাগার্ --- বিনা বেতনের কাজ।

ব্যাঘ্যার‌্যা --- স্বভাবে বাঁকা ধরণের মানুষ।

ব্যাঁচা --- বিক্রয়।

ব্যাচে --- ব্যাচে - বেছে বেছে।

ব্যাজার --- মন খারাপ করা। বিমর্ষ হওয়া।

ব্যাজন্মা --- জারজ, খারাপ গালি।

ব্যাদ্যা --- যাযাবর জাতি বিশেষ।

ব্যাদো্প > বেয়াদব।

ব্যাদ্না --- ব্যথা।

ব্যাটা --- ছেলে সন্তান।

বেটি১ --- মেয়ে সন্তান।

বেটি২ --- কাজের মেয়ে।

ব্যাঁটএ্যা --- বেঁটে।

ব্যাত্ --- বাড়ি।

ব্যান্ --- বোধ হয়। 'হামি ব্যান্ আম যাই ন্যা।'

ব্যান্দ্যা --- বেঁধে ফেলা। 'ওক্ ব্যান্দ্যা থো।'

ব্যান্কার --- সকালবেলার।

ব্যান্বেলা --- ভোরবেলা।

বেন্চি --- বেঞ্চ।

বেন্নে --- যার কিছু নাই।

ব্যানে --- বণিক।

ব্যাপর্দা --- পর্দাহীন।

ব্যাপারি --- ব্যবসায়ী, বেপারী।

ব্যাভাগ্যা --- ভাগে না পড়া।

ব্যাভার --- ব্যবহার।

ব্যামাক্ --- সব। 'চোর ব্যামাক্ লিয়্যা গেছে।

ব্যাবাক্ --- দেখুন ব্যামাক।৷

ব্যাব্শা > ব্যবসা।

ব্যারা > বেড়া, ঘেরাটোপ।

বেঁরি > বিড়ি।

ব্যারাম --- অসুখ।

বেরাশ্ > ব্রাশ।

বের্জাল --- পুকুরে মাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনের জাল।

ব্যাল্ --- বেল, ফলবিশেষ।

ব্যালা১ > বেলা, সময় বিশেষ।

ব্যালা২ > রুটি বেলানো।

ব্যালাবেলি --- দিনের আলো থাক্তে থাক্তে।

ব্যালাউজ > ব্লাউজ।

বেল্ --- দেখুন ব্যালা।

বেল্চ্যা --- মাটি খননের জন্য কোদাল জাতিয় অস্ত্র।

বেশ্শ্যা > বেশ্যা, পতিতা।

ব্যাশর --- নোলক্।

বেহুদ্দা --- অসংযত কথা বলে এমন লোক।

ব্যাঁয়্যা --- বাঁ-হাতি লোক।

বোউ > বউ, বৌ।

বউ-ছি --- মেয়েদের বিশেষ ধরনের খেলা।

বোউদি --- ভ্রাতৃবধু। (হিন্দুরীতি)

বোউনি --- দিনের প্রথম বিক্রি।

বোউমা --- বধূমাতাকে গুরুজনের ডাক।

বোক্‌চা --- ছোট কাপড়ের পুটলি।

বোক্‌রি --- ছাগল (মাদী)

বোগ্‌র্যা > বকগুডা জেলা। 'হামার বারি বোগ্‌র্যা।

বোগ্‌দা -- বোকা লোক।

বোঁচা --- খাঁদা বা বসা নাক।

বোঁটা --- বৃন্ত।

বোটি > বটি।

বোট্‌এ্যা --- বৈঠা।

বোনি --- দেখুন বুজি।

বোন্‌ত্যা --- বোনের স্বামী।

বোর্‌কি --- দেখুন বোক্‌রি।

বোল্১ --- বোয়াল মাছ।

বোল্২ --- কথা।

বোল্‌চাল্ --- বেশি কথা বলা।

বোল্‌লা --- বোল্‌তা ।

বোলতি্চচি --- বলছে অর্থে।

বোশ্‌নে --- বসার জায়গা।

বোশ্যাক্ --- বৈশাখ মাস।

ভ

ভ- ব্যঞ্জনবর্ণের চব্বিশ বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। ওষ্ঠধ্বনি।

ভকিচোকি --- ছলচাতুরি।

ভজোগটো --- ফ্যাসাদ।

ভট্‌ভোটি --- তিন চাকার ইঞ্জিন চালিত গাড়ি, যা নছিমন নামে পরিচিত।

ভট্‌টোশ্ --- কোনো কিছু ফেটে যাওয়ার শব্দ।

ভত্‌তা > ভর্তা।

ভর্‌শা --- ভরসা।

ভশ্‌ভশা --- ঠুনকো, ভঙ্গুর। ভেতরে কিছু নেই এমন।

ভাং --- নেশা জাতীয় দ্রব্য।

ভাংমো --- ভাঙ্গবো অর্থে।

ভাইজান্ --- বড় ভাই।

ভাইশাব্ --- বড় ভাই সমতুল্য, সম্মানার্থে।

ভাক্কা --- অকাজ, ঢং। 'তুই এ্যাতো ভাক্কা কোরিশ্ ক্যা?'

ভাগা১ --- ভাপা পিঠে।

ভাগা২ --- ভাগ।

ভাউর‌্যা --- বশংবদ, তোষামদকারী, স্ত্রৈণ।

ভাতুন্ --- পান্তাভাতের পানি।

ভাতার --- স্বামী।

ভাদ্‌দোর --- ভাদ্র মাস।

ভাপ --- গরম।

ভাবি --- ভ্রাতৃবধূ।

ভার১ --- ভারী।

ভার২ --- ব্যাংসহ দুই টুক্‌রি, যা দিয়ে জিনিস পত্র বহন করা যায়

ভাল্‌লয় > ভালো নয়।

ভাল্‌ক্যা --- বাঁশের জাত।

ভালুক্ > ভল্লুক।

ভাশুর --- পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভাশা --- পাখির বাসা।

ভিঁউ --- জমি।

ভিক্ --- ভিক্ষা।

ভিক্কর্নি --- ভিখারিনী।

ভিক্ক্যা --- দেখুন ভিক্।

ভিট্এ্যা --- উঁচু জমি বা জায়গা।

ভিটি --- দেখুন ভিট্এ্যা।

ভিম্রি --- মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া।

ভুআ --- অসত্য।

ভুও[১] --- মরচে, জংধরা।

ভুও[২] --- দেখুন ভুআ।

ভুক্ --- ক্ষুধা।

ভুট্যা --- মশাল।

ভুরু --- চোখের উপর এবং কপালের নিচের লোমরাজি।

ভুল্ক্যাভাত্ --- বন্ভোজন।

ভুল্কি --- উঁকি।

ভুল্ক্যান --- উঁকি দেওয়া।

ভুশ্এ্যা --- অলস, অকর্মণ্য লোক।

ভুশ্ক্যা --- ফ্যাকাশে।

ভুশ্ভুশ্এ্যা --- নরম, ভঙ্গুর।

ভ্যাগ্ন্যা --- বোনের ছেলে।

ভ্যাছ্ত্যা --- ভাতুস্পুত্র, ভাইয়ের ছেলে।

ভ্যাজাল্ --- খাঁটি নয়।

ভ্যাদ্র্যা --- ভাদ্র মাসের গরম বোঝানো অর্থে।

ভ্যাদা --- বোকা।

ভ্যাড়া > ভেরা।

ভেন্ডি --- ঢেঁড়শ।

ভেটকি[১] --- মাছ বিশেষ।

ভেটকি[২] --- কলাকৌশল।

ভোঁকো --- বোকা ধরণের লোক।

ভোঁতা --- ধারহীন।

ভোদা ---- দেখুন ভ্যাদা।

ম

ম --- ব্যঞ্জনবর্ণের পঁচিশতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। ওষ্ঠধ্বনি। নাসিক্য ধ্বনির পর্যায়ের।

ম-ম --- মৌ-মৌ গন্ধ।

মউশুম --- ঋতু।

মওকা --- সুযোগ।

মগ্রা --- হাতের কব্জি।

মজিত্ > মস্জিদ।

মত্লোব্ > মতলব, ফন্দি।

মদ্দা --- পুরুষ।

মদ্দামি --- ক্ষমতাধর পুরুষ।

মফোশ্শোল > মফস্বল, অনুন্নত শহরাঞ্চল।

মরা --- মৃতদেহ।

মম্ > মোম্

মম্বাতি > মোমবাতি।

মলা[১] --- মর্দন করা, কানমলা।

মলা[২] --- মোয়া, মুড়ির মোয়া।

মল্লিশ্ > মজলিশ।

মশ্করা --- ইয়ার্কি, পরিহাস।

মশোল্লা > মশ্লা।

মাংগা --- হাত পাতা।

মাই --- স্তন।

মাইন্যা --- মাহিন

মাও --- মা অর্থে। স্বামী কর্তৃক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'ছকিনার মাও, ভাত দ্যাও।'

মাওক্ --- মাকে।ভ 'তোর মাওক ক।'

মাওজান্ --- দেখুন মাও।

মাক্ --- দেখুন মাওক্।

মাকুন্দ্যা --- দাড়িগোঁফহীন অর্থে।

মাগি --- মেয়ে। খারাপ মেয়ে অর্থে ও ব্যবহৃত হয়ে।

মাগ্না --- বিনামূল্যে প্রাপ্ত।

মাচ্ > মাছ

মাচাং --- বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরী উঁচু বিশ্রামের স্থান।

মাছ্তান১ > মহাস্থান (প্রাচীন পুন্ড্রনগর)

মাছ্তান২ > বখাটে।

মাজা১ > কোমর।

মাজা২ > মাজা-ঘঁষা।

মাজ্ল্যা --- মেজ।

মাট্ > মাঠ।

মাতা > মাথা।

মাতুল --- মাথা রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য বাঁশের বাতার তৈরী ত্রিকোণাকৃতি আবরণ।

মাদি --- স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে।

মান্জা১ --- দেখুন মাজা২

মান্জা২ --- ঘুড়ির সুতোতে মাজন লেপন।

মান্শে > মানুষে।

মাপ্১ --- ওজন।

মাপ্২ --- ক্ষমা।

মামু > মামা, মায়ের ভাই।

মার্বল্ > মার্বেল।

মাল্১ --- সম্পত্তি।

মাল্২ --- মদ।

মাল্৩ --- খারাপ মেয়ে মানুষ।

মালু --- মালাউন।

মাল্শা --- মাটির পাত্র বিশেষ।

মাল্কাছ্ --- লুঙ্গি নেংটির মতো পরা।

মালোই --- নারকেলের খোল।

মাশ্ক্যা --- মাস সম্বন্ধীয়।

মাশ্টোর --- শিক্ষক।

মাশি --- মায়ের বোন। (হিন্ধু রীতি)

মাএক --- মাকে (হিন্দু রীতি)

মিএ্যাঁ --- মিঞা বংশের লোক। সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। 'কী মিএ্যাঁ, কুটি যাও।'

মিএ্যাঁভাই --- বড় ভাই, সম্মানিত ব্যাক্তি।

মিচচি্এ্যানা --- অল্প একটু।

মিচ্চেনা --- দেখুন মিচ্চেনা।

মিচ্চিকোনা --- দেখুন মিচ্চেনা।

মিচ্চিরি > মিস্ত্রিরী।

মিছ্এ্যা --- মিথ্যা।

মিছাই --- দেখুন মিছ্এ্যা।

মিন্শ্যা --- স্বামী অর্থে।

মিন্মিন্যা --- দুর্বলচেতা মানুষ।

মিশ্যান্ --- মিশ্রণ।

মুক্ --- মুখ।

মুক্এ্যা --- কৌটা বা বোতলের ঢাক্নি।

মুক্টি--- মুষ্টি, মুঠোর আঘাত।

মুগরি > মুরগী।

মুচি১ --- চর্মকার।

মুচি২ --- অপরিণত কাঁঠাল।

মুছোল্লি --- নামাযে অংশগ্রহণরত ব্যাক্তিবর্গ।

মুজ্এ্যা --- মোজা, পায়ের আবরণ।

মুট্কি --- মোটা মেয়ে মানুষ।

মুটএ্যা --- এক ধরণের পিঠে, যা হাতের মুঠো দিয়ে তৈরী করা হয়।

মুত্ --- প্রস্রাব।

মুত্যা --- গোড়া।

মুন্জ্যা --- বুঁজে দেওয়া।

মুন্তিরি > মন্ত্রি।

মুর্উব্বি --- মুরুব্বি।

মুরোদ --- পৌরুষ, ক্ষমতা।

ম্যাভাই --- মিঞা ভাই।

ম্যাগ্১ --- মেঘ।

ম্যাগ্২ --- স্ত্রী।

ম্যাজাজ > মেজাজ।

ম্যাঝ্এ্যা --- মেঝে।

ম্যাদা --- অলস, অকর্মণ্য।

ম্যান্ক্যা --- দেখুন মিন্মিন্এ্যা।

ম্যান্দা --- দেখুন ম্যাদা।

মেন্দি --- মেহেদী।

মেনোত্ > মেহনত।

মেশো --- মাসীর স্বামী। (হিন্দু রীতি)

ম্যালা১ --- অনেক। 'হামার ম্যালা কাম।'

ম্যালা২ --- গ্রামীণ বা শহুরে মেলা। 'শওরোত্ বলে ম্যালা লাগিচে, যাবু না ক্যারে?'

মোংগা --- অভাব।

মোআ --- নাড়ু।

মোআজন > মহাজন।

মোউজ --- আনন্দ।

মোকোদ্দমা --- মামলা বিষয়ক।

মোচ্ --- গোঁফ।

মোছল্মান > মুসলমান।

মোট্কা --- মোটা পুরুষ।

মোট্কি১ --- মোটা মেয়ে।

মোট্কি২ --- মাটির জালা।

মোতা১ --- মুত্রত্যাগ করা।

মোতা২ --- প্রধান বা পয়লা নম্বর। লোকটা শয়তানের মোতা।

মোতা৩ --- শিকড় বা গোড়া।

মোদ্দা --- আসল।

মোদ্দুন্নী --- পুরুষালি আচরণের মেয়ে।

মোদ্দে > মধ্যে।

মোন্জা --- বন্ধ করা।

মোনা --- আদরের ডাক।

মোন্ডা --- মনটা।

মোরিচ্চে --- মারা যাচ্ছে অর্থে।

মোরিজ > মরিচ।

মোল্ --- মুকুল।

মোল্বি --- মৌলবি।

মোশ্ --- মহিষ।

মোশাএব > মোসাহেব, তোষামোদকারী।

মোশি --- মশারী।

র

র[১] --- ব্যাঞ্জনবর্ণের সাতাশতম বর্ণ। অন্তঃস্থ বর্ণ। পুর্ণমাত্রা।

র[২] --- একটু দেরি করতে বলা।

রংগিল --- রঙিন, নানা রঙের।

রওনা --- যাত্রা শুরু করা।

রবাট্ --- রাবার।

রাংতা --- চকচকে রঙিন বিশেষ ধরণের কাগজ।

রিদ > ঈদ।

রিশ্কা --- রিক্শা।

রেশ্কা --- দেখুন রেশ্ক।

রো --- মেয়েরি সম্বোধনে ব্যবহৃত। 'ক্যা রো, তোক্ কোমা আজ সোন্দর লাগিচ্চে !

ল

ল[১] --- ব্যঞ্জনবর্ণের আটাশত বর্ণ। অন্তঃস্থ বর্ণ। পূর্ণমাত্রা।'

ল[২] --- নিতে বলা।

লও --- ৯ সংখ্যা।

লওর --- ল্যাঠা, সমস্যা। 'এতে লওর তো ভাল্লয়।'

লক্শা > নক্শা। 'হ এড্যা কোমা লক্শা'।

লক্কো > লক্ষ।

লোক্কি > লক্ষী।

লগর[১] > নগর।

লগর[২] > রগড়, কৌতুক।

লজর > নজর।

লর্ভরা --- ঢিলেঢালা।

লর্ভারে --- নড়বড়ে, ঠুন্কো।

লবান্ --- নবান্ন।

লবাব --- নবাব।

লয়্যা --- নতুন।

লাং --- উপপতি অর্থে।

লাই --- লাভী।

লাইঢিল্যা --- অলস।

লাইক্যা --- নায়িকা।

লাও > নাও, নৌকা।

লাক্ > নাক।

লাকান্ --- মতো।

লাগাল্ --- হাদিস।

লাগিচ্চে --- লেগেছে অর্থে।

লাচ্ > নাচ।

লাচিচ্চে --- নাচ্ছে অর্থে।

লাজ --- লজ্জা।

লাত্তি --- লাথি।

লাদ্ --- গোবর।

লাদি > নাদি।

লাটু --- লাটিম।

লাটু --- দেখুন লাট্টু।

লাটোক > নাটক।

লাপ্ > লাফ্।

লাপিত > নাপিত।

লার --- নাড়ী।

লারকোল্ > নারকেল।

লাল্[১] --- মুখের লালা।

লাল্[২] --- লাল রং।

লালোচ্ --- লোলুপ, লোভী।

লালা > নালা।

লাশ্তা > নাশতা।

লায়ক > নায়ক।

লিক্যা --- পুনরায় বিয়ে।

লিচ্‌চে --- নিচ্ছে অর্থে।

লিচ্‌চয় > নিশ্চয়।

লিত্‌তি --- প্রতিদিন।

লিত্‌তিনি --- দেখুন লিত্‌তি।

লিত্‌পত্‌তি --- দেখুন লিত্‌তিনি।

লিব্যান্ --- নিভিয়ে দেওয়া।

লিব্যাল্‌লয় --- নেবে না অর্থে।

লিবিশ্‌টিক > লিপষ্টিক।

লুংগি --- পুরুষদের পরিধেয় বিশেষ বস্ত্র।

লুক্যা --- লুকিয়ে দেখা।

লুচ্চ্যা --- ইতর, খারাপ লোক।

লুচ্‌নি --- পাতিলের কাঁধ মোছার জন্য পাটের আঁশ বা টুকরো কাপড়ের অংশ।

লুটিশ > নোটিশ।

লুল্যা > নূলা, খোঁড়া লোক।

লুশ্যা --- অলস।

ল্যাং --- আগ বাড়িয়ে ফেলে দেওয়া।

ল্যাংটা --- উলঙ্গ।

ল্যাংরা --- খোঁড়া পুরুষমানুষ।

লেংরি --- খোঁড়া মেয়েমানুষ।

ল্যাকা > লেখা।

ল্যাজ > লেজ।

ল্যাজ্‌জো > ন্যায্য।

ল্যাটা --- সমস্যা।

ল্যাটাপারা --- পা বিছিয়ে বসা।

ল্যাতা --- ঘর মোছার ন্যাক্‌ড়া।

ল্যাদ্‌ল্যাদা --- বেশি পাকা।

ল্যাপ্ > লেপ।

ল্যাপা --- নিকানো।

ল্যাবান্‌ডুশ --- বোকা।

লেবেন্‌চুশ --- লজেন্স।

লেম্‌বু --- লেবু।

ল্যারা দ্যাওয়া --- বিছিয়ে দেওয়া।

ল্যাল্‌পা --- ভাঁড় টাইপের লোকের আচরণ।

লোক১ --- চুপ করে থাকা। 'তুই লোক্ কোরে থাক্।'

লোক২ --- লুকিয়ে দেখা। 'হামি লোক্ করে দেখিচি।'

লোক৩ --- নখ।

লোক৪ --- ব্যক্তি।

লোক্‌শি --- ঘর ঝাড়ার জন্য বাঁশের আগা।

লোগা --- লগি।

লোটি --- খারাপ মেয়েমানুষ। নটী।

লোত্‌তি --- যে দড়ি দিয়ে লাটিম ঘোরানো হয়।

লোদি > নদী।

লোনা --- নোনতা স্বাদ।

লোল্‌লি --- গলা।

লোশ্ --- না অর্থে। 'তুই ভাল্‌লোশ্।'

লোশ্‌কান > লোকসান।

শ

শ১ --- ব্যঞ্জনবর্ণের উনত্রিশতম বর্ণ। উষ্মবর্ণ। অর্ধমাত্রা।

শ২ --- একশত এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

শ৩ --- দেখুন শ২।

শওর্ --- শহর।

শওরোত্ --- শহরে।

শতো --- দেখুন শও।

শপ্ --- মাদুর।

শব্বোল্ --- শাবল, মাটি খোঁড়ার বিশেষ যন্ত্র।

শরশ্যা --- সরিষা।

শরোম্ > শরম, লজ্জা।

শরিল্ > শরীর।

শল্শলা --- পিচ্ছিল কোন বস্তু।

শলা --- কাঠি।

শলুপ্ --- রন্ধনকাযে্য ব্যবহৃত মশলাজাতীয় গাছ।

শলোক্ --- আলো।

শাওন --- শ্রাবণ মাস।

শাট্ > শার্ট, জামা।

শানান --- ধার দেওয়া।

শাম্টা --- ঝাড়ু।

শাঁরোক্ --- পাখি বিশেষ।

শিং --- গরু-মহিষের শিং।

শিংকাটা --- সিঁদকাটা।

শিক্ --- মুখের দিকে সূচালো লোহার রড়।

শিক্ট্যা --- শীতে বা ভয়ে জড়সড়।

শিগ্গিরি --- শীঘ্রই।

শিত্তি --- শীত লাগা। (জয়)

শিত্যান্ --- শিয়রের দিকে।

শিন্যা --- বক্ষ।

শিন্ট্যা --- পাটকাঠি। পাঠের আঁশ ছাড়ানোর পর যে শাদা কাঠি।

শিন্নি > শিরণী।

শিল্[১] --- পাটায় পেষার জন্য ব্যবহৃত বড় পাথর।

শিল্[২] --- বৃষ্টির সাথে আকাশ থেকে পড়া বরফের টুকরো।

শিল্যা --- শক্ত।

শিল্যাই > সেলাই।

শিব্যা --- শিকড়।

শির‍্যা --- মিষ্টি, ভেজানো রস।

শিশ্ --- ঠোঁট ও জিভ দিয়ে উৎপন্ন বাঁশির মতো শব্দ।

শুক্টি --- ক্ষীণাঙ্গী বা শীর্ণকায়া রমণী।

শুট্কি --- শুকনো মাছ।

শুত্রে দ্যাওয়া --- হাত দিয়ে মালিশ করা।

শুম্যার্ --- গণনা।

শুরজো > সূর্য।

শূর‍্যা --- ঝোল ; তরল ব্যাঞ্জন।

শুল্[১] --- বিশেষ ধরনের ব্যাথা।

শুল্[২] --- বর্শা লাগানো বাঁশের লাঠি।

শুল্পি --- দেখুন শুল[২]

শুল্টি --- সরু গলি।

শুল্লি --- দুই পাশে উঁচু জায়গার মাঝখানে দিয়ে সরুপথ।

শুরশ্যা --- দরজার খিল। (জয়)

শ্যাওলা --- শৈবাল।

শ্যার্ > সের।

শ্যাল্ > শিয়াল।

শ্যাশ্ --- শেষ।

শোংগা --- শোকানো।

শোআরি --- পাল্কী বিশেষ।

শোউরি --- শাশুড়ী।

শোউরে --- শহুরে।

শোউল্ --- মাছ বিশেষ।

শোক্টা --- কৃশকায় ব্যাক্তি।

শোকুন --- পাখি বিশেষ।

শোকর --- কৃতজ্ঞতা।

শোকর্বার --- শুক্রবার।

শোট্কা --- দেখুন শোক্টা।

শোজ্ন্যা --- গাছ বিশেষ, ঐ গাছের ডাঁটা।

শোত্রা --- গরু-মহিষের তরল খাদ্য।

শোতা --- শোয়া।

শোল্ --- দেখুন শোউল।

শোলা --- হাল্কা এক জাতীয় জলজ উদ্ভিদ বিশেষ।

শোলক্ > শ্লোক।

শোশুর > শ্বশুর।

স

স- ব্যঞ্জনবর্ণের একত্রিশতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। অল্পপ্রাণ।

সংরা --- ভায়রা ভাই (জয়)

সই১ --- সখি।

সই২ --- স্বাক্ষর।

সই৩ --- সঠিক। 'তুই যা কচ্চু, তা-ই সই।'

সওআ --- সহ্য করা।

সত্তে --- আঘাত স্থানে মালিশ করা। (জয়)

সদা১ --- বেসাতি।

সদা২ --- সারাক্ষণ।

সদ্দাই --- সেহরী (জয়)।

সমোন্দি --- স্ত্রীর বড় ভাই।

সমবার > সোমবার।

সমে > স্বামী।

সর্১ --- সরতে বলা।

সর্২ --- দুধের সর।

সরতা --- সুপারি কাটার যন্ত্র বিশেষ।

সর্কি১ --- লোহার ফলা বিশেষ।

সর্কি২ --- বাঁশের চিকন খিল দিয়ে তৈরি এক ধরনের জালি, মশা-মাছি রোধে দরজা-জানালায় ফেলে দেওয়া হয়।

সরা১ --- সরে দিতে বলা অর্থে।

সরা২ --- মাটির পাত্র বিশেষ।

সাঁজ্ব্যালা --- সন্ধ্যাবেলা।

সাদু > সাধু।

সাদ্দো > সাধ্য।

সান্দা --- ঢোকা।

সান্দানো --- ঢোকানো।

সান্দের সোমে --- সন্ধ্যার সময়। 'তুই যা, হামি সান্দের সোমে আশ্মো।'

সাঁপ > সাপ।

সিংক্যা --- সেই রকম।

সিংটালি --- হিংসুক। (জয়)

সিংগারা১ --- পানি ফল।

সিংগারা২ --- আলু-ময়দা সহযোগে ভাজা খাবার।

সিঁউই --- সেমাই।

সিদ্এ্যা --- সোজা।

সিদিন্কা --- সেইদিন।

সিন্দুর --- সিদুঁর।

সুবিদা > সুবিধা।

সুআ --- বড় সূচ।

সুক্ > সুখ।

সুর্‌তে --- দেখুন সত্‌তে।

সুল্‌লুত্‌ --- চট করে।

সোংকা --- দেখুন সিংক্যা।

সেঁতি > সিঁথি।

সেন্‌দুর > দেখুন সিন্দুর।

সোআ --- এক ও এক চতুর্থাংশ।

সোগ্‌লি --- সকলে।

সোতিন্‌ --- স্বামীর অন্য পত্নী।

সোঁত্‌ > স্রোত।

সোন্‌দোর > সুন্দর।

সোমে --- সময়।

সোমাজ > সমাজ।

সোভা > সভা।

সোর্‌তা --- এক চুমুকে খেয়ে নেওয়া।

সোর্‌দি --- কফ্‌জনিত রোগ।

হ

হ[১] --- ব্যঞ্জনবর্ণের বত্রিশতম বর্ণ। পূর্ণমাত্রা। মহাপ্রাণ বর্ণ।

হ[২] --- হতে বলা অর্থে। 'হামি দোআ করি তুই মানুষ হ।'

হনু --- হলাম অর্থে।

হমো --- হবো অর্থে।

হবোলয় --- হবে না। (জয়)

হাংকুর --- হামাগুড়ি।

হাংগে --- আমার।

হাঁই --- অতিরিক্ত ইচ্ছা। খাওয়ার হাঁই, টাকার হাঁই ইত্যাদি।

হাঁইফাঁই --- হাঁসফাঁস।

হাউশ্‌ --- সখ বা ইচ্ছা।

হাউল্যান্‌ --- মাদী ছাগল।

হাওলাত্‌ --- ঋণ।

হাকুদাকু --- তড়িঘড়ি। (জয়)

হাগা --- পায়খানা।

হাঁচোর --- আঁচড়।

হাছ্‌তান্‌ --- হাতড়ান।

হাজির --- উপস্থিত।

হাট্‌র্‌যা --- হাটুরে, যে হাটে যায় বা হাট করে।

হাটোত্‌ --- হাটে।

হাঁটকুর্‌যা --- আঁটকুড়ে, নিঃসন্তান।

হাতোত্‌ --- হাতে।

হাদিচ --- হাদিস্‌।

হাঁপ্‌ --- দেখুন হাঁই। (জয়)

হাপ্‌পিন্‌ --- হাফ্‌প্যান্ট।

হাপ্‌প্যান্‌ --- দেখুন হাপ্‌পিন্‌।

হাবা --- বোকা কালা।

হাপ্‌শ্যা --- ক্লান্ত।

হামি > আমি।

হামার > আমার।

হামাকি --- আমাকে।

হামারি --- আমারই।

হাম্‌রা > আমরা।

হামাগেরে --- আমাদের।

হামারথিনি --- আমার থেকে।

হাম্‌কি > হুমকি।

হার[১] --- গলার হাড়।

হার[২] --- পরাজিত হওয়া।

হাম্‌বোরি --- দম্ভ।

হারকিন > হেরিকেন।

হারামি --- হারাম খায় যে। গালি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

হারম্নি --- হারমোনিয়াম।

হারুপাট্টি --- পরাজিত দল।

হালুন --- যে ছ্ঝাগলের বাচ্চা হয়নি।

হাঁশ্পাতাল > হাসপাতাল।

হিঁএ্যাল্ --- ঠান্ডা। (জয়)

হিজর‍্যা --- নপুংসক।

হিঁট্যা --- হাঁটু। (জয়)

হিদ্এ্যা --- ঠিকভাবে চলার ইঙ্গিত।

হিন্জ্যার --- কেমন। 'তুই কোন্ হিনজ্যার মানুষ?'

হিনি --- থেকে।

হিশ্শ্যা --- অংশ।

হুঁচ্যা --- আবর্জনা ফেলার বিশেষ ডালি।

হুর্ক্যা --- দরজা আটকানোর লাঠি।

হুঁশোর --- সাবধান।

হে --- ক্রোধের প্রকাশ। 'তুই কে হে?'

হ্যাক্না --- গাছের মূল কান্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া ডালের প্রথম স্তর।

হ্যাতেব্যাটা --- পোষ্য ছেলে।

হেন্দু > হিন্দু।

হেমান্ --- জেদি (জয়)।

হ্যারা --- ডাকা।

হ্যারাতো --- কাছে আসার আহ্বান।

হ্যাঁল্ --- দেখুন হিঁএ্যাল্।

হ্যালা --- যে হালচাষ করে।

হ্যাঁশ্যা --- হাসুয়া।

হ্যাঁশ্যাল্ --- চুলা।

হোঁক্ --- হঠাৎ।

হোঁকর্ --- উগ্র মেজাজ। (জয়)

হোঁকা > হুঁকা।

হোঁচা --- দেখুন হুঁচ্যা।

হোদিচ --- খোঁজ।

হোবি > হবে অর্থে।

হোবে --- দেখুন হোবি।

হোবিল্লয় --- হবে না অর্থে।

হবোলয় --- দেখুন হবিল্লয়। (জয়)

হোল্দি --- হলুদ।

হোল্দ্যা --- হলুদ রং জাতীয়।

'পরিশিষ্ট-খ'*

বগুড়ার লেখক পরিচিতি

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩। গাইবান্ধা, পৈতৃক নিবাস বগুড়ায়, মৃত্যু : ১৯৯৭।

প্রকাশিত গ্রন্থ

গল্প : অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধেভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম(১৯৮৯)

উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬)।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির ভাঙা সেতু।

২. আতাউল হক

জন্ম : ১৯১৯

প্রকাশিত গ্রন্থ:

বীথিকা,অঙ্গীকার, মহানবীর অমর বাণী, রক্তশিখা, মুসলিম দর্পণ।

৩. আতাউর রহমান

জন্ম : ৮ মে ১৯২৫। বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৯৯।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গবেষণা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬৩), কবি নজরুল (১৯৬৮) নজরুল কাব্য-সমীক্ষা (১৯৭২) নজরুল জীবনে প্রেম ও বিবাহ (১৯৯৭)।

জীবনী : বেনজীর আহমেদ (১৯৯৪)।

কবিতা: দুই ঋতু (১৯৫৬) একদিন প্রতিদিন (১৯৬৫), বিষাদ নগরে আছি (১৯৯৩), সারাটা জীবন ধরে (১৯৯৪)।

৪. আবু হায়দার সাজেদুর রহমান।

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : উপন্যাস : মডেল, বিচিত্রা, কালনাগিনী।

৫. আমানুল্লাহ খান

***সূত্র:** সংকলক : সাজ্জাদ বিপ্লব "স্বল্পদৈর্ঘ্য", বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ (একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গবেষণার কাগজ),

প্রকাশিত গ্রন্থ :

সম্পাদনা : আজকের বগুড়া : অতীত ও বর্তমান (১৯৬৮), স্বাধীনতার দুই দশক, নর্দান ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

৬. আলতাফ আলী হাসু

জন্ম : ২১ অক্টোবর ১৯৫০। বগুড়া। মৃত্যু : ২ মার্চ ২০০০।

প্রকাশিত গ্রন্থ : আলতাফ আলী হাসুর নির্বাচিত ছড়া

৭. আনওয়ার আহমদ

জন্ম : ১৩ মার্চ, ১৯৪১, বগুড়া

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : রিলকের গোলাপ, মানব সম্মত বিরোধ, (১৯৯২), অঙ্গ তোমার কাব্য করে, নীল কষ্টের ডাক (১৯৯৯), প্রেম পদাবলী, ঊনষাটের পদাবলী (২০০১), ঘাটের প্রান্ত ছুঁয়ে (২০০১), অটল থাকা ধীর সুন্ন্যাস (২০০১)।

গল্প : সর্তক প্রহরা, অন্ধকারের সীমানা আন্ওয়ার আহমদের গল্প।

সম্পাদনা : পঞ্চশর,আজকের কবিতা, Selected pomes of abdul Mannan syed. একজন কবি দিলওয়ারম কবি আতাউর রহমান, একজন কবি আহমদ রফিক, একজন গল্পকার *[আবদুল মান্নান সৈয়দ]*

৮. আনোয়ারা রহমান ত্র্যানা

জন্ম : ২৭ জানুয়ারী ১৯৩৮। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : আমার বধুঁয়া (১৯৬৪)

গল্প : ঐকতান (যৌথ, ১৯৮৩), অন্তর্লীনা (১৯৯০), গল্প মঞ্জুরী (যৌথ ১৯৮৩), পুষ্পরাগ।

কবিতা : প্রিয় পংক্তিমালা (যৌথ), জননী আমার অহঙ্কার (যৌথ)

৯. আব্দুল করিম (ডাঃ)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণকাহিনী : বিলাতে একশত পঞ্চাশ দিন (১৯৭৯), পথে প্রবাসে (১৯৯৫)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণকাহিনী : বিলাতে একশত পঞ্চাশ দিন (১৯৭৯), পথে প্রবাসে (১৯৯৫)।

১০. আব্দুল মজিদ ফকীর

জন্ম : ১ মার্চ ১৯৩৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণ ও শিক্ষামূলক : ফেলে আসা দিনগুলো (১৯৯৬), স্মৃতির ভান্ডার থেকে (১৯৯৭)।

১১. আবদুল্লাহ ইকবাল

জন্ম : ২৫ জানুয়ারী ১৯৫৯।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : গোল গোল রাত (১৯৯৪)

১২. আবদুর রফিক খান

জন্ম : ১৯৪১। মণ্ডলধরণ, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : তবুওমানুষ *(প্রথম খন্ড, ১৯৯৯)*

১৩. আব্দুর রহিম বগ্‌রা

জন্ম : ১৯৫৭

প্রকাশিত গ্রন্থ :

দর্শন ও সমকালীনপ্রসঙ্গে : এ্যাঞ্জেলিক ভয়েজ (১৯৯৩) মহাপ্রলয় (২০০০), ফতোয়া : রক্তাক্ত ইতিহাস (২০০১)

ইতিহাস : বগুড়ার নওয়াব বাড়ীর ইতিহাস (১৯৯৯)

জীবনী : জিয়াউর রহমান : জীবন থেকে নেওয়া (১৯৯৯)

১৪.আবদুর রাজ্জাক

জন্ম : ০১ জানুয়ারী ১৯২৬। রাজাবাজার, বগুড়া। **মৃত্যু : ১৯৮১**।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : কন্যাকুমারী (১৯৬০)

১৫. আবদুর রজ্জাক

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কে গ্রহণ করে অস্তিত্ব আমার (১৯৯০)।

১৬. আসফউদ্‌দৌলা রেজা

জন্ম : ১৯২৬। ধানকুন্ডী, শেরপুর বগুড়া।

মৃত্যু : ১৯৮৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : অভিযোগ।

অনুবাদ : সোভিয়েত মতবাদ, রাজনীতি ও সরকার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, নিরস্ত্র সংগ্রাম।

১৭. আ. ব. ম. ফজলুর রহমান।

জন্ম : ১৯২২।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

সাহিত্য সন্দর্ভ : নগন্য।

অনুবাদ : সোভিয়েত মতবাদ, রাজনীতি ও সরকার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, নিরস্ত্র সংগ্রাম।

১৮. ইবনে মফিজ পৌন্ড্র

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : মহাস্থানের ইতিহাস (এক, ১৪০০, মহাস্থানের ইতিহাস (দুই, ১৪০১), মহাস্থানের ইতিহাস (তিন, ১৪০১)।

১৯.এ.কে.এম আব্দুর রহমান

জন্ম : ২০ আগষ্ট ১৯৪৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি (১৯৯১)।

২০.এ.কে.এম শামসুদ্দীন তরফদার

জন্ম : ১৯১৪।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : দুই শতাব্দীর বুকে : বগুড়ার ইতিহাস(১৯৭০।

২১. ড. এনামুল হক।

জন্ম : ১ মার্চ ১৯৩৭। সুত্রাপুর, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দেয় (১৯৫৭), Treasures in the Dhaka museum (1963), Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents(1968), survey of Meseum and Archaeological Education and Traning in East Pakistan (1978) , Islamic Art in

Bangladesh (1978), Catalogue of special Exibitions of Islamic Arts & crafts in Bangladesh (1983), Glimpeses of mosque of Bangladesh (1985), Bengal Sculptures : Hindu Icconography upto C. 1250 A.D (1992) ।

কবিতা : উত্তরণের দেশে (১৯৬০), হাজার তারের বীণা(১৯৬১), রাজপথ জনপথ, অস্ত্র হাতে তুলে নাও (১৯৭১), সুবর্ণ ইত্যাদি উত্তেজনা (১৯৭৮), সূর্যমূখী নদী (১৯৮১), রমনায় বৈশাখের বাঁশী (১৯৮৫), অসম্ভব ধৃষ্টতার মগ্ন (১৯৮৯), আত্মবিশ্বাসের চিতা বাঘ (১৯৯০), ভীষণ সুখের নির্যাতনে (১৯৮৭), সুবিশাল অস্থিরতা (১৯৯০), গীতি নাট্য চতুষ্টর, (১৯৯০)।

শিশুতোষ : টুকুন মনি (১৯৮৫)

২২. এফ শাহাজাহান

জন্ম : ১৯৭২

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : বর্গী এলো শেষে (১৯৯৮)

২৩.এম., তবিবুর রহমান

জন্ম : ২৭ জানুয়ারী ১৯৩৮। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : মহাস্থান গড়ের ইতিহাস ও সুলতানের জীবনী (ষোড়শ সংস্করণ, ১৯৯৪)

২৪. এম আর আখতার মুকুল

জন্ম : ৯ আগষ্ট ১৯৩০। বগুড়া

প্রকাশিত গ্রন্থ :

আত্ম জীবনী : রূপালী বাতাস (১৯৭৩) রূপালীবাতাস সোনালী আকাশ (১৯৭৫), লণ্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮১)।

প্রবন্ধ : মুজিবের রক্ত লাল (১৯৭৬), ভাসানী-মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), আমি বিজয় দেখেছি (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর (১৯৮৫) কোলকাতা কেন্দ্রিয় বুদ্ধিজীবী (১৯৮৭), নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১৯৮৭), ওরা চারজন। (১৯৮৭) লেছড়াগঞ্জের লড়াই (১৯৮৮) একাত্তরের বর্ণমালা (১৯৮৯), একুশের দলিল (১৯৯০), দু'মুখী লড়াই (১৯৯২) আমাকে কথা বলতে দিন (১৯৯৩) বাংলা নাটকের গোড়ার কথা (১৯৯৪) হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীর চোখে

নজরুল (১৯৯৪), কে ভারতের দালাল (১৯৯৫), বন্ধুবন্ধু (১৯৯৭) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), পঞ্চাশের দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন (১৩৯১), বায়ান্নোর জবানবন্দী (১৩৯২)

সম্পাদনা : বাংলাদেশের স্বাধীনতারযুদ্ধ : দলিলপত্র (একখন্ডে সমাপ্ত ১৯৮৮), স্বাধীনতার যুদ্ধের আলোকচিত্র (১৯৮৮) আমিই খালেদ মোশাররফ (১৯৯০), বিজয় একাত্তর (১৯৯১), নকশালের শেষ সূর্য (১৯৮১) বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন (১৩৯১)।

রম্য রচনা : বিচিত্র দেশে সুরমার লোক (১৯৮৪)

২৫. এম.শামসুল হক

জন্ম : ১৯৩২

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : পল্লী তরুণী (১৯৪৯), উৎসর্গ, সাজেদা, আগ্নিশিখা, ফরিয়াদ।

নাটক : শিল্পীর সাধনা মিথ্যার খেসারত।

রম্যরচনা : কৃচিৎ কিরণে দীপ্ত, আয়নায় আমার মুখ দেখি।

২৬. এস.কে.এম রোস্তম আলী কর্ণপুরী

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারী ১৯০২। মৃত্যু : ১৯৮৯।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বিশ্বকথা (১৩৩২) সমন্বয়ের বাঁশী (৯১৯৮৪), রোস্তম সোহরাব, তকবীরাতে পাকিস্তান (১৯৫২, তসবীরাতে পাকিস্তান।

প্রবন্ধ : পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী সংগঠন (১৯৪৩), বগুড়ার লোক সাহিত্য : মেয়েলী গীত (৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৫).

২৭. এস.এম রোকেয়া মাহমুদ

গল্প : ছিন্ন মালার নীল কুসুম (১৯৯৯)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : ছিন্ন মালার নীল কুসুরম (১৯৯৯)

শিক্ষামূলক : পড়ায় আনন্দ (১৯৯৯)

কবিতা : ছন্দের একগুচ্ছ

শিশুতোষ : সোনামনিরা এসো হেসে রূপকথার এই দেশে।

২৮. কাজী মোহাম্মদ মিছের

জন্ম : ১৯২৭। শিবগঞ্জ, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : বগুড়ার ইতি কাহিনী (১৯৫৭), পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের উপাদান (১৯৬১-৬২), রাজশাহীর ইতিহাস (১৯৬৫)

২৯. কাজী রব

জন্ম : ১৩ জানুয়ারী ১৯৪৭। ক্ষেতলালম বগুড়া। মৃত্যু : ৩০ এপ্রিল ১৯৯৬।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ফণিমসার-সানগ্লাস (১৯৯০), তুমি হে দুধের মাছি(১৯৯১) আবাবিল ও বিশল্যাকরণীর মার্চ-এপ্রিল (১৯৯২),পাখির পার্লামেন্ট (১৯৯৩), নক্ষত্রের নিকোটিন (১৯৯৪), চোখ এক জলের সংসার (১৯৯৭)।

৩০.কামরুজ্জামনা মাসুম

জন্ম : ৫ নভেম্বর ১৯৪৭। ক্ষেতলাল১৯৯৮।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : যুগল সংলাপ (১৯৯৩)।

৩১. কে এম শমশের আলী

জন্ম : ২১ অক্টোবর ১৯০৭। মণ্ডলধরণ, বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৯৮।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আলিম্পন (১৯৩৭), পাকিস্তানের গান (১৯৪৭),সুরের মায়া (১৯৪৮), স্বাক্ষর (১৯৪৮),সোনার কমল (১৯৫৫) রমনার কবি (১৯৬২)কল্লোল (১৯৭০), সুর ঝংকার (১৯৭৩),দীওয়ানা বা রুবাইয়াৎ-ই-শমশের (১৯৮৩)গোধূলীর রং (১৯৯১), বৈকালী (১৯৯২)।

আত্মজীবনী : নানা রঙের দিনগুলো (১৩৯১)

৩২. খন্দকার বজলুর রহীম

জন্ম : ১৯৪৩। মালগ্রামম বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : হৃদয়ের স্পন্দন (১৯৯৬) ইডিয়েট, ইয়েস ম্যাডাম (১৯৯৯), একটু ছুঁয়ে দেখি (২০০২)।

শিশু সাহিত্য : কুমীরের রাজা (২০০২), ভূতের বাড়ি (২০০২)।

৩৩. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

জন্ম : ২৩ এপ্রিল ১৯৪৯। ঢাকা। (পৈতৃক নিবাস, বগুড়া)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী (১৯৮৫), রাসোমন (১৯৮২) মিখাইলি শলোখভের প্রথম জীবনের গল্প (১৯৮৪) মিথের শক্তি ১৯৯৬।

৩৪. খাদিজা এলমিস

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : এই ফুলবন অনা জনম (১৯৯৩)

৩৫. খোদেজা খাতুন

জন্ম : ১৫ আগষ্ট ১৯১৭। মণ্ডলধরণ বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৯০।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বেদনার এই বালুচরে (১৯৬৩)।

গল্প : সাগরিকা (১৯৫৯), রুপকথার রাজ্যে (১৯৬৩), শেষ প্রহরের আলো (১৯৬৯), একটি সুর একটি গান।

প্রবন্ধ : সাহিত্য ভাবনা, আমার দীর্ঘতম ভ্রমণ।

লোক সাহিত্য : বগুড়ার লোকসাহিত্য (১৯৭০)

রম্যরচনা : আরন্য মঞ্জরী

সম্পাদনা: শতপুষ্পা (১ম খন্ড, কবিতা সংকলন ১৯৮৪; ২য় খন্ড সংকলন ১৯৮৯; ৩য় খণ্ড, প্রবন্ধ সংকলন (১৯৯০)

৩৬. খোন্দকার মুহম্মদ আজিজুল হক

জন্ম : ৯ জানুয়ারি ১৯৩৬। তালোড়া, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : অনুপম দিনগুলির মাঠে স্বর্ণ ঘোড়া। (১৯৭৩)

জীবনী: এমদাদ আলী (১৯৭০)।

গল্প : হয়তো নক্ষত্র নয় ১৯৬৫।

৩৭. খুরশীদ আলম তাপু

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : জালাময় স্বপ্ন (১৯৯৪)

৩৮. খৈয়াম কাদের

জন্ম : ২০ নভেম্বর ১৯৬৩। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : পারদ বিশ্বাস (১৯৯৯)

৩৯. গাজীউল হক

জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯। ফেনী।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

জেলের কবিতা (১৯৫৯) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৭১) Bangladesh Unchained (1971) মোহাম্মদ সুলতান (১৯১৪). Media Law & Regulations in Bangladesh (1992) বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন (১৯৯৬)

৪০. সাইফুল বারী ডাবলূ

জন্ম : ১ জুলাই ১৯৫৭। শেরপুর, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : শেরপুরের ইতিহাস (১৯৯৭)

৪১. জগলুল হায়দার আফরিক

জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর ১৯১২। বগুড়া।মৃত্য ১৯৬৯।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : বিপ্লবী নায়িকা (১৯৬৫)।

ব্যাঙ্গ কবিতা : পর্দা নশিন হাওয়া (১৯৫৩)

ভ্রমণ কাহিনী : সিন্ধু নিলাব দেশে (১৯৬০)

ভিন্ন ভাষার রচনা : সফিলসওদার (উর্দু) Call of the Red Sea (ইংরেজী)

৪২. জাঙ্গীর চৌধুরী

জন্ম : ১৯১৯। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : সোনালী প্রহর (১৩৭৫)

কবিতা : আধুনিক কোরিয়ার কবিতা (১৯৬৪) বটতলায় ঝড় (১৯৭৫)

৪৩.জি.এম হারুন

জন্ম : ৮ জুন ১৯৫০। বাদুড়তলা, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : নীল চোখে নীল যন্ত্রণা (১৯৭৩), তপ্ত শ্বাসে মৃত্যু (১৯৭৩), কন্ডাক্টর (১৯৮২), পানি মাটি বন্যা (১৯৮৮), সেই মুখ - সেই হাসি (১৯৯৩), হরিণীর বাঁকা চোখ (১৯৯৪), তুই তোকারী (১৯৯৪), যে ছিল অন্তরে (১৯৯৫)

গল্প : সরবে নীরবে (১৯৯০) অধিবৃত্তে আঁধার (১৯৯২), স্মৃতি নির্ভর (১৯৯৩) চোখের আয়তনে (১৯৯৩)।

কবিতা : ভালোবাসার একদিন (১৯৯০), মগ্ন রব মাটির প্রেমে (১৯৯০), বৃষ্টি নামে নামে না (১৯৯০) হৃদয়ের কার্ণিশে তুমি (১৯৯৩), পাপ পুণ্যহীন (১৯৯৩) নেকাবের নীচে ঘাতক ছুরি (১৯৯৩) জন্ম মম এই বঙ্গে (১৯৯২. তুমি চলে গেলে (১৯৯৬)।

ছড়া : হেই সামালো (১৯৯১) কেচ্ছা কাগু (১৯৯১) ছড়া বোল (১৯৯১) পিকলি মামা (১৯৯১), এক বস্তা ছড়া (২০০১)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : পাম্বিং ধারণা (১৯৯০),পানি চালান (১৯৯০)।

সম্পাদক : স্মৃতিতে জাল পড়ে টুপটাপ (১৯৯১)।

৪৪.**জেব-উন-নেসা জামাল**

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। মৃত্যু : ১৯৯৫।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গানের সংকলন : আমার যত গান (১৯৭৯), আরজি (১৯৮৫), গান এলো মোর মনে (১৯৯৩), জাদুর পেন্সিল (১৯৯৪), সাগরেরতীর থেকে (১৯৯৪)।

অনুবাদ : বেল সাহেবের টেলিফোন আবিষ্কার।

গল্প : হারানো দিনের গল্প (১৯৯৪)

৪৫. টিপু কিবরিয়া

জন্ম : ১১ নভেম্বর ১৯৬৬। মৃত্যু ১৯৬৬

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : টুকুর কুকুর (১৯৮৭), মনহারাতে চায় (১৯৯২), আজ নয় কাল (১৯৯৪), যেমন তেমন (১৯৯৬)।

৪৬. **তবিবর রহমান**

জন্ম : ০৮ জানুরারী ১৯৪০। মৃত্যুঃ।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণ : পশ্চিমবঙ্গে কয়েকদিন (১৯৯০)

৪৭. **তাজমিলুর রহমান**

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫। কর্ণপুর, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৬৪)

শিশু সাহিত্য : কলির জ্বিন (১৯৫০), ভাই (১৯৫২), রূপচাঁদ (১৯৫২), সুবেহ উম্মিদ (১৯৫৬) কারিগর (১৯৫৬)।

কিশোর উপন্যাস : জুলফিকারের অভিযান, সুন্দর বনে জুলফিকার, ভূতের কবলে জুফিকার।

নাটক : টোপ, অনেক আঁধার পেরিয়ে,যেমন খুশী সাজ।

৪৮.তৌফিক হাসান ময়না

নাটক : যে গল্পের শেষ নেই, যুদ্ধ স্বাধীনতার সোনাভানের পালা (১৯৯৭)।

৪৯. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

জন্ম : ১৯০৬। বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৮২।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : জীবনের জয়যাত্রা, দুর্বিপাক।

গল্প : সোনলী স্বপন, পয়সা, স্বর্গীয় পলিটিক্স

ভ্রমণ : দূরে দূরান্তরে।

শিশুতোষ : পিঁপড়ের সফর, শিশু মানস বিজ্ঞান।

প্রবন্ধ : বাঙ্গলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস (৩ খণ্ড) দিগ-দগন্ত।

অন্যান্য : অজানা দেশ, ভুলে যাওয়া দেশ, নারী সমস্যা, বাংলা শিখানো, মনীষা নির্ধারণ পরীক্ষা।

ইংরেজী : The education of Personality, Education Psychology, Method of Teaching Geography, The History of Muslim Education, psychology Analysis for everybody, the way to free Pakistan.

৫০. **নীলুফার নাসির নীলা**

গল্প : আপন বলয় (১৯৯৭)

৫১. **পান্না করিম**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আকরিক সুখ-দুঃখের জর্নাল (১৪০০ বাংলা)।

৫২. **পিয়াল খন্দকার**

জন্ম : ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : শুধু তোমাকেই ভালোবাসি (১৯৮৪) প্রেম তুমি তোমাকে (১৯৯২), ভালোবাসার তিন রং (১৯৯৩) ফিরে এসো হৃদয় আমার ১৯৯৩), ধন্যবাদ হে ভালোবাসা (১৯৯৬), শ্রাবণে শ্রাবনে তোমাকে চাই। (১৯৯৮)।

গল্প : প্রেম ও স্বপ্নের পাখিরা (১৯৯৪)

৫৩. **প্রদীপ মিত্র**

জন্ম : ১৯৫৬

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : পতাকার অহঙ্কার (১৯৯৯), দেখি সেই দগ্ধ গ্রাম (২০০১)।

৫৪. **প্রভাসচন্দ্র সেন**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : বগুড়ার ইতিহাস (২য় সংস্করণ, ১৯২৯)

৫৫. **ফজলুল আলম**

জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

Cybernatics : a subject guide (1968), Salience of Homeland Societal Polarization among Bangladesh in Britain (1988) মনের ব্যাভিচার (১৯৮৭), পরবাস (১৯৯২), প্রশ্ন থেকে যায় (১৯৯৪), ইরফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সিস্টেমস এনালিসিস (১৯৯৭)

অুনবাদ : পিটার প্যান (১৯৬৫) , সাহসিনী নারী) (১৯৬৯)

৫৬. **ফরিদুর রহমান**

জন্ম : ৩ জানুয়ারি ১৯৫৪। তলোড়া, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : উল্টো গাধার পিঠে (১৯৮৪)।

৫৭. **ফারুক সিদ্দিকী**

জন্ম : ৬ সেপ্টেম্বর **১৯৪১**। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : স্বরচিহ্নে ফুলেরর শব (১৯৭২)

৫৮. **ফারুখ ফয়সল।**

জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর **১৯৭২**। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : তার নীল চোখ (১৯৮৬)।

রাজনৈতিক নিবন্ধ : রাজধানীর রাজনীতি (১৯৮৬)

৫৯. **ফিরোজ আহমেদ**

জন্ম : ৬ ডিসেম্বর **১৯৭২**। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

দর্শন : একটি সত্য চিহ্নায়ক বয়ান (২০০১)।

৬০. **ফেরদৌসুর রহমান রিটা**

জন্ম : ১৫ ডিসেম্বর **১৯৬৮**। বগুড়া। মৃত্যু-**১৯৯৫**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : লাল চিঠি (১৯৯১)।

৬১. **বজলুল করিম বাহার**

জন্ম : ৬ সেপ্টেম্বর **১৯৪১**। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : সমকালীন কবিতার বিগবলয় (১৯৯০), নানা অনুভবে (১৯৯১), কথায় মেওয়াসকল (২০০১)।

৬২. **মতলেবুর রহমান**

জন্ম : ১.১.১৯৭২।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : অভিমানের অসুখ (১৯৯৬)।

৬৩. **মতিউল ইসলাম জিন্নাহ**

জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৯৫৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : মনের কথাগুলি মোর (১৯৯৫)

৬৪. **মনজু রহমান**

জন্ম : অক্টোবর ১৯৫৬।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : জলেরনূপুর (১৯৯৪)।

৬৫. **মফিজ চৌধুরী**

জন্ম : ১৯১৪। জয়পুরহাট, বগুড়া। মৃত্যু ১৯৯৩।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

অনুবাদ : কিং লিয়র,রোমিও জুলিয়েট, আন্তনি ও ক্লিওপেত্রা (১৯৯২)।

স্মৃতিকথা : বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভায় (১৯৯১)

৬৬. **মলয় কুমার ভৌমিক**

জন্ম : ১৯৪৬। বগুড়া মৃত্যু- ১৯৭৬।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণকাহিনী : নতুন চোখে দেখা।

গল্প : এক যে ছিল সাদাগোড়া।

৬৭. **মনোজ দাশগুপ্ত**

জন্ম : ৫ আগস্ট ১৯৭৯। বগুড়া। মৃত্যু : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : সজল বৃক্ষের দিকে (২০০০ মরণোত্তর)

৬৮. **মমতাজুর রহমান**

জন্ম : ১৯২৮। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ-গবেষণা : জেনারেল গাইট টু দি মিউজিয়াম (১৯৬৪) হোসেনশাহী বেঙ্গল : এ সোসিও পলিটিক্যাল স্টাডি (১৯৬৫), ইতিহাসের দর্শন (১৯৬৯)।

৬৯. **মহল আরা**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : সুখের সন্ধানে (১৯৯৬)

৭০. **মহসীন আলী দেওয়ান**

জন্ম : ১জানুয়ারি ১৯৩৯। জয়পুরহাট, বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৭১।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছোট গল্প : গল্পের চিড়িয়াখানা (২ খণ্ড), প্রথমা।

প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যের আধুরিক ইতিহাস, ছন্দ পরিচয়, সকলের জানা ভাল সরল অর্থনীতি (যৌথ)

নাটিকা : নীলরক্ত।

৭১. **মানিকউদ্দীন আহম্মদ**

জন্ম : ১৮৬৮। আদমদীঘি, বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৪৮।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

বিবিধ উপদেশ সম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার রচনা (১৮৯৯–) নবহীরক খনি বা ইসলাম সুহৃদ (১৯০৯), উপদেশ লহরী (১৯১৩) বাঙ্গলাশব্দ কোষ বা ছাত্র সহচর অভিধান (১৯১৪), শোকচ্ছ্বাস্ বা বিদায়গীত।

৭২. **মাফরুহা চৌধুরী**

জন্ম : ২৭ জুলাই ১৯৩৬। কাটনারপাড়া, বগুড়া। মৃত্যু

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : অরণ্য গাথা ও অন্যান্য গল্প (১৯৭৬), কোথাও ঝড় (১৯৮১), শব নিয়ে বসবাস (১৯৮৭), ছায়া পথের মানচিত্র (১৯৮৮), মাফরুহা চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প (১৯৯০)।

উপন্যাস : এক নয় সাত (১৯৯১), একদা এক দ্বীপবাসিনী (১৯৯২)।

কবিতা : এই সব অশরীরি ছবি (১৯৯৫), কাঠগড়ায় আমি ও ঝরণা (১৯৯৭), এই শরৎ এই সূর্য সংবাদ (১৯৯৮)

প্রবন্ধ : ক্রান্তি কালের ছায়ায় (১৯৮৭), সঙ্গ প্রসঙ্গ (১৯৯৩)

শিশুতোষ : একটি ফুলের জন্যে (১৯৬৬), পানিতে কখনো আগুন লাগে(১৯৮০)।

অনুবাদ : চেনা আছে জানা নেই (১৯৫৯), পাহাড় থেকে সমতলে (১৯৬৬), ছোটদের কায়েদে আজম।

৭৩. **মাসুদ কামাল**

জন্ম : ২ জুন ১৯৮২।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : উল্টো খোদার মন্ত্র (১৯৯৮)

৭৪. **মাহমুদ হোসেন পিন্টু**

জন্ম : ২৭ জুলাই ১৯৩৬। কাটনারপাড়া, বগুড়া। মৃত্যু

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কেউ নেয় না গোলাপ (১৯৯১). এসো একাকিত্বের অরণ্যে (১৪০০ বাংলা)।

উপন্যাস : কষ্টবিলাস (২০০১)

৭৫. **ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম,**

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫। কর্ণপুর, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম (১৯৬৯) বাংলাদেশ মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (অনু ১৯৬৯) মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৯৭০) BengaliMuslim Public Opinion (1976) , উচ্চ শিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ (১৯৭৬), সাময়িকপত্র জীবন ও জনমত (১৯৭৭), সমকালে নজরুল ইসলাম (১৯৮৩), আমাদের বাঙলিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ (১৯৯৪), সময়েরমুখ তাঁহাদের কথা (১৯৯৭)

সম্পদাক : বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (১৯৯০), নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গে (১৯৯১) আবহমান বাংলা (১৯৯৩)।

৭৬. **মুহম্মদ রহমতুল বারী (ডাঃ)**

জন্ম : ২৮ অক্টোবর ১৯৩৬। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : স্বপ্নের সোনালী আবীর (১৯৯১)

গল্প : বিকাউ (১৯৯১)

৭৭. **মুহম্মদ শহীদুল্লাহ**

জন্ম : ১৫ জানুয়ারী ১৯৪৭। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ভিজে মাঠের রাখাল বালক (১৯৯০), দুই প্রহরের রোদ (১৯৯৩), বাদামী বৃক্ষলিপি (১৯৯৪) বিচুর্ণ কবিতা (১৯৯৭), দূর থেকে আরো দূরে (যৌথ, ১৯৯৯)

প্রবন্ধ : কবিতা : অনুষঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯১), জহির রায়হান ও তাঁর শিল্পভূবন (২০০১)।

সম্পাদনা : কবি কাজী রব : নিবেদিত কথামালা (২০০০)।

৭৮. **মোঃ আব্দুল মজিদ**

জন্ম : ২৯ মে ১৯৩৫। শিবগঞ্জ, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : গ্রন্থণা (১৯৯১)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : গ্রন্থনা (১৯৯১)।

৭৯. **মোঃ আবদুস সালাম চন্দনী**

জন্ম : ১৯৬৪। শেরপুর, বগুড়া

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ইতিহাস : মুক্তিযুদ্ধ জাতীয়তাবোধ ও জিয়াউর রহমান (১৯৯৫)।

৮০. মো ঃ তাহমিনুর রহমান

জন্ম : ১৮ আগস্ট ১৯৫২

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ব্যবহারিক রোগরত্ত্ব (১৯৮৮), কিডনী রোগ (১৯৯০), Laboratory Tests (1993) ।

৮১. মো ঃ নুরুল ইসলাম মন্ডল

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : মনীষী একাদশ (১৯৯২)।

৮২.২মোঃ সায়েদুর রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

নাটক : বন্ধন, আর্তনাদ, রক্তাক্ত আশা (১৯৮৮)।

৮৩. **রহমান তাওহীদ**

জন্ম : ৩ অক্টোবর ১৯৮৪

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : দোল দোল দোলনি (১৯৯৮)।

৮৪. রেজাউল করিম চৌধুরী।

জন্ম : ২০ শে ভাদ্র **১৩৫৬, বগুড়া।**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ভালোমন্দের অপরাহ্ন (১৯৯১), পরাজিত শালিকের অনুশোচনা (১৯৯৩), চাঁদের হাতে তরবারি (১৯৯৪), পারদধোয়াশরীর (১৯৯৫), ভেঙে যাচ্ছে ডিমের কুসুম (১৯৯৬), স্বপ্নঘনত্বে অন্ধ উপগ্রহ –১৯৯৭), দূর থেকে আরও দূরে (যৌথ ১৯৯৯)।

৮৫. **রোমেনা আফাজ।**

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। শেরপুর বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : অভিশপ্ত (১৯৬৮), উত্তাল তরঙ্গ (১৯৭৬) কাগজের নৌকা (১৯৬৫) (১৯৬৬), ভোরের সুর্য (১৩৭৬), লেখকের স্বপ্ন (১৯৬৮) নিয়মিত চক্র (১৯৬৮), নীল আকাশ (১৩৭১), প্রিয় কণ্ঠস্বর, আলেয়ার আলো (১৯৬৭) জানিতুমি আসবে (১৩৭৩), নীলআকাশ, (১৯৭৩) দেশের মেয়ে, হারানো মানিক (১৩৬৯), শেষ মিলন (১৯৬৬), রূপালী পর্দা (১৯৭০), সোনালী সন্ধ্যা (১৩৭৬), রঙ্গীন (১৩৭২), মায়ার সংসার, কুমারী বধূ, ঘূর্ণি হওয়া অভিশপ্ত জীবন, হুসনা, পরশমনি, বাসর রাতের স্বপ্ন,মাটির মানুষ, অনির্বাণ, পদ্মকণ্যা, স্বপ্ন সাধনা, মা ও মাটি, পারুল প্রায়শ্চিত্ত, মা ও মেয়ে, স্মৃতিরেখা, স্বয়ংবরা আত্মহুতি, বিবর্তিত, বসুন্ধরা, দুলালী, পাহাড়ী মেয়ে, লাইটপোস্ট, বিদগ্ধ জননী, দুটি চোখ, ঝরা পাতা, ধূসর পৃথিবী, বড় ভাবী বাঁশীর, ভূলের শেষে পরিণতি, অভিসারিকা, সুর্যাস্ত, বধূর পরিচয়, হীরক খণ্ড, ফাঁসির মঞ্চে, বিষাক্ত তীর, প্রতিচ্ছবি, মধুমিলন, বধূ।

কিশোর উপন্যাস : মান্দী গড়ের বাড়ী।

দস্যূরাণী সিরিজ : ১২টি।

দস্যু বনহুর সিরিজ : ১৩৮টি।

সংকলন : বিশ্বনবী (স.) সম্বন্ধে অনুসলিম মনীষীদের বাণী।

৮৬. **লুৎফর রহমান সরকার**

জন্ম : ১১ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪। ফুলকোট, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

রম্যরচনা : দৈনন্দিন (১৯৬৭), সূর্যের সাত রং (১৯৭৬), জীবন যখন যেমন (১৯৮০, কতিপয় জনপ্রিয় কার্যকলাপ (১৯৮৮)

ছড়া : টিয়ে পাখির বিয়ে (১৯৭৯, নতুন বউ (১৯৮২)

৮৭.**সা'দত্ত আলী আখন্দ**

জন্ম : ১ জুলাই ১৮৯৯। চিঙ্গাশপুর, বগুড়া। মৃত্যু : ১৯৭১।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : তরুণ মুসলিম (১৯২৯), ইতিহাসের শহীদ (১৯৩৫)।

স্মৃতিকথা : যখন দারোগা ছিলাম , তেরো নম্বরে পাঁচ বছর (১৯৬৬) , অন্যদিন অন্য জীবন (১৯৬৯)।

শিশু সাহিত্য :ঈদের চাঁদ।

৮৮. **সাদী হাসান**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ভ্রমণ কাহিনী : সূর্যোদয়ের দেশ জাপান

৮৯. **শামীম কবীর**

জন্ম :১৯ এপ্রিল ১৯৭১। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : শামীম কবীর সমগ্র (১৯৯৭ মরণাত্তর)।

৯০. **শোয়েব শাহরিয়ার**

জন্ম : ০৩ জানুয়ারী ১৯৫৩। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : শোকাগুচ্ছ শে- াকগুচ্ছ (১৯৯১), অনেকদিনের বুকের উসুম (১৪০১)।

৯১.**শ্যামল ভট্টাচর্য**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

জীবন : শুনিয়েছিলেম গান ১৯৭৫)।

৯২. সাজ্জাদ বিপ-ব

জন্ম : ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ছড়া : চলো সবে লড়ি (১৯৯৫), টুকটুকাটুক(১৯৯৫), সাম্প্রতিক ছড়া (১৯৯৮)

কবিতা : পৃথিবীর তোমার নয় (১৯৯৭), কবিতাং শরগং গচ্ছামি (২০০০)

সম্পাদনা : নব্বইয়ের কবিতা : অন্য আকাশ

৯৩. **সাজাহান সাকিদার**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : শ্মশানযাত্রীর নরক উল্লাস (১৯৯৫), বত্রিশ বিঘা ধানী জমি (২০০১)।

৯৪. **সামস্ রাশীদ**

জন্ম : ৫ ডিসেম্বর ১৯২০। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : চন্দ্রাহত (১৯৭৯)।

উপন্যাস : উপল উপকূলে (১ম খণ্ড ১৯৬৯), সিন্ধু বারোয়া (১৯৭৭), মনকোরক (১৯৮১), মন প্রসূন (১৯৮২) ক্যামেলিয়া মিনেনমিস (১৯৮৫) পর্বত বুরঞ্জি (১৯৯০), প্রীতমপুর।

৯৫. **সায়রা হেলাল**

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : হৃদয় জুড়ে তুমি (১৯৯৬),কষ্টে ভেজা উপহার (১৯৯৭)।

৯৬. **সালেহা চৌধুরী**

জন্ম : ১ মে ১৯৪৩। রাজশাহী

প্রকাশিত গ্রন্থ :

গল্প : যখন নিঃসঙ্গ (১৯৬৭), উষ্ণতর প্রপাতে (১৯৯০), তাহিতি এবং অন্যান্য (১৯৯০), জোয়ী এবং জনদের গল্প (১৯৯৩)।

উপন্যাস : আনন্দ (১৯৬৯৩) বিন্নি ধানের খই (১৯৯৪), ময়ুরীর মুখ (১৯৯৬), শেষ মারবেলা।

ছড়া : জুডাস এবং তৃতীয় পক্ষ (১৯৯৮), on my visit to Bangladesh

প্রবন্ধ : সাহিত্য প্রসঙ্গে (১৯৭১) পরমা (১১৯৫), প্রবাস চিন্তা (১৯৯৮)।

কবিতা : A Broad Canvas (1997), It Grows in my Heart (2001).

৯৭. **সুজ্জাত আলী**

জন্ম : ১৯৮০। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

শিশু সাহিত্য : চাঁদের হাট।

৯৮. **সুলতানা রহমান**

জন্ম : ১৯২৪। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

জীবনী : বুলবুল চৌধুরী (১৯৬২, বুলবুলচৌধুরীর বাল্যজীবন

শিশুতোষ : কাকের ছা বকের ছা (১৯৬২), আমাদের মহানবী, বুলবুল।

৯৯. **সৈয়দ আনোয়ার হোসেন**

জন্ম : ৫ নভেম্বর ১৯৪৭। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ-গবেষণা : বাংলাদেশে স্বধীনতার যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা (১৯৮২) বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব (১৯৮৫) প্রাচীন চীন সভ্যতা (১৯৮৬), ক্রান্তিকালের বাংলাদেশঃ নব্বইয়ের গণঅভূত্থান থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র উত্তরণ (১৯৯৩), বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও বর্হিবিশ্ব (১৯৯৪)বাংলাদেশেল গনতন্ত্র : আশা-নরাশার দোলচল (১১৯৪)), বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্ব (১৯৯৫), বাংলাদেশ : সংকট-সংলাপের রাজনীতি (১৯৯৫), বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব (১৯৯৬), বাংলাদেশ-৯৬ : রাজনৈতি ও পররাষ্ট্রনীতি (১১৯৭), Back to Africa Movement (1983), Administration of India 1858-1924 (1984) Superpowers and Security in Indian Ocean : A south Asian perspective (1991)

সম্পাদনা : বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন (১৯৮৬), বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চা (১৯৮৭), সমাজতন্ত্রের সঙ্কট : নানা চোখে দেখা (১৯৯২), Bangladesh Studies : Politics Administration, Rural Development and Foreign Policy (1985), Poland : Yesterday, Today & Tomorrow (1990),

১০০. স্বাতী রহমান

জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ

গল্প : বিউগল (১৯৮৯), বনভূমি (১৯৯১), গল্পমঞ্জুরী যৌথ, ১৯৯৬)।

কবিতা : জননী আমার অহঙ্কার (যৌথ)।

১০১. হাবিবুল্লাহ জুয়েল

জন্ম : ২২ নভেম্বর ১৯৭০।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা : কুয়াশার চাষ (১৪০০)।

১০২. হাসনা আকরাম

জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। জয়পুরহাট, বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা : সংবর্তীকা (১৯৮৩)।

গল্প : হাসি কাশি বিড়ালী (১৯৭৮)।

উপন্যাস : এক পলকে (১৯৭৪), এক নদীর দুই কিনারা (১৯৭৪)।

শিশুতোষ : ছবি দেখে ছড়া (১৯৭৮). রঙ্গিন প্রজাপতি (নাটিকা, ১৯৭৯)।

১০৩. হোমায়রা নাজনীন সোমা

জন্ম : ৪ অক্টোবর ১৯৬১। বগুড়া।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা : অরণ্যের ভেতরে পা (১৯৮৩). বিষাক্ত ফুলে মধু (১৯৮৯). জননী আমার অহঙ্কার (যৌথ)।

গল্প : ঐকতান (১৯৮৩), গল্পমঞ্জুরী (যৌথ, ৪র্থ খণ্ড)।

পরিশিষ্ট-গ*

বগুড়া জেলার লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট কাগজ

[লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট কাগজ-এর আত্মপ্রকাশ ষাট দশকের প্রথমার্ধ থেকে। মূলত এগুলি সবই সাহিত্য পত্রিকা। এর চরিত্র এরকম: তরুণদের দ্বারা সম্পাদিত, অনিয়মিত এবং স্বল্পজীবী]

বিপ্রতীক। বগুড়ার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন। কবিতা পত্রিকা। সম্পাদক: মহাদেব সাহা, কাজী রব ও ফারুক সিদ্দিকী। প্রথম প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ১৯৬৭। সংখ্যা : ৩৫।

পদধ্বনি। বগুড়ার দ্বিতীয় লিটল ম্যাগাজিন। কবিতা পত্রিকা । সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মনোজ দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৭। সংখ্যা : ৩।

স্বরক্ষেপ। সম্পাদক: নুর মোহাম্মদ তালুকদার ও নূরুল হক। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৬৭। সংখ্যা: ১।

অবেলা। সম্পাদক: শাহ্নুর খান ও আরেফ উল ইসলাম। প্রকাশকাল: এপ্রিল ১৯৬৮। সংখ্যা: ১।

অপরাহ্ন। সম্পাদ :সাইফুল ইসলাম, সা.ম.হেদায়েতুল্লাহ ও রেজাউল করিম চৌধুরী। প্রকাশকাল: ১৯৬৮। সংখ্যা: ১।

লাল সূর্য। সম্পদাক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল : ১৯৬৯। সখ্যা: ১।

উদয়ন। সম্পাদক: এমদাদুল কবির সিদ্দিকী। প্রকাশকাল : ১৯৬৯। সংখ্যা: ১।

নতুন দিন। সম্পাদক : আমানুল্লাহ খান। প্রকাশকাল: ১৯৭০।

করতোয়া। সম্পাদক : খাজা জহরুল হক। প্রকাশকাল : ১৯৭০।

সোনারকাঠি। সম্পাদক :তাইফুল ইসলাম তোফা। প্রকাশকাল : ১৯৭০।

প্রাচী। সম্পাদক : মোহাম্মদ শাহ্আলম। প্রকাশকাল: ১৯৭২।

রক্তশব্দ। সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল : ১৯৭৩। সংখ্যা: ১।

শব্দাবলী। সম্পাদক : স্বপন গুহ রায়। প্রকাশকাল : ১৯৭৪। সংখ্যা : ১।

অনুকাল। সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল : ১৯৭৪। সংখ্যা: ২।

জল পড়ে পাতা নড়ে। সম্পাদক :তোফাজ্জল হোসেন জিন্নাহ॥

*__সূত্র:__ গ্রন্থনা: সাজ্জাদ বিপ্লব "স্বল্পদৈর্ঘ্য", বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ (একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গবেষণার কাগজ),

প্রকাশকাল : ১৯৭৪ । সংখ্যা : **১** ।

ইতল বিতল । সম্পাদক : মনজু রহমান । প্রকাশকাল : **১৯৭৪** ।

তূণ । সম্পাদক : জি. এম. হারূন । প্রকাশকাল : ১৯৭৫ ।

জন্মভূমি । সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম । প্রকাশকাল : **১৯৭৫** ।

স্বাক্ষর । সম্পাদকমোজ্জামেল হক । প্রকাশকাল :**১৯৭৫** । সংখ্যাঃ **১** ।

অর্কেস্ট্রা । সম্পাদক :রেজাউল করিমচৌধুরী ও মুহম্মদ শহীদুল্লা ।

প্রকাশকাল : **১৯৭৬** ।মোট সংখ্যা :৮

শাদাশার্ট । সম্পাদক :মোস্তফা নূরউল ইসলাম ও মাহমুদ হাসান ।

প্রকাশকাল : **১৯৭৬** । সংখ্যা : **১**

আঁচল । সম্পাদক : জি.এম.হারূন । প্রকাশকাল : **১৯৭৮** ।

আত্মপ্রকাশ । সম্পাকদ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। প্রকাশকাল : **১৯৭৯** ।

সংখ্যা : ৩ ।

প্রেম । সম্পাদক : কবি রব প্রকাশকাল : **১৯৮০** । সংখ্যা :**১**

অনড় । সম্পাদক : মনজু রহমান, রায়হান রাহমান ও আব্দুল কুদ্দুস ।

প্রকাশকাল : **১৯৭৬** । সংখ্যা : ৪ ।

চিরকুট । সম্পাদক :তোফাজ্জল হোসেন । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

সংখ্যা : **১** ।

এ্যালবাম । সম্পাদক : মনজু রহমান । প্রকাশকাল : **১৯৭৪** ।

সংখ্যা : **১৮** ।ৎ

শতবর্ষী । সম্পাদক : আবদুর রাজ্জাক । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

সংখ্যা : ৭ ।

নিঃস্বন । সম্পাদক : রেজাউল করিম চৌধুরী । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

সংখ্যা : **১** ।

সারাক্ষণ । সম্পাদক মনজু রহমান ও রায়হান রাহমান । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

যুগল জানালা । সম্পাদক : মনজু রহমান । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

যন্ত্রণা । সম্পাদক : মাহমুদ হাসান । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

অন্তরঙ্গ । সম্পাদক: বাদল চৌধুরী । প্রকাশকাল : **১৯৮০** ।

সোমবার । সম্পাদক : বাদল চৌধুরী । প্রকাশকাল: **১৯৮০** ।

অবসর। সম্পাদক: জি.এম হারুন। প্রকাশকাল: ১৯৮০।

দিশারী। সম্পাদক: আখতার ফরহাদ জামান। প্রকাশকাল : ১৯৮০।

চিত্রক। সম্পাদক: এস.বি. আখতার। প্রকাশকাল : ১৯৮০। সংখ্যা: ২।

ময়ুখ। সম্পাদক: কে.এম শমশের আলী। প্রকাশকাল: ১৯৮০। সংখ্যা: ১।

বাংলা সাহিত্য সারণী। সম্পাদক: মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। প্রকাশকাল: ১৯৮০।

দীপান্বিতা। দীপান্বিতা। সম্পাদক: অশোক ভৌমিক। প্রকাশকাল : ১৯৮০।

দ্যুতি। সম্পাদক: জয়ন্ত দেব। প্রকাশকাল : ১৯৮১।

সিম্ফনী। সম্পাদক মনসুর-উর-রহমান ও তৌহিদ আহমদ। প্রকাশকাল : ১৯৮১।

পিঙ্গলিকা। সম্পাদক: সুলতান মোহাম্মদ আরিফ। প্রকাশকাল: ১৯৮১।

চোখ। সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। প্রকাশকাল : ১৯৮২।

ঝুলন। সম্পাদক: আবু সাঈদ। প্রকাশকাল : ১৯৮২।

সচেতন। সচেতন। সম্পাদক: শের আফগান শেরা। প্রকাশকাল: ১৯৮২।

উত্তর। সম্পাদক : সাগর বসাক। প্রকাশকাল : ১৯৮২।

বিতর্ক : সম্পাদক : মীর সাজ্জাদ আলী সন্তোষ। প্রকাশকাল: ১৯৮২।

কপোতী। সম্পাদক : তোসাদ্দেক হোসেন। প্রকাশকাল: ১৯৮৩।

চত্বর। সম্পাদক : শেখ ফিরোজ আহম্মেদ। প্রকাশকাল: ১৯৮৩।

মর্মর। সম্পাদক: মাহ্মুদুল আলম নয়ন। প্রকাশকাল: ১৯৮৩।

ইদানীং। সম্পাদক: আতিকুর রহমান। প্রকাশকাল: ১৯৮৩।

সুমেরু। সম্পাদক : আন্ওয়ারুল করিম দুলাল ও মুহম্মদ মতিয়ার ।

প্রকাশকাল : ১৯৮৪।

অনির্বাণ। সম্পাদক : শেখ ফিরোজ আহমেদ বাবু। প্রকাশকাল :১৯৮৪

প্রতিধ্বনি । সম্পাদক : রেজাউল মতিন। প্রকাশকাল : ১৯৮৪।

উত্তর নক্ষত্র। সম্পাদক : আনোয়ারা রহমান। প্রকাশকাল। ১৯৮৪।

হেঁটে যাচ্ছি । সম্পাদক : সৈয়দ কামরুল মাহমুদ। প্রকাশকাল : ১৯৮৪।

হায়রে একুশ। সম্পাদক : পুটু আখতা। প্রকাশকাল : ১৯৮৪।

এবং। সম্পাদক : রায়হান রাহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

ও। সম্পাদক : রায়হান রাহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

অমিত। সম্পাদক : সৈয়দ সারোয়ার। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

ঐতিহ্য। সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ও বজলুল করিম বাহার। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

অবাধ্য বাতাস। সম্পাদক : জামিলুর রহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

সম্প্রতি। সম্পাদক : খোরশেদ আলম আপেল। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

রক্তিম সুর্য। সম্পাদক : সুকুমার দাস। প্রকাশকাল : ১৯৮৫।

চেতনা। সম্পাদক : রায়হান রাহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৬।

ভোরের আলো। সম্পাদক : মোস্তফা তারিক। প্রকাশকাল : ১৯৮৬।

মল্লিকা। সম্পাদক : আজিজুর রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৭।

কবি । সম্পাদক : আজিজুর রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৭।

সকাল। সম্পাদক : মোফাজ্জল হক। প্রকাশকাল : ১৯৮৭।

দুর্জয়। সম্পাদক : রায়হান রাহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৭।

মনোসরণী। সম্পাদক : তোফাজ্জল হোসেন। প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

প্রজন্ম। সম্পাদক : রেদওয়ানুল কবির। প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

সমকাল। সম্পাদক : সাব্বির সানজিদ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

কাকতাড়ুয়া। সম্পাদক : সালেহ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ । প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

খেয়া। সম্পাদক : আশীষ- উর-রহমান শুভ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

আনন্দ আনন্দ। সম্পাদক : কাবিদুল ইসলাম স্বাধীন। প্রকাশকাল : ১৯৮৮।

ঈক্ষণ। বুগড়া লেখক চক্রের মুখপত্র। সম্পাদক : শেখ ফিরোজ আহমেদ, আরিফ রেহমান, পান্না করিম, সুপাহ মল্লিক (পর্যায়ক্রমে)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯।

পথ। সম্পাদক : ফখরুল আহসান। প্রকাশকাল : ১৯৮৯।

অনামিকা । সম্পাদক : আজিজার রহমান। প্রকাশকাল : ১৯৮৯। সংখ্যা :১৫

তুমি। সম্পাদক : আজিজার রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮। সংখ্যা : ৫

হৃদয় অম্লান। সম্পাদক : আজিজার রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮। সংখ্যা : ৫

কবিতায় বঙ্গবন্ধু। সম্পাদক : আজিজার রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮। সংখ্যা : ১৫।

ধূপশিখা। সম্পাদক : আজিজার রহমান তাজ। প্রকাশকাল : ১৯৮৮। সংখ্যা : ৬।

সংবিৎ । সম্পাদক : নূরন্নবী। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

প্রচ্ছায়া। সম্পাদক : আলতুনিয়া টুটু। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

দ্যোতনা। সম্পাদক : কমল লোদী। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

দরুদ। সম্পাদক : প্রতীক নজরুল। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

নিসর্গ। সম্পাদক : প্রতীক নজরুল। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

দ্রষ্টব্য। সম্পাদক : সরকার আশরাফ। প্রকাশকাল : ১৯৯০।

দীপ্তি। সম্পাদক : সৈয়দা তানজিলা আফরোজ। প্রকাশকাল : ১৯৯১।

প্রবাল। সম্পাদক : সাহাব উদ্দিন হিজল : ১৯৯২।

সংবর্ত। সম্পাদক: শের আফগান শেরা। প্রকাশকাল : ১৯৯২।

মাইলস্টোন। সম্পাদক : আবদুল্লাহ ইকবাল। প্রকাশকাল : ১৯৯২৫।

এক ঝাঁক জোনাকি। সম্পাদক : রহমান তাওহীদ। প্রকাশকাল : ১৯৯২।

অতিক্রম। অতিক্রম। সম্পাদক : আবদুল্লা ইকবাল। প্রকাশকাল : ১৯৯৩।

প্রাবৃষ্য। প্রাবৃষ্য। সম্পাদক : রেজাউল করিম রাজু। প্রকাশকাল : ১৯৯৪।

নোয়াজার্ক। সম্পাদক : আবদুল্লাহ ইকবাল। প্রকাশকাল : ১৯৯৫।

পংক্তি। সম্পাদক : সাজ্জাদ বিপ্লব। প্রকাশকাল : ১৯৯৭।

বিকেল। সম্পাদক : সাজ্জাদ বিপ্লব। প্রকাশকাল : ১৯৯৭।

নেমেসিস। সম্পাদক : খৈয়াম কাদের। প্রকাশকাল : ১৯৯৭। সংখ্যা : ৩।

উৎসর্গ। সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল : ১৯৯৮।

সংখ্যা : ১৮।

স্বল্পদৈর্ঘ্য। সম্পাদক : সাজ্জাদ বিপ্লব। প্রকাশকাল : ১৯৯৮।

প্রতীতী। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম রিমু। প্রকাশকাল : ১৯৯৮।

লেখক। সম্পাদক : গাজী সারোয়ার। প্রকাশকাল : ১৯৯৮। সংখ্যা : ৪।

শ্বাশ্বত বাংলার মুখ। শেরপুর সাহিত্য চক্রের মুখপত্র। সম্পাদক : স্বর্গীয় দ্বীপঙ্কর চক্রবর্তী, আজিজুল হক,এস.এম.বেলাল হোসেন। প্রকাশকাল : ১৯৯৮।

পুণ্ড্রতোয়া। সম্পাদক : আব্দুর রশীদ । প্রকাশকাল : ২০০০।

পরমা । সম্পাদক টুটুল রহমান। প্রকাশকাল : ২০০০।

দোআঁশ। সম্পাদক : ইসলাম রফিক। প্রকাশকাল : ২০০১।

সুবিল। সম্পাদক : অজন্ত সুজন। প্রকাশকাল : ২০০২।

জলচাপ। সম্পাদক :লিটন সাহা। প্রকাশকাল : ২০০২।

থার্ডম্যাগ। সম্পাদক : এমরান কবির। প্রকাশকাল : ২০০০।

ছাড়পত্র। সম্পাদক: এস.আই শামীম। প্রকাশকাল: ২০০০।

মাটি ও মানুষ। সম্পাদক: রায়হানুল ইসলাম। প্রকাশকাল: ২০০৪।

টাপুর টুপুর। সম্পাদক: মোহাম্মদ জোবায়ের। প্রকাশকাল: ২০০৫।

পলাশ। সম্পাদক: শহীদুল ইসলাম। প্রকাশকাল: ২০০৫।

কবিকথা। সম্পাদক: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল: ২০০৭।

সময়ের ডাক: সম্পাদক: সুকুমার দাস। প্রকাশকাল: ২০০৮।

ডামি এডিশন। সম্পাদক: মাইনুল ফারুক ও অমিত রেজা চৌধুরী। প্রকাশকাল: ২০০৮।

সৃজন। সম্পাদক : অমিত রেজা চৌধুরী । প্রকাশক : ২০০৮।

প্রতিকাগজ। সম্পাদক : মাহমুদ হোসেন পিন্টু। প্রকাশকাল ২০০৮।

উদ্যান। সম্পাদক : তৌফিক জহুর। প্রকাশকাল : ২০০৮।

ঘুড়িঘর। সম্পাদক : আবু সাইদ অরুণ। প্রকাশকাল : ২০০৮।

আঁতুরঘর। সম্পাদক : কামাল আহসান। প্রকাশকাল : ২০০৮।

সুতারাং। সম্পাদক : মাহমুদ শাওন। প্রকাশকাল : ২০০৮।

বালুবেলা। সম্পাদক : এস.এম. শাহজাহান। প্রকাশকাল : ২০০৮।

হৃদয়ে স্বাধীনতা। সম্পাদক : এস. এম. শাহজাহান। প্রকাশকাল : ২০০০।

রোদ। সম্পাদক। নূরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রকাশকাল : ২০০৯।

বায়াতান। সম্পাদক : সাহাব উদ্দিন হিজল। প্রকাশকাল : ২০১০। সংখ্যা।

লিথি। সম্পাদক : সাকিব হাসান। প্রকাশকাল : ২০১১।

বঙ্গপ্রভা। সম্পাদক : কবি ধূমকেতু। প্রকাশকাল : ২০১১।

সাহিত্য প্রাঙ্গণ। সম্পাদক : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রকাশকাল : ২০১২।

সংখ্যা : ৪।

নিজকল্লা। সম্পাদক : কাবীর রানা। প্রকাশকাল : ২০১২।

অভিজন। সম্পাদক : ঈশান সামী। প্রকাশকাল : ২০১২।

অ আ। সম্পাদক : রবিউল আলম অশ্রু। প্রকাশকাল : ২০১২।

শিল্পস্বর। সম্পাদক : অচিতন্ত্য অরণ্য। প্রকাশকাল : ২০১২।

বিবর। সম্পাদক : প্রান্তিক অরণ্য। প্রকাশকাল : ২০১৩।

অর্কিড। সম্পাদক : নাহিদ হাসান রবিন। প্রকাশকাল : ২০১৩।

আচঁড়। সম্পাদক : নাহিদ হাসান রবিন। প্রকাশকাল : ২০১৩।

অপারাজিত। সম্পাদক : নাহিদ হাসান রবিন : প্রকাশকাল : ২০১৩।

প্রভাত মেঘ। সম্পাদক : মঞ্জুরুল ইসলাম মেঘ। প্রকাশকাল : ২০১৩।

মজার বগুড়া। সম্পাদক : মঞ্জুরুল ইসলাম মেঘ। প্রকাশকাল : ২০১৩।

জগতী। সম্পাদক : পান্না করিম। প্রকাশকাল : ২০১৪।

একুশের স্মরণপত্র। সম্পাদক : জে .এম. রউফ। প্রকাশকাল : ২০১৪।

সৃষ্টি। সম্পাদক : জিহাদ হোসেন। প্রকাশকাল : ২০১৪।